

কান্তিক প্রেମ

২২, স্কিয়া ষ্ট্রিট- কলিকাতা ।

শ্রীকালচাঁদ দালাল কল্লুক মুদ্রিত

২১০-৩-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট, কলিকাতা,

প্রবাসী-কার্যালয় হইতে

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বপুরুষগণ

মজিলপুৰ গ্রাম।—কলিকাতা সহবেব প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূৰ্ণ কোণে সুন্দৰবনের উত্তৰ প্রান্তে মজিলপুৰ নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা প্ৰসিদ্ধ জয়নগৰ গ্রামেৰ পূৰ্বপার্শ্বে অবস্থিত। ইহাতে ব্ৰাহ্মণ কাৰ্ষ্বেবই অধিক বাস। তদ্রলোকদিগেৰ বাসস্থান ইহাতে দুবে গ্রামেৰ পাৰ্শ্বে কামাব, কুমাব, ধোপা, নাপিত, হাড়ি, মুচি প্ৰভৃতিৰ বাস আছে। কিন্তু তাহাদেৰ সংখ্যা বড় আধিক নয়, গ্রামবাসী ব্ৰাহ্মণ-কাৰ্ষ্বেদিগেৰ কাৰ্যা-নিৰ্বাহেৰ উপযুক্ত। গ্রামথানিৰ ইতিবৃত্ত জানি না; অনুমান কৰি, এককালে গঙ্গা এই পথে বহুমানা ছিল * এবং গ্রামথানি গঙ্গাৰ চড়াৰ উপৰ প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে। পোৰ্তুগিজ্জেৰা যখন এদেশে আসে তখন এই পথে আসিয়াছিল কি না ঠিক বলিতে পাৰি না; কিন্তু প্ৰাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ও পোৰ্তুগিজ্জেৰা যাত্ৰাবিবৰণে “ময়দা” নামক একটা গ্রামেৰ উল্লেখ দেপা যায়; এই মজিলপুৰেৰ কয়েক ক্ৰোশ উত্তৰ-পূৰ্বে “ময়দা” নামে এক গ্রাম এখনও বিজ্ঞমান আছে। ইহাতে অনুমান কৰা

* “এখনও মজিলপুৰ ও জয়নগৰ এই উভয় গ্রামেৰ মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ডকে ‘গঙ্গাৰ বাদা’ বলে; এবং এখনও আমাদেৰ গ্রামেৰ সমুদয় পুৰণিগাঁৱ অল পৰিষ্কাৰ গঙ্গাজল বহিয়া গণ্য হয়।”—গ্ৰন্থকাৰেৰ হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা।

বায়ু, পোর্ভুগিজেরা এই পথেই আসিয়া থাকিবে। গ্রামের পার্শ্বে মাঠে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভগ্ন জাহাজ ও বোটের নিদর্শন স্বরূপ অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও অনুমান হয়, এক সময় এই পথে জাহাজাদি চলিত। এইরূপে, গ্রামখানি যে বহুকালের নয় তাহাব অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

মজিলপুরের বৈদিক ব্রাহ্মণবংশ।—এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, যে, জাহাজীব বাদসাহ সময় যখন বাজা মানসিং যশোব নগর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু দত্ত নামক একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোক, সপরিবারে যশোব বিভাগ হইতে পলায়ন করিয়া, ঐ চড়াব উপবিস্থিত গ্রামে সুন্দরবনের ভিতরে আসিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। * তাঁহাব সহিত তাঁহাব যজ্ঞপুত্রোহত ও কুলগুণক শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাবই প্রদত্ত এক সামান্য ভূমিখণ্ডে আপনাব বাসস্থান নির্দেশ করেন। তিনিই আমাদের পূর্বপুরুষ। এই শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা কে, এবং কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, তাহাব সর্বিশেষ বিবরণ জানি না। যশোব হইতে আসিয়াছিলেন বলিলে মনে হইতে পারে তিনি পূর্বদেশের লোক, কিন্তু তাহা নহে। আমবা দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধক শ্রেণীব ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদ হইতে বৈদিক নামেব উৎপত্তি। তন্নিম্ন উদগাতা উপাধিটিও বৈদিক সম্পর্ক হুচনা করিতেছে। বৈদিক ঋত্বিক-গণের মধ্যে হোতা পোতা অধ্বর্যু ও উদগাতাব উল্লেখ দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এখনও বৈদিক শব্দ একশ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুক্ত দেখা যায়। যাহাবা ধর্ম্মেব যজনযাজন লইয়া থাকেন তাঁহারা “বৈদিক”, আব যাহাবা বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত হন তাঁহারা

* “চন্দ্রকেতু দত্তের পরিবারগণ এখনও আছেন। তাঁহারা মজিলপুরের দত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।”—গ্রন্থকারের হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা।

“লৌকিক”। তদ্ব্যতীত এখনও সে-সকল প্রদেশে অনেক স্থানে বৈদিক প্রণালীতে হোমাদি ক্রিয়াকাণ্ডের রীতি প্রচলিত দেখা যায়। তন্মিত্ত এইরূপ বহু বহু ব্রাহ্মণ আছেন, যাহারা বেদগান, বেদমন্ত্রপাঠ ও হোমাদিরূপ বৈদিক কার্যের অনুষ্ঠানাদিকে জীবনের প্রধান কার্য্য করিয়া রহিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ উপলক্ষে গোদাবরী-তীরে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

“বৈদিক ব্রাহ্মণ সব কবেন বিচার,—

এই সন্ন্যাসীও তেজ দেখি ব্রহ্ম সম,

গুণে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।”

অতএব মনে হয় যে, হয় শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা, না হয় তাঁহার পূর্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া থাকিবেন। আমাদের বংশে এরূপ প্রবাদ আছে যে ইহঁদের পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যাতে এখনও “ওতা” নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। এই “ওতা” শব্দ হোতা কি উদগাতার অপভ্রংশ কি না বলিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা হইতে আমি নবম পুরুষ পবে।

কৌলিক ব্যবসায় :—এই বংশের ব্রাহ্মণগণ মজিলপুর গ্রামের মধ্যভাগ ছাইয়া ফেলিয়াছেন। এই বাৎস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আবহমান কাল কেবল যজ্ঞ যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন কার্য্যে রত থাকিয়া গৌরবান্বিত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন। যতদূর স্মরণ হয়, এই বংশে আমার পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বাঙ্গে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে পণ্ডিতী ক্রম লইয়া সকলের অগ্রিম হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে আমার জাতিবর্গের মধ্যে কেহ রাজসেবা করেন নাই।

প্রণিভামহ।—বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও তৎপূর্ব শতাব্দীর

শেষ ভাগে আমাদের স্ববংশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক সময়ে একই গ্রামে ১০।১২ খানি টোল চতুষ্পাঠী ছিল। তন্মধ্যে আমাদের প্রপিতামহ স্বর্গাষ বামজয় শ্রায়ালঙ্কার মহাশয়ের একখানি। তিনি একশত তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহাকে আমি ১০।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে আমার বাল্যজীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাব কথা অনেক বলিতে হইবে।

পিতামহী।—আমার পিতামহ মহাশয় স্বগ্রামেই কাশ্মাষণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কাশ্মাষণ বংশীয়গণ বড় অহঙ্কৃত ও তেজো মান্নুষ ছিলেন। আমার পিতামহী ঠাকুরাণী লক্ষ্মীদেবী সেই বংশের কন্যা। তিনিও অতিশয় তেজস্বিনী নারী ছিলেন। আমাদের গৃহে একপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহার দবে একবার চৌন ছকিয়া নিদ্রিতাবস্থায় তাহার কণ্ঠদেশ হঠাৎ হঠাতে কণ্ঠাভরণ হরণ করিবাব চেষ্টা করিতেছিল; তিনি তথাৎ জাগত হইয়া একপ বলর সহিত চোবের হাত ধরিলেন, যে, তাঁহার হস্ত হঠাতে নিকৃতি পাওয়া তাব পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। অনেক টানাটানির পব চোব কোনও মতে নিকৃতি পাইল।

আব-একটি গল্প ইহা অপেক্ষাও অধিক সাহস ও প্রত্যাশপন্নমতিত্বের পবিচায়ক। সেটি এই। সকালে আমাদের গ্রামে শীতকালে মধ্যে মধ্যে বাঘ দেখা দিত। গ্রামটি সুন্দরবনের মধ্যেই বলিলে হয়। কয়েক ক্রোশের মধ্যে আকাত জঙ্গল ছিল। গ্রামের চতুষ্পার্শেও বন-জঙ্গল যথেষ্ট ছিল। সুতবাং বাঘের আসা কিছুই বিচিত্র ছিল না। এই কারণে এই নিরম প্রবর্তিত হইয়াছিল, যে, একশাখাভুক্ত চাবি পাঁচ পবিবার একত্র বাস করিয়া সমগ্র পাড়াটী এক বড় প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া বাধিত; সম্মুখের দ্বার এক, খিড়কীর দ্বার ভিন্ন ভিন্ন। এই বন্দোবস্তে কাজ-কর্ম চলিত। আমাদের কয়েক ঘর জাতির সহিত আমাদের বাড়ীটী এইরূপ

এক প্রাচীবে আবদ্ধ ছিল। একদিন শীতকালে সন্ধ্যাব প্রাকালে আমাব পিতামহ সাংসন্ধ্যা কবিতা খড়ম পায়ে উঠানে বেড়াইতেছেন, প্রপিতামহ-দেব সাংসন্ধ্যাতে নিমগ্ন আছেন, পিতামহী ঠাকুবাণী বন্ধনশালাতে পাককার্যে বত আছেন, এমন সময়ে পার্শ্বের প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে “বাঘ, বাঘ” চাৎকাব উঠিল। পিতামহ মহাশয় কোতূহলাক্রান্ত হইয়া দৌঁধাব জন্ত সেদিকে উঁকি মাবিলেন, অমনি বাঘেব সঙ্গে চোকাচোকা। তিনি চাৎকাব কবিতা বলিলেন, “বাবা, সত্যি ত বাঘ, আমাকে নিলুে যে!” প্রপিতামহ বলিলেন, “দাঁড়িষে থাক্, পিছন ফিবিস না।” অমনি যিনি যেখানে যে কাজে ছিলেন, সকলেই আমাব পিতামহেব বক্ষাব জন্ত ছুটিয়া আসিলেন। পিতামহী ঠাকুবাণী উনান হইতে এক জলন্ত কাঠ লইয়া বাঘেব দিকে ধাবিত হইলেন। শুনিতে পাই, সেই প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে বাঘ ভীত হইয়া যে দ্বাব দিয়া প্রবেশ কবিতাছিল, সেই দ্বাব দিয়া মহাবেগে বহির্গত হইয়া গেল। তখন জানিতে পাবা গেল, কোনও প্রতিবেশীর একটি নবাগতা বধু একটা খিড়কীর দ্বাব খুলিয়া বাঁথিয়া আসিতাছিলেন, বাঘ তাহা দিয়াই প্রবেশ কবিতাছিল।

আমাব পিতামহীর সমগ্র চবিত্র এই সাহস ও প্রত্যাংপরমতিষেব অল্পরূপ ছিল। গ্রামেই বাপেব বাড়ী, তাহাতে বাপেবা পদস্থ ও গর্ভিত লোক, এজন্ত তাঁহাব দোদীও-প্রতাপে পাড়াব লোক সশঙ্ক-চিত্তে বাস কবিত। আমাব পিতা শ্রীযুক্ত হবানন্দ বিজ্ঞাসাগব তাঁহাবই গর্ভজাত পুত্র। তিনি স্বীয় জননীব ব্যক্তিত্ব ও প্রথব তেজস্বিতা প্রচুব পৰিমাণে পাইতাছিলেন।

পিতামহ।—পিতামহ ঠাকুর স্বর্গীয় রামকুমাব ভট্টাচার্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে পিতামহী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিলেন। পিতামহী গৌবালী, তিনি শ্রামবর্ণ, পিতামহী অসহিষ্ণু, তিনি সহিষ্ণু; পিতামহী অজ্ঞায়ের গন্ধ পাইলেই অগ্নিমুগ্ধি ধারণ কবিতেন, পিতামহ ঠাকুর অনেক অজ্ঞায় শাস্ত-

ভাবে বহন করিতেন ; এমন লোক ছিল না যে, পিতামহী ঠাকুবাণীকে অপমানের কথা শুনাইয়া দশ কথা না শুনিয়া যায়, পিতামহ মহাশয় অনেক অস্ত্রায় কথা ও ব্যবহাব নির্বাক থাকিয়া সহ্য করিতেন, অপমানের সম্ভাবনা হইতে দূরে থাকিতেন ; পিতামহী ঠাকুবাণী নিজগৃহেব সুখ-সমৃদ্ধি সর্বাত্রে বৃদ্ধিতেন, সেই দিকে প্রধান দৃষ্টি রাখিতেন, বাহিবেব লোকেব সুখদুঃখেব দিকে ততটা মন দিতেন না ; পিতামহেব হৃদয়েব দ্বাব বাহিবেব দ্রোকেব জন্ত সর্বদাই উদ্বেল ছিল। তিনি অতিশয় দখালু মানুষ ছিলেন। বড়পিসীর মুখে নিম্নলিখিত গল্পটা শুনিয়াছি। একদিন বড়পিসী দেলাতে বসিয়া আছেন, এমন সময় পিতামহ ঠাকুর জ্ঞান করিয়া আসিলেন। আসিয়াই সম্ভব শয়ন-ববে প্রবিষ্ট হইলেন। পিসী দেখিলেন, তিনি গামছাখানি পরিয়া আসিয়াছেন, পরিধেয় বস্ত্র নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা ! তোমাব কাপড় কোথায় ফেলে এলে ?” পিতামহ তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন, “চোঁচিয়ো না মা ! তোমাব মা যেন টেব পায় না, কাপড়খানা একজন গবীবকে দিয়ে এসেছি।” ইহাতে বৃদ্ধিতে পাবা যাঠিতেছে, পিতামহ মহাশয়কে অনেক সময় পিতামহী-ঠাকুবাণীর ভয়ে লুকাইয়া দান করিতে হইত। আমাব পিতাঠাকুর স্বায় মাসাব এই তেজস্বিতা ও নিজ পিতাব এই সহৃদয়তা, উভয়ই পাইয়াছিলেন।

পিতামহ ও পিতামহীর মৃত্যু।—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরেব উপকূলবর্তী প্রদেশে ভীষণ সাইক্লোন হয়। এই ঝড়ে সমুদ্রতলজ উঠিয়া আমাদের গ্রামেব দক্ষিণবর্তী সমুদ্র প্রদেশকে প্লাবিত করে। সেই সময়ে হাজার হাজার লোক মারা যায়। তদনন্তর ওলাউঠা রোগ বঙ্গদেশে প্রথম দেখা দিয়া আরও সহস্র সহস্র লোককে নিধন প্রাপ্ত করে। সেই ওলাউঠা রোগে দশদিনের মধ্যে আমার পিতামহ পিতামহী ও পিতামহী মারা পড়েন।



পণ্ডিত শ্রীমানন্দ শর্মাচার্য

আমাৰ পিতামহ ঠাকুৰ যখন গত হইলেন, তখন দুই পুত্ৰ, দুই কন্যা পশ্চাতে বাখিষা গেলেন। তন্মধ্যে বড়পিসী তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। অৰ্থাৎ ১৬।১৭ বৎসৰেৰে মেয়ে, এবং তৎপূৰ্বেই সন্তানেৰ মুখ দেখিরাছেন। কাজেই তিনি তখন গৃহেৰ কৰ্ত্তী হইয়া বসিলেন। পিসামহাশয় এই সময় হতে ঘৰজামাই হইয়া, বড় পিসীৰ শাসনাধানে থাকিরা, আমাদেৰ বাডীতেই বাস ও সমুদয় বিষয়েৰ বক্ষণাবেক্ষণ কবিতে লাগিলেন। আমাৰ পিতাৰ বয়ঃকম তখন ৩৭ বৎসৰ। এইকপে, বৃদ্ধ প্ৰপিতামহ, পিসামহাশয় ও বড়পিসা, ছোটপিসা, কাকা ও বড়পিসীৰ দুই সন্তান গইয়া সংসাৰ চলিতে লাগিল।

আমাৰ প্ৰপিতামহ বামজয় গ্ৰামালঙ্কাৰ মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাৰ আয়েই দংসাৰ চলিত। তিনি ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিতেৰ বৃত্তিৰূপে অনেক উপাঞ্জন কৰিতেন। তিনি অনেক সময় কলিকাতাতে বাস কৰিতেন। সেখানে তিনি পটমডাঙ্গাৰ প্ৰসিদ্ধ বাৰানাথ মল্লিক মহাশয়দেৰ পৰিবাবেৰ কুলপুৰোহিত ছিলেন। দেশেৰ কাজকৰ্ম্ম দেখাৰ ভাব পিসামহাশয় ও বড়পিসাৰ উপৰ ছিল।

পিতাৰ বিবাঃ ; “কুলসম্বন্ধ”।—ক্ৰমে আমাৰ পিতাৰ দশম কি একাদশ বৎসৰ বয়ঃক্ৰম ও সেই সঙ্গে বিবাহেৰ কাল উপস্থিত হইল। দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলানদিগেৰ মধ্যে তখন কুলসম্বন্ধেৰ প্ৰথা ছিল,

* “পিতামহ-পিতামহীৰ মৃত্যু হইলে, বৃদ্ধ প্ৰপিতামহ, আমাৰ জ্যেষ্ঠা পিতৃবসা আনন্দময়ী বা বিলী, কনিষ্ঠা পিতৃবসা গণেশজননী, আমাৰ পিতা, ও আমাৰ পিতৃব্য বামভাৰণ, এই কয়জন সংসাৰে থাকেন। বড় পিসাৰ মৃত্যুৰ গোপালচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্ত্তীৰ সহিত বিবাহ হয়। * * পিসা মহাশয় দস্তবাড়ীতে পুজাৰী ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। কয়েক বৎসৰেৰ মধ্যেই আমাৰ পিতৃব্য বামভাৰণ ভট্টাচাৰ্য্যেৰ মৃত্যু হয়।”—প্ৰবন্ধকাৰেৰ হস্তলিখিত কুলপত্ৰিকা।

এখন দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে। কুলসম্বন্ধেব অর্থ এই যে, কুলীন বৈদিকের ঘরে কন্যা জন্মিলেই দুই একমাসেব মধ্যে সমশ্রেণীর কোনও শিশু বালকের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখা হইত। তৎপরে কন্যা আট নয় বৎসরের হইলেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত। যদি বিবাহের পূর্বে বাগ্‌দত্ত বরের মৃত্যু হইত, তাহা হইলে কন্যা “অন্তপূরী” নাম পাইত। তৎপরে আর তাহার কুলীন বরের সহিত বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না; মৌলিক বরের সহিত বিবাহ হইত। আমাব দুই পিসী, এইরূপে “অন্তপূরী” হইয়া মৌলিক বরেব সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। এই প্রথামুসাবে আমার পিতাব ছয় কি সাতমাস বয়সের সময়, কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ববর্তী চান্দাড়পোতা গ্রামেব হবচন্দ্র শ্রায়রত্ন মহাশয়ের একমাস-বয়স্কা প্রথমা কন্যার সহিত কুলসম্বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তদনুসারে দশম কি একাদশ বৎসর বয়সে আমার পিতার বিবাহ হইল।

মাতামহ।—আমার মাতামহ হরচন্দ্র শ্রায়রত্ন মহাশয় একজন সুবিস্তৃত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা কঁাসারি-পাড়াতে তাঁহার টোল চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বাবকানাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্য-জগতে চিরদিনের জন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আমার মাতামহ কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত “প্রভাকর” নামক পত্রিকা সম্পাদনে তাঁহার সাহায্য করিতেন। তিনি উত্তরকালে মহাত্মা ডেবিড হেন্সলের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গলা পাঠশালাতে পণ্ডিতী কর্ম লইয়াছিলেন, এবং আমার বড় মামা সংস্কৃত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই কলেজেই কর্ম পাইলে, মাতামহ মহাশয় মিতব্যয়িতার গুণে কিঞ্চিৎ অর্থ স্বক্ষয় করিয়া পৈতৃক ভিটা হইতে উঠিয়া স্বগ্রামেই একটি দোতালা পাকা বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে ইহা এক নূতন ব্যাপার বলিয়া ঐ দোতালা বাড়ী

‘প্রতিবেশীবর্গের অনেকের চক্ষের শূলস্বরূপ হইয়া বহুদিন ধরিয়া আমার মাতুল-পরিবারের ঘোর অশান্তির কাবণ হইয়াছিল। তাহা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব।

মাতামহ মহাশয়কে আমার বেশ স্মরণ হয়। আমার ২১০ বৎসরের সময় তিনি দারুণ উরুস্তম্ভ রোগে গতানু হন। তিনি উজ্জ্বল-শ্রামবর্ণ, প্রসন্নমুর্তি, দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। আমাকে ‘শিবরাম’ বলিয়া ডাকিতেন। গৃহস্থালী বিষয়ে পবিপক্বতা তাঁহাব প্রধান গুণ ছিল। আমার মাতুলালয়ে সম্বৎসরেব চাল, ডাল, প্রভৃতি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য এক্রপ সঞ্চিত থাকিত যে, হঠাৎ কোনও দিন দশ-পনব জন অতিথি উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে দুই খণ্টার মধ্যে পরিতোষ পূর্বক আহার করান মাতামহী ঠাকুরাণীর পক্ষে কিছুই ক্লেশকর হইত না। মাতামহের মিতব্যয়িতা ও পাকা গৃহস্থাসীর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাব বড়মামা দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের প্রথম পুত্র উপেন্দ্রনাথের শৈশব কালে হুঁকা কলিকা হাতে লইয়া বেড়াইবার বাতীক ছিল। একটা হুঁকা ও কলিকা না পাইলে কাঁদিয়া ঘর ফাটাইত; রাত্রে তাহাব শয্যার পার্শ্বে হুঁকা কলিকা রাখিত হইত; বাত্রি দুই প্রহরের সময় আগিলে হুঁকা হুঁকা করিয়া কাঁদিত। সুতরাং তাহার জগ্গ হুঁকা ও কলিকা সর্বদাই রাখিতে হইত। হুঁকা ত বড় একটা ভাঙ্গিতে পারিত না, কলিকাগুলি দিনে ২৩ বার ভাঙ্গিত। মাতামহ মহাশয় প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে গৃহে আসিতেন, আসিয়া রবিবার গৃহস্থালীর জিনিস গুছাইতেন। একবার আসিয়া রবিবার কয়েক ঘণ্টা বসিয়া মাটি দিয়া এক ঝোড়া কলিকা গড়িয়া খড়ের আগুনে পোড়াইয়া রাখিয়া গেলেন; অভ্যপ্রাণ এই, উত্তপ্ত যত পারে কলিকা ভাঙ্গুক। তখন এক পরসাতে বোধ হয় আটটা কলিকা পাওয়া যাইত, সে ব্যয়টুকুও বাঁচাইবার দিকে তাঁহার এত দৃষ্টি পড়িল।

পূৰ্বেই বলিয়াছি চান্দড়িপোতা গ্রাম কলিকাতাৰ ছষ ক্রোশ দক্ষিণ-পূৰ্ব কোণে প্ৰতিষ্ঠিত। সেকালে একপ্ৰকাৰ দোলদাব ছকড় গাড়ি ছিল, তাহা চান্দড়িপোতাৰ সন্নিহিত বাজপুৰ গ্ৰাম হইতে কলিকাতায় আসিত। কুঠীওয়ালা বাবুৱা ও অপেক্ষাকৃত পদস্থ ব্যক্তিবা প্ৰতি সোমবাব সেই দোলদাব ছকড় গাড়ি চাডিয়া কলিকাতায় আসিতেন ও শনিবাব কলিকাতাৰ ধৰ্ম্মতলা হইতে ঐ গাড়ি চাডিয়া বাড়ী যাইতেন। আমাৰ মাতামহেৰ অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে কেহ কখনও গাড়িতে দেখিতে পাইত না, তিনি সদায়ে শনিবাব পদব্ৰজে কলিকাতা হইতে বাডীয়াত যাইতেন, এবং সোমবাব পদব্ৰজেই কলিকাতাৰ ফিৰিতেন, বডমামাও সেইৰূপ কৰিতেন। আমি ৮ বৎসৰেৰ সময় কলিকাতায় আসিলে, আমিও তাহাদেৰ সঙ্গে পদব্ৰজে যাতায়াত কৰিতাম।

এই-সকল কাৰণে লোকে কুপণ বলিয়া আমাৰ মাতামহেৰ অখ্যাতি কৰিত; কিন্তু আমি কলিকাতায় তাঁহাৰ বাসাত আসিয়া দেখিযাছি, তিনি জামাতা ছাড়া স্বসম্পৰ্কীয় প্ৰায় চান জন যুবক তাঁহাৰ অন্তে প্ৰতিপালিত হইতেছে। যাহা হউক তিনি যে অতিশয় হিসাবী ও মিতব্যয়ী লোক ছিৰেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাৰ মাতা ঠাকুবাণী গোলোকমণি দেৱী স্বীয় পিতাৰ গৃহস্থানোৰ সুব্যৱস্থা ও মিতব্যয়িতা পাইয়াছিলেন।

মাতামহী।—আমাৰ মাতামহী ঠাকুবাণী আকৃতি ও প্ৰকৃতিতে মাতামহ হইতে বিভিন্ন ছিলেন। মাতামহ সৰ্ব্বসম্বৰেৰ চাল ডাল গোলাতে সঞ্চয় কৰিতেন, মাতামহী দৰিদ্ৰা জীলোকদিগকে গোপনে ডাকিবা সেই চাল ডাল অঞ্চল ভৰিবা দান কৰিতেন, টাকা কড়ি সৰ্ব্বদা হুই হাতে দান কৰিতেন। এজন্য তাঁহাৰ পতি বা পুত্ৰ তাঁহাৰ হস্তে সংসাৰেৰ টাকা বাখিতেন না, আপনাদেৰ নিকট বাখিতেন। কিন্তু মাতামহীৰ

নিজব্যয় বলিয়া তাঁহাব হস্তে যাহা দেওয়া হইত, তাহা হইতেই দান ধ্যান চলিত।

এইস্থানে মাতামহী ঠাকুরাণীৰ সদাশয়তাব কয়েকটি নিদর্শন দেখাই। আমাব পিতা আমাকে কলিকাতায় বাখিয়া গেলে সময় সময় আমার ভয়ানক অর্থাভাব হইত; তখন অনন্তোপায় হইয়া আমি মাতুলালয়ে যাইতাম। মামীদিগকে আমাব অভাব জানাইতে সাহস করিতাম না। মাতামহী ঠাকুরাণী আমাকে এত ভালবাসিতেন যে আমি মাতুলালয়ে গেলে, বাত্রে আমাকে স্বীয় শয্যাতে লইয়া, গলা জড়াইয়া শুইতে ভালবাসিতেন। এই নিয়মে তিনি আমায় উনিশ বিশ বৎসব পর্য্যন্ত রাখিয়া ছিলেন। তিনি কিরূপে আমাকে আলিঙ্গন প্যুশে বঁধিতেন তাহা শ্রবণ কবিলে এখনও চক্ষু জল আসে। যাহা হউক, যে জন্ত এ বিষয়টা উল্লেখ কবিতোছি তাহা এই।—মাতামহী আমাকে আলিঙ্গনপাশে বঁধিয়া শয়ন কবিলে আমি বাত্রে তাঁহাব কানে কানে আমার দাবিদ্র্যের কথা বলিতাম; তিনি গোপনে আমাব কাপড়ের খুঁটে তাঁহাব নিজ ব্যয়ের টাকা হইতে হয়তো দুইটি বা চারিটি টাকা বাঁধিয়া দিতেন, বলিতেন, “এ কথা কারকে বলো না, টাকার কষ্ট হলেই আমার কাছে এস।” এখন শ্রবণ কবিয়া লজ্জা হয়, কি স্বার্থপরতাব কাজই করিতাম।

আমার মাতামহী ঠাকুরাণী বড় ধর্ম্মভীরু মানুষ ছিলেন। উপহাস-জ্বলেও যদি কাহাকেও কিছু দিব বলিয়া মুখ দিয়া কথা বাহির করিতেন, তাহা হইলে তাহা না দিয়া প্রসন্নমনে থাকিতে পারিতেন না; তাহা দিতেই হইত। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার রন্ধনশালার জন্ত একটা বড় ঘট কেনা হইল। ঘটটি এত বড়, যে জলতট নাড়াচাড়া কবিতো মেয়েদেব কষ্ট হয়। মাতামহী একবার জলসমেত ঘটটি তুলিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, “বাবারে! এ ঘটাব একঘটা জল যদি কেউ একেবারে খেতে পারে, তবে তাকে একটাকা দিই।” অমনি জ্ঞাতিবর্গের

মধ্যে এক পবিবাবেব একটি ছেলে ছুটিয়া গিয়া ঘটীটা লইয়া জলপান কবিত্তে বসিয়া গেল। মাতামহী ভয় পাইয়া তাহাব হাত ধৰিয়া বলিতে লাগিলেন, “ওবে, তুই অত জল খাসনি, আমি টাকা দিব বলিছি, দিবই,” এই বলিয়া একটি টাকা আনিয়া তাহাব হাতে দিলেন। আব একবাব একদিন গ্রীষ্মকালে ভয়ানক বোজ, উঠান তাতিয়া অগ্নিসমান হইয়াছে। এমন সময় মাতামহী ঠাকুবাণীব একবাব গোলাতে যাওযাব আবশ্যক হইল। উঠানে পা দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “বাবাবে। যেন আগুন, এ উঠানে যদি কেউ হুদুগু এসতে পাবে, তবে তাকে ছুটাকা দিই।” অমনি একজন যুবক প্রস্তুত। সে লক্ষ দিয়া সেই তপ্ত উঠানেব মধ্যে গিয়া বসিল। মাতামহী একেবাবে অস্থির হইয়া উঠিলেন, “ওবে তুই উঠে আয়, আমি ছুটাকা দিছি,” বলিয়া তাহাকে ছুইটাকা দিলেন।

বাস্তবিক তাহাব মত কোমল-হৃদয়া দয়াশীলা, স্বজনবৎসলা, উদারপ্রকৃতি, সত্যপবায়ণা নাবা অল্পই দেখিয়াছি। আমাব বড়মামা দ্বাবকানাথ বিদ্যভূষণ মহাশয় ধর্ম্মভীকতাৰ জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে ধর্ম্মভীকতা তিনি জননী হইতে পাইয়াছিলেন।

মাতামহীব বৃদ্ধাবস্থা আমাব ত্রহ মামী যখন ধবকনাব ভাব লইলেন ও তাহাকে সংসাবেব খুটিনাট হইতে নিষ্কৃত দিলেন, তখন ধর্ম্মচিন্তা, দৰিদ্ৰেব সেবা ও গৃহস্থ শিশুগণেব পালন, তাহাব প্রধান কাজ দাঁড়াইল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে প্রায় অর্দ্ধকোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গান্নান কবিত্তে যাইতেন, এবং স্নানান্তে ফিৰিবাব সময়, পথেব ত্রই পার্শ্বে পবিচিত দৰিদ্ৰ পবিবাবদিগকে দেখিয়া আসিতেন। এটি তাহাব নিত্য ক্রতেব মধ্যে হইয়াছিল। এজন্ত তিনি নিজ ব্যয়েব টাকা হইতে কয়েক আনা পয়সা সঙ্গে লইতেন, এবং গৃহে ফিৰিবাব সময় বাড়ীতে গুড়ীতে প্রবেশ কৰিয়া আবশ্যকমত কিছু কিছু সাহায্য কবিতেন, এবং নিজেব সাধ্যে না কুলাইলে, পুত্রদিগকে অল্পবোধ কৰিয়া সাহায্য কবাইয়া দিতেন।

তাঁহাব সহৃদয়তাব দৃষ্টান্ত স্বৰূপ একটা কথা স্মৰণ হইতেছে। একবাব আমি পদব্রজে স্বীয় বাসগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিতে-ছিলাম। পথিমধ্যে মাতুলালয়ে একবেলা থাকিয়া আসিব এইরূপ সংকল্প ছিল; কিন্তু অগ্রে তথায় সংবাদ দিই নাই। গ্রাম হইতে অতি প্রত্যয়ে বাহিব হইয়াছিলাম; মাতুলালয়ে পৌঁছিতে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া যাইবে। পথিমধ্যে একজন হিনজাতীয় লোক আমাব সঙ্গ লইল। সে ব্যক্তি সৰ্বপ্রথম কলিকাতায় আসিতেছে। সে যখন গুনিল যে, আমি সহবে আসিতেছি তখন ব্যগ্রতা সহকাৰে তাহাকে সঙ্গ লইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি জানিতাম বিনা সংবাদে অসময়ে মাতুলালয়ে পৌঁছিব, হয়ত মামীদিগকে আবাব পাক কবাইতে হইবে, সেই ভয়ে প্রথমে ইতস্ততঃ কবিতাম, কিন্তু তাহাব ব্যগ্রতাতিশয় দেখিয়া চকুলজ্জাবশতঃ “না” বলিতে পাবিতাম না। হইজনে দ্বিপ্রহবেব সময় মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মামীবা তখন আহাবে বসিষাছেন, মাতামহী ঠাকুবাণী বসিতে যাইতেছেন, তখনও ভাতে হাত দেন নাই। আমায় গলাব স্বব গুনিয়া বাহিবে আসিলেন। আমি তাঁহাকে চুপে চুপে বলিতাম, একটা অশ্রুজাতীয় লোক পথ হইতে আমাব সঙ্গ লইয়াছে। সে কলিকাতায় কখনও যায় নাই, আমাব সঙ্গ যাইবে। তিনি বলিলেন, “বেশ ত, তুই শীগগিব নেয়ে এসে মামীদেব পাতে বসে যা, আমাব ভাত ঐ লোকটা খাক, আমি আমাব ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি, পবে খাব।” এ প্রকাৰ বন্দোবস্তটা আমাব ভাল লাগিল না। একবাব বলিতাম, “তোমাব ভাত ওকে কেন দেবে, যে ভাত চড়াবে, তাই ওকে দিয়ে, তোমাব ভাত তুমি খাও।” তিনি বলিলেন, “আহা! বেচাবা পথ চলে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ও বসে থাকবে আর আমবা খাব, তা কি হয়? যা যা তুই নেয়ে আর।” তাঁব স্ববাস্তে আমাকে আব ভাবিতে চিন্তিতে সময় দিল না, তাড়াতাড়ি স্থান

কবিতা আসিয়া মামীদেব পাতে বসিয়া গেলাম। মাতামহী সেই লোকটীর হাতে একটু তেল দিয়া বলিলেন, “বাবা। তুমিও নেয়ে এসো, আসবাব সময় আমাদের বাগান থেকে একখানা কলাপাতা কেটে এনো।”

তাবপবে মাতামহী ঠাকুবাণী যখন উঠানের পাশে টেকিশালাব দাবা ঝাঁট দিয়া নিজেব ভাতগুলি তুলিয়া তাহাকে দিতে গেলেন, তখন মামীদেব সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহাবা বাগাবাগি কবিতো লাগিলেন। দিদিমা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগকে বলিয়া নিজেব ভাতগুলি ঐ ব্যক্তিকে পবিয়া দিলেন। আমি আহাবাস্তে আচমন কবিতা আসিতা দেখি, সে ব্যক্তি আহাবে বসিয়াছে, দিদিমা অদূবে দাঁড়াইয়া দোখিতেছেন, এবং “বাবা, এটা খাও, ওটা খাও,” বলিতে-ছেন ; যেন তাহাব প্রত্যেক গ্রাসে তাঁহাব সন্তোষ হইতেছে। সে ব্যক্তি আহাবাস্তে আসিতা গলবস্ত্র হইয়া আমাব মাতামহাব চবণে প্রণিপাত করিতা বলিল, “মা, অনেক বামনেব মেয়ে দেখেছি, তোমাব মত বামনেব মেয়ে দেখিনি।”

ঠিক কথা। আমাব মাতামহাব ভ্রায় ব্রাহ্মণকন্তা বিবল। বলিতে কি, তাঁহাকে আমি যখন স্মরণ করি, আমাব হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয়, এবং এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পাৰি যে, আমাতে যে কিছু ভাল আছে, তাহাব অনেক অংশ তাঁহাকে দেখিয়া পাইয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম ও শৈশব ; মজিলপুরে বাস

১৮৪৭—১৮৫৬

মাতুলালয়ে জন্ম ।—এই মাতামহীৰ ক্রোড়ে, মাতুলালয়ে, বাঃ ১২৫৩ সাল ১২শে মাঘ, ইংবাজা ১৮৪৭ সাল ৩১ শে জানুয়ারি, ববিবাব, আমাব জন্ম হইল । আমাব জন্মকালের বিষয় যাহা শুনিয়াছি, লিখিতেছি । সাংকালে যখন আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখন সবে পূর্ণিমা গিয়া প্রতিপদের সঞ্চাব হইতেছে । সোদন আমাব মাতামহ বাড়ীতে আছেন । পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শ্রবণমাত্র তিনি তাঁহাব এক দৈবজ্ঞ জাতিবন্ধুব ভবনে ধাবিত হইলেন । গৃহস্থ বমণীগণেব শঙ্খধ্বনিতে পাড়া কাঁপিয়া যাইতে লাগল । ওদিকে গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, শ্রায়বন্ধেব দৌহিত্র জন্মিয়াছে । মাতুলগৃহে সেই প্রথম শিশুবালাকেব আবির্ভাব । আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতামহী ও তাঁহাব জননী, দুই মামী, দুই মাসী (আর এক মাসা তখনও শিশু) ও গৃহস্থ অপব দুই এক জন বিধবা, ইহাঁদের আদব ও অভ্যর্থনাৰ ধন হইলাম । পবদিন বজনী প্রভাত হইতে না হইতেই দলে দলে বাজ্ঞানাদাব আসিয়া বাড়ী আক্রমণ কবিতে লাগিল । পবদিন প্রাতে মাতামহ মহাশয় কলিকাতায় গেলেন । শনিবাব তাঁহাদের ফিবিয়া না আসা পর্য্যন্ত সাতদিন দলে দলে বাজ্ঞানাদাব আসিয়া বাড়ী মাথায় কবিয়া তুলিল ।

শনিবাব মাতামহঠাকুর ও বড়মামা কলিকাতা হইতে আসিলেন । বাবা তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, তিনি বোধ হয় লজ্জান্তে তাঁহাদের সঙ্গে আসেন নাই । কিছুদিন পরে আসিয়াছিলেন । বড়মামা রবিবার

প্রাতে স্মৃতিকাগৃহেব দ্বাবে দাঁড়াইয়া মোহব দিয়া ভাগিনাব মুখে দেখিলেন । জননীৰ মুখে শুনিয়াছি, আমাব মামা আমাব মাথা ও কপাল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “আমাব এই ভাগিনা বডলোক হবে ।”

ক্রমে স্মৃতিকাগৃহ হইতে বাহিৰ হইয়া আমি মাতামহী মামী ও মাসাদেব কোলে বাড়িতে লাগিলাম । বিশেষতঃ আমাব মেজমাসী একদণ্ড আমাকে কোল হইতে নামাইতেন না ।

মাতার সঙ্গিত মজিলপুরে আগমন ।—কিন্তু আমি পৃথিবীতে পদার্পণ কবিবামাত্র মাতুলগৃহে ঘোব বিপ্লব উপস্থিত হইল । পূৰ্বেই বলিয়াছি, আমাব মাতামহ মহাশয় স্বীয় অবস্থাব উন্নতি কবিষা পৈতৃক ভিটা পবিত্যাগপূৰ্ব্বক, তাহাব নাতিদুবে একটি দ্বিতল পাকা বাডী নিৰ্ম্মাণ কবিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেব ঐ দ্বিতল বাডাটি পাডাব লোকেব চক্ষুশূল হইল । একথণ্ড পতিত জমি ক্রয় কবিয়া সেই জমিব উপবে ঐ বাড়ীটি নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল । কিন্তু ভূমিখণ্ড বহুদিন পতিত অবস্থাতে থাকাতে তাহাব উপব দিয়া লোকেব যাতায়াতেব পথ হইষা গিয়াছিল । বহু বহু বৎসব ধৰিয়া লোকে সেই পথ দিয়া যাতায়াত কৰিত । কিন্তু মাতামহ যখন তাহা ক্রয় কবিয়া, প্রাচাবেব দ্বাৰা আবদ্ধ কবিষা, তত্ৰপৰি গৃহনিৰ্ম্মাণ কৰিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহা লইষা বিবাদ ও বিষম দলাদলি ও তাহাব ফলস্বৰূপ মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইল । তখন প্রতিবেশীগণ আমাব মাতুল-পৰিবাবেব প্রতি একপ উপদ্রব আবস্থ কবিল যে, তাঁহাবা বাধ্য হইয়া গ্রাম পবিত্যাগ কবিষা কলিকাতায় আসিয়া বাস কৰিতে বাধ্য হইলেন । সেই সূত্রে আমাব ছয়মাস বয়সে জননী আমাকে লইয়া আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরেব বাটীতে গেলেন ।

আমাব প্রপিতামহ তখন সকল কৰ্ম্ম হইতে অবসৃত হইষা গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন ; চক্ষে দেখেন না, কানে শোনেন না । তিনি আমাকে পাইয়া “আমাব বংশধব আসিয়াছে” বলিয়া মহা

আনন্দিত হইলেন এবং আমাকে “বাবা বাবা” করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

বাড়ীতে অশান্তি।—আমাব এতটা অভ্যর্থনা আমার বড় পিসীর সহ্য হইল না। কয়েক বৎসব পূর্বে আমার কাকার মৃত্যু হওয়াব পর, ও ছোটপিসা শ্বশুরবালায়ে যাওয়াব পব, তিনি নিজ পুত্রকন্যাগণকে লইয়া গৃহের কত্রী হইয়া বসিয়াছিলেন। সে ভিটা যে তাঁহাকে কোনও দিন পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা বোধ হয় স্বপ্নেও জানিতেন না। গৃহকর্তা স্বীয় পিতামহের হাতে নূতন বংশধরের এই আদর দেখিয়া তাঁহার আব-এক চিন্তাব উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, তিনি এতদিন ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে বহিয়াছেন।

ইহাব পব হইতে আমাব মাতাব প্রীতি তাঁহাব দারুণ বিরুদ্ধভাব জন্মিল এবং ননদে ও ভাজে মন-কবাকষি আবন্ত হইল। তাহার কলস্বরূপ আমাব মা আমাকে দেখিতেন না। মনের রাগে প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অনাহারে রান্নাঘরে সংসারের কাজে নিমগ্ন থাকিতেন, আমি চোঁচাইয়া মরিয়া যাইতাম, একবার ফিরিয়া চাহিতেন না। বড় কাঁদিলে আমাব পিস্তুতো বোনেরা কোলে করিয়া রান্নাঘরে লইয়া গিয়া উনানের নিকট হইতে স্তনপান করাইয়া আনিত। কিন্তু রাগের ছুধ খাইয়া খাইয়া আমার ঘোর উদরাময় জন্মিল; যেমন ছুধ পান করিতাম, তেমনি ছুধ বাহির হইয়া যাইত। অল্প দিনের মধ্যে রাগে ও অনাহারে মায়ের বুকের ছুধ শুকাইয়া গেল। তখন আমার জীবন-সংকট উপস্থিত। রক্তভেদ ও রক্তবমন আরম্ভ হইল। তখন মার চক্ষু স্থির হইল। তিনি সমস্ত দিন সংসারের কাজে থাকিতেন, সমস্ত রাত্রি আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া কাঁদিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে আমার মুখে জল দিতেন। এই অবস্থাতে একদিন আমার পিসীর অল্পপস্থিতি-কালে আমার মা আমার প্রপিতামহের ক্রোড়ে

আমাকে শোয়াইয়া তাঁহার কানে চীৎকাব কবিয়া বলিলেন, “আমাব হুধ শুকিয়ে গিয়েছে, তোমাব বাবা না খেতে পেয়ে মবে।” এই কথা শুনিয়া তিনি নিজের গালে মুখে চড়াইতে লাগিলেন, এবং এই সংবাদ তাঁকে কেহ দেখে নাই বলিয়া আমাব পিসামহাশয় ও পিসীমাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন; এবং পিসামহাশয় আসিলে হুকুম দিলেন, “আমাব বাবাব জন্ত যত হুধ লাগে বোজ কবে দাও।” আমাব জন্ত গুধেব বোজ হইল। তদবধি প্রপিতামহ কিছু সতর্ক হইয়া কান পাতিয়া থাকিতেন। ছোট ছেলেব কান্না একটু কানে গেলেই “বাবা কেন কাদে” বলিয়া চীৎকাব করিতেন, আব বড়পিসী বাগিয়া যাঠিতেন।

শৈশবে স্বাস্থ্য ভঙ্গ।—আমার জন্ম ঘূষেব বোজ হইল বাটে, কিন্তু তখন উদব ভাজিয়াছে, ছেলে আব বাচান যায় না। আমাব শবাব আস্থচর্য্যসাব হইল। তখনকাব অবস্থা এই বলিতেই যথেষ্ট হইবে যে আমাব পাছা ছিল না, যে পাছা পাতিয়া বসি; যখন বসিতে শিখিলাম, তখন পিঠেব দাঁড়াব উপব বসিতাম। সেই যে আমাব হাত পা ছিনা-পাড়িয়া গেল, সেই ছিনা-পড়া এখনও বহিয়াছে।

দাকণ উদবভঙ্গেব উপবে বসতড়্কা বোগ দেখা দিল। মধ্যে মধ্যে সমুদব গা গবম হইয়া হাত পা খোঁচতাম ও অজ্ঞান হইয়া যাঠিতাম। মা আমাকে বুকে ধবিয়া ‘ছেলে গেল’ বলিয়া চাৎকাব কাঁবয়া কাদিতেন। মায়ের মুখে শুনিয়াছি, এই বোগ প্রায় ৭৮ বৎসব বয়স পর্য্যন্ত ছিল, ডুব দিয়া নাইতে শিখিলে সাবিয়া যায়। আমাব আকাব ও মূর্ত্তি তখন এ প্রকাব হইয়াছিল যে, আমাকে বাখা ও আমাব সেবা কবা একমাত্র জর্ননী ভিন্ন আব কাহাবও সাধ্য ছিল না।

পিসীমার স্বতন্ত্র বাটীতে গমন।—যাহা হউক, আমাব পিসীমা আমার প্রপিতামহের ভিরঙ্কার খাইয়া খাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে আমাদের ভিটাতে আর তাঁহার থাকা হইতেছে না। পিসামহাশয় আমাদের বাড়ীর



মাতা গোলোকমণি দেবী

সম্মুখেই কিছু জমি লইয়া একটি বসতবাটা নির্মাণ করিলেন। পিসীমা সপরিবারে সেখানে উঠিয়া গেলেন। আমার বয়স তখন দুই কি আড়াই বৎসর হইবে।

বড়পিসী উঠিয়া গেলে গৃহে শান্তি হইল বটে, কিন্তু আমার মার আবে-
একপ্রকার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একমাত্র দাসী সহায় করিয়া সেই
বুদ্ধ দাদাশুভ ও শিশুপুত্রের বক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইতে হইল। একলা
যবে একলা স্ত্রীলোক পাতখা চোবে বড় উপদ্রব আবিস্কৃত করিল। কয়েকবার
সিঁদ হইল। এক বাত্রে এক ঘরে পাঁচ জায়গায় সিঁদ ফুটাইয়াছিল।

মাতার আত্মমর্যাদাবোধ।—একদিকে চোবের উপদ্রব, অপর-
দিকে চুইলোকের উপদ্রব। বাবা তখন কলিকাতায় আমার মাতামহের
বাসায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়িতেছেন। স্মৃতবাৎ আমার মাকে
বৎসরের অধিকাংশকাল সশঙ্কচিত্ত একাকিনী থাকিতে হইত, এবং
আত্মবক্ষণ জন্ত অনেক সময় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইত। সেই অবস্থি
মারের এমন একটা আত্মমর্যাদা-জ্ঞান জন্মিয়াছিল, যে, তাঁহার মর্যাদার
অণুমাত্র লঙ্ঘন হইলে, তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না, লঙ্ঘনকারীকে
জানিতে দিতেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটি ভিতরে মেহের বাধিবাবার জ্বর
আগ্নেয়গিরির অগ্নিও আছে।

আমার মাতার আত্মমর্যাদা-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটা ঘটনার
উল্লেখ করিতেছি। একটি আমার শৈশবে ঘটিয়াছিল, অপরটি বহু-বৎসর
পরে। প্রথম ঘটনাটি এই।—পাঁচ বৎসর বয়স হইলেই মা আমাকে
গ্রামের একটি পাঠশালে দিলেন। বহুপাড়ায় বহুদেব বাড়ীতে এক
বর্দ্ধমেনে গুরু পাঠশালা ছিল, তাহাতে আমাকে ভর্ত্তি করা হইল। আমি
তালপাত্রে লিখিতে আবিস্কৃত করিয়াই দিন দিন সমপাঠী বালকদিগের
অপেক্ষা উন্নতি দেখাইতে লাগিলাম। ইহার কারণ এই, আমার মা
সে সময়কার তুলনাত্তে অনেক লেখাপড়া জানিতেন। আমার স্মৃতি

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেব ছাত্র এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার মত-সত একটু উদার ছিল, তিনি আমাব মাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মা প্রায় প্রতিদিন দুপুর বেলা বামায়ণ পড়িতেন। দুপুরবেলা তিনি নিজে পড়িতেন ও আমাকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতেন। সেই জন্ত আমি পাঠশালাে অপবাপব বালকেব অপেক্ষা অধিক উন্নতি দেখাটতে লাগিলাম। ইহাতে গুরুমহাশয়ের কিছু আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তোবে কে পড়া বলে দেয় বে?” আমি বলিলাম, “আমাব মা।” গুরুমহাশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তোব মা লেখাপড়া জানে?” উত্তব, “হাঁ, আমাব মা বেশ পড়তে পাবে।” তাবপব গুরুমহাশয় সন্ধান লইলেন যে আমাব মা একাকিনী বাড়ীতে থাকেন, বাবা বিদেশে। একদিন গুরুমহাশয় আমাব লিখিবাব তালপাতে ক লিখিয়া আমাকে দিলেন, বলিলেন, “তোব মাকে দিস, আব কেউ যেন দেখে না।” আমি ভাবিলাম, সকল বালকেব মধ্যে আমি ভাগ্যবান, গুরুমহাশয় আমাব মাকে পত্র লিখিয়াছেন। আমি বাড়ীতে আসয়া একগাল হাসিয়া মাকে বলিলাম, “ওবে মা, গুরুমহাশয় তোকে ক লিখেচে দেখ।” মা তালপাতাটি আমাব হাত হইতে লইয়া একটু পড়িয়াই গম্ভাব মূর্ত্তি ধারণ কবিলেন, পাতাটি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা কবিয়া ফেলিয়া দিলেন। আমি তাহা আনিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে মাবিলেন, এবং তৎপব দিন হইতে আমাব পাঠশালাে যাওয়া বন্ধ কবিলেন। সেই আমাব পাঠশালাে যাওয়া শেষ। তৎপব তিনি আমাকে গ্রামেব নবপ্রতিষ্ঠিত হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলে ভর্ত্তি কবিয়া দিলেন।

আব একটি ঘটনা অত্যন্তপ। সে ঘটনাটি সে সময়ে আমাব মনে চুড়ঙ্গপে মুদ্রিত হওয়াতেই স্মরণ আছে। একবাব আমাব মাতুলালয়ে

কয়েকজন নবাগত অতিথি আহাবে বসিয়াছেন। আমার মায়ের জ্ঞাতি সম্বন্ধে খুড়তুতো ভাই অভয়াচরণ চক্রবর্তী সেই সঙ্গে বসিয়াছেন। এই অভয় মামা কলিকাতাব সেন্টজেরিয়ার্স কলেজে কি বিশপস্ কলেজে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রামে একজন পদস্থ ব্যক্তি। কিন্তু আমার মা ও পাড়ার অপবাপব প্রাচীনা আত্মীয়্য মহিলাবা অভয় মামাকে বালককাল হইতে “ঘেনো” “ঘেনো” বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার অভয় নাম দিদিদেব বা খুড়া-জ্যেষ্ঠাদেব মুখে কখনই শোনা যাইত না। সকলেই “ঘেনো” “ঘেনো” বলিয়া ডাকিতেন। উক্ত দিবস আহাবের সময় আমার মা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি মাছ পরিবেশন করিবাব সময় অভয় মামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘেনো, তোকে একটা মাছেব মুড়ো দেব?” কাণে অভয় মামা আহাবেব বিষয়ে খুঁতখুঁতে লোক ছিলেন, মা তাহা জ্ঞানতেন। এত লোকেব সমক্ষে “ঘেনো” বলিয়া ডাকাতে অভয় মামা বোধকষায়িতলোচনে একবার আমার মায়েব মুখেব দিকে চাভিলেন, এবং অবজ্ঞাসূচক হুই একটি বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমার মা তখন কিছু বলিলেন না। তৎপরে আচমনান্তে অভয় মামা যেই ঘবেব মধ্যে পান থাইতে আসিয়াছেন, অমনি মা কুপিতা সিংহীব ছায়, পদাহতা ফণিনীব ছায়, গর্জিয়া উঠিলেন, “তবে বে গাধা ! লেখাপড়া শিখে তোব এই বিত্তে হয়েছে ? আমি তোকে ঘেনো বজাছি, তাই ভাল দেখায়, না, অভয়বাবু বললে ভাল দেখায় ? তোব বজুবা কি জানে না আমি তোব দিদি ? তুই বাইরে অভয়বাবু হতে পাবিস, আমাদের কাছে তো সেই ঘেনোই আছিল। জিজ্ঞাসা কবে দেখিস, তোব বজুরা ঐ ঘেনো ডাকেই খুসী হয়েছে কি না।” আব যদি আম্যুব ঘেনো বলাটা চুকই হয়ে থাকে, তুই জো অতগুলো ভদ্রলোকের সমক্ষে তোর দিদিকে অপমান করলি। এই তোব লেখাপড়ার ফল ? তোর লেখাপড়াকে ঘিক, তোর প্রবেশান্তে

ধিক্, তোর নাম সন্ত্রমকে ধিক্ ! অমুক কাকার কি কপাল, তোর মত গাধার জন্ত এতগুলো টাকা খরচ করেছেন !” যখন আশ্বেষ-গিরির অগ্নিস্থলিঙ্গের শ্রায় এইরূপ বাক্যবাণ বর্ষণ চলিতে লাগিল, তখন অভয় মামা আব সহিতে না পারিয়া মায়ের পায়ে পড়িয়া গেলেন, “দিদি ! মাপ কব, অপবাদ হয়েছে।” অভয় মামাকে আমি বিদ্বান লোক ও গুণী লোক বলিয়া মনে মনে উচ্চ স্থান দিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি যখন আমাব মায়ের পায়ে পড়িয়া গেলেন, তখন আমি চক্ষু বঁজল রাখিতে পাবিলাম না। তিনি চলিয়া গেলে মাকে বাকিতে লাগিলাম, “তুমি আমাকে যেমন কবে বক’, তেমনি কবে অত বড় লোকটাকে বক্লে ?” মা বলিলেন, “বেখে দে তোব বড় লোক, বড়লোকেব মুখে ছাই। অসভ্য, বর্বর, গোয়াব !” সেদিনকাব সে দৃশ্য আমি জন্মে তুলিব না।

আমাব তেজস্বিনী মা, একাকিনী পড়িয়াও এইরূপে তাঁহাব আত্ম-মর্যাদা-জ্ঞানের গুণে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। বাবা গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার ছুটির সময় বাড়ীতে আসিতেন। আমি তাঁহাকে যমের মত ডবাইতাম, কাবণ তিনি সামান্য সামান্য কাবণে আমাকে ভয়ানক মাঝিতেন।

মাতার স্নেহ ও ধ্যাননিষ্ঠা।—আমার মা আমাতে কিছু অশ্রায় দেখিলে রাগ করিতেন এবং সাজা দিতেন বটে, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার কি প্রকার স্নেহ ছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। একবারকার একটা ঘটনা মনে আছে। তখন আমাব বয়স চারি পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। সেই সময়ে একবার আমার গুরুতর পীড়া হইয়াছিল। সেই পীড়ার অবস্থাতে মা ইষ্টদেবতার চরণে প্রণত হইয়া প্রকৃতজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহার কৃপার ছেলে যদি সারিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি হাতে মাথাতে ধূনা শোঁকাইবেন, এবং নিজের বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া দেবতার স্তব লিখিয়া

দিবেন। কয়েক দিনেৰ পৰা আমি সাবিত্ৰা উঠিলাম। যেদিন ব্ৰত উদ্ঘাপনেৰ দিন আসিল, সেদিন পাডাৰ একাটি মেয়ে আমাকে কোলে কবিতা মাষেৰ ব্ৰত উদ্ঘাপন দেখিবাব জন্ত ঠাকুৰঘৰে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি, মা স্নান কবিতা আসিয়া ছই হাঁটুৰ উপৰ ছই হাত দিয়া যোগাসনে বসিয়াছেন। পূজাৰি ব্ৰাহ্মণ তাঁহাৰ ছই হাতে ও মাথাৰ উপৰে কাদাৰ তাল দিয়া ততপৰি জলপ্ৰসাদ আশুনেৰ সৰা বসাইয়াছেন এবং মন্ত্ৰ পড়িতে পড়িতে সেই আশুনে ধূনাৰ গুঁড়ো নিক্ষেপ কৰিতেছেন, আশুনে দপ দপ কৰিয়া জ্বলিতেছে। দেখিয়া আমাৰ বড় ভয় হইল। মনে হইল আমাৰ মাকে পোডাইতে যাঠিতেছে। যাঁহাৰ কোলে ছিলাম, ভয়ে তাঁহাৰ কাষে মুখ লুকাইলাম। তাবপৰা যখন একখানা ছুবিৰ বা নকনেৰ অগ্ৰভাগ দিয়া মাৰ বুক চিৰিল এবং একটা কিছুকে বস্ত্ৰ ধৰিয়া এক ভূৰ্জপত্ৰে দুৰ্গাৰ স্তব লিখতে লাগিল, তখন আৰ আমাকে সে ঘৰে বাখতে পাবিল না। আমি মেয়েটিৰ কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম, আমাকে বাহিৰে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পৰে মা আসিয়া আমাকে কোলে লইলেন, ও নানা মিষ্ট সম্বোধনে থামাইবাব চেষ্টা কৰিতে লাগিলেন। আমাৰ বয়স তখন চাৰি পাঁচ বৎসৰেৰ অধিক হইবে না। আমাৰ মাষেৰ উনিশ বৎসৰ বয়সেৰ সময় আমি হইয়াছি ; স্ত্ৰীত্বাং মাষেৰ বয়স তখন ২৩ কি ২৪ বৎসৰেৰ অধিক নয়। ২৪ বৎসৰেৰ বালিকাৰ ঐ মানতেৰ কথা যখন স্মৰণ কৰি, তখন বিশ্বাস্যবিষ্ট হইয়া মনে ভাবি, এই ধৰ্ম্মনিষ্ঠা আমাৰ চৰিত্ৰে কৈ ?

শৈশবে ঠাকুৰেৰ নিবেদিত অগ্নে অকচি।—এসময়কাৰ একটা অল্পত কথা আছে। অল্পমান চাৰি-পাঁচ বৎসৰ বয়সেৰ সময় আমি কোন মতেই ঠাকুৰদেব নিবেদিত অগ্নি আহাৰ কৰিতে চাহিতাম না। ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিতেৰ বাটীতে এটা একটা ভয়ানক কথা। কে বে আমাৰ মাথাতে এ সংকল্প হুকাইয়া দিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

কিন্তু বেশ মনে আছে যে প্রায় প্রতিদিন আমাব ভাত খাওয়া লইয়া একটা মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইত। আমাদের বাড়ীতে শালগ্রাম শিব পঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পৈতৃক ঠাকুর ছিলেন। প্রপিতামহ মহাশয়ের কথা বলিবার সময় তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইবে। প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন তাঁহাদের অগ্রে নিবেদন না কাবয়া কাহাবও আহাব কবিবাব অধিকাব ছিল না। আমাবও ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল, ঠাকুরদের নিবেদিত অন্ন আহাব কবিব না। এজন্ত বাবাব ও মাৰ হাতে গুরুতব প্রহাব সহ করিতাম, তবুও নিজের জেদ ছাড়িতাম না। অবশেষে নিকপায় দোঁথয়া এই নিয়ম কবা হইয়াছিল যে, আমাব অন্নগুলি স্বতন্ত্র বাঁথিয়া, অপব অন্ন ঠাকুরদের নিবেদন কবা হইত। কিন্তু আমাব পিতামাতাব প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভব থাকিত না। অধিকাংশ সময় ঠাকুরদের নিবেদনের পূর্বে আসিয়া আমি বাঁহিবেব দাবাতে আহাব কবিতে বসিতাম। কোনও কোনও দিন বাবা কোতুক দোঁধবাব জন্ত বান্নাঘবেব ভিতব হইতে অন্ন নিবেদন কবিয়া ঠাকুর লইয়া যাইবাব সময় দাবাব এক প্রান্তে যে আমি আহাবে বসিয়াছ, আমাব পাতে ঠাকুরদের কুশাব জল ছড়াইয়া দিতেন। অর্মান, ‘ভাত আমি খাব না,’ বলিয়া আমি হাত তুলিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিতাম; মা আসিয়া অনেক বুঝাইতেন, কিছুতেই ঋণাইতে পারিতেন না। শেষে বড়পিসীদের বাড়ী হইতে আমাকে ঋণাইয়া আনিতে হইত, কাবণ তাঁহাদের বাড়ীতে ঠাকুর-টাকুর ছিল না।

“জাতহরণী”।—এই ব্যাপাব লইয়া আমাব মাকে পাড়াব মেয়েদের নিকট বড় লজ্জা পাইতে হইত। তাঁহাবা বলিতেন, “তোমাব পেটে এ কি কালাপাহাড় এসেছে?” তখন মা তাঁহাদিগকে নিজের একটি স্বপ্নেব কথা বলিয়া বলিতেন, “আমি জানি, ও ছেলে জাতহরণীতে হরে নিয়েছে।” সে স্বপ্নটি এই। আমাদের এতৎ প্রদেশের স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে সংস্কার আছে যে, স্ত্রীকান্ধে ছন্নদিনের রায়ে

শিশুকে মাটিতে শোয়াইতে নাই, প্রহৃতিকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। মাটিতে শোয়াইলে জাতহরগীতে হরিয়া লইয়া যায়। তদনুসারে আমি যখন ছয়দিনের ছেলে, সেদিন রাত্রে মা খাইয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন যে অর্দ্ধেক রাত সে আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবে, আর অর্দ্ধেক রাত মা নিজে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবেন। তদনুসাবে খাই অর্দ্ধেক রাত্রি রহিল, পরে মার পালা আসিল। মা কিয়ৎকাল বসিয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইলেন। মনে করিলেন, শুইয়া ছেলে বুকের উপর শোয়াইয়া ঘুমাইবেন, মাটিতে না শোয়াইলেই হইল। এই ভাবিয়া আমাকে বুকের উপর শোয়াইয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, একটি রূপলাবণ্যসম্পন্ন নারী স্তবিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে ছেলোট নিজ কোলে তুলিয়া লইয়া গাইবার উপক্রম করিল। মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “তুমি কে ? আমাব খোকাকে কোথায় নিয়ে যাও ?” স্ত্রীলোক হাসিয়া বলিল, “বাঃ, এ যে আমাব খোকা।” মা বলিলেন, “না, আমার খোকা।” মেয়েটি বলিল, “না, আমার খোকা।” এই বিবাদে মার ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখেন, আমি বুক হইতে সরিয়া পড়িয়াছি। এই স্বপ্নের কথা চিরদিন মার মনে জাগিয়া রহিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আমাকে জাতহরগীতে হরিয়াছে বলিয়া কুলধর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি। মার মুখে বাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম।

ভগিনী উম্মাদিনীর জন্ম।—আমার ছয় বৎসর বয়সের সময় আমার এক ভগিনী জন্মিল। সে দেখিতে অতি সুন্দরী হইয়াছিল বলিয়া বাবা কবিত্ব করিয়া তাহার নাম উম্মাদিনী রাখিলেন। সে যখন পাঁচ ছয় মাসের মেয়ে, তখন মা একদিন তাহাকে প্রপিতামহদেবের সন্মুখে রাখিয়া, তাঁহার হাতখানি লইয়া উম্মাদিনীর উপরে রাখিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, “এই মেয়ে হয়েছে দেখ, পদযুগি দেও, আশীর্বাদ কর।” প্রপিতামহদেব

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “মা বে দয়াময়ী ! তুলতে মা পেবে আবাব এসেছিঁস্ ?” প্রপিতামহেব দয়াময়ী ও করুণাময়ী নান্না ছইটী কথা শৈশবেই গত হইয়াছিল। তিনি বিবেচনা কবিলেন, সেই দয়াময়ী পুনবায় আসিয়াছে। তদবধি উন্মাদিনীকে তিনি দয়াময়ী বলিয়া ডাকিতেন।

পাড়ার কুসঙ্গ।—উন্মাদিনী বসিতে সমর্থ হইলেই আমাব খেলিবাব সঙ্গিনী হইল। ছই ভাই বোনে বসিয়া খেলিতাম। মা পাড়াব ছেলেদেব সঙ্গে আমাব মেশা পছন্দ কৰিতেন না। তখন পাড়াব ছেলেবা যে কি খাবাপ কথা বলিত ও খাবাপ কাজ কবিত, তাহা শ্রবণ কবিলে লজ্জা হয়। গালাগালি বৈ তাহাদেব মুখে ভাল কথা ছিল না। অধিকাংশ ছেলে বাগিলেই তাদেব মাকে “পাটী” বলিত। আমাদেব প্রতিবেশী এক জ্ঞাতি ক্ষেঠাব ছেলে-মেবেবা মাকে এত পাটী পাটী বলিত যে, তাদেব * একটি বোনেব মা মা বলাব পৰিবৰ্ত্তে পাটী পাটী বলিমাই কথা ফুটিল। সে মাকে না দেখিতে পাইলেও, “পাটী, ও পাটী” কবিয়া কাদিত। সেই কুসঙ্গেব মধ্যে আমাব মা যে আমাদিগকে কিরূপে বাঁচাইবাব চেষ্টা কবিতেন, তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। * একবাব পাড়াব এক ছেলেব মুখে তাব মাব প্রতি বাপান্ত গালি শুানয়া আসিয়া আমি নিজেব মাকে সেই গালি দিলাম। আব কোথায় যায়। মা আমাকে ধবিয়া ছইখানা খোলাব কুচি একত্র কবিয়া আমাব গালেব মাংস ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ; রক্তে মুখ ভাসিয়া যাউতে লাগিল। তৎপবে কয়েকদিন আহাব বন্ধ হইল ; মা আমাব গলায গলান ভাত ও দুধ ঢালিয়া দিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি জননাব প্রতি গালাগালি আমাব মুখে কেহ কখনও শোনে নাই।

উন্মাদিনীএ প্রতি স্নেহ।—উন্মাদিনীকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম ; সৰ্বদাই কাঁধে কৰিয়া বেড়াইতাম ; কোথাও কিছু ভাল

ফল বা ফুল পাইলে তাহার জন্ত আনিতাম ; সে সজ্জিনী না হইলে খাইতে বসিতাম না ; এবং তাহাকে ফেলিয়া একা শয্যাতে বাইতে পারিতাম না । মা সন্ধ্যার পূর্বে আমাদের দুই ভাই বোনকে খাওয়াইয়া দিতেন ; আমরা দুজনে গিয়া শয়ন করিতাম । আমার কল্লনা-শক্তি শৈশব হইতেই প্রবল, কত যে গল্প বানাইয়া উন্মাদিনীকে শুনাইতাম, এখন মনে হইলে হাসি পায় । গল্প শুনিতে শুনিতে আমার গায়ে হাত দিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িত, আমিও ঘুমাইয়া পড়িতাম ।

“চিন্তা” দাসী ।—১৮৩৩ সালেব সাইক্লোনে সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া স্রন্দববনের অভ্যন্তরবর্তী প্রদেশ সকলকে প্লাবিত করে । সেই প্লাবনে যখন গরীব লোকের কুঁড়েঘর ভাসিয়া যায়, তখন হাজার হাজার পুরুষ ও রমণী জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে । কেহ কেহ নিজ নিজ ঘরের চালের উপরে আশ্রয় লইয়া প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বিভাগে ভাসিয়া আসে । এইরূপে অনেক পুরুষ ও নারী ভাসিয়া আসিয়া আমাদের গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল । তৎপরেই তাহারা বিষম কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করে । এই কলেরার মহামারীতে আমার প্রপিতামহী পিতামহ ও পিতামহীর মৃত্যু হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি । যে সকল লোক ভাসিয়া আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে চিন্তা নামে এক নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক আসিয়া আমাদের বাড়ীতে শরণাপন্ন হয় । আমার পিতামহ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে বাড়ীতে স্থান দেন ; তৎপরেই তাহারা বিষম কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন । চিন্তা আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া যায়, এবং আমার বড়পিসীর পরিচারিকা হয় । আমার বড়পিসীর ছেলেমেয়েরা মাতার গর্ভ হইতে চিন্তা-দাসীর কোড়েই পড়িয়াছেন, ও তাহার কোড়েই প্রতিপালিত হইয়াছেন । আমিও মাতুলালয় হইতে আসিয়া চিন্তার কোড়ে আশ্রয় পাই । আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই দেখিতাম যে চিন্তাই আমাদেরই হইল কৰ্ত্তা । আমরা তাহাকে দাসী বলিয়া মনে করিতাম না, চিন্তা

দিদি বলিয়া ডাকিতাম। চিন্তা সকল কার্যেই পটু ছিল। বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত ; জাল, পোঙ্গো প্রভৃতি লইয়া গ্রামেব প্রান্তবর্তী খাল হইতে মাছ ধরিয়া আনিত ; গো দোহন করিত ; বাজাব হাট করিত, ধান ভানিত ; সর্বোপরি আমাদের প্রতি কেহ কোনও অত্যাচার করিলে বাধিনীর ছায় তাব ঘাড়ে গিয়া পড়িত। চিন্তাব প্রতাপে পাড়াব লোক সশঙ্কিত থাকিত। চিন্তা এমন সুস্থ ও সবল ছিল যে প্রাতে উঠিয়া ১৮১৯ মাইল হাঁটিয়া আমার মাতুলালয়ে তত্ত্ব লইয়া যাওয়া তাহাব পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না।

সেই শৈশবকালে চিন্তাদাসী বোধ হয় আমাদেরকে বলিয়া দিয়াছিল যে, আমাদের বাটীর সম্মুখস্থ নাবিকেলের গাছ বাত্রিকালে দেশ ভ্রমণ কবে। এক ডাকিনী তাহাতে চাপিয়া বেড়াইতে যায়। ইহাতে আমাদের শিশুদলে মহাভয় হইয়াছিল, পাছে আমাদের নাবিকেলগাছ হাবাইয়া যায় ; কি জানি, ডাকিনী যদি কোথাও ফেলিয়া আসে। চিন্তাদাসী ইহা বলিয়া দিয়াছিল, গাছেব গায়ে লোহা মাঝিয়া বাথিলে ডাকিনীতে গাছ লইতে পারে না। আমার স্মরণ হয়, আমবা কয়েক জন শিশুতে মিলিয়া সন্ধ্যাব-পূর্বে গাছেব গায়ে গজাল মাঝিয়া বাথিয়াছিলাম।

মজিলপুরে হার্ডিঞ্জ মডেল (বাজলা) স্কুল।—গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের বাজত্বকালে দেশে কতকগুলি আদর্শ বাজলা স্কুল স্থাপিত হয়। তাহাব একটা আমাদের গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিল। কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী গ্রামাচরণ গুপ্ত নামক একজন ভদ্রলোক তাহাব প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হন। মা পাঠশালের গুরুমহাশয়ের প্রতি বিবর্ত্ত হইয়া আমাকে পাঠশালা ছাড়াইয়া সেই স্কুলে ভর্ত্তি কবাইয়া দিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া আমি “স্কুল বুক সোসাইটি”র প্রকাশিত ‘বর্ণমালা ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নবপ্রকাশিত শিশুশিক্ষা পড়িতে লাগিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষায় অনেক পাঠ মিত্রাকর ও কবিতার

মত ছিল, সেগুলি আমার বড় ভাল লাগিত ; হুই একবার পড়িলেই মুখস্থ হইয়া যাইত। ইহাতে বর্ণপবিচয়ের ব্যাঘাত হইত বটে, কিন্তু আমি বর্ণ মিলাইয়া মুখে মুখে কবিতা কবিত্তে পারিতাম।

মজিলপুরে ইংবাজীস্কুল প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মধর্মের প্রবেশ।—
হার্ডিঞ্জ বাঙ্গলা স্কুল স্থাপনের পবেই আমাদের গ্রামে এক ইংবাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। হবিদাস দত্ত নামে জমিদার-বাবুদেব বাড়ীর একজন যুবক তখন দেশে শিক্ষা-বিস্তার-বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। ইনি অল্পদিন হইল পবলোকগত হইয়াছেন। অমুমান কবি, প্রধানতঃ ইহার ও ইহার বয়স্কাদিগেব যত্নে ও জমিদার-বাবুদেব সাহায্যে ঐ ইংবাজী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। আমার মনে আছে যে সেই স্কুলে একজন ইংবাজ হেডমাষ্টার লওয়া হইয়াছিল। সেটা গ্রামবাসীদের পক্ষে এক নূতন ব্যাপার। সাহেবেব সঙ্গে এক কুকুর স্কুলে আসিত, সে সাহেবের টেবিলেব তলায় শুইয়া থাকিত। আমবা তাহাকে দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। সাহেব জমিদার-বাবুদেব এক বাগান-বাড়ীতে থাকিতেন। আমবা তাঁব পালিত মুরগী ও অত্যাশ পাখী দেখিবাব জ্ঞান গিয়া সেই বাগানে 'কি খুঁকি মাঝিতাম। সাহেবকে রাস্তায় দেখিলে সে পথ হইতে অন্তর্ধান কবিতাম ! ইহাতেই প্রমাণ, আমাদের গ্রামে নূতন সভ্যতার আলোক আমার বাল্যদশাতেই প্রবেশ করিয়াছিল। কেবল তাহা নহে ; হবিদাস দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবকের উৎসাহে “মজিলপুর পত্রিকা” নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, এবং কিছুদিন চলিয়াছিল। তত্ত্বিন্ন ব্রজনাথ দত্ত নামে আমাদের গ্রামে একজন মধ্যবিস্তার বিষয়ী লোক ছিলেন। জ্ঞান-চর্চাতে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও জ্ঞানী মানুষদিগকে লইয়া সর্বদা জ্ঞানালোচনা করিতে ভালবাসিতেন। শুনিয়াছি, তিনি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবকৃষ্ণ দত্ত মজিলপুর পত্রিকার

সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং গ্রামের উন্নতি-বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। শুনিয়েছি, তিনিই গ্রামে ব্রাহ্মধর্মকে প্রবর্তিত করেন এবং আমার ভক্তি-ভাজন স্বগ্রামবাসী গুরুস্থানীয় উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্মে অনুবাসী করেন। এই শিবরক্ষ দত্ত ইহাব কিছুদিন পবে লুক্সিসিয়াব উপাখ্যান বাঙ্গলা পড়ে অনুবাদ করেন এবং বাঙ্গলা কাব্য বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হন। পবে ইনি উন্মাদ-বোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই বহুদিন পবে গতানু হন। ইহাব উন্মাদ বোগ সম্বন্ধে একটি শ্রবণীয় কথা আছে। ইহাব পিতা ব্রজনাথ দত্ত জ্ঞানানুবাসী ও গুণীগণের উৎসাহদাতা মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় সিদ্ধি খাইতেন। লোকে যেমন ঘবেব দেওয়ালে গোববেব ঘুঁটে দিয়া বাধে, তেমনি তিনি গাহাব বৈঠক-ঘাবে দণ্ডবালে ছোট ছোট ঘুঁটেব মত সিদ্ধি দিয়া বাধিতেন, মধ্যে মধ্যে তাহা লইয়া নিজে খাইতেন এবং বন্ধুদিগকে খাইতে দিতেন। আশ্চর্য্য এই দেখা গেল ইহাব কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পাগল হইয়া গেল। ইহাব অতিবিস্তৃত সিদ্ধি পান ও ভোজন তাহাব কারণ হইতে পারে। বাহা হউক, আমার শৈশবে ও আমার গ্রাম ভাগ কবিবাব সময়ে, মজিলপুৰ শিক্ষাদি বিষয়ে চব্বিশ পবগণাব দক্ষিণ প্রদেশে একটা অগ্রগণ্য গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইগ্রামে ব্রাহ্মধর্মের ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলন চতুর্থ পবিচ্ছেদ বর্ণনা কবা যাউবে।

মাতার কাছে পাঠশিক্ষা।—এই সময়ের আব কবেকটা বিষয় স্মরণ আছে। মাতাঠাকুবাবীব আহাব কবান'ব গুণে আমার ভুঁড়িটি বিলক্ষণ বড় হইয়াছিল। কথাকৃতি হাত পা, কিন্তু ভুঁড়িটি বেশ গোলগাল। সেজন্য গ্রামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় আমাকে “অক্ষিংথেকো বামন” বলিতেন; এবং আমাকে কাছে পাইলেই, হুই আঁচুল দিয়া আমার পেট টিপিতেন। আমি ভুঁড়ির জন্য অনেক শিক্কের কাছে এই পেট টেপাব যত্না ভোগ

কবিতা। এক এক দিন স্কুলে পৌঁছিলেই পণ্ডিত মহাশয় আমার কাপড়খানি খুলিয়া মাথায় বাঁধিয়া দিতেন; এবং পেট টিপিয়া বলিতেন, “আফিংখোব বামণ, তোমাব মা তোমাকে কত ভরি আফিং খাওয়ান?” ফলতঃ পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বড় ভালবাসিতেন; তাহাব কারণ এই, আমি ক্লাসেব পড়াতে সৰ্ব্বদা প্রথম কি দ্বিতাব স্থানে থাকিতাম। তাহাব কাবণ ছিলেন আমাব মা। আমি মায়েব কাছে পড়া শিখিয়া যাইতাম। তবে আমাব এইটুকু প্রশংসাব বিষয় যে পড়াতে আমার মনোযোগ ছিল। মা প্রাতে উঠিয়া গৃহকন্ডে ব্যস্ত হইতেন। আমি বইখানা হাতে লইবা, “মা এটা কি?” “মা এ কথাব অর্থ কি?” এই বলিতে বলিতে তাঁব সঙ্গে সঙ্গে যুঁবিতাম। একাটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শিশুর্গশব্দাতে আছে, “অ” ও “উ” এ “য” ফলা—উদাহরণ “আচা লোক সদা সুখী।” মা ফিবিষা বলিলেন, “ওটা আচা।” ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। প্রশ্ন, “আচা কাকে বলে মা?” উত্তর, “আচা বডমাহুয, যেমন গোপালবাবু” (গ্রামেব একজন জমিদার)। স্কুলে পণ্ডিত মহাশয় যেই “আচা” শব্দ বানান কবিত্তে বলিলেন, অমনি সৰ্ব্বাগ্রে আমি বানান কবিতাম, অা ও উ-য়ে য ফলা—আচা, আচা বলতে বডমাহুয, যেমন গোপাল বাবু। পণ্ডিত মহাশয় তনিতাই হাসিয়া উসিলেন। বলিলেন, “হাঃ হাঃ—ও তুই কোথায় পেলা রে?” উত্তর, “কেন, আমাব মা বলে দিয়েছে।” এইরূপে মায়ের গুণে কোনও বালক আমাকে আঁটিয়া উঠিতে পাবিত না। ইহাব এক ফল এই হইল যে অশ্রান্ত বালকেবা বাড়ীতে গিয়া নিজ নিজ মায়ের কাছে আবদার আবস্ত কবিল, “শিবেব মা কেমন পড়া বলে দেয়। তুই কেন দিল না?” মায়েরা বলিতে লাগিলেন, “আরে মলো, আমি কি লেখা পড়া জানি? শিবেব মা ত ভাল জালা ঘটালে।” এইরূপে আরোহিত একটু লেখাপড়া জানিয়া বরে বরে গোল বাবাইয়া দিতাছিলেন।

“শিব নাচি নাচি যায়”।—আমাদের বাড়ীর পাশে জ্ঞাতদেব বাড়ীতে এক গোবান্দা বিববা যুবতী থাকিতেন, তিনি সম্পর্কে আমার পিতার খুড়ী। আমার মাকে অন্নদামঙ্গল, বামায়ণ, মহাভারত, বোমিও জুলিয়েট প্রভৃতি পড়িতে দেখিয়া তাঁর লেখাপড়া শিখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি আমাকে তাঁর ঘর ডাকিয়া লইয়া খাইবার জন্ত কিছু মিষ্টদ্রব্য হাতে দিয়া, অনেক খোসাগোদ করিয়া বর্ণপরিচয় করিত বসিতেন, এবং হাতে তালি দিয়া আমাকে নাচাতেন, আব বগিতেন, “শিব নাচি নাচি যায়, শিব ডম্বুক বাজায়, ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডম্বুক বাজায়।” আমি তাতে তাতে নাচতাম। ঈহাব পবে আমার সহৃদয় খুড়ী জেঠী দিদিবা আমাকে দেখিলেই “শিব নাচি নাচি যায়” বলিয়া আমার অভ্যর্থনা করিতেন।

খোঁড়া জ্যাঠাভূতো বোন।—আমি বোধ হয় ভিতবে ভিতবে চিরদিন প্রশংসাপ্রিয় মানুষ। এ দুর্বলতাটা শৈশব হইতেই আছে। আমাদের পাশের বাড়ীতে আমার একজন জ্ঞাতী জেঠাব একটি খোঁড়া মেয়ে ছিল, সে বোধ হয় আমার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড় ছিল। সে আমাকে ভুলাইয়া বোজ্ঞ প্রাতে আমার খাবার হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য চাহিয়া খাইত। আমি যেই খাবারের ধানীটা হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতাম, অমনি সে আমাকে মিষ্টস্ববে ডাকিত, “আগাশ দাদা! এখানে এস।” সে তাদের দাবা হইতে নামিতে পারিত না, কাজেই আমাকে যাইতে হইত। কেন যে সে আমাকে “আগাশ দাদা” বলিত জানি না। যতই আমি তাহাদের দাবার দিকে অগ্রসর হইতাম, ততই তাব মিষ্ট কথাব মাত্রা বাড়িত, “কি লক্ষ্মী ছেলে, কি সুন্দর ছেলে,” ইত্যাদি। আমি আত্মলাদে আর্চিথানা হইয়া সেই দাবার গিন্না উঠিতাম, অমনি সে বলিত, “এস না ভাই, দুজনকে খাবার মিশিয়ে খাই।” এই বলিয়া তার ধানীর খাবারগুলি আমার ধানীতে কেলিয়া খাবা খাবা

কবিতা খাটতে আবন্ত কবিত। তাহাতে আমাব আনন্দই হইত। হাঁসিৰ কথা এই, খাবাবগুলি শেষ হইলেই আব সে আমাব প্ৰতি প্ৰেম দেখাইত না। সামান্য একটু কিছু মনেব অনভিমত কাজ কৰিলেই আমাকে খাম্চাইয়া গালি দিয়া, দাবা হইতে নামাইয়া দিত। আমি কঁাদিতে কঁাদিতে ঘৰে আসিতাম। মা বলিতেন, “থুব হয়েছে, বেশ হয়েছে, পাঁচশ’ বাব বলি খুঁড়ীৰ কাছে যাস্‌নি, তবুও মব্‌তে যাস্‌।” মা বাবণ কৰিলে কি হয়, আমি খুঁড়ীৰ কাছে না গিয়া থাকিতে পাবিতাম না; বোধ হয় প্ৰংশসাতুকুব লোভে। ইংৰাজ কবি Cowper নিজেৰ সম্বন্ধে বলিষাছেন, “Dupe of to-morrow even from a child.” আমিও নিজেব সম্বন্ধে বলিতে পাৰি, “Duped by to-morrow even from a child.”

“তুমি কি আমাব সেই খেলাৰ সঙ্গিনী ?”—সে কালেব আব একটা কথা মনে আছে। একটা সুন্দৰ ফুটুকুটে গৌবৰ্ণ মেবে আমাদেব পাশেব বাড়ীতে তাব মাসীৰ কাছে আসিত। সে আমাব সমবয়স্ক। ঐ মেয়ে আসিলেই আমাব খেলা-ধুলা লেখাপড়া ঘুচিয়া যাইত। আমি তাব পায়ে পায়ে বেড়াইতাম। আমবা পাড়াব বালক বালিকা মিলিয়া “চাঁদ চাঁদ, কেন ভাই কঁাদ” প্ৰভৃতি অনেক খেলা খেলিতাম। তখন সে আমাদেব সঙ্গে খেলিত। খেলাব ঘটনাচক্ৰে যদি আমি তাহাব সঙ্গে এক দলে না পড়িতাম, আমাব অস্থৰেব সীমা থাকিত না। আমি তাব হাত ধৰিয়া খেলাব সঙ্গীদিগকে বলিতাম, “আমি এব সঙ্গে থাকুব, তোমাব আমাব বদলে এ দল হতে ও দলে আব কাককে দেও।” বালকেয়া আমাব অস্থবোধ বাঞ্ছিত না; বকিয়া, ঠেলিয়া, গলা টিপিয়া আমাকে আৰ এক দলে দিয়া আসিত। ঐ বালিকাৰ বাড়ী আমাদেব ঘুলেব পথে ছিল। আমি স্কুল হইতে আলিবাৰ সময় তাহাব সঙ্গে দেখা কৰিয়া একটু খেলা কবিতা আসিতাম। ইহাব পৰ আমি বখন কলিকাতাৰ আমাৰ

ও এখানকার পাঠাদিতে ব্যস্ত হইলাম, তখন গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সে দুবে খণ্ডরবাড়ী চলিয়া গেল। আর বহু বৎসর তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে বড় হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পূর্বে গ্রামে গিয়া আবার তাহাকে দেখিলাম, দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সে প্রস্ফুটিতপুষ্পসম কান্তি বিলীন হইয়াছে! সম্ভ্রান্তভাবে ও সংসাবভাবে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহা “তুমি কি আমার সেই খেলার সঙ্গিনী?” নামে একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছি। আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমার বন্ধু দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেই কবিতাটি জ্যোত কবিতা কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার অবলা-বান্ধবে ছাপিয়াছিলেন। আমি সেটিকে সংগ্রহ করিবাব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু অবলা-বান্ধবের পুত্রাতন ফাইল না পাওয়াতে পারি নাই।

গাছে চড়া।—এই পঠদশাব স্মৃতি হৃদয়ে বড় মিষ্ট হইয়া বহিয়াছে। গ্রীষ্মের কয় মাস মর্নিংস্কুল হইত। আমি পাড়ার বালকদের সঙ্গে মিলিয়া অতি প্রভুত্বে উঠিয়া ফুল তুলিতে যাইতাম। কোঁচড় ভরিয়া ফুল লইয়া স্কুলে যাইতাম। জমিদারবাবুদের বাড়ীর সম্মুখে একটা চাঁপা গাছ ছিল, সেই গাছে চড়িয়া ফুল পাড়িতাম। আমি গাছে চড়িতে তত পবিশক ছিলাম না। কখনই ডাংপিটে ছেলে ছিলাম না। কিন্তু পাড়ার ডাংপটে ছেলেরা আমাকে গাছে চড়িতে শিখাইতে ক্রটি করিত না। চড়িতে ভয় পাইলে ভীক বলিয়া উপহাস করিত, সেটা প্রাণে সহিত না।

গানের দলে দোহার।—সে কালের আরও কয়েকটি কথা মনে আছে। একবার পাড়াতে একদিন রামায়ণ গান হইল। তাহা দেখিয়া পাড়ার ছেলেরা এক রামায়ণ গানের দল করিল। আমি গাইতে পারিতাম না, সুতরাং মূলগায়ন হইতে পারিলাম না। কিন্তু আমার উৎসাহে দলটি ক্ষমিতা পেল। এক ছেলের গলায় একটা চোল, আর

একজনের হাতে কবতাল, মুলগানের হাতে চামচ দিয়া, আমরা নুপুর পায়ে দিয়া দোয়াব হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে বাড়ীতে গান গাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সে গানের মাথা মুণ্ড ভাব অর্থ কিছুই থাকিত না। পাড়ার একজন কোতুকপ্রিয় লোক হাসাইবার মত কতকগুলো ছড়া বাঁধিয়া আমাদেরকে শিখাইয়া দিলেন, তাহাই আমরা বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েদিগকে শুনাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মেয়েরা হৌ হৌ কবিয়া হাসয়া কে কাব গায়ে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতেই আমরা পবমানন্দিত হইয়া আপনাদের শ্রম সার্থক বোধ কবিতে লাগিলাম।

জানোয়ার পোষা, পীপড়া পোষা — আমি তখন পশুপক্ষী পুষ্টিতে বড় ভালবাসিতাম। পুষ্টি নাই এমন জন্তুই নাই। টুনটুনি, বুলবুলি, দবেল, ছাতাবে, শালিক, টিয়া, ওসকল তো পুষ্টিবাছি, পীপড়াও পুষ্টিতাম। ফড়িং ও পীপড়া পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্নে কোটাব মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দুর্কীব ঘাস খাওয়াইতাম, পীপড়াদিগকে চিনি মধু প্রভৃতি খাইতে দিতাম। পীপড়ার গতিবিধি লক্ষ্য কবিতে এতই ভাল লাগিত যে, আমি যখন ৬৭ বৎসরের ছেলে তখনও পীপড়া হইয়া চাবি হাত পায়ে পীপড়াদের সঙ্গে সঙ্গে ঘূষিতাম। মাছি মাঝিয়া খ্যাংবা কাঠিৰ অগ্রভাগ তালিয়া সেই কাঁটা দ্বারা সেই মাছি দাবাব মাটিতে পুঁতিয়া দিতাম; দিয়া কখন পীপড়া আসিয়া মাছি ধরিয়া টানাটানি করিবে সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম। হয়তো আধ ঘণ্টার পৰ সেখানে একটা পীপড়া দেখা দিল। সে প্রথমে আসিয়া মাছিটির পা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। যখন দেখিল সহজে টানিয়া লইতে পাবে না, তখন চারিদিক এদক্ষিণ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমার খ্যাংবা কাঠিটার উপরে একবার উঠে, একবার নামে, বড়ই ব্যস্ত। অবশেষে সে চলিয়া গেল। আমি

তাৰ সঙ্গ সঙ্গ গুঁড়ি মাৰিয়া চলিলাম। সে গিয়া গন্তেৰ মধ্য প্ৰবিষ্ট হইল। আমি দ্বাবে অপেক্ষা কৰিয়া বহিলাম। আৰু আধঘণ্টা গেল। শেষে দেখি সৈন্তদল বাহিৰ হইল। পীপডাৰ সাৰি, মধ্য মধ্য ভইট কৰিয়া বলবান অপেক্ষাকৃত দীৰ্ঘাকৃতি পীপডা। পৰে ভাবিবাছি, তাহাৰ সেনাপতি হইবে। প্ৰকাণ্ড সৈন্তদল ক্ৰমে আমাৰ মাছিৰ নিকট উপস্থিত, তখন মহা টানাটানি আৰম্ভ হইল। অবশেষে আমি খ্যাংবা কাঠিটি তুলিয়া লইলাম। তখন মাছি লইয়া সকল গন্তেৰ দিকে দৌড়ল। ইহাৰা কিবিতোছে, তখন অপানবা আসতোছে, পথে মুখোমুখী কৰিবা কি সঙ্কেত কৰিলে যে, যাহাৰা আসিতোছিল তাহাৰাও দিবি। আমি মান কবিতাম, ইহাৰা নিশ্চয় কথা কয়। তখন মাটীৰ নিকটে কান পাতিয়া বহিলাম, তাহাদেব শব্দ শোনা বায় কি না? কান পাতিয়া আছি, তখন কেহ শব্দ কৰিলে বাবল কবিতাম, “চুপ কব, চুপ কব, পীপডেবা কি বলছে গুনি।” ইহা দেখিবা বাডীৰ লোকেবা হাসাহাসি কৰিতেন। এই ব্যাপাৰ প্ৰায় সৰ্বদাই ঘটিত।

পাখাধৰা ও পাখা পোষা।—তৎপৰে, পাখী ধৰিবাব ও পুৰিবাব জন্ত অতিশয় উৎসাহ ছিল। পাখাৰ গাসা হইতে বাছা চুৰি কৰিয়া আনিতাম, আনিবা তাৰ মায়েৰ মত যত্ন তাহাকে পালন কৰিতাম। সে-জাতীয় পাখীবা কি খায়, তাৰেব মানেবা কিকপে খাওয়ায়, এ-সকল সংবাদ পাড়াৰ ডাংপিটে ছেলেদেব কাছে পাইতাম, সেইকপ কৰিয়া দিনেৰ মধ্য দশবাৰ কৰিবা-খাওয়াইতাম। হাঁডিৰ গায়ে ছিদ্ৰ কৰিবা, তাৰ মধ্য কুটিকাটি দিয়া বাসা বাধিয়া তাৰ মধ্য বাছা বাধিতাম। বাধিয়া একখানি সৰা দিয়া ঢাকিয়া হাঁড়িট ঘৰেৰ চালে বুলাইয়া বাধিতাম, পাছে সাপে বাইয়া যায়। তাৰপৰ খেজুৰ গাছেৰ ডাল ফাটিয়া, অগ্ৰভাগেৰ পাতাগুলি চিৰিয়া খ্যাংবাব মত কবিতাম; তাহাকে বলে ছাট। সেই ছাট হাতে কৰিয়া মাঠে মাঠে ঘাস-বনে কড়িৎ ধৰিতে বাইতাম। ঘাসেৰ

উপব ছাটগাছি বুলাইলেই ফড়িং লাফাইয়া উঠিত। অমনি 'সেই ছাট সম্ভবে তাব পৃষ্ঠদেশে মাঝিয়া তাহাকে অর্দ্ধমৃতপ্রায় করিতাম। সেই অচৈতন্য অবস্থাতে তাহাকে এক বাঁশেব কেঁড়ের মধ্যে পুঁষিতাম। এইরূপে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা ফড়িং ধরিতাম। ধবিষা আনিয়া পাখীকে খাওয়াইতাম। পাখীবা বাচ্চা পোষা প্রায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইত। বাবা তখন ছুটিতে বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি আমাদের পাখীপোষা দেখিতে পারিতেন না। পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, ইহা সহিতে পারিতেন না। পাখীবা বাচ্চাকে খাওয়াইতে দেখিলেই আমাদের মাঝিতেন। সুতরাং তাঁহাব অনুপস্থিতি-কালে, আমাদের ঐ বাচ্চাব মায়ের কাজ কাবতে হইত। পিতাব হস্তে এত প্রহাব খাইবাও কিরূপে আমি তাহাদিগকে পালন করিতাম, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

মা আমাদের পাখী পোষাব বড় বিবোধী ছিলেন না। বোধ হয় ছেলে বাড়ীতে থাকে এবং একটা কাজে ভুলিয়া থাকে, এই তাঁব মনেব ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহাবও পাখী পোষাব সখ ছিল। আমি চলিয়া আসিবাব পবও তিন অনেক পাখী পুঁষিয়াছেন।

আমি যে কেবল পাখীবা বাচ্চা পুঁষিতাম তাহা নহে, ধাড়ি পাখীও পুঁষিতাম। বড় পাখী ধবিবাব তিনপ্রকাব কোশল ছিল। প্রথম, আমাদের উঠানে একটা ধামা খাড়া কবিয়া তাহাব সম্মুখে চাল কড়াই ছড়াইয়া, ধামাব পৃষ্ঠে একগাছি বাঁকাবিব অগ্রভাগ লাগাইয়া, অপব প্রান্ত দাবান্তে লাগাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কোনও ঘুঘু বা পার্বা বা শালিক যেই আসিয়া একমনে চাল কড়াই খাইত, অমনি বাঁকাবিব দ্বারা ধামাটি ঠেলিয়া তাহাকে ধামা চাপা দিতাম। দ্বিতীয়, গাছেব ডালে বধন পাখীতে পাখীতে ঝগড়া ও মারামারি করিত, তখন তাহাব নীচে গিয়া কাপড়ের-জাল পাতিতাম। তাহাবা মাঝামাঝি করিবাব সময় রাগে এমন অন্ধ হয় যে, দুজনে জড়ামড়ি করিয়া পাকা ফলটির মত গাছের

তলার পড়িয়া যায়। কখন কখনও ঐরূপে আমাব কাপড়ে পড়িয়া বাইত। তৃতীয়, টুনটুনি, দয়েল, প্রভৃতি ক্ষুদ্র পাখীরা যখন অশ্রমনস্ক ভাবে গাছেব ডালে বসিয়া থাকিত, তখন ভেঁ। কবিয়া তাহাব পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল মারিতাম। হঠাৎ তাহাদের পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল লাগাতে তাহারা দিশাহাবা হইয়া পড়িয়া যাইত ; আমি অমনি তাহাদিগকে ধবিতাম।

ঢিল ছোড়া।— ঢিল ছোড়া বিষয়ে আমাব অদ্ভুত বিজ্ঞা ছিল। পাখীকে বাচাইয়া ডালে ঢিল মাঝিতে পারিতাম। বলা বাহুল্য যে অনেক সময় ডালে ঢিল না লাগিয়া পাখীর মাথায় লাগিত এবং পাখীটির প্রাণ বাইত। এইরূপে আমাব হস্তে অনেক পাখীর প্রাণ গিয়াছে। বলিতে কি, পুরুবে বাঙাটা ভাসিতেছে বা গাছে পাখীটা বসিয়া আছে দেখিলেই আমার ঢিল মাঝবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিত। শুনিলে হয়তো অনেকে হাসিবেন, এই বৃদ্ধ বয়সেও সময় সময় বৃক্ষশাখায় পাখীটি আছে দেখিয়া আমার ঢিল মাঝিতে ইচ্ছা করে, অমনি হাসিয়া সে ইচ্ছা নিবারণ করি।

আমাব ঢিল ছোড়া বিষয়ে দুইটা ঘটনা স্মরণ আছে। একবার আমার পিতার সহিত কোথায় যাইতেছিলাম। তখন আমার বয়স ১৩১৪ হইবে। পিতা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। আমি পশ্চাৎ হইতে দৌড়িতে পাইলাম, আমার পিতার সম্মুখস্থিত একটি বৃক্ষের শাখাতে একটি শালিক পাখী অশ্রমনস্ক ভাবে বসিয়া আছে। আর সে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। যে পিতাকে যমের মত ভয় করিতাম, তিনি সঙ্গে, সে কথাও মনে থাকিল না। ভেঁ। করিয়া আমার ঢিলটি ছুটিল। পাখীটির কোথায় যে লাগিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু পাখীটা পাকা কলটির মত বাবার সম্মুখে পড়িয়া গেল। বাবা বুঝিতে পারেন নাই যে, আমি পশ্চাৎ হইতে ঢিল ছুড়িয়াছি, সুতরাং তিনি মনে করিলেন, আর কোনও কারণে পড়িয়াছে। তিনি পাখীটিকে কুড়াইয়া

লইলেন। নিকটবর্তী এক পুষ্করিণীর ঘাটে লইয়া অতুলির অগ্রভাগে কবিয়া তাব মুখে জল দিতে লাগিলেন। স্নেহে বিষয় পাখীটি মবিল না। তিনি পথেব একজন লোককে পাখীটি দিয়া গন্তব্যস্থানের অভিমুখে চলিলেন। আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

আব একদা আমি পথে যাইতেছি, আমার সম্মুখে আব-একজন লোক যাইতেছে। আমি দেখিতে পাঠলাম, দুবে আমাদের সম্মুখস্থ বাস্তার পার্শ্বে একটি ছাগল বাধা বহিয়াছে। অমনি ঢিল ছুড়িবাব প্রবৃত্তি আসিল। বহিতে এজ্জা হইতেছে, তেঁা কবিয়া এক ঢিল ছুড়িলাম। সে নিবপবাব প্রাণী চাৰিতেছিল, আমার ঢিল গিয়া বোধহয় তাব মাথায় লাগিল। ব্যাধিতে পারিলাম না, কেবল মাত্র দেখিলাম, ছাগলটি একবার ভ্যা কবিয়া ডাকিয়া মাটাতে মুখ খুঁড়াইয়া-খুঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঐ দেখাবাই আমি পশ্চাৎ হইতে চম্পট। আব-এক পথ ধরিয়া পাত্তা ঘুরিয়া কিছু পবে গিয়া দেখি, কয়েকজন লোক জুটিয়াছে, ছাগলটাকে শোয়াইয়া জল ঢালিয়া বাঁচাইতেছে, বোধ হইল ছাগলটি মবিবে না।

পাখী দেখিতে তন্ময়স্বভা।—তখন আমি যেমন পাঁপড়ার গতিবিধি লক্ষ্য কবিতাম, তেমনি পাখীর গতিবিধি লক্ষ্য কবিতেও জলবাসিতাম। যদি দৈবাৎ উঠানে কোনও পাখী আসিত, তাহা হইলে আমি, মা খুঁড়া জেঠী যে কেহ সে সময় কথা কহিতেন, সকলেব মুখ চাপিয়া ধবিতাম, “চুপ কব, চুপ কব, পাখী এসেছে।” একবাব পাখী দেখিতে গিয়া হাতীব পায়েব মধ্যে পড়িয়া গেলাম। তখন আমাদের গ্রামে পোলবন্দী ইঞ্জিনিয়ার সাহেবেব হাতী বাইত; কারণ, বেল বা বাস্তা বাট ছিল না। একবাব আমি পাঠশালে বা স্কুলে যাইবার জুত বাহিব হইয়াছি; দণ্ডবুটী বগলে আছে; এমন সময় হঠাৎ একটী নূতন বকমেব পাখী দেখিলাম, যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই। সে লেজ তুলিয়া চমৎকার নীন্দ্র দিতেছে। আমি চিত্তাৰ্পিতের ভাৱ দাঁড়াইয়া

গেলাম, “এ কি পাখী ?” নিম্নাচিলে তাহার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগলাম। ওদিকে পোলবন্দী সাহেবের হাতী আসিতেছে। মাহত চোঁচাইতেছে, পাড়ার লোকেরা “ওরে অমকের ছেলে, মলি মলি, পালা পালা” বলিয়া চোঁচাইতেছে। আমাব সোদকে খেয়াল নাই ; কানে একটা আওয়াজ আসিতেছে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ চেতনা হইতেছে না ; এমন সময় হঠাৎ দেখি হাতী শুঁড় দিয়া আমাকে ধরিবাব চেষ্টা করিতেছে। মাহত বোধ হয় আমাকে সরাইয়া দিতে হুঁজিত করিতেছে। হাতাব শুঁড় দেখিয়াই ভয়ে চাৎকাব করিয়া সরিয়া গেলাম।

কারগানুসন্ধিৎসা।—আম বে কিছু দেখিলেই এত মনোযোগী হইতাম, তাহার কারণ বোধ হয় এই বে, শৈশব হইতেই আমাব কাবগানু-সন্ধিৎসা বড় প্রবল ছিল। মায়েব মুখে শুনিয়াছি বে, আমি দাঁড়াইতে ও কথা কাহিতে শিখিলেই সকল বিষয়ে কেন কেন বলিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতাম। যথা, তাহাব কোলে চাড়িয়া আব-এক পাড়ায় নিমন্ত্রণে যাইতেছি, হঠাৎ পথে একটি নূতন গরু দেখিলাম। অমনি প্রশ্ন—ও কাদের গরু ? উত্তর—পুঁটেদেব গরু। প্রশ্ন—এখানে কেন বেথে গেছে ? উত্তর—ঘাস খাবে বলে। প্রশ্ন—কেন ঘাস খাবে ? উত্তর—ক্ষিদে পেয়েছে বলে। প্রশ্ন—কেন ক্ষিদে পেয়েছে ? উত্তর—সমস্ত রাত কিছু খায়নি বলে। প্রশ্ন—কেন খায়নি ? উত্তর—ওরা রাত্রে গরুকে জাব্না দেয় না বলে। প্রশ্ন—কেন রাত্রে জাব্না দেয়না ? উত্তর—ওরা গরীব বলে। প্রশ্ন—গরীব কাকে বলে ? ইত্যাদি। সময়ে সময়ে এই কেন’র মাত্রা এত অধিক হইত যে উত্তরের পরিবর্তে চপেটাঘাত পাইতাম। এই কারগানুসন্ধান-প্রবৃত্তি হইতেই বোধ হয়, পী’পড়ে ও পাখীর গতিবিধি এত লক্ষ্য করিতাম।

বিড়ালছানা পোষা।—কেবল বে পুখী ভালবাসিতাম, তাহা নহে, অন্যান্য জন্তুও পুখিতাম। বিড়ালছানা আনিয়া উন্মাদিনীকে দিতাম, সে পুখিত। অনেক সময়ে আমাদের উভয়ের অতিরিক্ত প্রেমবশতঃ তাহাদের

প্রাণ যাইত। বিড়ালেব মধো রূপীৰ কথা শ্রবণ আছে। রূপী একটি মেনি বিড়াল ছিল। এমন সুন্দর বিড়াল কম দেখা যায়। শাদাব উপরে পেটেব দুই পাশে ও মাথায় কাল দাগ। লোমগুলি পুরু পুরু, চক্কুহাট হরিদ্রাবর্ণ, ও লেজটি মোটা। এখন মনে করি রূপী বোধ হয় দোআঁশলা বিড়াল ছিল। কে যে তাহাকে দিয়াছিল মনে নাই। উন্মাদিনী ও আমি তাহাকে পুষিয়াছিলাম। তিনি এমন আত্মবে হইয়াছিলেন যে, উনান কাষায় শোয়া তাব পক্ষে সম্মত হইত, বিছানাব উপর না হইলে তিনি গুততেন না। উন্মাদিনী ও আমি যখন সন্ধ্যাব সময় আসিয়া শয়ন করিতাম, তখন রূপী বাবা ও মাৰ পাতেব মাছেব কাটাৰ লোভও ত্যাগ কাবয়া আমাদেব হৃজনেব মধো আসিয়া শুইত। অনেক সময় তিনজনে গলা-ধড়াজড়ি করিয়া ঘুমাইতাম। মা শয়ন করিতে আসিয়া, তাহাকে মশাবিব বাহিবে ফেলিয়া দিতেন। ভোরে যদি কোন দিন ঘুম ভাঙিত, দোখতাম রূপী গবাব-দুঃখীৰ মত মশাবিব বাহবে পাড়য়া আছে। তখন বড় দুঃখ হইত; তাহাকে আবার মশাবিব মধ্যে আনিতাম। তাহা লইয়া মাতাপুত্রে বিবাদ হইত।

কুকুর “শেয়াল-থাকী”।—আমাদেব তখনকাব আব-একজন খেলার সঙ্গীৰ কথা শ্রবণ আছে। সে শেয়ালথাকী। শেয়ালথাকী একটা মাদী কুকুব। তাহাব ইতিবৃত্ত এই। আমার বাবা একদিন দোখলেন একটি কুকুবেৰ বাচ্ছাকে শেয়ালে লইয়া যাইতেছে। দেখিয়া তাঁৰ দয়ার আৰিষ্ঠাব হইল। তিনি হৈ হৈ কবাতে ও টিল ঢেলা মারাতে শেয়ালটা বাচ্ছাটাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। বাবা বাচ্ছাটা কুড়াইয়া আনিলেন, সে তখন অতি শিশু। তাহার পুষ্ঠেৰ শেয়ালেৰ কামড়ের ঘা শুকাইতে অনেকদিন গেল। সে বড় হইল, বাবা তাহাব নাম শেয়ালথাকী রাখিলেন। শেয়ালথাকী আমাদেব বাড়ীতেই রহিয়া গেল, এবং পাড়ার বালক-বালিকার খেলিবার একটা মন্ত সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। এখন আমার ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়,

আমবা শেয়ালখাকাকে আমাদেরই একজন ভাবিতাম। সে সকল খেলাতেই সঙ্গে থাকিত। আমবা পাড়ার বালক বালিকাদের সঙ্গে মিশিয়া কখন কখন বনভোজনে গাইতাম। পাড়ার নিকট কোনও জঙ্গলময় স্থান পৰিষ্কার করিয়া সেখানে উনান করিয়া প্রত্যেকেব বাড়ী হইতে কাঠ কুটা চাল ডাল বহিয়া লইয়া যাইতাম। বালকাবা বাবত, বালকেবা হইত। নমস্কৃত ব্রাহ্মণ, এবং গাঙ্গাদের মা খুড়া জেঠীরা হঠাতেন অতিথি। পবন স্থখে বনভোজন হইত। শেয়ালখাকা আমাদের সঙ্গে সমস্ত দিন বনে থাকিত। আহাবান্তে আমবা যখন বনে লুকোচুর খেলিতাম, তখন শেয়ালখাকার বনেব মধ্যে লুকাইত, আমবা খুঁজিয়া বাতন করিতাম। আমবা তাকে খেলাব সঙ্গী বলিয়া জানিতাম।

শেয়ালখাকার ছোটটি কান্দি স্বৰ্ণ আছে। একবার আমবা কয়েকজন বালকে পবামশ কাবলাম যে প্রাণ বশাদের একটা পুৰাতন ভাঙ্গা দালানে চুকিয়া পায়বা বাবব। ঐ দালানের মধ্যে অনেক পায়বা থাকিত। আমবা মধ্যে মধ্যে ধবে চুকিয়া দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া তাড়া দিয়া পায়বা ধাবতাম। কিন্তু দাব জানালা ভাঙ্গিয়া তাহাতে এত গৰ্ভ হইয়া গিয়াছিল যে সেগুল বন্ধ কাববার ভিত্ত প্রায় পাঁচ-ছয়জন বালককে ঘবে প্রবেশ করিতে হইত। দবজা জানালাব গৰ্ভে গৰ্ভে পিঠ দিয়া এক-একজন বালক দাঁড়াইত, আব একজন পাববাদগকে তাড়াহবা করিত। সেদিন আমাদের পাঁচজনেব মধ্যে চাবজন বৈ জুটল না। আমবা আব-একটি বালক খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে দেখি শেয়ালখাকার আসিতেছে। শেয়ালখাকাকে দেখিয়া আমবা আনন্দত হইলাম, ভাবিলাম আব বালকেব প্রয়োজন নাই, শেয়ালখাকার দ্বাবাই কাজ চলিবে। বলিলাম “শেয়ালখাকি। আয় আয় পায়বা ধবিতৈ যাই।” শেয়ালখাকার অমনি প্রস্তুত। আমাদের সঙ্গে চলিল। ঘবেব ভিতর চুকিয়া এক একজন বালক এক এক ছিদ্রে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। দ্বাবেব নাচে

চৌকাঠের উপরে একটা ছিঁকি, শেয়ালখাকীকে বলা গেল, "শেয়াল-খাকি ! এই গর্তের মধ্যে লেজ দিয়ে বসে থাক, দেখিস্ যেন এ জায়গা ছেড়ে উঠিস্নে।" তখন আশ্চর্য্য বোধ হয় নাট, এখন যতবার ভাবি আশ্চর্য্য বোধ হয়, শেয়ালখাকী কিরূপে আমাদের কথা বুঝিল। সেই ছিদ্রের মধ্যে লেজ দিয়া নিজেব পিঠেব দ্বারা ছিদ্রটি ঢাকিয়া বসিয়া বহিল। পবে'পায়বান্দিগকে যখন তাড়া দিতে আবশ্য কবা গেল এবং পায়বান্দিগ তা'ব মুখের সম্মুখ দিয়া উড়ায়া যাঠিতে লাগিল, তখন না জানি শেয়াল-খাকী'ব স্থান ত্যাগ কবিয়া পায়বাব সঙ্গে জুটবাব কি প্রলোভনই হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে তা কবিল না; আমবা যেরূপ পিঠ দিয়া ছিদ্র ঢাকিয়া স্থিৰ থাকিলাম, সেও সেই প্রকাৰ বহিল।

আব একটা ঘটনা এই। আমাদের বুধী বলিয়া একটা গাভী ছিল। তাহাব একটা বাখাল ছিল। শেয়ালখাকী অনেক সময় বাখালের সঙ্গে বুধাকে লইয়া মাঠে যাঠিত। সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া বৈকালে ঘরে আসিত। একবার বাবা কি কাবণে বাগ কবিয়া বাখালটাকে মাঝিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন বুধা ঘবে বাধা পড়িল। তাকে চবায় কে ? এইকপে দুই-একদিন গেল। পবে আমি বলিলাম, "বাবা, শেয়াল-খাকীকে দিলে সে গক চবায়ে আনতে পাবে।" শুনিয়া বাবা হাসিলেন, "হাঁঃ, কুকুরে আবাব গক চবাবে !" মা শেয়ালখাকীকে চিনিতেন, তিনি তখন আমাব কথাতে যোগ দিলেন। তখন শেয়ালখাকী'ব সঙ্গে গক পাঠান স্থিৰ হইল। কেমন কবিয়া গক চবাঠিতে হইবে তাহা শেয়ালখাকীকে বুঝাইয়া দেওয়া গেল। সে গক লইয়া যাঠিতে আবশ্য কবিল। একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল, গক আব আসে না। বাবা ও মা চিন্তিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল যে, একা শেয়ালখাকী মহা চীৎকার করিতে কবিতে আসিতেছে; সঙ্গে গক নাই। আসিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করে, একটু দৌড়িয়া যায়, আবাব দাঁড়াই,

আবাব নিকটে ছুটিয়া আসে, মুখেৰ দিকে চায়, ডাকে, আবাব দৌড়িয়া যায়, আবাব দাঁডায়। শেষে বাবা বুঝিলেন যে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছে। তখন আমাদেৰ ছুইজন বালককে সঙ্গে যাইতে আদেশ কৰিলেন। আমবা সঙ্গে গিয়া দেখি একজনবা আমাদেৰ গৰু বাঁধিয়া বাঁথিয়াছে। তাহাবা শেয়ালখাকীকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—“ওবে, কুকুৰটা আবাব এসেছে; নিজে মাৰ খেয়ে গিয়ে বাড়োৱ লোক ডেকে এনেছে।”

এই শেয়ালখাকীৰ গ্ৰাম আবও অনেকবাৰ অনেক কুকুৰ পুৰিয়াছি।

প্ৰাপি গ্ৰামহ। -সৰ্বশেষে আমাব প্ৰাপিতামহকে এই কালেৰ মধ্যে যেকুপ দেখিয়া নাম, তাহাব উল্লেখ কাবয়া এই পৰিচ্ছেদেৰ উপসংহাৰ কৰিতেছি। আমাব স্মৃতিশক্তি যতদূৰ যাৰ, আমাব জ্ঞানোদয় পৰ্য্যন্ত আমি তাঁহাকে অন্ধ বঁৰি ও বাড়োৰ বাঁধে যাইতে অসমৰ্থ দোখয়াছি। সে সময়ে বোৰ হয় তাঁহাব বয়স ৯৫ বৎসৰ বয়স ছিল। তিনি খৰ্কাৰ্জিত ও কুশাগ্ৰ মায়ুষ ছিলেন, স্মৃতবাং তাঁহাকে একটা বালকেৰ মত দেখাইত। আমাব মা তাঁহাব ধন্যভাব ও সাধননিষ্ঠা দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কুলগুৰুৰ নিকট মন্ত্ৰদীক্ষাৰ সংকল্প ত্যাগ কৰিয়া তাঁহাবই নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপবে কোলেৰ শিশুটিব গ্ৰাম তাঁহাকে হাতে ধৰিয়া পালন কৰা আমাব মাৰ এক প্ৰধান কাজ হইয়া দাড়াইয়াছিল। প্ৰাতে উঠিয়া গলবস্ত্ৰে তাঁৰ চৰণে প্ৰণত হইতেন; তৎপবে ছোট শিশুটিব গ্ৰাম তাঁৰ কাপড় ছাড়াইয়া কাচা কাপড় পৰাইয়া পূজাব আসন ও কোণা-কুণা দিয়া তাঁহাকে সেখানে বসাইয়া দিতেন। বসাইয়া দিয়া নিজেৰ গৃহকন্দ্ৰে যাইতেন। পূজা অন্তে আমি তাঁৰ হাত ধৰিয়া বসিবাৰ আসনে বসাইয়া দিতাম।

আমাদেৰ বাড়ীৰ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ছোট কোটা-বৰ ছিল, তাহাব এক অংশে প্ৰাপিতামহ মহাশয় থাকিতেন, আৰ এক অংশে ঠাকুৰ-

ঘব ছিল। সে জন্তু সমগ্ৰ ঘৰটি ঠাকুবঘৰ বলিয়া উক্ত হইত। ঠাকুবঘৰে এক পাথৰেব বড় শিব, এক কাঠান্মিত পঞ্চানন, এক স্ফটিকনির্মিত বাণলিঙ্গাশব, এক শালগ্ৰাম শিলা, এই চাৰি ঠাকুব থাকিতেন। বোধ হয় প্ৰপিতামহেব অন্তপ্ৰাশানব সময় পাথৰেব শিবেব প্ৰতিষ্ঠা হয় ; আমাব পিতাব অন্তপ্ৰাশানব সময় কাঠান্মিত পঞ্চাননেব প্ৰতিষ্ঠা হয় ; এবং অপব তইটি ঠাকুব বোব ভষ কুলক্ৰমাগত। প্ৰপিতামহেব মতদিন শক্তি ছিল, তিনি নিত্য ঠাকুবঘৰে গিয়া ঐ ঠাকুবগুলি পূজা কৰিতেন। কিন্তু আমা যখন দেখিয়াছি, তখন তিনি আব ঠাকুবপূজা কৰিতে ঠাকুবঘৰে যান না, আমাব পসামহাশয় পড়তি অল্প লোকে ঠাকুবপূজা কৰেন।

স্নানেব প্ৰতি প্ৰপিতামহ মহাশয়ব বড় ভয় ছিল, এজন্তু মাসে দুই চাৰিবাব মাত্ৰ স্নান কৰান হইত। কেন যে স্নানে ভয় ছিল বলিতে পাব না। দেখিতাম, মাথায় বা গায়ে জল দিলে “বাপ্বে মাৰে” কবিয়া পাতাব লোক জড় কৰিতেন। সেই জন্তু প্ৰতিদিন প্ৰাতে কাপড় • ডাডাইয়া সন্ধ্যা আছিলে বসান হইত।

আমি চলিতে বলিতে শিথিলেই তাঁহাকে ধৰিয়া ঘৰেব বাহিৰ কৰা, শোচে লইয়া যাওয়া, তাঁহাব মুখ ধুইবাব জল আনিয়া দেওয়া, কাপড় আনিয়া দেওয়া, প্ৰভৃতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কাৰ্য্যেব ভাব আমাব প্ৰতি অৰ্পিত হইয়াছিল। পূৰ্বেই বাল্যাকাছি, তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে সব গলাতে “পো” বলিয়া ডাকিলেই তিনি পুলকিত হইয়া উঠিতেন। কোনও কাজে আমাব দব্কাব হইলেই আমাকে “বাবা” “বাবা” বলিয়া ডাকিতেন। সৰ্ববিষয়ে আমাকে অতিবিক্ত আদব দিতেন। মা আমাকে মাৰিলে আমি কাঁদিতাম, আমাব ক্ৰন্দনেব স্বৰ যদি তাঁহাব কানে যাইত তাহা হইলে “বাবা কাঁদে কেন ?” বলিয়া বাগিয়া ফাটাকাটি কৰিতেন। এইজন্তু মা মাৰিলেই আমি আকাশ-পাতাল ইা কবিয়া পো-ব নিকট গিয়া কাঁদিতাম।

পেটুকু ছেলে।—পো অধ্যাপক ছিলেন, বাড়ীতে বসিয়া বিদায় আদায় যাহা উপাঞ্জন করিতেন, তাহাতেই সুখে সংসার চলিত। কখনও কখনও গ্রামেব বিষয়ী লোকদিগেব গৃহে ক্রিয়া কন্ম হইলে, পো-ব জ্ঞাত বিদায়েব ডালি আসিত। ডালিব অর্থ একখানি সবাত্তে একটু চিনি ও দশ বাবটী সন্দেশ, তৎসহ একটি ঘড়া, এক একটি গাডু, কি কতকগুলি মুদ্রা। আমি বাহিবে খেলা করিতে কাবতে যদি দেখিতাম যে ডালি আমাদের ভবনেব আত্মস্থেই বাইতেছে, তখন সজ্ঞ লইতাম। প্রপিতামহ মহাশয় বাহিৰ বাড়ীৰ দিকে এক একে বসিয়া জপ করিতেন। লোকে ডালিটী সম্মুখে রাখিয়া তাহাব হাত ধৰিয়া ছুঁয়াইয়া দিত। তিনি বুঝিতেন যে ডালি আসিয়াছে। “জজ্ঞাসা কাবতেন, “কাব বাড়ী হতে।” ডালি-বাহক চাঁৎকাব করিয়া নামটা বলিয়া দিত। তখন পো আমাকে ডাকিতেন “বাবা।” আমি অর্মান ছোট ছোট অঙ্কুলিতে তাহাব গা ছুঁইয়া দিতাম, ভাবিতাম, বেশি চোচাইলে মা শুনিতে পাইবেন। প্রপিতামহ বুঝিতেন, বাবা উপস্থিত। টাকাগুলি নিজেব কাছে বাখিয়া বলিতেন, “এই সন্দেশেব সব মাকে নিয়া দেও।” বাবা তো সবাখানি লইয়া একান্তে দাড়াইয়া অধিকাংশ সন্দেশ পাইলেন, শেষে বাগ্নাঘবেব কাছে গিয়া বলিলেন, “মিত্রেব বাড়ী থেকে ডালি এসেছিল, ঐ সে সব”, এই বলিয়াই বাগ্নাঘবেব দাবাতে সবাখানি বাখিয়াই দোড। মা বাগিয়া পো-ব নিকট আসিয়া বকাবকি করিতেন। বলিতেন, “আমাকে কি ডাক্তে পাব না? বড় যে ‘বাবা’ ‘বাবা’ কব, ঐ বাবা সব সন্দেশ খেয়ে ফেলেছে।” প্রপিতামহ মহাশয় শুনিয়া হাসিয়া উঠিতেন, “হাঃ হাঃ বেশ কবেছে, ওব জ্ঞাই ত সব।” যখন সবাখানি আমাব হাতে না পড়িয়া মায়েব হাতে পড়িত, তখন পো হাত দিয়া সন্দেশগুলি গণিয়া বাখিতেন। তাবপব তাঁকে প্রতিদিন কয়টা করিয়া সন্দেশ দেওয়া হইত তাহা গণিতেন। যদি দেখিতেন অধিকাংশ তাঁকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে

ফাটাফাট করিতেন, “আমাকে যদি সব দিলে তো বাবা খেলে কি ?”

এ-সকল লিখিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে। হায় ! তখন আমি তাব এতটা প্রেম বুঝি নাট।

আমাদের বাড়িতে প্রায়ই ২৩টা বিড়াল থাকে। সে সময় একটা কদাকার বিড়াল ছিল। সে কদাকার বলিয়া মা তাকে “হুম্মান” বলিয়া ডাকিতেন ; আমরাও হুম্মান বলিতাম। হুম্ম বড় চোর ছিল। পো-ব পাতেব মাছ চুবি করিয়া খাইত ; তিনি দেখিতে পাইতেন না। এইজন্ত মা প্রথম প্রথম পো-কে আহারে বসাইয়া বামহস্তে একগাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন ; বলিয়া আসিতেন, “মধ্যে মধ্যে বাড়ি-গাছটা আপসো, বেবাল আসো।” পো মধ্যে মধ্যে ছড়ি-গাছটা লইয়া উদ্দেশে মারিতেন। একদিন দেখা গেল, হুম্মান লম্বা হইয়া পো-র পাত হইতে চুরি করিয়া মাছ খাইতেছে, পো উদ্দেশে ছড়ি মারিতেছেন, সে ছড়ি হুম্মব পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া পাড়তেছে, হুম্মর গ্রাহই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পো-র পাতেব নিকট ছড়ি হস্তে বিড়াল তাড়াইবার জন্ত বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর আর বিড়াল আসিতে পারিত না। কিন্তু একদিন যে ব্যাপাব ঘটয়াছিল তাহা বলিতে হাসিও পাইতেছে, লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, পো আহার করিতেছেন। শুক্ল, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন ; আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভ্রাট ঘটিল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ কলা ও সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন হইল। অলক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলেন। আমার প্রণিতামহের নিয়ম ছিল ৫২ আহারে বসিয়া কথা কহিতেন না ; এ নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০০ বৎসর বয়স পর্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটি নিয়ম এই ছিল যে, আহারের সময় কেহ স্পর্শ

কবিলে আহাব হইতে বিবত হইতেন। আমাব ক্ষুদ্র হাতেব থাবা উঠিতেছে উঠিতেছে, একবাব হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। অমনি পো শিঃবিষা মাকে ঈসাৰাতে ডাকিতে লাগলেন, “ঔ, ঔ।” অৰ্থাৎ কে আমাকে ছুঁইয়া দিল, দেখ। মা আসিয়া দেখেন, পেটুক পুত্ৰটিব হাতে মুখে দৈষেব দাগ, আব লুকাইবাব যো নাই। পো-ব কানে চীৎকাব কবিয়া বলিলেন, “আব ঔ কি ? ঐ ‘বাবা’। বড় যে আদব দেও।” শুনিয়া প্রপিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, “হা হা বেশ কবেছে, তবে ও-ই সব থাক্”, বলিয়া আহাব ত্যাগ কবিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মাৰ সঙ্ঘ হইল না। তিনি আমাব গলা টিপিয়া থাবড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, “আচ্ছা ত বেবাল তাড়াতে বসিবেছি, নিজেই বেবাল হয়েছি।”

প্রপিতামহেব অধৰ্ম্মেব প্রতি বিবাগ।—আমি বাল্যকালে প্রপিতামহদেবেব অধৰ্ম্মেব প্রতি যে বিবাগ দেখিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবাব নহে। পবিবাব মধ্যে আমাব পিতা বা মাতা কাহাবও কাৰ্য্য ধন্য বা নীতিসঙ্গত হয় নাই, একপ মনে কবিলে তিনি গালে মুখে চড়াইতেন বা মাথা খুঁড়িতেন। ক্রোধ কোন প্রকাৰেই সম্বরণ কবিতে পারিতেন না। আমাব কোনও ছটামি তাঁহাব কৰ্ণগোচৰ হইলে মাকে ডাকিয়া আমাকে শাসন কবিতে আদেশ কবিতেন। পাছে আমি পাড়াব কুসঙ্গে মিশিয়া ছটামি শিখি, বোধ হয় এই ভয় কবিতেন; কাবণ, দেখিতে পাইতাম, যে কুকুরটা বাছুবটা তাঁব ঘবেব বকেব সম্মুখ দিয়া গেলে, বাপসা-বাপসা দেখিয়া, “ওই বাবা বাইবে গেল” বলিয়া মাকে ডাকাডাকি ও মহামাৰি উপস্থিত কবিতেন। এইজন্য আমাকে পা টিপিয়া টিপিয়া বা পিছন দিয়া অনেক সময়ে পলাইতে হইত।

প্রপিতামহেব শাস্ত্রজ্ঞান ও সংস্কৃতানুয়াগ।—প্রপিতামহদেব একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতানুবাগী মানুষ ছিলেন। আমাব শ্রবণ আছে,

গ্রামেব পণ্ডিতদিগেব মধ্যে অনেকে মধ্যে মধ্যে কঠিন কঠিন প্রশ্ন বিষয়ে শাস্ত্রায ব্যবস্থা জানিবাৰ জন্ত তাঁহাব নিকট আসিতেন। তখন চীৎকাৰ কৰিয়া প্রশ্নগুণি তাঁহাকে বোঝান ও ব্যবস্থা লওয়া এক মহা ব্যাপাৰ পড়িয়া যাইত। বয়সে অতি প্রাচীন হইলেও তিনি সেকপ স্মৃতিশক্তি হাবান নাই। তিনি শাস্ত্রায বচন উদ্ধৃত কৰিয়া প্রশ্নেব মামাংসা কৰিয়া দিতেন।

সেই বৃদ্ধ বয়সেও তাহাব জ্ঞানালোচনাতে আনন্দ দেখিতাম। তাহাব সংস্কৃতজ্ঞান বিষয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। প্রথমটী এই। অনুমান ১৮৫১ কি ১৮৫২ সালে আমাদেব গ্রামেব স্কুলেব মধ্যে একটি সংস্কৃত শিক্ষাব শ্রেণী খোলা হয়। আমাদেব জ্ঞাতিবর্গেব বাড়ীৰ অনেক ছেলে তাহাতে ভৰ্তি হয়, এবং আমাব মাতাব জাঠতুতো ভাই চাক্কাড়িপোতা গ্রাম নিবাসী কৈলাসচন্দ্র চকবত্তী মহাশয় সেই সংস্কৃত শিক্ষা শ্রেণীৰ শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি কশ্ম হইয়া আমাদেব গ্রামে গিয়া আমাদেব বাড়ীতেই বাস কৰিতে থাকেন; এবং সংস্কৃত কাব্যাদিৰ বিচাৰ বিষয়ে আমাব প্রপিতামহেব একজন সহায় ও সঙ্গী হইয়া পড়েন। প্রাতে গ্রামেব কোনও কোনও বান্ধৱ যুবক তাঁহাব নিকট পড়িতে আসিতেন। তাঁহাদেব মুখে প্রপিতামহ মহাশয় সংবাদ পাইতেন, তাঁহাবা কি পড়েন; তাহাতে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ কৰিতেন। আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী গেলেই দেখিতে পাইতাম, তিনি কৈলাস মামাকে ডাকিয়া তিন চৰণ সংস্কৃত কবিতা পাঠ কৰিয়া, শেষ চৰণ কি, তাহা জানিতে চাহিতেছেন; কৈলাস মামা আশ্চৰ্য্যান্বিত হইয়া আমাব মাকে বলিতেছেন, “দিদি, কি আশ্চৰ্য্য! এ সকল শ্লোক এখনও শুঁব স্মৰণ আছে!”

অপৰ ঘটনাটী হাস্ত-জনক। আমি ১৮৫৬ সালে যখন কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভৰ্তি হইলাম, তখন বিভাসাগর মহাশয় সেখানকার কর্তা। তিনি তৎপূৰ্বে মুণ্ডবোধ ব্যাকরণ পড়ান বন্ধ করিয়া নিম্ন

শ্রেণীতে তাঁহাব প্রণীত উপক্রমণিকা ধবাইয়াছেন। আমবা উপক্রমণিকা অনুসাবে সংস্কৃত শিক্ষা আবন্ত কবিলাম। তৎপবে গ্রীষ্মেব ছুটিতে বাড়ীতে আসিলে, আমাব প্রাপ্তামহদেব শুনিলেন যে, আমি সংস্কৃত কলেজে ভৰ্তি হইয়াছি; তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। একদিন সন্ধ্যাব সময় আমাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, “বাবা! বাম শব্দেব ‘টা’-তে কি হয়, বল ত।” আমি বালকেব কণ্ঠস্ববে চাৎকাব কবিয়া বলিলাম, “বাম শব্দেব আবাব ‘টা’ কি?—বামটা।” তখন তিনি বিবস্ত হইয়া তাঁব দস্তবিহান মুখেব ভাবাতে বলিলেন, “ঘোঁণাব ঘাস কাংবে” অর্থাৎ, ঘোড়াব ঘাস কাটবে। “বাম শব্দেব তৃতীয়াব একবচনে কি হয়?” বলিরা জিজ্ঞাসা কাবলে আমি বালিতে পার্বিতাম “বামেণ”; কিন্তু আমি ত মুগ্ধবোধ পড়ি নাই, কাংজত বাম শব্দেব ‘টা’ যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা লইবা আমাব বাবাব সহিত প্রাপ্তামহদেবেব কথা হইল; বাবা সমুদয় কথা বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতেছি না শুনিয়া তিনি বড়ত দুঃখিত হইলেন।

বাবাব মুখে শুনিয়াছি, প্রাপ্তামহ মহাশয়েব সময়ে কলাপ ব্যাকরণ পড়িবাব বাঁতি ছিল, তদনুসাবে তিনি যোবনে কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়া-ছিলেন। কিন্তু আমাব পিতা মহাশয়েব পঠদশাতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িবাব বাঁতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। তদনুসাবে প্রাপ্তামহ মহাশয় বোধ হয় মনে কবিয়াছিলেন যে আমি মুগ্ধবোধ পড়ি; সেই জন্তই প্রশ্ন কবিয়া-ছিলেন, “বাম শব্দেব ‘টা’-তে কি হয়?”

মাতার উপর প্রাপ্তামহের প্রভাব।—প্রাপ্তামহদেব আমাব মাতাব মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। স্ততরাং সময়ে অসময়ে মাতাকে ডাকিয়া, কোন্ স্থলে কিরূপ কর্তব্য, সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এই সকল উপদেশ আমাব মাতার অন্তবে একরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, যে তিনি সমগ্র জীবনে ঐ সকল উপদেশ হইতে এক পদও বিচলিত হন নাই বলিলে

অত্যাশ্রিত হইয়া না। প্রপিতামহ মহাশয় আমাব জননীকে বিবাহিতা হিন্দু বমণীৰ যে গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, মাতা চিবদিন সেই পথে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আমাব শৈশবে আমাব মাতৃদেবাব ও আমাব প্রপিতামহেব যে ধর্মভাব দেখিয়াছি তাহা ভুলিবাব নহে। আমাকে বোগমুক্ত করিবাব জন্য মাব ইষ্টদেবতাব নিকট মানতের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাই কেবল নত, বস্মসানন তাঁব প্রতিদিনেব প্রধান কাৰ্য্য ছিল। মাটী দিয়া শিব ৫ ডিঘা নত পূজা করিতেন। সে পূজাতে অনেকরূপ থাকিতেন; খাবাব অন্ন ঠাকুরদিকে নিবেদন না করিয়া কাহাকেও খাইতে দিতেন না, তাবপব বিশেষ বিশেষ দিনে ব্রহ্ম নিয়ম উপবাসাদি চলিত; প্রতিদিন পূজাব ফুল আনিয়া আমাব মাথায় দিতেন এবং নিজের পদধূলি দিয়া আশীর্বাদ করিতেন।

প্রপিতামহেব ধর্মভাব।—প্রপিতামহদেবের ধর্মভাবও চিবস্মরণীয় হইয়া বহিয়াছে। তিনি বিদ্যাসী, শুদ্ধ, শাক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহাব ইষ্টদেবতাকে সর্বদা “দয়াময়ী মা” বলিয়া ডাকিতেন। যৌবনে নিজের দুই কণ্ঠাস্তান জন্মিণে তাহাদেব নাম দয়াময়ী ও করুণাময়ী রাখিয়াছিলেন। তাহাবা বাল্যকালেই গত হন। দয়াময়ী করুণাময়ীৰ চিন্তা তাহাব মনে কিকপ লাগিয়া ছিল, তাহাব প্রমাণ এই যে, তাহাদেব মৃত্যুব প্রায় ষাট বৎসব পবে যখন আমাব প্রথম ভগিনী উন্মাদিনী জন্মিল, তখন তাহাব মনে হইল, দয়াময়ী আবাব আসিয়াছে।

প্রপিতামহদেব জপ তপ পূজাদিতে প্রতিদিন প্রাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় যাপন করিতেন। প্রথমতঃ প্রায় একঘণ্টা কাল দেব দেবীৰ পূজা ও জপ প্রভৃতিতে যাইত; তৎপবে প্রায় আধঘণ্টা কাল পিতৃ পুরুষের তর্পণে অতিবাহিত হইত। তৎপবে প্রায় আধঘণ্টা কাল মাটীতে মাথা ঠুকিয়া

ইষ্টদেবতাব চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা হইত। এই প্রণাম কবিতা কবিতা তাঁর কপালের উপরে একটা আবেগ মত মাংসের গুলি জমিয়াছিল। মাথা ঠুকিয়া যখন প্রার্থনা করিতেন, তখন আমার মা কান পাতিয়া কোনও কোনও দিন শুনিতেন। একদিন মা শুনিলেন যে তিনি মুখে মুখে বাঙ্গলা ভাষাতে তাহার ইষ্টদেবতাব চরণে আমার বিদেশবাসী পিতার জগ্ন প্রার্থনা করিতেছেন। বলিতেছেন, “মা দশামণি, সে বিদেশে প’ড়ে আছে, তাকে বন্ধা ক’বো। সে কাহাবও বাবণ শোনে না, তাকে স্মৃতি দেও,” ইত্যাদি। সর্বশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কবিতা দিয়া নাচিতেন। নাচিবাব সময় আমার ডাক হইত, “বাবা।” আমি তখন দ্বিগম্বমূর্ত্তি বালক; মা আমাকে খেলাব ভিতর হইতে ধরিয়া আনিতেন, এবং প্রাপ্তমহেব হাতে হাত দিয়া নাচিতে বলিতেন, ‘অমনি ছুইজনে হাতে হাতে ধরিয়া নৃত্য আবঙ্গ হইত। তিনি তিনশত পঁয়ষট্টি দিন নাচিবাব সময় একই গান করিতেন, তাহার দুই পংক্তি মাত্র আমার মনে আছে—

“দুর্গা দুর্গা বল ভাই

দুর্গা বই আর গতি নাই।”

মা প্রপিতামহদেবকে আমার ধর্মশিক্ষাব দিকে দৃষ্টি বাধিবাব জগ্ন অল্পবোধ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আমাকে লইয়া প্রাতে নাচিতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সায়াংসন্ধ্যাব পর কাপড় মুড়ি দিয়া নিজ শয্যাতে বসিয়া আমাকে কোলে লইয়া মুখে মুখে ধর্মোপদেশ দিতেন, দেবতাদেব স্তব প্রভৃতি শিখাইতেন, প্রমোত্তবচ্ছলে অবগুজ্ঞাতব্য বিষয়-সকল শিখাইতেন। যথা—“প্রপিতামহেব নাম কি?” প্রশ্ন করিয়াই তত্ত্বত্তবে বলিতেন, “বল জীবামজয় ত্রায়ালঙ্কার।” আমি বাল্যস্ববে বলিতাম,— “জীবামজয় ত্রায়ালঙ্কার,” ইত্যাদি। তৎপরে দেব-দেবীর যে-সকল স্তব মুখস্থ আবৃত্তি করিতেন এবং আমাকে আবৃত্তি করাইতেন, তাহার সকল-গুলি মনে নাই। একটা মনে আছে, তাহা এই

সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে, শিবে, সকার্থ-সাধিকে,

শবণ্যে, ত্র্যম্বকে, গোবি, নাবাঘর্গি, নমোহস্ত তে ।

সে সমযকাল আব একটি শ্লোক আমাব শ্রবণ আছে, তাহা মনে হইলে ক্ষোভমিশ্রিত বিস্ময়েব উদয় হয় । মনে হয়, অল্পদিনেব মধ্যে আমাদের গৃহে কি পবিত্রতনট ঘটয়া গেল । আমাব প্রপিতামহ আমাকে অপবাগব প্রশ্নেব মন্য প্রশ্ন কবিতেন, “বাবা, তোমবা কোন্ জাতি ?” বলিয়াই বণিতেন, “বন, ‘আমবা ব্রাহ্মণ’ ।” পবে প্রশ্ন “কোন্ শ্রেণীব ব্রাহ্মণ ?” আবাব উত্তর— “দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীব ব্রাহ্মণ ।” আবাব প্রশ্ন— “তোমবা কতদিন ব্রাহ্মণ ?” উত্তর—

যাবন্মোর্বো স্থিতা দেবা, যাবদগঙ্গা মহীতলে,

চক্ষাকৌ গগনে যাবৎ, তাবদ্বিপকূলে বযম্ ।

অর্থাৎ, দেবগণ যতদিন মেঘতে আছেন, গঙ্গা যতদিন পৃথিবীতে আছেন, চন্দ্র সূর্য্য যতদিন আকাশে আছেন, ততদিন আমবা ব্রাহ্মণকূলে আছি । এখন ভাবি, তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, আব আমি কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি ।

আমি জবে পড়িলে বা অথ কোনও প্রকাব পীড়াতে আক্রান্ত হইলে আমাব মা সন্ধ্যাকালে আমাকে লইয়া তাঁহাব ক্রোড়ে বসাইয়া দিতেন, এবং পীড়াব কথা জানাইতেন । তৎপবে প্রপিতামহদেব আমাব দেহে হাত বুলাইয়া ঝাড়িতে আবস্ত কবিতেন, ও সমগ্র দেহে ফুৎকাব দিতেন, ও মুখে মুখে ঈষ্টদেবতাব স্তব আবৃত্তি কবিতেন । আশ্চর্য্যেব বিষয় এই, ঝাড়িয়া দেওয়াতেই অনেক সময়ে বোধ হয় আমাব জব সাবিত্তা বাইত । এইজন্য জবে আমাব গাত্রজালা উপস্থিত হইলেই আমি “পো-ব কাছে নে যা” বলিয়া কাঁদিতাম ।

এই সাধু ও সিদ্ধ পুরুষেব স্মৃতি আমাদের পবিত্রাবে জীবন্ত বহিয়াছে । তাঁহাব স্মৃতিচিহ্ন যাহা কিছু আছে, আমাদের গৃহে যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত

হইতেছে। সে-সকলকে সকলেই পবিত্র ঋক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রাহ্ম হইয়া উপবীত ত্যাগের পব, আমার একবার যক্ষ্মাবোগেব সূচনা হয়; তখন আমার জননী আমার পবিত্র্যাব জন্ত কলিকাতা আসিয়া আমাকে লইয়া কয়েক মাস ছিলেন*। তিনি আমার পূজ্য পো-ঠাকুরদাদাব লাঠি, সোণপট ও মালা আনিয়া আমার শয্যাতে বাধিয়াছিলেন; বিশ্বাস এই ছিল, তাহাব গুণে আমি বোগমুক্ত হইব। তিনমাস কাল ঐ-সকল দ্রব্য আমার শয্যা হইতে সবাইতে দেন নাই। তৎপবে এলোক হইতে যাঁহাব সমব পো-ব জপেব মালা আমার ভগিনীকে ও তাঁব আহাবেব বাটি আমাকে দিয়া গিয়াছেন, আমি প্রতিদিন তাহা ব্যবহাব করিতেছি।

আমি আব কি বলিব, তাহাব পব বহুবৎসব চলিয়া গিয়াছে, অনেক মানুষ দেখিয়াছি, নিজে অনেক লম প্রমাদ করিগাছি, কিন্তু যখনই সেই সাধুপুরুষেব সেই ধর্মনিষ্ঠাব কথা শ্রবণ করি, তখনই নিজেব দুর্বলতা শ্রবণ করিয়া লজ্জাতে অভিভূত হইয়া যাই। বহুবর্ষ পবে যখন আমার মা কাঁদিয়া বলিতেন, “হায় বে, এমন সাধু পুরুষেব এত আশীর্বাদ কি বৃথা গেল?” তখন আমি চক্ষেব জল বাধিতে পারিতাম না। মনে মনে বলিতাম, “হায় বে, তিনি তাঁব ইষ্টদেবতাকে যেমন অকপটে মা বলিতেন, আমি কেন তেমন করিয়া ঈশ্ববকে ডাকিতে পারি না?”

উপনয়ন।—ক্রমে আমি নবম বৎসবে আসিয়া উপনীত হইলাম। নবম বৎসবে আমার উপনয়ন হইল। উপনয়নান্তে পো নিজে আমাকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নিজেব নিকট লইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা করাইতে লাগিলেন।

কলিকাতা যাত্রা; মাতা ও ভগ্নিনীর ক্রন্দন।—ইহাব অল্প দিন পরেই, বাবা আমাকে কলিকাতায় আনিলেন। সেদিনকাব কথা

আমি ভুলিব না। আমি মায়েব এক ছেলে ; বাছুব লইয়া গেলে গাভী যেমন হামলায়, তেমনি আমাব মা সেদিন হামলাইতে লাগিলেন। আমি বাবাব সঙ্গে চলিয়া আসিলাম, তিনি পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দন কোনও দিন ভুলিব না। উম্মাদিনী চিন্তা-দাসোব সঙ্গে শাল্‌তাঘাট পর্য্যন্ত আমাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। যখন সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—“পাগ্‌গা দাদা, [অর্থাৎ পাগ্‌লা দাদা,] আমাব জন্তে পুতুল এনো,” তখন আমি কাঁদিয়া অধীর হইলাম। সে চলিয়া গেল, আমাব মনে হইল, আমাব বুকেব হাড় খুলিয়া লইয়া গেল। আমি পিতাব সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

মাতুল ও পিতাব সহিত কলিকাতায় বাস ।

১৮৫৬— ১৮৬১

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ।—১৮৫৬ সালের আশাঢ় মাসে বাবা আমাকে কলিকাতায় আনিলেন । সেখানে আমাকে ডেভিড হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়া ইংবাজী শিখাইবেন, কাবণ তিনি দেখিয়াছিলেন যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষাতে এত বৎসর দয়াও এবং কলেজ হইতে সুখ্যাতিও সহিত উদ্ভার্ণ হইয়াও ২৫ টাকার অধিক বেতন পাইলেন না । সুতরাং বুঝিয়াছিলেন যে ইংবাজীর গন্ধ না হইলে কাজকর্ম পাইবার সুবিধা নাই । কিন্তু তাহার অবস্থাতে গ্রাহ্য করিতে দিল না । তিনি তখন বর্দ্ধমান জেলায় আমদপুর্বে পণ্ডিত করিয়া আসিয়া কালকাতা বাজলা পাঠশালাতে ২৫ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্য করতেন । অতএব পুত্রকে উৎকৃষ্টরূপে ইংবাজী শিখাইবার যে বাসনা ছিল, তাহা তাহাকে পবিত্যাগ করিতে হইল ।

কেবল তাহাই নহে । হেয়ার স্কুলে না দিবার আবও একটি কাবণ উপস্থিত হইল । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ; ঐ কলেজে আমার মাতুল দ্বাবকানাথ বিদ্যাতৃষণ মহাশয় অধ্যাপকতা করিতেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার মাতুলের সহায়্যায়ী বন্ধু ছিলেন ; তিনি সপ্তাহের মধ্যে তিন-চারিদিন আমাদের বাসাতে আসিতেন, এবং আমাকে নিকটে পাইলেই ছুটি আঙ্গুল চিম্টিব মত করিয়া আমার পেট টিপিতেন ; সুতরাং 'বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন শুনিলেই আমি সেখান হইতে পলাইতাম । যাহা হউক,

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ইংবাজী শিক্ষা প্রবর্তিত কবিতা-
ছিলেন ; তিনি আমাব বাবাকে, আমাকে হেয়াবস্কুলে না দিয়া সংস্কৃত
কলেজেই দিতে বলিলেন ; তদনুসারে আমাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি
করা হইল ।

চাঁপাতলায় মাতুলের প্রথম বাসা “মহাপ্রভুর বাড়ী” ।—
আমাব মাতামহ ইবচন্দ্র গ্রায়বর মহাশয় সে সময়ে পীড়িত হইয়া স্বীয়
গ্রামের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন । আমি কলিকাতায় আসিয়া
চাঁপাতলা সিদ্ধেশ্বরচন্দ্রের লেনের নিকটস্থ “মহাপ্রভুর বাড়ী” নামক
এক বাড়ীতে মাতুলের বাসাতে বহিলাম । ঐ বাড়ীর বাহিরে নীচের
তাল্লাতে চৈত্র ও নিত্যানন্দ দুইজনের কাঠনিম্নিত দুই প্রকাণ্ড মূর্তি
ছিল । হরেকৃষ্ণ বাবাজী নামক এক বাবাজী ঐ বাড়ীর মালিক এবং
ঐ উভয় মূর্তির সেবক ছিলেন । সেই বাড়ীর এক ঘরে একটা চিত্রকর
থাকিতেন, তিনি বাবুদের ছাত্র আকিতেন । তাঁহার ঘরে অনেক
সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল । আমি স্কুল হইতে আসিয়া তাঁহার ঘরে
তনেকক্ষণ থাকিতাম ; নিম্নচিত্রে ছবিগুলি দেখিতাম । আমাব ছবি
দেখাব নেশা সেই অবধি অল্প পর্য্যন্ত যায় নাই । আমাকে উৎকৃষ্ট
উৎকৃষ্ট ছবির মধ্যে বাথিয়া দিলে বোধ হয় আহার নিদ্রা ভুলিয়া ঘণ্টার পর
ঘণ্টা থাকিতে পারি ।

আমাব বাড়ীর ভিতর উপবতলায় থাকিতাম । সেই উপবতলায়
একপার্শ্বে আমাব মাতুলগ্রামের আব-কয়েকটি ভদ্রলোক থাকিতেন ।
তাঁহারা আমাকে বড় ভালবাসিতেন । সে পুরুষের বাসা, সমস্ত দিনের
মধ্যে একটি মেয়েমানুষের মুখ দেখিতে পাইতাম না । স্বসম্পর্কীয় ও
স্বগ্রামের অনেকগুলি যুবককে আমাব মাতুল অন্ন দিতেন ; তাঁহারা
সকলে ঐ বাসাতে থাকিতেন । এক একটা ভীষণাকৃতি মর্দ ; কেহ দেড়
কুনিকা, কেহ দুই কুনিকা চাউলের ভাত খায় । কেহ পড়ে, কেহ বা

কিছু কাজ কবে, কেহ বা নিষ্কর্মা বসিয়া থায়। আমার বাবা সংস্কৃত দশকুমাচরিত হইতে নাম সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাহাবও নাম “দর্পসাব,” কাহাবও নাম “দর্পনাবায়ণ,” কাহাবও নাম “চণ্ডবন্দ্য” বাখিয়া-ছিলেন; সেই নামে তাহাদিগকে ডাকিতেন। তত্ত্বিন্ন প্রত্যেকেব ভোজনের পাথরের পৃষ্ঠে নকন দিয়া খুঁদিয়া কে কত কনিকা চাউলের ভাত খায়, তাহাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। খাড়া খটী বাটি সর্বদা চুবি যাইত বলিয়া আমার মাতামহ খালা বাটির পাট উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেকেব জন্ত এক-একখানি মেটে পাথর কিনিয়া দিয়াছিলেন। অতিবিক্ত লোক আসিলে শালপাতা কিনিয়া দেওয়া হইত। আমি আসিলে আমার একখানি মেটে পাথর আসিল। প্রত্যেকে আপন আপন পাথর মাজিতে হইত।

মাতুলের বাসায অভদ্র আলাপ : “শিবে জেঠা”।—পুরুষ পুরুষের সঙ্গে থাকিলে তাহাদের আগাম আগমোদ, কথা বার্তাতে লাজ-সবম থাকে না। বাসাব লোক আগাকে দেখিয়াও কিছু সংকোচ করিত না; অবোধে সকল প্রকার আলাপ করিত। আমার বাবা দেখিতে পাইলে, কখনও কখনও তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন, কখনও কখনও আমাকে তাড়াইয়া দিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সহিত নিবস্তব বাস করিয়া ও এই-সকল অভদ্র আলাপ নিবস্তব শুনিয়া আমার মহা অনিষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি; আমার অকালপকতা জন্মিয়াছিল। গ্রামের লোকে তাহাব পব হইতে আমায় “শিবে জেঠা” নাম দিয়াছিল। আমি অল্পবয়স্ক বালক হইয়াও কিরূপে বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত জেঠাম করিতাম, তাহা স্বরণ করিয়া এখন লজ্জা হয়। তত্ত্বিন্ন ঐ পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অনেক খাবাপ বিষয় শিখাইয়াছিল; যাহাব অনিষ্ট ফল পবজীবনেও অনেকদিন ভোগ করিয়াছি। এই পুরুষদের

সঙ্গে বাস ও অভদ্র আলাপাদি দ্বারা আর-একটি অনিষ্ট এই হইয়াছে যে, আমার বীতি নীতি আলাপ সম্ভাষণ প্রভৃতিতে ভদ্রতা ও সৌজ্ঞ্য সমুচিতরূপে ফুটিতে পায় নাই। বন্ধুরা আমাকে ভালবাসেন বলিয়া আমাব আলাপ সম্ভাষণে সৌজ্ঞ্যেব প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। কিন্তু আমি সময়ে সময়ে অনুভব করি যে, আমার আলাপ আচরণ তদ্রতর অনুরূপ নহে। এমন কি, যে নারীজাতিব প্রতি আমার এত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, তাঁহাদেব প্রতিও সমুচিত সৌজ্ঞ্য প্রকাশ কবি না।

এই হরেক্ষণ্য বাবাজীর বাড়ীতে স্ববর্ণীয় বিষয়ের মধ্যে আর-একটা কথা আছে। তখন কলিকাতার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, কেহ প্রথমে আসিলে একবার গুরুতব পীড়াতে পড়িতে হইত। আমিও আসিয়া ২১ মাসের মধ্যে কঠিন অব বোগে আক্রান্ত হইলাম। দেশে আমার মাকে সে সংবাদ দেওয়া হইল না। এই অবের বিষয়ে আমার এই মাত্র স্মরণ আছে যে, আমাকে একখানা ভাঙ্গা রথের চুড়ার উপরে বসাইয়া ভাপ বা দেওয়া হইয়াছিল। সে সময়ে ভাপ দিয়া জ্বর ছাড়ান, ও মাথাব্যথা হইলে জ্বাক লাগান, চিকিৎসার প্রণালী ছিল।

“হা-কাল”।—আব-একটা ঘটনা বোধ হয় এই সময়েই ঘটিয়া থাকিবে। আমার বাবা তখন আমাকে “হা-কাল” বলিয়া ডাকিতেন। কারণ এই। যখন আমি হাঁ করিয়া থাকিতাম, অর্থাৎ একমনে কিছু কাজ করিতাম, তখন পশ্চাৎ হইতে ডাকিলে শুনিতে পাইতাম না। বাবা অনেক সময় ডাকিয়া ডাকিয়া শেষে রাগিয়া আসিয়া মারিতেন। বাবার বিশ্বাস জন্মিল যে আমি কাল হইয়া যাইতেছি। আব এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কিছু কারণ ছিল; ছেলেবেলায় মধ্যে মধ্যে আমার কান পাকিত। বাহা হউক বাবা আমাকে কাল ভাবিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আউট-ডোরে লইয়া গেলেন। তখন ডাক্তার গুডিত চক্রবর্তী আউট-ডোরে বসিতেন। তিনি পরীক্ষা করিবার

উদ্দেশ্যে আমাকে বলিলেন, “ছোক্কা, তুমি আমার দিকে পিছন কবে দাঁড়াও তো ?” আমি তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিৰিয়া দাঁড়াইলাম। তখন একথোলো চাৰি মাটীতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, “কিছু শুনিলে কি ?” আমি বলিলাম, “চাৰি ফেলে দিয়েছেন।” তখন তিনি হাসিয়া বাবাকে বলিলেন, “এ ছেলে তো কালা নয়।” বাবাব সে কথা মনঃপূত হইল না। তিনি আমাকে বাড়িতে আনিয়া অল্প কোনও ডাক্তাবেব পৰামর্শে, আমার কানে পিচকাই দিয়া, নাপিত ডাকিয়া কান পাঁচকাই কবাইয়া আমাকে জ্বালাতন কবিয়া তেলিতে ফেলিলেন। তখন মাসে মাসে নাপিত ডাকিয়া আমার কান খাঁদন হইত। নাপিতবা তখন কুঠীওয়াল বাবুদেব ছায়া, বেনিয়ান পরিষা, পাণ্ডী মাথায় দিয়া পথে পথে ঘুরিত। একজন নাপিত এলেন, বেন কেবাণীবাবু এলেন। এই শ্রেণীর নাপিতের হস্তে, ঐ অগ্নমনস্কতার জগৎ, আমার অনেক নিগ্রহ হইয়াছে।

পিতার সঙ্গে জেলিয়াপাড়ায় বাস।—হংকং বাবাজীব বাড়ীর বাসা অর্ধদশের মধ্যেই নাকিয়া গেল। মাতুল মহাশয় উঠিয়া সিদ্ধেশ্বর-চন্দ্রের গেনে এক বাড়িতে গেলেন, এবং বাবা আমাকে লইয়া বহুবাজার জেলিয়াপাড়া নামক গলিতে বাস করিলেন। ইহাও পুরুষের বাসা। বাসার লোকেরা কর্মস্থল হইতে আসিয়া, বসিয়া তামাক খাইতেন ও গল্প করিতেন; ধাবে স্নানস্থ বাঁধিতে যাইতেন; আমি যে একটা ছোট বালক আছি, তাই যে শব্দ শব্দ আহাব কবা চাই, ইহা কাহাবও মনে থাকিত না। তাঁহাদের বাঁধিতে বাজি প্রায় ৯টা-১০টা হইয়া যাইত। আমি ততক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিতাম না; কেতাব হাতে কবিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। আহাবেব সময় সকলে আমাকে টানাটানি করিত; কোনও রূপে তুলিতে পারিত না। অবশেষে বাবা প্রহাব করিতেন; তখন নিজা ভঙ্গ হইত; কাঁদিতে কাঁদিতে

আজ্ঞা করিতে যাইতাম। সেই বাসাতে হবিনাভিব বামগতি চক্রবর্তী নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তিনি জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার নায়েব খুড়া। সেই স্ত্রে তাঁহাকে দাদামশাই বান্ধা ডাকিতাম। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমার বাবা আমাকে প্রহার করিতেন, প্রবৃত্ত হইলে তিনি আমাকে এক্ষা করিতেন, এবং তাহা লইয়া বাবাব সঙ্গে বকাবকি করিতেন। এই কারণে আমি তাঁহাকে আমার একক মনে করিতাম।

জেলিয়া পাড়াতে যখন আমাদের বাসা, তখন ১৮৫৭ সালের মিউটিনী ঘটে; এবং আমাদের কলেজ পটলডাঙ্গা হইতে উঠিয়া গিয়া বহুবাজার বোডেন তিনটা বাড়ীতে থাকে। মিউটিনী থামিলেও ঐ স্থানে কলেজ কিছুকাল থাকে, তৎপবে নিজ আলয়ে উঠিয়া আসে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কাল্পনা ক্যাগ।—ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের সাহিত্য বিবাদ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ পবিত্যাগ করেন। আমি পেট টিপুনীর ভয়ে পলাইয়া বেড়াইতাম বটে, কিন্তু তাঁহাকে অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম। তিনি তখন আমাদের আদর্শ পুরুষ। ১৮৫৬ সালের শেষভাগে যেদিন প্রথম বিধবাবিবাহ দেওয়া হয়, সেদিন আমি বাসাব লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভিড়! সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে ঐ বিবাহ হয়। বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আমাদের বাসাতে সর্বদা বিচার হইত; এবং বাসার অনেকে তাব পক্ষ ছিল। সুতরাং আমি জ্ঞানোদয় হইতেই এই সংস্কারের পক্ষপাতী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আমবা বলকেরা পর্য্যন্ত মহা দুঃখিত হইলাম।

কাউয়েল সাহেব।—তাঁহাৰ কাজে ই বি কাউয়েল সাহেব আসিলেন। তিনি সাধুতার মুৰ্ত্তি ছিলেন। সকলেরই মুখে তাঁহার

প্ৰশংসা শুনিতাম। তিনি আমাদিগকে বড় ভালবাসিতেন; আমবা খেলা কবিতোঁছি দেখিলে তিনি সুখী হইতেন।

কলেজে দাঙ্গা ও সত্য কথা বলাটোঁ কাউকেল সাহেবেব সন্তোষ।—তাঁহাব বিষয়ে এট সময়েব একটা ঘটনা মনে আছে। একদিন আমাদেব ক্লাসেব ছোক্‌বাবা একটা ছোট কাঠেব সিঁড়ী লইয়া আব এক ক্লাসেব ছেলেদেব সঙ্গে একটােব ছুটীেব সময় ভয়ানক দাঙ্গা কৰিলে। আমি তখন খেলিতেছিলাম। আমাকে ক্লাসেব ছেলেবা দাঙ্গাব জন্ত ধৰিয়া আনিল। যে কয়জন বালক সিঁড়ী লইয়া টানাটানি কৰিয়াছিল আমি তাহাদেব মধ্যে একজন ছিলাম, স্ততবাং কাল দেওলা অপেক্ষা কীল খাওয়া আমাব ভাগ্যে অধিক ঘাটয়াছিল। ছুটীেব পব শুল আবাব বসিলে এ বিষয়েব তদন্ত আবন্ত হইল। কাউকেল সাহেব বড় বাড়ী হইতে তদন্ত কবিতো আসিলেন। তিনি যখন ক্লাসেব মধ্যে দাঁড়াইয়া ধীৰ গম্ভােব স্ববে বলিলেন, “কে কে দাঙ্গাতে ছিলো উঠিয়া দাঁড়াও,” তখন তাঁহাব সেই সাধুতাপূৰ্ণ মুখেব দিকে চাহিয়া আমি যেন আব না দাঁড়াইয়া থাকিতে পাৰি না, কে যেন ঠেলা দিতে লাগিল। কিন্তু চাবিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ক্লাসেব আব কোনও ছেলে উঠো না; ইতস্ততঃ কবিতো লাগিলাম। অবশেষে সাহেব বলিলেন, “তবে কি আমি বুঝিব, তোমবা কেহ দাঙ্গাতে যাও নাট ? যে যে গিয়াছ উঠিয়া দাঁড়াও।” আমি আব না দাঁড়াইয়া থাকিতে পাৰিলাম না; উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বলিলেন, “তুমি কি একা দাঙ্গাতে গিয়াছ ?” আমি বলিলাম, “ক্লাসেব সকলেই গিয়াছিল।” ইহাব পব সাহেব ক্লাসন্ত্ৰ বালকেব ২২ ছই টাকা কৰিয়া জবিসমানা কবিলেন; এবং আমাকে তাঁহাব গাড়ীতে তুলিয়া বড় বাড়ীতে তাঁব ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, “তুমি সত্য বলিয়াছ বলিয়া মাৰ্জ্জনা কৰিলাম, কিন্তু দাঙ্গাতে গিয়া ভাল কৰ নাট।” আবও অনেক সত্ৰপদেশ দিলেন। তিনি যখন আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,

“তুমি ভাল ছেলে, আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছি,” তখন ভাল ছেলে হইবাব বাসনা যে মনে কত প্রবল হইল, তাহা বলিতে পারি না।

সত্যপরায়ণতা।—ফলতঃ আমি তখন মিথ্যা বলিতে পারিতাম না, বড় জোব মৌনী থাকিতাম; অসত্য বলিতাম না। ইহারই কিস্তি পববর্ত্তীকালের আব-একটা কথা স্মরণ আছে, তাহা এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ কবি। তখন আমি সিদ্ধেশ্বর-চন্দ্রের লেনে মাতুলের নিকট থাকি। বাসাব বড় বড় ছেলেরা আমাকে তামাক খাইতে শিখাইয়াছিল। নিজে তামাক খাইয়া আমার হাতে ছঁকাটা দিয়া বলিত, “টান্।” প্রথম প্রথম টানিয়া ঘুব গাংগত, তবু সখেব জন্ত টানিতাম। একদিন তামাক টানিয়া বড়মামাব নিকট বাজাবেব পরস্যা আনিতে গিয়াছি, তিনি তামাকের গন্ধ পাইয়া জিজ্ঞাসা কবিসেন, “তুই তামাক খাস্?” আমি মন্তক সঞ্চালন কবিয়া বলিলাম, “হাঁ।” তৎপব তিনি প্রশ্ন করাতে যেরূপে যেরূপে তামাক খাইতে শিখিয়াছি, ও যতবাব খাই, সমুদয় বর্ণনা করিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম তেব বৎসবেব অধিক হইবে না। মাতুল শুনিয়া বাসার লোকের প্রাতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং আমাকে তামাক না খাইবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন। আমি তদবধি আর তামাক খাই নাই। কিন্তু একবাংক-একটা মিথ্যা বলিয়া মাতুলকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম, তাহা যথাস্থানে বলিব।

ব্যঙ্গ কবিতা “গঙ্গাধর হাতী।”—জেলিয়াপাড়াতে অবস্থিতিকালের একটি কোতুকজনক ঘটনা স্মরণ আছে। আমাদের ক্লাসে গঙ্গাধর নামে একটা ধনী-সন্তান পড়িত। সে বড় মোটা ছিল, একজ ক্লাসের ছেলেরা তাহাকে “গঙ্গাধর হাতী” বলিত। গঙ্গাধর পড়াশুনাত্তে বড় মনোযোগী ছিল না, সেজন্ত ওঠা-নামার সময় উপরে উঠিতে পারিত না। একদিন কিন্তু ঘটনাক্রমে গঙ্গাধর কাষ্ট হইয়া গেল। তখন তার আমাদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি দেখে কে? তাহা আমার

সহ হইল না। পবদিন আমি তাহাব নামে কবিতা বাঁধিয়া ক্লাসে উপস্থিত। একটাব ছুটাব সময় সমস্ত ক্লাসেব ছেলেদিগকে ও তন্মধ্যে গঙ্গাধবকে দণ্ডায়মান করিয়া, সেই কবিতা পাঠ কর্ত্তা হইল। সমুদয় কবিতাটী আমাব মনে নাই। চাৰি পংক্তি মাত্র শ্রবণ আছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কবিতৈছি। -

ইজাব চাপকান গাব

ইস্কুলে আসে বাঘ

নাম তাব গঙ্গাধব হাতা,

বড তাব অরুন্ধাব,

ধবা দেখে সবাকাব

চলে যেন নবাবেব নাভী।

কবিতা যখন পড়া হইল, তখন ছেলেদেব কবিতালিতে ও অট্টহাস্তে সমুদয় স্কুলেব ছেলে জড় হইল। গঙ্গাধব অপমানে কাদিয়া ফেলিল; এবং মাষ্টাব মহাশয়েব নিকট নালিশ কবিল। কুমাবখালিব চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়েব জ্যেষ্ঠপুত্র বাধাগোবিন্দ মৈত্র তখন আমাদেব ইংবাজীব মাষ্টাব ছিলেন। তিনি কবিতাটী আমাবহাত হইতে লইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ কবিলেন; এবং আমাব মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, “তোমাব কবিতা বেশ হযেছে, কিন্তু মানুষকে গালাগালি দিলে কবিতা লেখা ভাল নয়।” ইহাব পব আমাব কবিতা লিখিবাব উৎসাহ বাঁড়িয়া গেল।

বাল্যকালেব কবিতাব খাতা।—ফলতঃ, আমি যে কত ছোট বয়সে কবিতা লিখিতে আবশ্য কবিয়াছি, তাহা মনে নাই। বর্ণপরিচয় হইলেই মা আমাকে কৃতিবাসেব বামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন, অথবা নিজে মুখে মুখে আবৃত্তি কবিয়া শুনাইতেন। সেই-সকল কবিতা আমাব কানে লাগিয়া ছিল। তৎপবে কলিকাতাতে আসিয়া ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তেব কবিতা কোনও প্রকাবে হাতে পাইলেই গিলিয়া খাইতাম। তৎপরে আমাব বাবা কবিতাব বসগ্রাহী মানুষ, তিনি বন্ধুদেব সহিত ভারত-

চন্দ্র প্রভৃতির কবিতার সমালোচনা কবিতেন। এই-সকল কাবণে আমার শৈশব হইতে কবিতা লিখিবার বাতিক জাগিয়া থাকিবে। আমার দশ বৎসর বয়সেব লিখিত খাতা পবে দেখিয়াছি, তাহাতে কয়েকটি কবিতা লিখিত আছে। সেগুলি এরূপ উৎকৃষ্ট যে অতটুকু বালকেব লিখিত বলিয়া বোধ হয় না। অসুমান কবি, সেগুলি অল্প কোনও স্থান হইতে নকল কবিতা লইয়াছিলাম। তাহাতেও এই প্রমাণ হয় যে, নয় দশ বৎসর বয়সেও ভাল কবিতা দেখিলেই নকল কবিতা লইতাম।

সহাধ্যায়ীদিগের বাটীতে গিয়া মা বোনের অভাব পূরণ —
এই সময়ের স্ববর্ণীয় বিষয় আর একটি আছে। আমার দুইটা সহাধ্যায়ী বালকেব মাতা এই সময়ে আমার মাসীৰ কাজ কবিতা-
ছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম; সৰ্বদা তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতাম, তাঁহাদের কন্যাদের সঙ্গে ভাইবোনের মত খেলিতাম। ইহাতে আমার জননীৰ ও ভগিনীৰ অভাব দূৰ হইত। ভাল জিনিস কিছু গৃহে হইলেই তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন। পাছে আমি কুসঙ্গে পড়ি এই ভয়ে তাঁহারা কলেজের ছুটীৰ দিনে আমাকে নিজের বাড়ীতে রাখিতেন।

এই দশ এগাব বৎসর বয়সেব আর-একটি কৌতুকজনক ঘটনা স্বর্ণ হয়। আমাদের কলেজের স্লিকটের গলিতে একটি বালিকা ছিল। সে আমার সমবয়স্কা। দেখিতে যে খুব সুন্দরী ছিল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মুখখানি আমার বেশ লাগিত। সে তাহাদের বাড়ীৰ উঠানে খেলা কবিত। আমি আর-একটি বালকেব সঙ্গে বোজ তাহাকে দেখিতে যাইতাম। সে তাব মাৰ ভয়ে পথের বালকেব সহিত বড় বেশী কথা বলিত না; কিন্তু সে জানিত যে আমরা তাহাকে দেখিতে ও তাহার সঙ্গে কথা কহিতে ভালবাসি, তাই সে আমাদের কর্তৃত্বর অনিলেই বাহিবে আসিত ও এটা ওটা বাহা দিতাম গোপনে লইত।

আমি বোনেৰ মত তাহাকে কাছে চাহিতাম, কিন্তু তাদেৰ বাড়ীৰ লোকে তাহা দিত না। বহুবাজার পাড়া হইতে কলেজ উঠিয়া গেলে আমবা তাহাকে হাবাইলাম।

উম্মাদিনীর ও প্রপিতামহেৰ মৃত্যু।—এই জেলিবা-পাড়াতে থাকিবাব সময় আমাদের পৰিবাবে দুইটী দুঘটনা ঘটে। প্রথম, উম্মাদিনীর মৃত্যু; দ্বিতীয়, আমাব প্রপিতামহদেৰ বামজয় শ্রায়ালঙ্কাৰেৰ স্বৰ্গাবোহণ।

একবাব গ্রীষ্মেৰ ছুটিতে বাড়াতে গেলাম। যাটবাব সময় কলিকাতা হইতে হাঁটিবা বাড়ীতে যাই। প্রথমদিন চান্দ্রি'পাতাব মামাব বাড়ীতে গিবা একবাত্রি যাপন কৰিলাম, পৰদিন প্রত্যুষে পদব্রজে যাত্রা কৰিবা বাড়ীতে গেলাম। বাব বৎসবেৰ বালকেৰ পক্ষে ২৮ মাইল পথ হাঁটবা যাওয়া বড় সহজ কথা নহে; আমি তো গলদঘর্ষ হইয়া বাড়ীতে গিবা উপস্থিত। কিন্তু উম্মাদিনাকে আম এমনি ভাল-বাসিতাম যে বাড়ীতে গিয়া বখন দেখিগাম উম্মাদিনী হবে নাহ, তখন যেন সব শূন্য দেখিলাম; মাকে দ্বিজ্ঞাসা কৰাতে তিনি বলিলেন সে বাহিৰে আমেব বাগানে গিবাছে, তৎক্ষণাৎ সেই দিকে দোড়। মা চীৎকাব কৰিতে লাগিলেন, “ওবে বোস, ওবে দাড়া, তাকে ডাক্চি,” কেবা তাহা শোনে। আমি একেবাবে গিয়া উম্মাদিনাকে ডুকে চুলিয়া ধৰে আনিয়া তবে নিঃশ্বাস কেলিলাম।

এই উম্মাদিনী সেই গ্রীষ্মকালে মাৰা পড়িল। বাবা একদিন তাহাকে সঙ্গে কৰিয়া জমিদাবাবুদেৰ বাগানে বালিকাবিদ্যালয়েৰ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তাব শ্রিয়নাথ বসুচৌধুরী* সাহিত দেখা কৰিতে গেলেন। তিনি উম্মাদিনীকে আদর কৰিয়া লিচু খাওয়াইলেন। উম্মাদিনী আনন্দিত অন্তবে হাসিতে হাসিতে বাবাব সঙ্গে ধৰে কৰিয়া আসি। আসিয়াই তাহাব দারুণ কলেবা যোগ দেখা দিল। একবাব ভেদ একবাব বমি হইয়াই সে যেন চূপসিয়া

গেল। তাৰ বমিতে আন্ত আন্ত লিচু উঠিল। সে কথা এইজন্ত বলিবে যে তাহাৰ মৃত্যুতে এত আঘাত পাইযাছিলাম, যে তদবধি আজ পর্য্যন্ত ৭ দাঘকাল ভাল মনে লিচু খাইতে পাৰি নাই। লিচু খাইতে গেলে উন্মাদিনাৰ কথা মনে হয়। প্রাতে ৯টাৰ সময় পীড়া জন্মিয়া অপবাক্ষ ৩টাৰ মধ্যে উন্মাদিনাৰ মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাহাকে যখন নিকটস্থ পুকুৰে * নামাইল, তখন আমি গিয়া তাৰ সম্মুখে দাঁড়াইলাম, মনে হইল সে আমাৰ দিকে চাহিয়া বাহৰাছে এবং তাহাৰ হই চক্ষে জলধাৰা পড়িতেছে। সেই চক্ষুৰ জলধাৰা এত দাঘকাল ভুলিতে পাৰি নাই। উন্মাদিনী চলিয়া গেলে গৃহ শূন্য দেখিলাম। তৎপবে আমাৰ তিন ভগ্নী জাহ্নবীৰাছে, এবং গাভৰু পৰেৰ মাকে মাসা পৰেৰ বোনকে বোন অনেকবাৰ কবিতাছি, কিন্তু শেণেৰেব সেই বিমল আনন্দেৰ স্মৃতি হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

বোৰ হয় ইচাৰ পূৰ্বে বৎসৰ পূজাৰ সময় আমাৰ প্রপিতামহদেৰ স্বগাবোহণ কৰিয়াছিলেন। তাহাৰ মৃত্যুৰ কয়েক দিন পূৰ্বে তিনি অমৃত্তৰ কবিত্তে পাবলেন যে তাৰ আসন্নকাল উপস্থিত। আমি ও আমাৰ পিতা ~~কলিকাতায়~~ কলিকাতায় ছিলাম। তিনি আমাৰ পিসামশায়কে, আমাদিগকে সংবাদ দিয়া খণ্ডী লইবাব জন্ত ব্যস্ত কবিত্তা তুলিলেন। বাবা গেলেন; আমি বোৰ হয় কলিকাতাতেহ থাকিলাম, কাৰণ তাঁৰ মৃত্যুশয্যা আমাৰ স্মৰণ হয় না। তৎপবে মৃত্যুৰ দুই একদিন পূৰ্বে নিজকে বাড়ীৰ বাহিৰে চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া বাধিবাব জন্ত আদেশ কবিলেন। অনেকবাৰ চীৎকাৰ কবিত্তা বলা হইল যে যথাসময়ে লগুৱা হইবে; কিন্তু কিছুতেই শুনিলেন না। তাঁতাকে লইয়া গুৱা হইল। তৎপবে ইষ্টদেবতাৰ নাম কবিত্তে কবিত্তে ১০৩ বৎসৰ বয়সে অমবধামে প্রস্থান কবিলেন।

প্রথম বিবাহ ।—এই জেলিয়াপাড়ার বাসাঘ থাকিতে থাকিতে আমার প্রথমবার বিবাহ হয় । সাল তাবিখ মনে নাই ; তখন ঠিক কত বয়ঃক্রম ছিল, তাহাও স্মরণ নাই, ১২।১৩ বৎসবেব অধিক হইবে না । আমার মাতুলালয়েব সন্নিকটস্থ বাজপুল গ্রামেব ৬ নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী'ব জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ী'ব সহিত আমার প্রথম বিবাহ হয় । প্রসন্নময়ী'ব বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসবেব অধিক হইবে না । আমাদের দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগেব কুলপ্রথা অনুসারে, প্রসন্নময়ী'ব বয়ঃক্রম যখন একমাস ও আমার বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসব, তখন তাঁহাব সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থি'ব হইবাছিল ।

এই বিবাহকালান সকল বিষয় আমার স্মরণ নাই । এইমাত্র স্মরণ আছে যে, আমি কানে মাকড়ী, গলায় হাব, হাতে বাজু ও বালা পবিষা বিবাহ কবিতে গিবাছিলাম । বাবা বাজনা ও আলো কবিষা আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন । আমাকে লইয়া যেই আসবে বসাইল, অমনি গ্রামেব সমবয়স্ক বালকেবা আসিয়া “ওবে তুই কি পড়িস ? কি পড়িস ?” বলিয়া পবীক্ষা আবস্ত কবিল । আমি অল্পক্ষণ মধ্যে ববোচিত লজ্জা তুলিয়া গিয়া তাহাদেব সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং আমাকে তাহাবা'পূ'র্ন দূবে থাক, আমিই তাহাদিগকে 'ঠুকাইয়া দিলাম । সেই'ই স্বর্গ' আছে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিবা কেহ কেহ বলিতে লাগলেন, “ছেলোট বড় জেষ্ঠা” । তৎপবে বাড়ী'ব মধ্যে লইয়া গেলে সমবয়স্ক বালিকাদিগেব কানমলা আবস্ত হইল । সেইবার ঠকিয়া গেলাম ; কানমলা'ব পবিবর্ত্তে কান মলিয়া দিতে পারিলাম না । নাবীদলে আমাকে ঘিবিয়া ফেলিল । এত মেয়ে একত্র দেখিয়া ভাবা-চ্যাকা লাগিয়া গেল ।

পাল্‌কী করিয়া বোঁ লইয়া আসা' ।—বিবাহেব পব পবদিন যখন এক পাল্‌কীতে ববকন্তাকে তুলিয়া দিয়া গৃহাভিমুখে বিদায় কবিল, তখন আমার মুক্তি'ল বোধ হইতে লাগিল । মেয়েটী ঘোমটা দিয়া

সন্মুখে বসিষা কাঁদিতে লাগিল; হাত পা ছড়াইতে পাবি না, বিলিতে পাবি না, মহা বিপদ। অবশেষে পশ্চিমধ্যে একটা পড়ো বাগানে গিয়া পাল্‌কী নামাইল; আমি বাহিব হইয়া বাঁচিলাম। বাহিব হইয়া দেখি, লিচু গাছে লিচু পাকিষা বহিয়াছে। গাছে উঠিয়া লিচু পাড়িয়া আহাব কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম। থাইতে থাইতে মনে হইল, মেয়েটা একা বসে আছে, তাবও তো খিদে পেয়েছে, তাকে গোটা কতক লিচু দিই। এই ভাবিয়া কতকগুলি লিচু লইয়া প্রসন্নময়ীৰ অঞ্চলে ফেলিয়া দিয়াই দৌড়, যদি বেহ দেখিতে পায়।

বৌ ও “ববা” কুকুৰ।—ক্রমে পাল্‌কী গ্রামেব প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল। আমাব পাড়াব খেলিবাব সঙ্গী বালকগণ আগ বাড়াইয়া লইতে আসিযাছে। পাড়াব দুইটা বালক আমাব বড় অনুগত ছিল। তাহাবা আসিয়া পাল্‌কীৰ দ্বাব খুলিয়া সব গলাতে বলিল, “ওবে, তোব ববা কুকুৰ ভাল আছে।” শুনিয়া হুঁতাবনা দুবে গেল, তাবী খুসী হইলাম। এই ববাব বিববণ একটু দেওয়া আবশ্যক। ববা একটা কুকুবেব বাচ্চা, মাদী কুকুৰ। শীতেব ছুটীব সময় বাড়ীতে ~~জানি~~ একটা বালকেব নিকট হইতে লইয়া তাহাকে পুৰিয়াছিলাম। যদিও মাদী কুকুৰ, তথাপি তাহাব নাম দিয়াছিলাম “ববার্ট”। ইহাবও একটু বিববণ আছে। কুকুৰটা যখন আসিল, সঙ্গী বালকগণ জিজ্ঞাসা কবিল, “ওব নাম কি হবে?” আমি নাম দিলাম “ববার্ট”। তাহাব মৰ্ম্ম এই; আমাব উপব ক্লাসেব ছেলেবা তখন “চেচাস’ কাষ্ট বুক অব বীডিং” পড়িত। তাহাদেব মুখে শুনিয়াছিলাম যে ববার্ট একজনেব নাম; সেইটা মনে, ছিল। পাড়াব বালকদিগেৰ নিকট তো বাহাহবি দেখান চাই, তাই নাম দিলাম “ববার্ট”। আমি সহৰ হইতে গিয়াছি, আমাব বাক্য তখন বেদবাক্য, তাই তাব নাম হইল “ববার্ট”। শিশুদেব মুখে “ববার্ট” বুঢ়িয়া দাঁড়াইল “ববা”। আমি ববাকে

লইয়া পাড়াব বালকদিগেৰ সঙ্গে স্মৃথেই ছিলাম, আমাকে ধৰিয়া লইয়া গেল বিবাহ দিতে। আমাব ভাবনা হইল, ববাকে দেখে কে ? মাৰ উপবে বিশ্বাস হইল না, কাৰণ মা তখন কুকুৰ ভালবাসিতেন না। কাজেই পাড়াব বালকদিগেৰ প্ৰতি তাৰ ভাব দিয়া আসিয়াছিলাম। তাহাবাট তাহাকে কয়েকদিন খাওয়াইয়াছিল ও দেখিয়াছিল। তাই আসিয়া সংবাদ দিল, “ববা ভাল আছে।”

ক্ৰমে পালকা বাড়ীতে উপস্থিত হইল। পাড়াব মেঘেবা বৌ দেখিতে আসিল। মা হলু দিয়া, ধানদুৰ্কা ফুল চন্দন ঠাকুৰেৰ চৰণামৃত প্ৰভৃতি দিয়া, বৌ ঘৰে তুলিলেন। আমি পাকী হইতে নামিয়াই তাড়াতাড়ি ববাকে দেখিতে ছুটিলাম। বড় পিসা “ওবে খা, ওবে খা” কবিয়া পশ্চাতে ছুটিলেন। কে বা মিষ্ট পাখ, কে বা বৌ লইয়া মেঘেদেৰ মধ্যে বসে। তখন ববা প্ৰসন্নময়ী অপেক্ষা বহুগুণে আমাব প্ৰিয়। এখন এইসব স্বৰণ হইয়া হাসি পায়।

পিতাৰ হাতে দাৰুণ প্ৰহাৰ।—বিবাহ-উৎসব শেষ হইতে না হইতে একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাৰ স্মৃতি অতাপি জাগৰক বহিয়াছে। আমাব বিবাহেৰ কয়েকদিন পৰেই আমাব জ্ঞাতিসম্পৰ্কে এক জ্যাঠাব এক কছাৰ ^{দেউৰা} উপস্থিত হইল। তখনও প্ৰসন্নময়ী আগাদেৰ বাড়ীতে ^{অপেক্ষা} ^{কৰি} ^{বসি} ^{ছিল}। তখনও প্ৰসন্নময়ী আগাদেৰ বাড়ীতে ^{অপেক্ষা} ^{কৰি} ^{বসি} ^{ছিল}। তাহাব পিত্ৰালয় হইতে যাহাব সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহাদেবও কেহ কেহ তখনও আছেন। আমাব এই জ্যাঠাতো বোনেৰ বিবাহ উপস্থিত হইলে, একদিন আমাদেৰ পাড়াব ছেলেবা বৰষাডদিগেৰ সহিত কোতুক কবিবাব জন্ত পঞ্চবৰ্ণেৰ গুঁড়া-দিয়া আসন প্ৰস্তুত কৰিতে প্ৰবৃত্ত হইল। আমিও তাহাদেৰ মধ্যে ছিলাম। সেখানে আমোদ প্ৰমোদ কৰিতে কৰিতে আমাব বড় পিসীৰ মেজো ছেলে বামদাদৰ চক্ৰবৰ্তীৰ সহিত আমাৰ হঠাৎ বিবাদ বাধিয়া গেল। দুইজনে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি ও দুৰাঘুৰি কৰিতে আৰম্ভ

কবিরাম। আমার মা এই সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিলেন এবং হুইজনেব কানে ধবিয়া থাবড়া দিয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেন। মেজদাদা কাদিয়া কাদিয়া বাড়ীতে গিয়া নিজের মাকে বলিল, “মামীমা মায়ে পোয়ে পড়ে আমায় মেবেছে।” বড়পিসী প্রকৃত ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিলেন না; ছেলেরদিককে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবাব চেষ্টা করিলেন না; একেবাবে রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন; এবং আমাব এক পিসতুতো বোনের সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমাব মায়েব প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হুই ননদ ভাজে খুব ঝগড়া হইয়া গেল।

ইহাব পবে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মা আমাকে বলিলেন, “আজ তোমার কপালে অনেক নিগ্রহ আছে। ভাত দিচ্ছি, শীগ্গির খেয়ে, ভট্‌চাষি-পাড়ার যাত্রা হবে, সেখানে গিয়ে বাত্রে যাত্রা শোনো। কর্তাব বাগ পড়ে গেলে সকাল বেলায় আসবে।” মা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বাবা সন্ধ্যাব পূর্বে ঠাড়া আসিতোছিলেন, পথ হইতে বড়পিসীব গালাগালি শুনিয়া ইহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গিয়া বলিলেন, “তোরা কাকে ঠাড়া কলে গালাগালি দিস্ যে রাস্তা হতে শোনা যায়?” আব কোথায় যায়? বড়পিসী বাবাব কানে মার নামে অনেক কথা ঢালিয়া দিলেন। বাবা আব কাহারো কাছে কিছু শুনিলেন কি না জানি না। আমাব মায়েব উপবে কি বড়পিসীব উপরে রাগ করিলেন, তাহাও জানি না। তাহাব মনে চিবদিন এই একটা ভাব ছিল যে, তাহার পুত্র এমনি সাধু ছেলে হবে যে তার নামে কেহ কখনও কোন অভিযোগ করিবে না; তাহাব কোনও দোষ কেহ দেখাইবে না; সে সকল দোষেব ও সকল অভিযোগের উপবে থাকিবে; সেই ভাবের ব্যাঘাত হইল বলিয়া রাগিয়া গেলেন কিনা, জানি না। বাবা হটক, মায়েব দ্বারা আমি রাস্তাঘরের এককোণে বসিয়া তাড়াতাড়ি আহার

কবিতোহি, এমন সময়ে বাবা আসিয়া বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলেন। হইয়াই জিজ্ঞাসা কবিলেন, “সে পাজীটা কোথায়?” আমার মা ছই হাত দিয়া বাবা-ঘবেব দবজাব ছই কাঠ ধবিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন “সে ঘবে নাই।” আমি বুঝিলাম, বাবা যদি বাবাঘবে প্রবেশ কবিতো আসেন, মা তাঁহাকে প্রবেশ কবিতো দিবেন না, বাধা দিয়া বাখিবেন। কিন্তু বাবা সেদিকে আসিলেন না; বলিলেন, “দা-খানা দাও দেখি।” মা জিজ্ঞাসা কবিলেন, “দা কেন?” বাবা বাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, “সে কথায় কাজ কি? দাও না।” মা দা-খানা বাহিব কবিয়া দিলেন। বাবা দা লইয়া বাড়ীৰ বাহিব হইয়া গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া, পিছনেব দ্বাব দিয়া খানা খন্দ বন জঙ্গল পাব হইয়া ভট্টাচার্য-পাড়ার যাত্রাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মা আমাকে মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিডেব ভিতব সৰ্বদা থাকিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসাবে আমি মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিডেব ভিতব বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে মন হইতে ভয় ভাবনা চলিয়া গেল। নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইতোছি, বাজি আটটা সাড়ে আটটান সময় কে আসিয়া পিছন হইতে আমার ঘাড়ের কাপড় ধবিল। আমি বলিলাম, “কে বে?” স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, বাবা সেখানে আসিয়া ধবিবেন। কিন্তু কিবিয়া দেখি, বাবা। তিনি আমার পিঠে দু-ঘুষা দিয়া বলিলেন, “খববদাব কাঁদতে পাবনি না।” সে ঘুষা খাইয়া কান্না গিলিয়া খাওয়া আমার পক্ষে মুক্ছিল হইয়া পড়িল। কি কবি, কান্না গিলিতে লাগিলাম। বাবা সে অবস্থায় আমাকে বাড়ী লইয়া গেলেন, এবং উঠানেব মধ্যে দাঁড় কবাইয়া বলিলেন, “দাঁড়িয়ে থাক, নড়িস্ নে, আমি আস্চি।” এই বলিয়া আমাকে মাঝিবাৰ জন্ত যে বাঁশেব ছড়ি কাটিয়া গোলাৰ গায়ে বাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিতে গেলেন; মা যে তৎপূৰ্বেই সে ছড়ি পুকুরেৰ জলে কেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা

জানিতেন না। আমি ২।৪ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারি। আমার মা, বড়পিসী, পিসতুতো দিদী, বিবাহ-বাড়ীর লোকেরা আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, “ওরে! পালা পালা, মাথাবাব জন্তে কেন দাঁড়িয়ে থাকিস্!” আমি বলিতে লাগিলাম, “না, আমি যাব না, বাবা যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গিয়েছেন।” এই বলিয়া প্রায় আধ ঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া বহিলাম।

ওদিকে বাবা আপনাব ছড়িগাছা না পাইয়া, কি দিয়া মাঝবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে আব কিছু না পাইয়া একখানা চেলা কাঠ লইয়া উপাস্থত হইলেন। সেই কাঠ লইয়া যখন আমাকে মারিতে আসিলেন, তখন বড়পিসী আমাব ও বাবার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, “ওরে ডাকাত! দে কাঠ দে। ওই কাঠেব বাড়ী মারলে কি ছেলে বাঁচবে!” এই বলিয়া বাবাব হাত হইতে কাঠ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই ভাই বোনে ছটোপুটি লাগিয়া গেল। বাবা বড়পিসীকে একরূপ এক ধাক্কা মাঝিলেন যে তিনি তিন চারি হাত দূরে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন আমাব মা প্রস্তুতের মূর্ত্তি বহ্ন অদূরে দাঁড়াইয়া; সাড়া নাই, শব্দ নাই, নড়া নাই, চড়া নাই। বাবার সহিত চৌশোচৌশি হওয়াতে তিনি বলিলেন, “তুমি আমাকে দেখ কি? ছেলে মেবে ফেলতে হয় মেরে ফেলো, আমি এক পা-ও নড়বো না।” বাবা বলিলেন, “আচ্ছা তবে দ্যাখো।” এই বলিয়া সেই চেলা কাঠ দিয়া আমাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আরো কেহ কেহ আমাকে বাঁচাইবার জন্ত আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মাথা ও পিঠে চেলাকাঠ পড়তে কিছু কনিয়া উঠিতে পারিলেন না। চেলাকাঠের করেক বা খাইয়াই আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর মাহুব চিনিতে পারি না। বোধ হইতে লাগিল, আমার চারিদিকে মুখগুলো ঘুরিতেছে। তৎপরেই আমি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পবে চৈতন্ত হইল। চৈতন্ত লাভ কবিয়া দেখি উঠান হইতে তুলিয়া আমাকে ঘবেব দাওয়াতে শোয়ান হইয়াছে, এবং ছই তিন জন লোক তর্পিন তেল দিয়া আমাব গা মালিস কবিতোছে, বাবা আপনি তেল জোগাইতোছেন ও তাহাদেব সাহায্য কবিতোছেন। আমি জাগিয়া মা মা কবিয়া ডাকিতে লাগিলাম। শুনিলাম, তিনি আমাকে অচেতন হইয়া পাড়িয়া যাইতে দেখিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়া পাড়িয়া আছেন। আমাব চেতনা হইনামান লোক তাঁহাকে আনিবাব জন্ত গেল। একজনেব পব তাব-একজন গেলে তিনি কাহাবও কথাতে বিশ্বাস কবিলেন না। অবশেষে পীড়াপীড়ি কবাতো বলিলেন, “কুম্ভচবণ নাপিত যদি আসিয়া বলে যে ছেলে বেঁচে আছে তবে আমি যাব, আব কাক কথাতে যাব না।”

এই কুম্ভচবণ নাপিত পাডাব একজন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন। তিনি বড ভরু ও ধ্বংসাত্মক মানুষ ছিলেন। পাডাব লোকে তাঁহাকে “ভক্ত কুম্ভচবণ” বদিয়া ডাকিত। সেই বাত্র কুম্ভচবণেব নিকট লোক গেল। বৃদ্ধ লাঠি ধবিয়া অতি কষ্টে আসিলেন, এবং আমাব সতিত কথা কহিয়া মাকে ডাকিত গেলেন। মা তাঁব কথা শুনিয়া জঙ্গল হইয়া উঠিয়া আসিলেন, এবং “বাবা বে, তুই কি আছিস্?” কহিয়া আমারি শয্যাপার্শ্বে পাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে, আমাব যখন চেতনা হইল, তখন আমি আমাব স্বভাবসিদ্ধ জ্যাঠাম কবিয়া বলিতে লাগিলাম, “আমি মেজদাদাব সঙ্গে ঝগড়া কবেছিলাম, মাবামাবি কবেছিলাম, দোষ হযেছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু লঘুপাণে এত গুরুদণ্ড দেওয়া বাবাব পক্ষে, কি ভাল হয়েছে? আমাব স্ত্রী ও স্বস্তববাড়ীল লোকেবা বাড়ীতে বযেছে, পার্শেব বাড়ীতে কুটুমবা এসেছে, তাহাদেব সমুখে এত মাঝি কি বাবাব পক্ষে ভাল হলো?” এই কথা বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইলাম, বাবা অদূবে মাটীতে নাক ধবিয়া নাকে

খং দিতেছেন। এখানে এ কথা বলা আবশ্যিক যে তাহার পবে ^{১১} সহস্র উত্তেজনাশব্দেও আমাব বা আমাব ভগ্নীদেব গায়ে আব হা তোলেন নাই। এমন কি, আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া উপবীত পরি-
ত্যাগ করিলেও, তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন কবিষাছেন, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া-
ছেন, কিন্তু আমাব গায়ে হাত দেন নাই। ইহাতেই সকলে বুঝিবেন,
তাঁহার অমুতাপ ও প্রতিজ্ঞা কিরূপ ঐকান্তিক ছিল।

গ্রামেব বাঙ্গলা স্কুলে বদলী হইয়া পিতান কলিকাতা-ত্যাগ।
চাঁপাতলায় মাতুলেব দ্বিতীয় বাসা; “সোমপ্রকাশ” ছাপাখানার
কর্মচারীদের আচরণ।—ইহাব কিছুদিন পবেই আমাব পিতা
কলিকাতা বাঙ্গলা পাঠশালাব কর্ম হইতে বদলী হইয়া আমাদেব
গ্রামেব হার্ডিঙ মডেল বাঙ্গলা স্কুলেব হেড পণ্ডিতেব কর্ম পাইয়া
গ্রামেব বাড়ীতে চলিষা যান। তখন আমাকে সিদ্ধেশ্বরচন্দ্রেব লেনে
আমাব মাতুল মহাশয়েব বাসাতে বাধিষা যান। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র
বিজ্ঞানাগর সর্কদার আসিতেন, এবং আমাব মাতুলেব সহিত কি
পবামর্শ কবিতেন। পবে শুনিলাম, “সোমপ্রকাশ” নামে একখানি
দৈনিক কাগজ বাহিব হইবে, তাহান পবামর্শ চলিতেছে। ১৮৫৮ সালে
সোমপ্রকাশ কাগজ বাহিব হইল। বাসাতে ধুম পড়িয়া গেল।
বাড়ীতেই ছাপাখানা খোলা হইল। কাগজ ছাপা ও কাগজ বিলিষ
জন্ত অনেক লোক বাসাতে থাকিতে আবন্ত কবিল। হৈ-হাই গোল-
মাল সমস্ত দিন ও রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত। তাহাব ভিতবে আমি
বয়সে সর্কাপেক্ষা ছোট, আমাব খাওয়া-দাওয়া বা কে দেখে, পড়াশোনার
প্রতিট বা কে দৃষ্টি বাধে! আমি সেই পুরুষেব দলে পড়িয়া, বাঁধি,
বাসম মাজি, এবং কোনও প্রকাষে নিজেব পড়াশুনা কবি। তহপরি,
বাসার বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকগণেব আলাপ আচরণ কিছুই আমার মত
বয়সেব ছেলের শুনাবাষ ও দেখিবার উপযুক্ত নহে। অধিক কি, একজন

যেহেতু আমাকে অতি অসং কাৰ্য্য শিক্ষা দিতে আবন্ত কবিল। সে সকল স্বৰণ কবিলে এখন লজ্জা হয়, এবং ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ কবি যে একেবাবে অসংপথগামী হই নাই।

সপ্তাহেব মধ্যে বাসাব অন্তৰ্গত লোকগুলি মাতুলেব ভয়ে অনেক শাস্তমূৰ্ত্তি ধারণ কবিয়া থাকিত; নিজ নিজ কাজে মনোযোগ কৰিতে বাধ্য হইত। মাতুল মহাশয় শনিবাব দেশে যাইতেন; শনিবাব বাত্ৰি ও ববিবাব সমস্ত দিন বাসা আব-এক মূৰ্ত্তি ধারণ কৰিত। কেহ গাঁজা, কেহ মদ খাইয়া ঢলাঢলি কৰিত। মাতুল খবচেব জন্তু যে-কিছু পষসা দিয়া যাইতেন তাহ এইৰূপে ব্যয় কবিয়া ফেলিত। আমাদিগকে অনেক বাববাব ভাতে-ভাত খাইয়া কাটাইতে হইত। প্রশংসাব বিষয়, আমাকে তাহাবা অনেক সময় একটা কিছু ছল কবিয়া অল্প কোনও বাসায় থাকিবাব জন্তু পাঠাইয়া দিত। তথাপি মাহা দোখতাম ও গুণিতাম, তাহা বালকেব দেখা কোনও প্রকাৰেই কৰ্ত্তব্য নহে। ঈশ্বৰকে আজ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি যে, সেই-সকল দৃষ্টান্তেব মধ্যে তিনি আমাকে বক্ষা কবিয়াছিলেন।

আমি একদিনেব বিবৰণ বলিতেছি। বাসাব অন্তৰ্গত আত্মীয়দিগেৰে মধ্যে একজনকে সকলে ‘মামা’ ‘মামা’ বলিয়া ডাকিত। এই ‘মামা’, সম্পৰ্কে আমাব মায়েব-মামা, তবু আমিও ‘মামা’ বলিয়া ডাকিতাম। বলিতে কি, চাকৰ বাকৰ দোকানি-পসাৰি কেহই তাহাকে আসল নামে ডাকিত না; সকলেই ‘মামা’ ‘মামা’ বলিয়া ডাকিত। ‘মামা’ ইংবেজী লেখাপড়া শেখে নাই; কম্পোজিটাইব, বিলসবকাৰি প্রভৃতি কবিয়া কিছু উপার্জন কৰিত। তাহাব সুবাপান ও অস্ত্ৰাস্ত্ৰ দোষ ছিল। একদিন ববিবাব সন্ধ্যাব পৰ একজন আত্মীয় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ‘মামা’ স্কুৰিয়া ষ্ট্রীটেব এক গণিকালয়ে মাতাল হইয়া বসি কবিয়া পড়িয়া আছে। গণিকারা দ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণেৰ বাসাব লোক বলিয়া তাহাব নাম উল্লেখ

কবিতা গালি দিতেছে। বাবাজনার মুখে মাতুলের নাম, ইহা যেন আঁ
‘অসঙ্গ বোধ হইতে লাগিল। আমি ‘মামা’কে ধবিত্তা আনিবাব জই
বাসাব বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে অনেক অন্তবোধ কবিলাম। কিন্তু
তাঁহারা নেশা কবিতা বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন, কেহই আমাব কথাব প্রতি
কর্ণপাত কবিলেন না। অবশেষে আমি যেদো নামক এক চাকরকে
সঙ্গে কবিতা স্কিকিতা ষ্টাটেব সেত গণিকালষেব অভিমুখে বাহিব হইলাম।
গিয়া দেখিলাম, এক গোলপাতা বসেব স্ত্রীদোকের দাওঘাতে ‘মামা’
বসি কবিতা ভাসাইয়াছে, ও অন্ধ-অচেতন অবস্থাতে পড়িয়া বসিয়াছে।
আমবা গাইবামাত্র স্ত্রীলোকটি গালাগালি আবন্ত কবিল। আমি বলি-
লাম, “চাকর সঙ্গে এনেছি, বসি পবিত্রাব কব্চি, ও ওকে তুলে নিয়ে
যাচ্চি, গালাগালি দিও না।” এই বলিয়া বসি পবিত্রাব কবাইয়া,
যেদো চাকরকে ‘মামা’কে তুলিয়া আনিতে বলিয়া, নিজে দ্রুতপদে বাসাৰ
অভিমুখে যাত্রা কবিলাম, কাবণ, তখন যদিও কলিকাতাব পথে ঘাটে
বাসাতে মাতাল দেখিতাম, তথাপি মাতালের প্রতি কেমন একটা
বিভ্রান্তীয় স্নগা ও ভয় ছিল, তাহাদেব কাছে ঘোঁসিতাম না। বাসাতে
আসিয়া তাহাদেব জন্ত অপেক্ষা কবিতা বসিয়া আছি; অনেকক্ষণ পরে
যেদো চাকর আসিয়া সজোবে দোব নাড়িতে লাগিল। দ্বাব খুলিয়া
দেখি, ‘মামা’ সঙ্গে নাই। কাবণ জিজ্ঞাসা কবাতো, সে ‘মামা’কে অভদ্র
ভাষায় গালাগালি দিয়া একখানা ছোবা আনিয়া দ্বাবেব নিকট বসিল;
বলিল, ‘মামা’ আসিলেই তাহাকে কাটবে। মনে ভাবিলাম, পথে দুজনে
মাবামাবি কবিতাছে। আমি মহাবিপদে পড়িয়া গেলাম। আমি
জানিতাম, যেদো চাকর গাঁজাখোৰ; সে যাহা ভয় দেখাইতেছে করিতে
পাবে। বাসাৰ লোককে ডাকাডাকি কবিলাম, কেহই উঠিলেন না,
বলিলেন, “মরুক হতভাগাৰ।” আমি নিরুপায় হইয়া বাহিবেব দবজার
ভিতৰেব দিকে এক তালা লাগাইলাম। যেদো উঠিয়া আমাব হাত

ଧିବିଳ, “ତାଲା ଲାଗାଓ କେନ ?” ଆମି ବଲିଲାମ, “ତାଲାବ ଚାବି ତୋ ଭିତରେ ଆମାଦେବ କାଛେ ବଇଳ, ‘ମାମା’ର ହାତେ ତ ବଢ଼ିଲ ନା । ଏଲେ ଖୁଲେ ଦେବ, ତାବ ଭସ କି ?” ସେଦୋ ତାହି ବୁଝିଲ ଏବଂ ଛୋବା ଲହିଷା ବାହିବେବ ଦବଜାବ କାଛେ ବସିୟା ବଢ଼ିଲ । ଆମି ବାଢ଼ାବ ଭିତରେ ଉପବେବ ସବେ ଶୁଣିତେ ଗେଲାମ । ଗିବା ଶୁନି, ‘ମାମା’ ବାସାବ ମଞ୍ଚାତେ ଅପବ ଏକ ଗଣିକା-ଲସେ ଗିଷା ମାତାଲି ଅୁବେ ଏକ ଗାନ ବସାଛେ । ସେ ବାତ୍ରେ ସେ ଆବ ବାସାୟ ଆସିଲ ନା ।

ପର୍ବାଦିନ ମାତୁଲ ମହାଶୟ ସତ୍ତବେ ଆମି ଆମି ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାହାବ ଗୋଚର କରିଲାମ । ତିନି କୁପିତ ହିସା ବାସା ହଟିତେ ହିସାଦିଗକେ ଡାଢ଼ାହସା ଦିଲେନ ।

ତାହାବ ପରେ ଆମାବ ମାତାମହୀ ଲାକୁବାଣୀ ଓ ଆମାବ ବଢ଼ିମାମୀ ଆସିଷା କିଛିଦିନ କାଳିକାତାତେ ଇଲେନ । ତାହାଦେବ ପଦାପଣେ ବାସା ଧାବିତ ହିସା ଗେଲ । ମାତୁଲ ମହାଶୟେବ ଶନିବାବ ବାଢ଼ା ଯାଓୟା ଏକ ହିସା । ମାମାଠାକୁବାଣୀ ମାତୁଲେବ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷେବ ପଢ଼ା, ଆମା ଅପେକ୍ଷା ଚାବ ପାଞ୍ଚ ବଂସବେବ ବଢ଼ । ତିନି ମାତାମହୀକେ ଗୋପନ କାବିୟା ଆମାକେ ମିଠାହି ଆନତେ ପସା ଦିତେନ, ମିଠାହି ଆନିଷା ଗର୍ଭାବ ବାତ୍ରେ ଦୁଇଜନେ ଥୁବ ଥାନ୍ତାମ । ଏ ମେଟୁକେବ ସେହି ସମୟଟା ସେ କି ଶୁଖେଟି ଗିବାଢ଼ିଲ, ତାହା ବାତ୍ରେ ପାବି ନା ।

ମାତୁଲେବ ଉତ୍ତର ଚରିତ୍ରେର ପ୍ରଭାବ ।—ଅଗ୍ରେ ବାଲିଷାଛି ବଢ଼ିମାମାବ କାଛେ ଏକବାବ ଏକଟି ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲିୟାଛିଲାମ ; ତାହାବ ନିବରଣ ଏଥାନେ ଦିତେଛି । ଆମାବ ଦୁଇଜନ ସହାଧ୍ୟାୟା ବନ୍ଧୁବ ଜନନାକେ ଆମି ନାମୀ ବଲିତାମ ଓ ତାହାଦେବ ବୋନକେ ଘେନ ବଲିତାମ । ତାହାବା ବାସ୍ତବିକ ଆମାକେ ମାମୀବ ଜ୍ଞାୟ ଖାଲବାସିତେନ । ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁବ ମଧ୍ୟେ ଏକ ଜନେବ ବାଢ଼ିତେ ଆମବା କରେକଟା ବାଳକ ଏକବାବ ଏକ ଛୁଟିବ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ହିସା-ଛିଲାମ । ନାନାପ୍ରକାର ଜୁକିଡ଼ା-କୋଡ଼ୁକେବ ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ବାଳକ ଏକଥାନା ବୋତଲ-ଭାଙ୍ଗା କାଞ୍ଚ ଲହିୟା ହାସିତେ ହାସିତେ ବଲିଲ, “ଦେଖ ତାହି, ଏହି କାଞ୍ଚ



জ্যেষ্ঠ মাতুল ছাবকানাথ বিষ্ণাভূষণ ।

যদি কেহ চিবাইয়া ভাজিতে পারে, তবে তাকে এখনি একটাকা দি।” আমি বলিলাম, “আচ্ছা দাও, আমি চিবাইছি।” এই বলিয়া তার হাত হইতে কাঁচখানা লইয়া চিবাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন ছুইপাটী দস্তেব মধ্যে কাচখানা বাথিয়া ভাজিতে যাইব, অমনি ডানদিকেব নীচের ঠোট কাটিয়া এখানা হইয়া গেল। এই অবস্থায় মাতুলেব বাসাতে দৌড়িলাম। বডমামা দেখিয়া ভয়ে আকুল হইলেন। কাবণ জিজ্ঞাসা কবান্তে বলিলাম যে, একখানা চাকু ছুঁবা বাহাত্বী করিয়া দাঁত দিয়া তুলিতে গিয়াছিলাম। ছুঁবখানা কয়দুব উঠিয়া সবেগে ঠোটের উপর বসিয়া গেল। মামা তাহাই বিশ্বাস কবিলেন, এবং ডাক্তার ডাকিয়া আমাব ঠোট সেলাই কবাঈয়া দিলেন। আমি তাঁহাব নিকট এই একটী মিথ্যা কথা কহিয়াছিলাম। এখনও ইহা স্মরণ হইয়া লজ্জা হইতেছে, কাবণ আমি আব তাহাব নিকট কখনও কোনও মিথ্যা কথা বলিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আমাব সত্যবাদিতাব প্রতি তাঁহাব প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। বলিতে কি, আমাকে তিন ক্রপে বিশ্বাস কবিতেন তাহা যখন ভাবি, আমাব মন আশ্চর্যান্বিত হয়। পাছে তিনি ক্রেশ পান, এই ভয়ে সর্বদা কুসঙ্গ হইতে দূবে থাকিতাম। তিনি দৃঢ়চেতা, কর্তব্যপবায়ণ মানুষ ছিলেন, তামাক পর্যন্ত খাইতেন না; ধীব গম্ভীবভাবে সকল কাজ কবিতেন, দিন বাত্রি পাঠে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহাব চক্ষের সমক্ষে বর্জিত না হইলে, আমাব মনে যত সাধুভাব জাগিয়াছিল, তাহা জাগিত না। তাঁহাব নিকট এই মিথ্যা কথা বলিয়া বহুদিন কষ্টভোগ কবিয়াছি।

তন্ময়নস্কতা।—মাতুলেব কলিকাতার বাসায় থাকিবার কালের আর একটা হাঙ্গমনক ঘটনা আছে। পূর্বেই বলিয়াছি বালককালে আমার অশিশুর তন্ময়নস্কতা ছিল। কিরূপে একবার গাছের পাখী দেখিতে দেখিতে হাতীর পায়ের তলার পড়িতে পড়িতে ঝাঁচিয়া গিয়াছিলাম, কিরূপে আমি

তন্ময়নকচিত্তে পড়িতে বসিলে বাবা আমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাঠিয়া আসিয়া প্রহাৰ করিতেন, এবং আমাব হা-কালো নাম বাধিয়া-ছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই মাতুলেব বাসায় থাকিবাব সময় একদিন আমি বাড়ীৰ ভিতবেব উপবেব ঘবে তন্ময়নকচিত্তে পাঠে মগ্ন আছি, এমন সময়ে বড়মামা শয়ন করিবাব জন্ত উপবে আসিতেছেন। আমি তন্ময়নকচিত্তে পড়িতে বসিলেই কোমবেব কাপড় খুলিয়া বাইত। সেইকপ কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছে, আমি পাঠে মগ্ন আছি। বড়মামাব জুতাৰ ঠক্ঠক শব্দ শুনিতোছি, কিন্তু চেতনা তইতেছে না, কাপড় সামলাইনা পনিতোছ না। অবশেষে বড়মামা যখন সেই-ঘবেব দ্বাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন আমি সজাগ হইবা কোমবেব কাপড় সামলাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। বড়মামা বলিলেন, “তুই কি ঘুমুচ্ছিলি ? বসে ঘুমুচ্ছিলি কেন, শুতে তো পারতিস ?” আমি বলিলাম “না, ঘুমুই নি।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “গমন খাড়ি-মাড়ি দিয়ে উঠলি কেন ?” আমি বলিলাম, “আমি মনে কবলাম ছুচো আসছে।” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “ছুচো কি জুতো-পাশে সিঁড়া দিয়ে আসে ?” এই লইবা বাড়ীৰ লোকেব মধ্যে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অবশেষে বড়মামা আমাব পাঠে মনোযো ও চিত্তেব একাগ্রতাৰ জন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

মাতুলেব ছাপাখানা ও বাসা উঠিয়া যাওয়াতে নানাস্থানে বাস ও কষ্টভোগ।—তহাব কিছুদিন পবেই মাতলা বেলগুয়ে গুলিল। বড়মামা ডেলি প্যাসেঞ্জাব হইয়া বাড়ী হইতে কলেজে গতায়ত করিতে লাগিলেন। সোমপ্রকাশ যন্ত্র কলিকাতা হইতে চাকড়িপোতা গ্রামে তাঁহাব বাসভবনে উঠিয়া গেল। আমাদের বাসা আবাব ভাঙ্গিল। আমি দুদিন ইহাদেব সঙ্গে, দুদিন উহাদেব সঙ্গে, এইকপ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। শেষে আমাব পিতা আসিয়া আমাকে সুকিয়া ষ্টীটে বাহুড়-বাগানে এক আত্মীয়েব বাসাতে বাধিয়া গেলেন। তিনি আমার মাতাব

পিস্তুতো ভাই। তিনি কম্পোজিটবি কাজ কবিতেন, এবং একখানি সামান্য গোলপাতাব ঘব ভাড়া কবিয়া থাকিতেন। একরূপ স্থিৰ রহিল যে তিনি প্রাতে ও আমি বৈকালে পাক কবিব। কিন্তু কার্য্যকালে এই দাঁড়াইল যে আমাকেই দুই বেলা পাক কবিতে হইত। কেবল তাহা নহে, বাসন মাজা, ঘব ঝাড়ু দেওয়া, বাজাব কবা, জল তোলা প্রভৃতি সমুদয় কাজ আমার উপর পড়িয়া গেল। অনেক সময় আমাকে বাম হস্তে 'পাঠ্যপুস্তক ও দক্ষিণ হস্তে ভাতের কাঠি লইয়া বন্ধন ও পাঠ একসঙ্গে চালাইতে হইত। আমি বহুকাল পবে সেই সময়কার একখানি পুস্তক পাইবাছি, তাহাতে বামহস্তের হলুদেব দাগ এখনও বহিয়াছে। অনুমানে বোধ হয়, বাটনা বাটিয়া তৎপবে সেখানি পড়িবাব জন্ত লইয়াছিলাম, সেই জন্ত হলুদেব দাগ লাগিয়াছে।

এই স্থানে একছুদিন বাসের পর আমার পিতা আসিয়া আমাকে কলিকাতার উপনগরবর্তী ভবানীপুরে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটিতে রাখিয়া গেলেন।

চতুৰ্থ পৰিচ্ছেদ ।

-বানীপুৰে মহেশ চৌধুৰী মহাশয়েৰ বাটীতে অভিনাবকগণ হইতে

স্বতন্ত্ৰভাবে বাস । দ্বিতীয় বাৰ বিবাহ ও অমৃতাপ ।

ধন্যজীবনেৰ উন্মেষ । ঠাবুৰ পূজাৰ অসম্মতি ।

শাঁকাৰিটোলাৰ জগৎ বাবুৰ বাডী । বাৰ্য্য-

বিবাহেৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ উদয় ।

১৮৬২-১৮৬৭

মহেশচন্দ্ৰ চৌধুৰী মহাশয়েৰ সাধুতা ও সদাশয়তা ।—ভবানী-
পুৰে স্বৰ্গীয় মহেশচন্দ্ৰ চৌধুৰী মহাশয়েৰ বাটীতেই আমাৰ অভিনাবকগণ
হইতে বিযুক্ত হইয়া একাকী বাস আৰম্ভ হয় । এই সদাশয় সাধু পুৰুষ
কলিকাতা হাইকোর্টেৰ উকীল ছিলেন । ইনি বৰ্দ্ধমান জেলাৰ আমদপুৰ
নামক গ্ৰামেৰ জমিদাৰ কুড়োবাম চৌধুৰীৰ পোন্ধ । ইহাদেৰ বংশ
সৌজন্য সদাশয়তা সচ্চবিত্ততাৰ জ্ঞাত প্ৰসিদ্ধ । মহেশচন্দ্ৰ চৌধুৰী
মহাশয় চৰিত্ৰগুণে সৰ্বজননেৰ সমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন । তাঁহাতে যে সাধুতা
ও সদাশয়তা দেখিবাছি, তাহা কখনও ভুলিবাব নহে । ইনি এবং ইহাৰ
পৰিবাসস্থ সকলে আমাকে আপনাদেৰ স্বসম্পৰ্কীয় লোকেৰ ভাৱ দেখিতেন ।
বাৰা কলিকাতা বান্ধলা পাঠশালাতে আঁসিবাব পূৰ্বে ইহাদেৰ গ্ৰামে
পণ্ডিতী কন্ম কবিতেন * সেই সূত্ৰে ইহাদেৰ সহিত আলাপ ও বন্ধুতা
জন্মে । ইহাৰা একপ সদাশয় লোক যে সেই বন্ধুতাটুকুৰ খাতিৰে আমাকে
বাড়ীৰ ছেলেৰ মত কবিতা লইলেন । আমি একজন গবীৰ ব্ৰাহ্মণেৰ
ছেলে, ইহাদেৰ অগ্ৰে প্ৰতিপালিত হইতেছি, আমাৰ প্ৰতি ইহাদেৰ ব্যবহাৰ
দেখিলে তাহা মনে হইত না । আমাকে বাড়ীৰ ছেলে মনে হইত ।

‘ভট্টিবাবু’ ।—তাঁহাৰা আমাকে “ভট্ট” “ভট্টি” কবিতা ডাকিতেন ।
ইহাৰ একটু ইতিবৃত্ত আছে । আমাৰ স্বগ্ৰামেৰ অল্পশিক্ষিত একজন ব্ৰাহ্মণ



অর্গায় মহেশচন্দ্র চৌধুরী

সুবক, ইহাদেব ভবনে বাসকালে একবার আমাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে আপনাব নাম স্বাক্ষর করিবাব সময় ভট্টাচার্য্যের পরিবর্তে ভট্টীয়া লিখিয়াছিলেন। তাহা লইয়া আমাদেব মধ্যে খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তদবধি আমাবও উপাধি ভট্টাচার্য্য বলিয়া বাড়ীর লোকে আমাকে “ভট্টীয়া” “ভট্টায়া” বলিতে লাগিলেন। ভট্টীয়াটা ক্রমে ভট্টি হইবা দাঁড়াইল। অবশেষে চাকর-বাকর সকলে ভট্টিবাবু ভট্টিবাবু বলিতে আবস্ত করিল। বাড়ীর কর্তাদেব মুখে এই “ভট্টি” নামটি আমাব মিষ্ট লাগিত। কারণ তাহাতে অকপট স্নেহ ও আত্মীয়তা প্রকাশ গাইত।

ভাঁড়াবেব ভার।—তাহাবা আমাকে কিরূপ আপনাব লোক জাবিহেন, তাহাব একটা দৃষ্টান্ত এই স্থানেই দেওয়া ভাল। তাহাবা একবার তাহাদেব ভাড়াবেব চাবি আমাকেই দিলেন। বলিলেন, “প্রাতে পড়িতে বসিবাব পূর্বে তুমি ভাঁড়াবেব দোব খুলিয়া চাকরদিগকে ডাকিয়া, নিজের চোখে দেখিয়া সমুদয় জিনিসপত্র বাহিব করিয়া দিয়া পড়িতে বসিবে; চাবি তোমাব কাছেই থাকিবে।” সেই বিস্তীর্ণ পবিবাবেব ভাড়াব এক বৃহৎ ব্যাপাব ছিল। ৬০৭০ জন খাবাব লোক; ১০১৫ জন চাকর; ৭৫টা ঘোড়া; ৮১০টা গরু বাছুর। মানুষদেব খাবাব চাল ডাল তেল নুন, ঘোড়াব দানা ভূষি প্রভৃতি, গরুদেব ভূষি খইল কলাই প্রভৃতি, সমুদয় সেই ভাঁড়াবে থাকিত। প্রতিদিন কোন্ জিনিস কি পবিমাণ দিতে হইবে তাহা একটা কাগজে লিখিয়া, তাহাবা ভাঁড়াবেব মধ্যে উহা লটকাইয়া দিয়াছিলেন। আসি প্রাতে গিয়া, ভাঁড়াবেব দ্বার খুলিয়া চাকরদিগকে ডাকিয়া, সমুদয় জিনিস ওজন করিয়া দিতাম। দিয়া চাবি লইয়া গিয়া উপবে পড়িতে বসিতাম। তাৎপৰ্য সমস্ত দিন আমাব সঙ্গে ভাঁড়াবেব সম্পর্ক থাকিত না। ওই জিনিস পত্রের সঙ্গে চাকর বাকর তাহাকও দেওয়া হইত।

নবান ঠাকুর।—একদিন আমাব স্কুল বন্ধ। সেদিন আমি বাড়ীতে আছি। বাঁধুনী বামুন নবীন ঠাকুব আসিয়া আমাকে বলিল, “ভট্টিবাবু, আমাদের আব একটু তামাক দিন।” আমি প্রথমে বলিলাম, “যা তামাক দিবাব কথা কাগজে লেখা আছে, তা তো দিযেছি, আবাব কেন চাও?” পবে ভাবিলাম, একটু তামাক বই তো নয়, দিয়া আসি। ভাবিয়া তামাক দিতে গেলাম। ভাঁড়াব খুলিয়া তামাক দিতেছি, এমন সময় নবীন ঠাকুব আমাকে বলিল, “ভট্টিবাবু, আমাদের সঙ্গে লাগলে এখানে টিকতে পারেন না।” বাঁধুনী বামুনের কথা শুনিয়া আমাব মনে হইল, ভাড়াবব চাবি আমাব হাতে না পাখাই ভাল, চাকব বাকব আমাকে অন্ত্রাশ্রিত জানিয়া তেমন খাতিব কব না, পদে পদে তাহাদেব সঙ্গে বিবাদেব সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া পবাদন চাবিটা তাহাদিগকে ফিবাইয়া দিলাম। প্রকৃত কাবণটা আব কাহাকেও বলিলাম না, কেবলমাত্র মহেশচন্দ্র চৌধুরীৰ খুল্লতাত-পুত্র শ্রীশচন্দ্র চৌধুরাকে বলিযাছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে গোপন বাখিতে অনুবোধ কৰিযাছিলাম। আমি যখন চাবি ফিবাইয়া দিতে গেলাম, তখন কৰ্ত্তাদেব মধ্যে একজন বলিলেন, “কেন ফিবিযে দিচ্চ? তোমাব উপব আমাদের পূৰ্ণ বিশ্বাস, তোমাব উপব এ ভাব থাকলে আমবা নিশ্চিন্ত থাকি।” এই কথা যখন উঠিল, তখন শ্রীশ আসিয়া তাঁহাদেব নিকট সমুদয় কথা ব্যক্ত কবিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদেব মধ্যে কথাবার্তা উঠিল, তাহা শুনিতে শুনিতে আমি পাইখানা অভিমুখে চলিলাম; যাইবাব সময় দেখিয়া গেলাম বড়দা (অৰ্থাৎ মহেশচন্দ্র চৌধুরা মহাশয়) বাবাণ্ডাব একধাবে বসিয়া স্নানেব পূৰ্বে দাঁতন কবিতেছেন। এদিকে আমি পাইখানাতে গিয়া প্রবেশ কবিতে না কবিতেই চাকব গিয়া বলিল, “ভট্টিবাবু, শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন; ভয়ানক কাণ্ড বেধেছে; বড়বাবু (মহেশবাবু) আপনাকে ডাকছেন।” আমি পাইখানাৰ দ্বাব হইতে ফিবিয়া গেলাম। গিয়া দেখি, বড়দা বাগ্নাঘবেব

দ্বাবে দাঁড়াইয়া সিংহগর্জনে নবীন ঠাকুরকে বলিতেছেন, “বাথ্ বাথ্, হাতা বেড়ি বাথ্; এখনি ঘব হতে বের্ হয়ে যা, নতুবা গলাধাক্কা দিষে বের্ কবে দেব।” আমি গিয়া কাছে দাঁড়াইলে আমাকে বলিলেন, “কি গাই, নবীনঠাকুর তোমাকে কি বলেছে, বল ত।” আমি বলিলাম, “বেশী ঠকছু বলে নাই, সামান্য একটা কথা বলেছে, সে জন্ত বাগ কোরুচেন কেন?” বড়দা বিবস্ত্র হইয়া বলিলেন, “আঃ! কি বলেছে তাই বল না! সামান্য ঠক বেশী আমি বুঝ্‌বো।” তখন আমি বলিলাম, “ও বলেছে, ওদেব সঙ্গে লাগ্‌লে আমি টিক্তে পাব্‌ না।” বড়দা বলিলেন, “বলতে বাকী বেখেছে ঠক? তুখা জুতা মারলে কি সম্ভষ্ট হতে? ওই জন্তেই লোকে তোমাদেব অপমান কব্‌তে সাহস পায়।” এই বলিয়া নবীন ঠাকুরেব দিকে ফিবিয়া বলিলেন, “বা, এখানকাব কর্ম্ম গেল; এখানে তো তুহ টিক্তে পার্‌লিই না, তাবপব গ্রামে টিক্তে পার্‌বিস কি না পবে ভাব্‌ব।” (তাহাবা আমদপুব গ্রামেব জমিদাব ছিলেন, ও নবীন তাহাদেব প্রজা ছিল)।

নবীন তাহাদেব গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া গিয়া পথেব ধারে বাজাবে এক দোকান আশ্রয় কবিল। আমি স্থলে যাইবাব জন্ত বাহিব হইলেই দেখিতাম, নবীন বিষম্মুখে দোকানে বসিয়া আছে। আমাব মনে মহাসংগ্রাম উপস্থিত হহল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমি গবীব ব্রাহ্মণেব ছেলে, এও গবীব ব্রাহ্মণ; আমাব জন্ত এ ব্যক্তিব কর্ম্ম যায়, এটা প্রাণে সহ্য হয় না। অবশেষে একদিন বড়দা কোর্ট হইতে আসিয়া বাহিবেব উঠানে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে নবীনেব জন্ত তাহাকে অনুরোধ কবিতে গেলাম। তিনি গম্ভীর প্রকৃতিব লোক ছিলেন, গায়ে পড়িয়া কথা কহিতে ভয় হইত; স্নতবাং আমি নীৰবে বলি বলি করিয়া তাহাব পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইতে লাগিলাম। তিনি আমাকে পশ্চাতে বেড়াইতে দেখিয়া

ফিবিয়া দাঁড়াইলেন : বলিলেন, “কি ভাই, আমাকে কিছু বলবে না কি ?” আমি বলিলাম, “আপনি নবীন ঠাকুরকে মাপ করুন, নতুবা আমার মন পাবাপ হচ্ছে।” তিনি বলিলেন, “ছিঃ ! তোমরা বড় milky-muddle। সে আপনার কাজের ফল ভুলুক। ৫ দশ দিন যেতে দাও না।” আমি বলিলাম, “সে নিশাশয় হয়ে বাজাবেব দোকান আশ্রয় কবেছে, মাথা বাথবার স্থান নান, থাবার সম্বল নাই, এটা আমার সহ্য হচ্ছে না।” তখন তিনি চাবব পাঠাইয়া নবীন ঠাকুরকে বাজাব হইতে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিলেন, “দেখ বে দেখ, তুই কি মানুষের অপমান করেছিস। তোর জ্ঞান আমার কাছে মাপ চাচ্ছে। এব জ্ঞানই তোকে আস্তে দিলাম। যা, কাজ করো যা।” নবীন স্বীয় কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইল, আমার প্রাণের উদ্বেগ চালনা গেল। সেদিনকার সে ঘটনা ও মহেশচন্দ্র চৌধুরার অকৃত্রিম ভালবাসা চিরদিন স্মৃতিতে জাগিয়া বহিয়াছে।

মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া নানা উপকার। — ইহাদেব ভবনে আসিয়া আমি অনেক প্রকারে উপকৃত হইলাম। প্রথম, মহেশ বাবুর চাঁদে আমার সম্মুখে আদর্শের গ্রাম বহিল। আমি যখন তাঁহাকে দেখিতাম, আমার অন্তরে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিত। দ্বিতীয়তঃ, এখানে আসিয়া বাঁশা ভাত ও পণ্ডবার উপযুক্ত গ্রন্থ-সকল পাঠিয়া আমার পড়া-শুনার বিশেষ সুবিধা হইল। যদিও বাসাতে আমার গ্রাম অনেকগুলি ছাত্র প্ৰতিপালিত হইতেছিল, এবং অনেক সময় আমাদেরকে দলবদ্ধ হইয়া একসঙ্গেই বাস ও পাঠাদি করিতে হইত, তথাপি আমার যে স্বাভাবিক নির্বিষ্টচিত্ততা আছে, তাহার গুণে আমার পাঠের বিশেষ ক্ষতি হইত না। তৃতীয়তঃ, এখানে আসিয়া সমপাঠী কতকগুলি বালক পাইলাম, তাহাদেব দেখা-দেখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে আমার আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা অতীব প্রবল হইল।



স্বর্গীয় ডায়মন্ড দত্ত

ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আরম্ভ।—চতুর্থতঃ, ব্রাহ্মসমাজ গৃহ আমাদের বাসাব নিকট হওয়াত আমি মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাাদি শুনিতে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে লাগিলাম। আমি বোধ হয় ১৮৬২ সালে ভবানীপুৰে যাই; কাৰণ এখানে Destiny of Human Life বিষয়ে কেশববাবু যে ইংবাজী বক্তৃতা হয় তাহা শুনিষাছিলাম। তদ্বিন্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্গীয় অম্বোধানাথ পাণ্ডাশা মহাশয় এখানকান ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মবিজ্ঞাণয় স্থাপন কৰিয়া যে উপদেশ দিতেন তাহাব কতকগুলিও শুনিষাছিলাম। তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজের দিকে মনে মনে একটু আকর্ষণ হয়।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকর্ষণের হেতু!—এই আকর্ষণের আবও দুইটা কাৰণ ছিল। প্রথম, ভবানীপুৰে আমা এক সঙ্গাধ্যায়ী বন্ধু থাকিতেন, তাঁহাকে আমি অতিশয় ভাণবাসিতাম। তাঁহাব জ্যেষ্ঠ সহোদব ব্রাহ্ম ছিলেন; তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং সমাজে যাইতে বলিতেন।

মাজলপুৰে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন —দ্বিতীয়তঃ, আমাদের বাস-গ্রামে যে ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন উঠিয়াছিল, ও শিবকৃষ্ণ দত্ত নামে একজন যুবক সর্বপ্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের বাস্তা আমাদের গ্রামে লইয়া যান, তাহা পূর্বেই * বলিয়াছি। তাঁহাব পিতা ব্রজনাথ দত্ত একজন উদাবচেতা বিষয়া লোক ছিলেন; পণ্ডিতগণের সহিত সর্বদা শাস্ত্র আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি কালকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। সে সময়ে আমাদের গ্রামের বড় উন্নতিব অবস্থা ছিল। সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততম আচার্য্য আব্রাহাম ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রক্কেয় বন্ধু কালীনাথ দত্ত, হবনাথ বন্দু, বমানাথ ঘোষ প্রভৃতি, শিবকৃষ্ণ দত্তের দৃষ্টান্ত ও প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের

অম্বুবাগী হইয়া ব্রাহ্মধৰ্ম্ম অনুসাবে অনুষ্ঠানাদি কৰিতে অগ্ৰসৰ হইয়াছিলৈন। সেজন্তু গ্রামে মহা আন্দোলন ও এই যুবকদিগেৰ প্ৰতি মহা নিৰ্য্যাতন উপস্থিত হয়। সেই নিৰ্য্যাতনেৰ মধ্যে ইহঁাবা বীবেৰ শ্লাঘ দণ্ডাধৰমান ছিলৈন। সেজন্তু আমবা গ্রামবাসী যুবকগণ মনে মনে ইহঁাদিগকে অতিশয় শ্ৰদ্ধা কৰিতাম।

ব্ৰাহ্মদিগেৰ সাহায্যে মজিলপুৰে বাণিকাৰিডালয় প্ৰতিষ্ঠা। — ১৮৫৯ সালে আমাদেব গ্রাম-প্ৰবাসী টাকীনিবাসী ডাক্তাব প্ৰযনাথ বায় চৌধুৰীৰ সত্বে ও ব্ৰাহ্মদিগেৰ সাহায্যে এক বাণিকা-বিডালয় স্থাপন হয়। বিডালয়টি স্থাপিত হওয়ামাত্ৰ আমাব মা আমাব ভগিনীদিগকে তাহাতে প্ৰেৰণ কৰিযাছলৈন। প্ৰযনাথবাব গ্রাম হইতে চালিযা গেলৈ, স্কুলটি বন্ধাব ভাব বান্ধ যুবকগণেৰ উপৰে পড়িল।

জমিদাবেৰ অসন্তোষ ও বিকন্দাচৰণ। — কিন্তু ইহাব একছুকাল পৰে যখন উমেশচন্দ্ৰ দত্ত, হৰনাথ বসু ও কালীনাথ দত্ত প্ৰভৃতি ব্ৰাহ্ম যুবকগণ মে'বসী পাটীতে খাজনা কৰিযা একটু জমি লঠিলৈন, এবং তাহাতে স্কুলেৰ জন্তু একটী ঘৰ নিৰ্ম্মাণ কৰিতে প্ৰবৃত্ত হইলৈন, তখন জমিদাব-বাবুবা তাহাব বিবোধী হইযা দাড়াহলৈন, এবং বিধিমতে সে কাষে বাধা দিতে লাগিলৈন। ব্ৰাহ্ম যুবকগণ স্কুল-ঘৰ নিৰ্ম্মাণেৰ জন্তু শাল্টি কৰিযা স্তম্ভববনেৰ ভিতৰ হইতে খুঁটি ও বেড়াৰ হেতাল প্ৰভৃতি আনাইলৈন। গ্রামেৰ পূৰ্বপাৰ্শ্বে খালেৰ মধ্যে শাল্টি আসিয়া দাঁড়াইল। ব্ৰাহ্ম যুবকগণ সংবাদ পাইয়া খুঁটি প্ৰভৃতি আনিতে গেলৈন। গিয়া দেখৈন, চাৰিদিকেৰ শ্ৰমজীবা লোকেৰ প্ৰতি জমিদাব-বাবুদেব হুকুম গিয়াছে যে, খুঁটি প্ৰভৃতি কেহ বহিয়া দিবে না। তাহাবা অনেক অনুসন্ধান কৰিয়া এবং প্ৰলোভন দেখাইয়াও মুটে মজুৰ পাঠিলৈন না। অবশেষে কালীনাথ দত্ত, হৰনাথ বসু প্ৰভৃতি কাঁধে কৰিয়া খুঁটি প্ৰভৃতি বহিয়া স্কুলেৰ জমিতে লঠিয়া যাইতে লাগিলৈন। গ্রামেৰ লোকে দেখিলৈ আশ্চৰ্য্যান্বিত হইতে লাগিল এবং

চারিদিকে আলোচনা আবস্ত হইল। কিন্তু তাঁহারা খুঁটি প্রভৃতি আনিয়া দেখেন যে, ঘব নিম্মাণেব জগ্ৰ যে-ঘবামিদিগকে ঠিক কবিয়া বাখিয়াছিলেন, তাহাবা জমিদাব-বাবুদেব আদেশে ঘবামিৱ কাজ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। তখন ব্রাহ্ম যুবকগণ কোমব বাধিয়া নিজেবাই ঘবামিৱ কাজ কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপৰদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই কাজে প্রবৃত্ত বহিলেন। তাঁহাবা জাম মাশিয়া, খুঁটি প্রভৃতি পুঁতিয়া বাত্রে ঘবে গেলেন। প্রাতে আসিয়া দেখেন যে তাহাদেব পোতা খুঁটি প্রভৃতি নাই, তৎপৰিবৰ্ত্তে জমিৱ একপাশ্বে একথানি ছোট খড়েব ঘব বাধা বহিয়াছে! দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিকটবৰ্ত্তী পাড়াঘ কাবণ অন্তসন্ধান কবিয়া জানিলেন যে, শুকব মোল্লা নামক জমিদাব-বাবুদেব এক চাকব বাতাবার্তি ঐ ঘব বাধিয়া ভোবে ব্রাহ্ম যুবকদেব খুঁটিগুলি তুলিয়া কাধে কবিয়া লইয়া গিয়াছে। বালিকা-বিদ্ভালয়েব পাণ্ডিত মহাশয় এবং অপব গ্রাম হইতে শ্বশুৰালয়ে-যাওয়া এক যুবক ভোবে উঠিয়া ঐ খুঁটি প্রভৃতি লইয়া যাইতে দেখিয়াছে।

ইহাব পব ব্রাহ্ম যুবকগণ আদালতে শুকব মোল্লাব নামে অভিযোগ উপস্থিত কবিলেন। সেই মামলা মজিলপুব গ্রামের পাচ ছয় ক্রোশ উত্তববৰ্ত্তী বাবিপুৰ গ্রামেব আদালতে হইল। শুনিতে পাওয়া যায়, জমিদাব-বাবুবা ঐ মামলাব জগ্ৰ শুকব মোল্লাব নামে স্কুলেব জমীৱ এক জাল দলীল প্রস্তুত কবাইয়াছিলেন। মামলা উপস্থিত হইলে, তাঁহাবা সে স্থানের সৰ্ব্ব-প্রধান উকীলদিগকে নিযুক্ত কবিয়া মামলা চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে ব্রাহ্ম যুবকগণ কলিকাতাব ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে বলিয়া কতিপয় নবীন ব্রাহ্ম উকীল সংগ্রহ কবিলেন; তন্মিন্ন মামলা দেখিবাব কৌতুহলবশতঃ কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্ম যুবক বাবিপুবে গেলেন। আদালতগৃহে ব্রাহ্ম দৰ্শকের ভিড়েব কথা শুনিয়া জমিদাব-বাবুবা না কি বলিয়াছিলেন, “ও মা! আমরা ভেবেছিলাম গ্রামেব ঐ কয়েকটা ছোঁড়াই বুঝি ব্রাহ্ম; দেশে এত ব্রাহ্ম আছে তা ত জান্তাম না।” যাহা হউক, মামলাব শেষে শুকব মোল্লাৱ

কয়েক মাসের জন্ত কয়েদ হইল। সে কয়েদ হইয়া কলিকাতার নিকটবর্তী আলিপুর সহরের জেলে আসিল। তখন আমি ভবানীপুরে থাকিতাম ; আমার গ্রামবাসী ব্রাহ্ম যুবক হবনাথ বসু মহাশয় কালীঘাটে থাকিতেন। শুকব মোল্লা মনিবেব আদেশে অগ্রায় কাজ কবিয়া কয়েদ হইয়াছে, ইহাব জন্ত হবনাথ বাবু বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি কয়েদখানায় শুকব মোল্লাকে দেখিতে ও তাহার জন্ত খাবার লইয়া যাঠিতে লাগিলেন। যতদূর শ্রবণ হয়, আমি তখনও প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিই নাই, কিন্তু সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাত দত্ত, হবনাথ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্ম যুবকদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা চক্ষে দেখিতে আবন্ত কবিয়াছি। হবনাথ আমাকে শুকব মোল্লাব কয়েদের জন্ত দুঃখিত দেখিয়া, প্রতি ববিবার আলিপুর জেলখানায় গিয়া শুকব মোল্লাকে মিঠাই প্রভৃতি খাওয়াইয়া আসিবার ভাব আমার প্রতি দিলেন, আমি তাহাই কবিতে লাগিলাম। এই জন্ত শুকব মোল্লাব কয়েদের কথা আমার মনে আছে।

স্বয়ং জমিদার বাবুবাও সেই জমি হইতে ব্রাহ্মদিগকে বঞ্চিত কবিবার জন্ত চেষ্টা কবিয়া কৃতকার্য হইলেন না, ইহাতে ব্রাহ্মদের প্রভাব বাড়িয়া গেল। তখন অগ্র প্রকাব নির্যাতন আবন্ত হইল। একজন ব্রাহ্ম যুবক “পাড়াগাঁবে এক দায়, ধর্ম বক্ষাবাক উপায়” নাম দিয়া এক নাটক রচনা কবিলেন ; তাহাতে জমিদারবাবুদিগকে লোক-চক্ষে উপহাসাস্পদ কবিবার চেষ্টা কবা হইল। বিবাদটা আবও পাকিয়া গেল। অবশেষে জমিদার বাবুবা বাড়ীতে বাড়ীতে লোক-পাঠাইয়া বালিকা-বিশ্বালয়ে মেয়ে পাঠাইতে নিষেধ কবিলেন। বলিলেন, “বে মেয়ে পাঠাবে, তাকে এক-ঘবে করব।” আমি যখন প্রতি ববিবার গিয়া আলিপুর জেলে শুকব মোল্লাকে খাওয়াইতেছি, তখন জমিদারবাবুদের শাসনে স্কুলে মেয়ে পাঠান প্রায় বন্ধ হইয়াছে, কেবল আমার পিতামাতার দৃঢ়চিত্ততাব গুণে আমার দুই ভগিনীকে লইয়া পণ্ডিত স্কুল চালাইতেছেন।



স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত

পিতার তেজস্বিতা।—আধকাংশ গৃহস্থই জমিদারবাবুদের নিষেধ শুনিল, শুধু আমার বাবা ও মা শুনিলেন না। তাঁহারা উভয়ে তেজী মাহুষ, অতিশয় সত্যপাষণ গ্রায়পাষণ লোক ছিলেন। বিতাসাগরের প্রিয় লোক, তাঁহারা লোকেব বিবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বিতাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতির অনেক দোষগুণ আমার পিতাতে ছিল। তিনি বলিলেন, “কি! এত বড় আশ্পদ্য কথ্য? আমার ছেলে মেয়ে পড়ার ক না, তাব হকুম আছে দিবে? যদি কাহাবও মেয়ে স্কুলে না যায়, আমার মেয়ে যাবে, দেখি, কে ক কবে।” এই বলিয়া তিনি একমাত্র আমার ভাগনাকে লইয়া স্কুলে গেলেন ও পণ্ডিতকে বলিলেন, “কেবল আমার মেয়ে আসবে ও তুমি আসবে, স্কুল একদিনেব তত্ত্বও বন্ধ কবো না। যদি কব, তাহলে গভর্ণমেন্টেব কাছে পিপোট কবে গভর্ণমেন্ট সাহায্য বন্ধ কবে দেব।” বাস্তবিক কিছুদিন আমার ভগিনীদ্বয় ও পণ্ডিত মহাশয় এই তিন জনকে লইয়া স্কুল চলিল। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মদেব প্রতি অগ্রায় ব্যবহার হওয়াতে বাবা আগ্র-সমান জলিয়া উঠিলেন, এবং ব্রাহ্মদেব পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তখন তিনি বাড়াব লোকেব সমক্ষে ব্রাহ্মদেব প্রশংসা করিতেন। ইহাও আমার ব্রাহ্মসমাজেব দিকে আকৃষ্ট হইবার অগ্রতম কাৰণ।

১৮৬৪ সালের আশ্বিনের ঝড়। জালাসি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ।—এখন নিজের জীবন-বিবরণ আবার বলি। চোখুবা মহাশয়-দিগেব ভবনে অবস্থানকালে ১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসে মহাঝড় ঘটে। সেই ঘটনা স্মৃতিতে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত বহিয়াছে। সেটা পূজাব ছুটির সময়, বোধ হয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠী দিন। অনেকে পূজাব সময় কলিকাতা হইতে বাড়ী ঘাইতেছিল, স্রুতবাং পথে ঝড়ে পাড়িতে হয়। আমার স্বর্গামের একটা যুবকও আমি ছইজনে ঝড়ের পূর্বেদিন শালুতি কবিয়া কাগীঘাট হইতে বাসগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করি। সে দিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ

ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া জোবে বায়ু বহিতে আবস্ত হয় ও বৃষ্টি নামে। সেই বায়ু ও বৃষ্টিতে আমবা কোনও প্রকারে শাল্টিতে বসিয়া বাত্রি কাটাইলাম। শয়নেব স্তম্ভ আব হইল না। পবদিন প্রত্যুষে যখন মেঘেব অন্তবালে উষাব আলোক দেখা দিল, তখন দেখিলাম, আমাদের শাল্টি মগবাহাট নামক স্থানেব উত্তবে জালাসি নামক দ্বাপগ্রামেব কিঞ্চিং উত্তবে, বিশাল ভলা ও ধাতুক্ষেত্রেব মধ্যে, ঋড ও তবঙ্গেব আঘাতে আন্দোলিত হইতেছে। বায়ব বেগ এত অধিক যে সম্মুখদিকে এক পা অগ্রসব হওগা কঠিন। কোনও প্রকারে শাল্টিব চাককদম জালাসি গ্রামেব বাজাবেব ধাবে গিয়া শাল্টি লাগাইল। আমবা, লায়াইবা তীবে উঠিলাম এবং একটা দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, আমাদের ত্রাষ আবও কয়েকজন শাল্টিব যাত্রী নানাস্থান হইতে আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইবাছে। তখনও কাহাবও মনে হয় নাই যে ঋড আবলাষ ভাষণ সাইক্লোনেব আকাব ধারণ করিবে। সকলে পবামর্শ হইতে লাগিল যে, সকলে মিলিয়া খিচুড়ী বাধিয়া খাওয়া যাক। যাত্রীদের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ এই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন দুইজনেব জগ্ৰ বাধাও যা, দশজনেব জগ্ৰ বাধাও তা। আমবা কৃতজ্ঞচিত্ত সেই দ্যৈর্ঘ্যাগেব মনে খিচুড়ী খাইতে পাইব বলিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলাম। কিন্তু দেবতা আব-এব প্রকাব বন্দোবস্ত করিলেন।

ভাষণ সাইক্লোন। একজন পথিকেব অদম্য ভাসি ও গান।—
খিচুড়ীব পবামর্শ শেষ হইতে না হইতে, দোকানদাবেব সহিত চাউল দাউলেব মূল্য নিদ্ধারণ হইতে না হইতে, হুঁ হুঁ করিয়া সাইক্লোনেব বায়ু ডাকিয়া আসিল। আমাদের চক্ষেব সমক্ষে কয়েকখানি চালাঘব পড়িয়া গেল। অবশেষে যে দোকানে আমবা বসিয়া ছিলাম, সে ঘব কাঁপিতে লাগিল। আমবা বিপদ গণনা করিয়া কোমব বাঁধিতে লাগিলাম। তখনও দেখি যাত্রীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তুড়ি দিয়া মন-আনন্দে

“বৃন্দাবন-বিলাসিনী বাই আমাদের” ইত্যাদি কীর্তনটা গাইতেছেন। তাহাকে বলা গেল, “মশাই, গান বাখুন, কোমর বাঁধুন ; এ ঘর যে পড়ে।” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “বেখে দেও ঘর পড়া, গাইতে বড় ভাল লাগছে ; শোন শোন কীর্তনটা শোন।” আব শোন। চড়্‌চড়্‌ কবিতা ঘর হেলিতে লাগিল, আমবা দোড়িয়া বাহিবে গেলাম, সে ভদ্রলোকটা চাপা পড়িলেন। যেই ঘরের বাহির হওয়া, অমনি আমাদেরকে ঝড়ে উড়াইয়া কোথায় লইয়া গেল ! সোভাগ্যক্রমে আমার স্বগ্রামবাসী সেই যুবক বন্ধুটীর সহিত আমি হাতে হাত বাঁধিয়াছিলাম ; আমাদের দুইজনকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারিল না। একথানা দোকানঘর পড়িয়া গিয়া তাহার ছথানা চাল মাটাতে পড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমবা দুজনে গিয়া তাহার উপরে পাড়লাম। পড়িয়া ভাঙ্গা ঘরের খুঁটি ধরিয়া ঝড় ভোগ করিতে ও খব খব করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখি, সেই কীর্তনকাবী ভদ্রলোকটি পূর্ব্বেকার দোকানঘরের চাল ফুঁড়িয়া উপরে উঠিতেছেন। আমাদেরকে অদূরে দেখিয়াই তিনি হাসিতে লাগিলেন, এবং অতি কষ্টে আমাদের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, “বড় পিতৃপুণ্যে বেঁচে গেছি। আপনারা বোধ হয় ভাবছিলেন মারা পড়েছি। আবও কিছুদিন কর্ম্মভোগ বাকি আছে কি না, এখন কেন যাব ?” বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তাঁর সেই হাসি আমার আজও মনে আছে। কতবার ভাবিয়াছি, এরূপ স্নেহে হৃৎপ্রসন্ন চিত্ত পাওয়া বড় সোভাগ্যের বিষয়। কতকগুলি মানুষ এরূপ আছে, বাহ্যিকের কিছুতেই বিষন্ন করিতে পারে না। ইহাদের অবস্থা স্পৃহণীয়।

কিয়ৎকাল তিনজনে ঝড় ভোগ করিয়া পরামর্শ করা গেল যে, অদূরে রাণী বাসমণির কাছারি বাড়ী দেখা যাইতেছে,—সে গ্রামটা তাঁরই জমিদারী,—সেই কাছারিতে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। তিনজনে হাত-ধরাধরি করিয়া বাহির হইলাম। কাছারিবাড়ীর নিকটস্থ হইতে

না হইতে সমগ্র বাড়ী ভূমিসাৎ হইল। চারিদিকের প্রাচীর পর্য্যন্ত ধরাশায়ী হইয়া সমভূম হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ। ব্রাহ্মণযুবকের বীরত্ব ও মহত্ত্ব।—তখন বাত্যাঘ প্রকোপ হৃদ্যন্ত দৈত্যেব বিক্রমের আয় হইয়াছে। গ্রামের প্রায় একখানিও গৃহ দণ্ডায়মান নাই, সমুদয় সমভূম হইয়াছে। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অদূরে একখানি গৃহ তখনও দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইল। স্থিতি কবা গেল যে, সেখানে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। গিয়া দেখি সেট গ্রামের স্ত্রীলোক বালকবালিকাতে মে ঘব পরিপূর্ণ। ঘরখানি নূতন ছিল বলিয়া তখনও দণ্ডায়মান আছে। সেট গৃহস্বামী অতি বৃদ্ধ। তাহার যুগ্ম পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতাকে তাড়াতাড়ি খাওয়াইয়া, ঘরের ভিতরে পুরিয়া, বীরেব আয় কোমর বাঁধিয়াছে, এবং সেই ঝড়ে ছুটোছুটি করিয়া চারিদিকের স্ত্রীলোক বালকবালিকা সংগ্রহ করিয়া সেই ঘবে পুরিতেছে। আমরা ঘরের নিকটে পৌছিয়া দৌঁধ স্ত্রীলোকে ঘর পরিপূর্ণ। আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোকটি ঠেলিয়া ঘবে ঢুকিয়া পড়িলেন; আমাদের দুই বন্ধুর কিরূপ সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। আমরা দ্বার হইতে ফিরিয়া পার্শ্বের দাবাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তৎক্ষণাৎ সে দাবার চালটী আমাদের মাথাব উপরে পড়িয়া গেল। তখন আমরা ভাবিলাম যে, এক্ষণে ঘরচাপা পড়িয়া মবা অপেক্ষা বাহিরের উঠানে বসিয়া ঝড় খাওয়া ভাল। এই ভাবিয়া বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় গৃহের ভিতর হইতে এক বৃদ্ধা রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “বাবা! তোমরা কোথায় যাও, এত লোকের যদি জারগা হয়ে থাকে, তোমাদের দুজনেরও হবে।” তখন আমরা বাধ্য হইয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোক বালকবালিকার ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, সেখানে না ঢুকিলেই ভাল ছিল। ক্রমে বেলা অবসান হইল। অপরাহ্ন চারিটার পর ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। গ্রামস্থ বাহারা

সেই গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা “বাবা বে, মা রে” করিতে করিতে স্বায় স্বীয় ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করিল। আমাদের শাল্‌তির চালক দুইজন আমাদের বিছানা ও কিছু কিছু জিনিস পত্র মাথায় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, শাল্‌তি খাল হইতে লইয়া এক পুকুরের ধাবে বাঁধিয়া বাঁধিয়াছিল, দড়ি ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। তখন আর উদ্ধাব কবিবাব সময় নাই; সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়। তাহাদিগকে সেই ভাঙ্গা দাবাতে কোনও প্রকারে রাত্রিযাপন করিতে বলিয়া আমবা সেই দবিদ্র ব্রাহ্মণের ভাঙ্গা ঘরে রাত্রিযাপন কবিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। তাহারা পোদ নামক হীনজাতীয় লোকের ব্রাহ্মণ।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। সেই গৃহের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বীৰপ্রকৃতি-সম্পন্ন যুবক পুত্র সমস্ত দিনেব অনাহাব ও গুরুতব শ্রমের পব ক্লান্ত হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল। পিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া অনুৰোধ করিতে লাগিল, “ওরে, তুই মুখ হাত ধুয়ে ওই চোকীর নীচে তোর ভাত আছে, খা।” তখন আমবা সেই ঘবে নয়জন; আমরা বিদেশীয় পাঁচজন, ও বুড়োবুড়ী যুবক পুত্র ও গর্ভিণী পুত্রবধু এই চারিজন। পিতামাতার অনুৰোধ ও ব্যগ্রতা দেখিয়া যুবকটি বলিল, “বাবু! সমস্ত দিন অনাহাবে আছেন; গুঁরা ঘরে বসে থাকবেন, আর আমি খাব, তা কি হয়?” কোনওরূপেই সে খাইবে না। ইহাতে আমরা বাহিরের লোক চটিয়া উঠিলাম; বলিলাম, “সে কি কথা! এই বিপদে কি কেউ আতিথ্য করতে পারে? তুমি সমস্ত দিন ছুটাছুটি করেছ, তুমি ঐ ভাত খাও, কিছুই অগ্রাণ হবে না।” সে তাহা শুনিয়া না, বসিয়া রহিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা, তোমাদের ঘরে আমাদের খাবার মত কিছু আছে কি না?” যুবক বলিল, “চাউল আছে, তাহা ভিজ গিয়েছে।” উত্তর, “আচ্ছা, ভিজা চাউল আমাদেরকে

দাও।” সেই ভিজা চাউল লইয়া আমি সকলকে দিলাম ; বলিলাম, “ভাল লাগুক না-লাগুক আপনাবা খান, তা না হলে ও-ব্যক্তি খাবে না।” আমবা ভিজা চাউল খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। হঠাৎ মনে হইল, শাল্ভিতে একহাঁড়ি মাষকলাই বাড়ীর জন্ত লইয়া যাইতেছিলাম, সমস্ত দিন ভিজিয়া তাহাতে কল বাহিব হইয়াছে। আমি সেই ভিজা কলাই আনিয়া সকলকে চাউলের সঙ্গে খাইতে দিলাম। আমাদের আহাৰটা বড় মন্দ হইল না। তৎপবে শয়নেব ব্যাপাব। সেই দৰিদ্ৰ ব্রাহ্মণেব ঘবে যতগুলি লেপ কাঁথা মাড়ব ছিল, সমুদয় সমাগত কম্পান্বিত বালক-বালিকাদিগকে চাপা দিবাৰ জন্ত দিয়াছিল, তাহাতে সে সমুদয় ভিজিয়া গিয়াছে ; কেবল দুইটা সে ত্লা মাড়ব তখনও শুকনো আছে। গৃহস্থামীর পুত্র প্রস্তাব কবিল যে, তাহাব একটীতে তাহাবা সপৰিবাৰে শয়ন কৰিবে, আব-একটীতে আমবা পাঁচজনে শয়ন কৰিব। আমাব সঙ্গেব লোকেবা তাহাতে সন্মত হইয়া আদৰেব সহিত মাড়বটী লইলেন ; তাহা লইয়া তাহাদেব সঙ্গে আমাব ঝগড়া হইল। আমি বলিতে লাগিলাম, “ছি ছি ! ও মাড়ব নেবেন না, ওবা মাড়বে শুক।” এই প্রস্তাবে সঙ্গেব পথিকেবা হাসিতে লাগিলেন, “আমবা পাঁচজনে এক মাড়বে শুই, ওবা চাবজনে আব-এক মাড়বে শুক। এ বিপদে আব ভদ্ৰতা কববাৰ সম্ভব নাই।” এই কথাতে আমি বাগ কবিয়া মাড়বেব বাহিবে কাদাতে শুইয়া অগাধ নিদ্রা দিলাম।

পৰদিন প্রাতে যখন চক্ষু খুলিলাম, তখন দেখি বেশ বোদ উঠিয়াছে। আমার অগ্রেই আব সকলে জাগিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন কৰিতেছিলেন। আমি বাহিবে গিয়া দেখি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাব যুবক পুত্রটি আমাদের শাল্ভিৰ চালকদ্বয়েব সঙ্গে পুকুবে ডুবিয়া ডুবিয়া শাল্ভিধানি তুলিবাৰ চেষ্টা কৰিতেছে। দেখিয়া তাহাকে ওপ্রকাৰ জলে ডুবিতে বাধণ কবলাম, কিন্তু সে সে-কথার প্রতি কর্ণপাত কৰিল না। ক্ৰমে তিনজনে শাল্ভিধানি

তালল। চালকদ্বয় তাহাব জল ছেঁচিয়া পবিত্রাব কবিত্তে প্রবৃত্ত হইল, ব্রাহ্মণস্বৰূপ কুলীৰ ত্রায় মাথায় কবিত্তা আমাদেব জিনিসপত্র বহন কবিত্তে প্রবৃত্ত হইল। আমি চাহিয়া দেখি যে, সেই সময়ে পথে পতিত একটা ভগ্ন বৈদ্যুতাব চাকের উপবে পা দেওয়ায় তাহাব পায়ে অনেকগুলি বোলতা কামডাউয়াছে, তাহাব পা ফুলিয়া উঠিতেছে, তবু সে সেই কাজ কবিত্তেছে। তাহা দোখিয়া তাহাব প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতাৰ উদয় হইল, তাহা আব ভাষায় বর্ণন কবিবার নহে।

আমি ব্রাহ্মণ তনয়কে পবে অর্থসাহায্য করিয়াছিলাম, এবং পবে যখনই শার্ণগ কবিত্তা বাড়ী যাউতাম, সেট গ্রামে উঠিয়া তাহাদিগকে অব্বেষণ কবিত্তা কিছু কিছু অর্থসাহায্য কবিত্তা যাইতাম। সে গ্রামটা যেন আমার গীৰ্ণস্থানেব ত্রায় হইয়াছিল। কয়েক বৎসৰ পবে একবাব গিয়া আব তাহাদেব উদ্দেশ্য পাউলাম না।

উড়ো সাহেব ও চটি জুতা।—সাল ও তাবিধ মনে নাই, ভবানী-পুৰ চৌধুরী মহাশয়দিগেব আশ্রয়ে বাসেব কালে, একবাব আমাব পিতাঠাকুর মহাশয় একখানি সব্কাবি কাগজ আমাব নিকট পাঠাইয়া আদেশ কবিলেন, তাহা আমাকে স্বয়ং গিয়া স্কুলসমূহেব ইন্স্পেক্টেব উড়ো সাহেবেব হাতে দিতে হইবে। তদনুসাবে একদিন কলেজে যাইবাব পথে আমি উড়ো সাহেবেব আপীসে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাব আপীস-গৃহে প্রবেশ কবিত্তা তাঁহাব জ্ঞাত অপেক্ষা কবিত্তে লাগিলাম। সাহেব তখন পাশেব ঘৰে আহাবে বসিয়াছিলেন, কিন্তুক্ষণ পরেই উপস্থিত হইলেন। আমি অভিবাদন কবিত্তা তাঁহাব হস্তে কাগজখানি দিলাম। তিনি কাগজখানি লইতে চাহিলেন না; বলিলেন, “তুমি আপীসঘরেব বাহিৰে জুতা খুলিয়া এস নাই কেন?”

আমি। এ ঘরে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খুলিতে হয় এ নিয়ম যে আছে, তা তো জানিতাম না; তাহা হইলে এ ঘরে প্রবেশ করিতাম না।

ব্যাপাবধানা এই। তখন আমার এমনি দাবিদ্রা ও ছববস্থা যে, আমাকে চটি জুতাई সৰ্ব্বদা পৰিতে হইত ; বুট জুতা পৰা ভাগ্যে ঘটত না। স্নতবাং সেদিন চটি জুতা পায়ে দিয়াই কলেজে যাইবাব পথে সাহেবের আপীসে গিবাছিলাম। তাহা দেখিয়াই সাহেব চটিবাছিলেন।

উড়ো সাহেব। তুমি জুতা পৰিয়া এ ঘবে প্রবেশ কৰিয়া আমাকে অপমান কৰিয়াছ। তুমি জুতা খুলিয়া এস।

আমি। না সাহেব, আমি জুতা খুলিব না। আমি কিৰূপে আপনাব অপমান কৰিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাব পায়ে জুতা বহিযাছে, আপনাব কেবানী বাবুৰ পায়ে জুতা দেখিতেছি। আপনাবা যদি খেলেন তবে আমি খুলিতে পারি।

উড়ো সাহেব। ও যে বুট জুতা।

আমি। বুট জুতা পায়ে দিয়ে এবে আপনাব মান থাকিত, আব চটি জুতা পায়ে দিবা আসাতে আপনাব মান গেল, এ নূতন কথা, ইহা আমি কিৰূপে বুঝি ?

উড়ো সাহেব। হাঁ, আমার আপাসেব এ নিয়ম আছে, তাহা তুমি কি জান না ?

আমি। না সাহেব। আমার জন্মে এমন নিয়ম শুনি নাই।

উড়ো সাহেব। তুমি জুতা খুলিবে কি না, বল।

আমি। না সাহেব, খুলিব না।

উড়ো সাহেব। তবে তোমাব চিঠি নেব না।

আমি। এই কাগজ আপনাব ডেস্কেৰ উপব বৈল। ও আপনাদেবই কাগজ ; নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কাজ আমি কবে গেলাম।

এই বলিয়া ডেস্কেৰ উপব কাগজ বাখিয়া আমি 'যাইতে উত্তত। সাহেব বলিলেন, "শোন শোন, দাঁড়াও।" আমি দাঁড়াইলাম।

সাহেব। রাজা রাধাকান্ত দেব অত্যন্ত পীড়িত, তুমি কি শুনেছ ?
আমি। হাঁ সাহেব, শুনেছি।

সাহেব। আমার গাড়ি জোতা হচ্ছে, আমি এখনই তাঁকে দেখতে
যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

আমি। না সাহেব, আমাকে কলেজে যেতে হবে ; বেলা হয়ে
যাচ্ছে।

সাহেব। আচ্ছা, যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও, তাঁর ঘরে প্রবেশ
করবার সময় জুতা খুলবে কি না ?

আমি সেখানে জুতা খুলিবার কাৰণ বলিতে যাইতেছি, সাহেব
বাধা দিয়া বলিলেন, “ ‘হাঁ’ কি ‘না’ বল ; আমি আর কিছু শুন্তে
চাই না”।

আমি। হাঁ সাহেব, সেখানে খুলব।

সাহেব। তবে আমার এখানে খুলবে না কেন ?

আমি। আপনি কারণ শুনবেন না, তবে আমি কি করব ?

কারণটা শুনিলে বলিতাম যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বৈঠকখানাতে
জাজিম পাতা থাকে ; সকলেই জুতা খুলিয়া প্রবেশ করে ; সুতরাং
আমাকেও এইভাবে প্রবেশ করিতে হইত। কিন্তু সাহেব যখন আমার
কথাতে কাণ দিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া মোনাবলদ্বন করিলাম, এবং
তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ঘরের বাহির হইলাম। সাহেব আবার
ডাকিলেন, “ছাকুবা, শোন শোন।” আমি আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

সাহেব। তুমি একটা কথা শুনেছ, ‘নিজের মান যদি চাও অপরের
মান আগে রাখ’ ?

আমি। সাহেব, ও খুব ভাল কথা ; আমি অনেক দিন শুনেছি।

এই বলিয়া আবার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া স্বরিত পদে গৃহ হইতে
বাহির হইয়া কলেজের দিকে ছুটিলাম।

বড়মামা বৈকালে আমাকে ডাকাইয়া সমুদয় কথা শুনিলেন। বলিলেন, উড়ো সাহেব যে তোমাকে জুতা খুলাইতে পাবেন নাই ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার ভাগিনাব মত কাজ করিয়াছ। তৎপবে তিনি সোমপ্রকাশের জন্ত ইহাব একটি বিবরণ লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি “উড়ো সাহেব ও চটি জুতা” হেডিং দিয়া ইহাব একটি বিবরণ লিখিয়া দিলাম। পববর্তী সোমবাবে “ফলনা সাহেব ও চটি জুতা” হেডিং দিয়া বড়মামা সেটী বাহিব করিলেন, এবং বেচাবি উড়ো সাহেবেব উদ্দেশে অনেক উত্তম মধ্যম তিবন্ধাবের ব্যবস্থা করিলেন। পবে শুনিতে পাইলাম, উড়ো সাহেব তাতা পাঠ করিয়া আমার প্রতি গাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন, এবং আপীসেব বাবুদিগকে বলিলেন, ‘এই ছেলে কলেজ থেকে বাহিব হইয়া যদি কর্মপ্রার্থী হয় আমাকে জানাইও’। আমি উড়ো সাহেবেব ত্রায় সদাশয় পুরুষেব বিষয়নে পড়িয়া গেলাম ভাবিয়া বড় হৃৎক হইল। তিনি অতি সদাশয় মানুস ছিলেন বলিয়া এ ঘটনা তাঁব মনে বহিল না; কাবণ পববর্তী সময়ে আমি নখন ভবানীপুবেব সাউথ স্কবার্কেন স্কুল হইতে তেয়াব স্কুলে আসি, তখন তিনিই উক্তোগী হইয়া আমাকে আনিয়াছিলেন। তখন তাঁহাব কর্মচাবীবা তাঁহাব আদেশ-মত পূর্বেব কথা তাঁহাব নিকট ব্যক্ত কবেন নাই; কবিলে কি দাঁড়াইত জানি না। উড়ো সাহেব যেকপ-সদাশয় পুরুষ ছিলেন, এবং আমার ভবানীপুব সাউথ স্কবার্কেন স্কুলেব কাজে যেকপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে সবিশেষ বিবরণ জানিলেও কিছু কবিতেন না এইরূপ মনে হয়। আমার মাতুল মহাশয় সোমপ্রকাশে আকোলন করিয়াছিলেন বলিয়াই কথাটা আমার মনে বহিয়াছে।

কবিতা-লেখা-সূত্রে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা।—মধ্যে মধ্যে আমি সোমপ্রকাশে ও এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতাম। লোকে পড়িয়া প্রশংসা কবিত। তাহাতে কবিতা

লিখিতে উৎসাহিত হইতাম। কবিতা-লেখা-মুদ্রে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সহিত আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রফেসরী করিতেন, এবং এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ও সুস্বাপাননিবারিণী সভার সভাপতি ছিলেন। আমি তাঁর কাগজে প্রথমে কয়েকটা ছোট ছোট কবিতা মুদ্রিত করি। তাহাতে তিনি প্রীত হন; এবং আমাকে লিখিতে উৎসাহিত করেন।

বিলাত ফেরত ডাক্তারকে লইয়া কবিতামুদ্র।—ইহার পরে এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার কবিত্বশক্তিকে আর-একদিকে লইয়া গেল। আমাদের ভবানাপুর্বে একজন বিলাত-ফেরত ডাক্তার আসিয়া বসিলেন, তাঁহাব হাব-ভাব চাল-চলন সবটাই ইংরাজী ধরণের। তিনি নিজের দ্বারে এক সাইনবোর্ড দিলেন, তাহাতে “ডট্” বলিয়া নিজের উপাধি লিখিলেন। এই লইয়া আমাদের যুবকদলে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অমনি আমি বাঙ্গালীর সাহেবিয়ানার উপর বিজ্ঞপ বর্ষণের জন্ত বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী সাজিয়া “এস্ এন্ড ডট্” নাম লইয়া এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতে লাগিলাম; বাঙ্গালীর প্রিয় যাহা তাহার উপরে বিজ্ঞপ-বর্ষণ করিতে লাগিলাম, এবং ইংবাজী যাহা-কিছু তাহাব উপর আদর দেখাইতে লাগিলাম। স্বদেশীভাবাপন্ন হইয়া আর একজন কবিতাতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। সপ্তাহেব পর সপ্তাহ এই কবিতা-যুদ্ধ চলিতে লাগিল, চারিদিকে একটা চর্চ্চা উঠিয়া গেল। আমার কবিতাতে কাহারও বুদ্ধিতে বাকি থাকিল না যে, আমিও স্বদেশীভাবাপন্ন, কেবল সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞপ করিবার জন্ত লেখনী ধারণ করিয়াছি। ঐ-সকল কবিতার দুই এক ছত্র মনে আছে। তাহা দেখিলে সকলে হাসিবেন। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি বিভাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা করিতে আমি বঙ্গভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

বিজ্ঞান সাগর তব মূৰ্খের প্রধান,
টিকিদাব ভট্টাচার্য্য, নাহি কোন জ্ঞান ।

ইংবাজ মেয়েদেব প্রশংসা কবিতা লিখিলাম—

ধনলাকী তাম্রকেশী বিড়াল লোচনা,
বিবাহ কবির স্মৃতি ইংবাজ-ললনা ।

এই স্তব্ধে প্যাবীবাবুব নিকট আমাব একটা পসাব দাঁড়াইল । তাহাব একটা ফল মনে আছে । উহা বোধ হয় উহাব কিছু দিন পবে ঘটনা থাকিবে । একবাব আমাব বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চটগামবাসা প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্ততম ছাত্র নবীনচন্দ্র সেনেব লিখিত একটা কবিতা আনিয়া আমাকে দেখাইলেন । কবিতাটা পড়িয়া আমাব বড় ভাল লাগিল । আমি উমেশেব সঙ্গে নবীনবাবুব বাসাতে গিয়া তাহাব সহিত দেখা কবিলাম, এবং সেই কবিতাটা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ কবিবাব জন্ত উৎসাহিত ববিলাম । আমাব অন্তবোধে তিনি কবিতাটি আমাব হাতে দিলেন । আমি কাটিয়া কুটিয়া তাহাতে নিজে কিছু যোগ কবিসা প্যাবীবাবুব হাতে দিয়া আসিলাম । তিনি তাহা এডুকেশন গেজেটে ছাপিলেন এবং নবীনকে ডাকিয়া উৎসাহিত কবিলেন । পবে নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়েব কবিতা-গ্রন্থ বৃদ্ধিত হইলে পড়িয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সেই কবিতাটি আছে, এবং, যতদূৰ মনে হয়, আমাব পক্ষিপ্ত দুই চাবি পংক্তি এখনও বহিয়াছে । আমাব এখন স্মরণ কবিসা হাসি পায়, আমি সেই অল্পবয়সে কাব্য-জগতে কিকপ মুকবির হইয়া উঠিয়াছিলাম ।

প্যাবীবাবুব সন্মানেব সংশ্রবে আসার ফল ; স্মরণানে বিবেচ্য ।—প্যাবীবাবুব সংশ্রবে আসিয়া আমাব আব-এক উপকাৰ হইল । স্মরণানেব উপব আমাব দাক্ষণ বিবেচ্য জন্মিল । তাহাব একটা প্রমাণ আমাব মনে আছে । আমি অগ্রেই বলিয়াছি, ভবানীপুৰে যে

চৌধুবা মহাশয়দিগেব আশ্রয়ে আমি থাকিতাম, তাঁহাবা সকলেই সাধু সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহাদেব বিমল চবিত্বেব প্রভাব আমাকে অনেক পৰিমাণে গঠন কৰিয়াছে। তাঁহাদেব একজন অসম্পৰ্কীয় লোক ছিলেন, তিনি মধ্যো মধ্যো আসিয়া আমাদেব সঙ্গে দুই চাৰি দিন যাপন কৰিতেন। তিনি একটা সওদাগৰ আপীসে একটা বড় পদে প্ৰতিষ্ঠিত ছিলেন; অনেক টাকা উপাৰ্জন কৰিতেন এবং দুই হস্তে ব্যৱ কৰিতেন। বন্ধুক ছোড়া, শিকাব কৰা, সদলে নৌকাযোগে জলপথে বিচৰণ কৰা, প্ৰভৃতি আমোদে অনেক টাকা ব্যয় কৰিতেন। এই-সব কাৰণে তিনি আমাব জায় যুবকদেব চক্ষে একটা “হিবো”ৰ মত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাব একটু দোষ ছিল, তিনি স্নৰাপান কৰিতেন। একবাৰ অপৰাপৰ কয়েক ব্যক্তিৰ সহিত তাঁহাব সঙ্গে গজাব চড়াতে কয়েক দিন বাস কৰিতে গিয়াছিলাম। প্ৰাতদিন পাখা শিকাবেব সময় সঙ্গে বাইতাম, কিন্তু তাহাকে কখনও মাতাল অবস্থাতে দেখে নাই। বাহা হটক, তিনি আমাদিগকে সৰ্বদাই স্নৰাপান কৰিবাব জন্তু প্ৰয়োচনা কৰিতেন; বলিতেন, পৰিমিত স্নৰাপান কৰিলে শবাব ভাল থাকে, মনে স্মৃতি থাকে, কাজেব শক্তি বাড়ে, ইত্যাদি। আমাব যেন শ্রবণ হয় যে, তাঁহাব প্ৰবোচনায় একদিন কি দুই দিন একটু একটু স্নৰাপান কৰিয়াছিলাম। কিন্তু কি আশ্চৰ্য্য জগদীশ্বৰেব কৃপা! তৎপৰেই মনে মহা নিৰ্বেদ উপস্থিত হইল। প্যাবৌচৰণ সবকাৰ মহাশয়কে, মাতুল মহাশয়কে ও পিতাঠাকুৰকে শ্রবণ কৰিয়া মহা লাজ্জিত হইলাম, এবং স্নৰাপান নিবাবণেব জন্তু দুৰ্জয় প্ৰতিজ্ঞায় দৃঢ় হইলাম। তদবধি আমি স্নৰাপান নিবাবণেব পক্ষে বহিয়াছি।

“নির্বাসিতের বিলাপ” রচনা।—যহেশচন্দ্ৰ চৌধুবা মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিতে থাকিতে ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ সালে ভবানীপুৰেব একটী ভদ্রসন্তান কোনও গুরুতৰ অপরাধে দীপান্তৰে প্ৰেৰিত হয়। সেই ঘটনাতে

ভবানীপুরের লোকের চিত্তকে অতিশয় আন্দোলিত করে, আমারও চিত্তকে অতিশয় আন্দোলিত করে। সেইপ্রকার মনের ভাব লইয়া কবিতা লিখিতে বসি। কবিতাটি মাতুলের সংবাদপত্র সোমপ্রকাশে “নির্বাসিতের বিলাপ” নামে প্রকাশিত হয়।

মাতুলের হস্তে যখন ‘নির্বাসিতের বিলাপ’র প্রথম কয়েক পংক্তি সোমপ্রকাশে মুদ্রিত করিবার জন্ত দিয়া আসিলাম, তখন ভয়ে ভয়েই দিয়া আসিলাম। মনে হইল তিনি ডাকিয়া তিরস্কার করিবেন। মনে করিয়াছিলাম, দুই একবার লিখিয়া সমাপ্ত করিব। কিন্তু প্রথমবার কয়েক পংক্তি বাহির হইলে, তিনি কলেজে আমাকে ডাকিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং আরও কবিতা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অতিশয় উৎসাহিত হইয়া গেলাম। অমনি আরও লিখিতে বসিলাম। এইরূপ সপ্তাহের পব সপ্তাহ সোমপ্রকাশে কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। কয়েকবার প্রকাশিত হইতে না হইতে চারিদিকে সমালোচনা উঠিয়া গেল। পথে ঘাটে, ভাড়াটে গাড়িতে লোকে বলিতে লাগিল, “এ ‘শ্রীশিঃ’ কে হে?” আমার লাজুল ক্ষীত হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের মনে মনে মন্ত একটা কবি হইয়া দাঁড়াইলাম। বাস্তবিক তখন আমার কবিতার মধ্যে একটু নূতনত্ব ছিল। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঁধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না, কিন্তু দুইয়ের মধ্যস্থলে বাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের বশবর্তী করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই জন্ত ইহা তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব।—আমি যখন কবিতারসে নিমগ্ন আছি, তখন এক পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটিল। কোনও বিশেষ কারণে আমার পিতা আমার পত্নী প্রসন্নময়ীর ও তাঁর বাড়ীর লোকের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, তাঁহাকে



গীষ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আব আনিবেন না। তাঁহাকে একেবারে বর্জন করা যখন স্থির হইল, তখন এই প্রশ্ন উঠিল যে আমি ত একমাত্র পুত্রসন্তান, বংশরক্ষার উপায় কি হইবে? অতএব আমার পুনরায় বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। আমার একপ বয়স হইয়াছিল যে বহুবিবাহকে মন্দ বলিয়া জানি। প্রসন্নময়ীর প্রতি তখন আমাব যে বড় ভালবাসা ছিল, তাহা নহে। তবে তাঁহাব ও তাঁহাব বাড়ীর লোকেব সামান্য অপবাধে তাঁহাকে গুরুতর সাজা দেওয়া হইতেছে, ইহা অসুভব কবিয়াছিলাম। আমি কিরূপে এইরূপ কঠিন ব্যবহাবে সহায়তা কবি, ইহা ভাবিয়া মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু বাল্যাবধি পিতাকে একপ ভয় কবিতাম যে, তাঁহার ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া আমাব সাধ্যাতীত ছিল। তথাপি আমি নিজের ও জননীর দ্বাৰা তাঁহাকে জানিতে দিয়াছিলাম যে একপ বিবাহে আমার মত নাই।

দ্বিতীয়বার বিবাহ।—বাবা আমাকে বিবাহ দিতে লইয়া যাইবার জন্ত আমাকে লইতে ভবানাপুবে মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে আসিলেন, এবং আমাকে লইয়া গেলেন। পথে আমাকে আমার দ্বিতীয়বার বিবাহেব প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন। আমি তাঁহাকে বড় ভয় কবিতাম; তাঁহার মুখের উপর কিছু বলিতে পারিতেছি না, সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি; অবশেষে আমাদের গ্রামের দুই ক্রোশ উত্তরবর্তী বারাসত গ্রামে যাইবার সময় আমি বাবাকে বলিলাম, “বাবা, আপনি মনে করিতেছেন, আমার স্ত্রীকে বদায় করিয়া দিয়া আমার স্বত্তরবাড়ীর লোকদিগকে সাজা দিবেন; কিন্তু কলে এ সাজা আমাদিগকেই পেতে হবে। আমার বোধ হয় একপ কাজ না করাই ভাল।” যেই এই কথা বলা, অমনি বাবা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের পায়ের জুতা হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন, “তুই এখান হতে দ্বিগ্নে যা; আর এক পা তুলেছিস্ কি এই জুতা মারবো।” আমি বলিলাম,

“চলুন, বাড়ীতে গিয়ে মার সামনে কথা হবে। আমার বক্তব্য যা, তা আমি বললাম; তারপব কবা না কবা আপনার হাত।” তারপব হুজনে বাড়ীতে যাওয়া গেল। আমি গিয়া মাকে বলিলাম, “মা, এ কি হচ্ছে? আমার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের উপর রাগ কবে এ কি কবা হচ্ছে?” মা বলিলেন, “জানিস ত, আমার কাঁধেব উপর একটা বৈ মাথা নাই; আমি বাধা দিয়ে রাখতে পারব না, যা জানে করুক।” বাবা আমাদের আপত্তিও প্রতি দৃকপাতও করিলেন না। আমাকে ধবিয়া বিবাহ দিতে লইয়া গেলেন। এই দ্বিতীয় বিবাহ বর্ধমান জেলাব দেপুং নামক গ্রামেব অভয়াচরণ চক্রবর্তীর ছোট্টা কন্যা বিবাজমোহিনীর সহিত হইল। বিবাহটা ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ কোন সালে হইয়াছিল, ঠিক মনে নাই।

দারুণ অমুতাপ ও ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া।—এই বিবাহের পরেই আমার মনে দারুণ অমুতাপ উপস্থিত হইল। একটা নিবপরাধা স্ত্রীলোককে অত্যায়াসে গুরুতর সাজা দেওয়া হইল, এবং আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই অত্যায়াস কায়েব প্রধান পুরুষ হইলাম, ইহা ভাবিয়া লজ্জা ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পিতার আদেশে বিবাহ করিতে যাইবার পূর্বে আমি এই ভাবিয়া মনকে প্রস্তুত করিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ চতুদশ বর্ষ বনবাস করিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন, আমি না হয় পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া চিরকাল কষ্ট পাইব। কিন্তু এই অমুতাপের মুহূর্ত্তে সে চিন্তা আব আমাকে বল দিতে পারিল না। আমি মনে করিতে লাগিলাম, মানুষ আপনার কাজের জন্ত আপনাই দায়ী, হাজার গুরুব আদেশ হইলেও পাপের অংশ কেহ লয় না। আত্মনিন্দাতে আমার মন অধীর হইয়া উঠিল। সে তীব্র আত্মনিন্দার কথা মনে হইলেও এখন শবীর কম্পিত হয়। আমি আমুদে উপহাস-রসিক স্বভাবপ্রিয় মানুষ ছিলাম,

আমার হাস্ত-পরিহাস কোথায় উবিয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন হইলাম। পা ফেলিবার সময় মনে হইত যেন কোনও নীচেব গর্তে পা ফেলিতে যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আব প্রভাত না হইলে ভাল হয়।

এই অবস্থাতে আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাস কখনও কবি নাই। আমার শ্রবণ আছে, এই সময়ে আমার পিতা ফ্রামার নিকট অনেক সময় সংস্কৃত নাস্তিক দর্শনের বাঁতি অবলম্বনে নাস্তিকতা প্রচাব করিতেন। বলিতেন, বিজ্ঞানগব মহাশয় আন্তিক নহেন, ইত্যাদি। ইহা লইয়া পিতা-মাতাতে কখনও কখনও ঝগড়া হইয়াছে দেখিয়াছি। বাবাব সঙ্গে একরূপ বিচাবে প্রবৃত্ত আছি দেখিলে, মা বাবার প্রতি রাগ করিয়া আসিয়া আমাব হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেন। বলিতেন, “রাখ রাখ, তোমাব নাস্তিক দর্শন রাখ, ছেলেব মাথা খেও না।” কিন্তু নাস্তিকতা আমার মনে ভাল লাগিত না; মনে বসিত না। আমি বালক-কাল হইতে পাড়ার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে আলোচনা করিতে ভাল বাসিতাম। কিন্তু ইতিপূর্বে আমি ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে কখনও গুরুতররূপে চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনার অভ্যাস ছিল না। এই মানসিক স্থানির অবস্থাতে তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে ভক্তিবাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার মানসিক অবসাদের কথা অবগত হইয়া আমাকে একখানি থিওডোর পার্কারের ‘Ten Sermons and Prayers’ পাঠাইয়া দিলেন। পার্কারের প্রার্থনাগুলি যেন আমার চিত্তে নবজীবন আনিল। আমি প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্বে একখানি খাতাতে একটী প্রার্থনা লিখিয়া পাঠ করিয়া শয়ন করিতে লাগিলাম। কেবল তাহাই নহে; দিনের মধ্যে প্রত্যেক দশ পনের মিনিট অন্তর ঈশ্বর স্মরণ করিতাম ও

প্রার্থনা কবিতাম। হৃৎখেব বিষয় আমাব সে প্রার্থনাৰ খাতাখানি হাবাইয়া গিয়াছে। নতুবা ধৰ্ম্মজীবনেৰ শৈশবেব সেই আধ আধ ভাষা আজ দেখিতাম।

ধৰ্ম্মেৰ আদেশে চলিবার সঙ্কল্প ; ব্রাহ্মসমাজেৰ সন্নিতি যোগ আরম্ভ।—প্রার্থনা কবিতে কবিতে হৃদয়ে দুইটা পৰিবৰ্ত্তন দেখিতে পাইলাম। প্রথম, দুৰ্ব্বলতাৰ মধ্যে বল আসিল; আমি মনে সংকল্প কবিলাম, “কৰ্ত্তব্য ব্ৰিবি যাহা, নিৰ্ভয়ে কবিব তাহা, যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন প্রাণ মান বে।” আমি ধৰ্ম্মেৰ আদেশ ও হৃদয়বাগা ঈশ্ববেৰ আদেশ অনুসাবে চলিবাৰ জন্ত প্রস্তুত হইলাম। দ্বিতীয়, ভবানাপুৰ ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্ববেৰ উপাসনাতে যাইব স্থিৰ কাঁবলাম, ও যাঠিতে আবন্ত কবিলাম। কিন্তু পাছে আমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা কবেন, পাছে লোকেব সঙ্গে আলাপ হয়, এই ভয়ে উপাসনা আবন্ত হইলে যাইতাম, ও উপাসনা ভাঙ্গিবাৰ অগ্ৰেই চাঁলিয়া আসিতাম।

এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজেৰ সঙ্গে আমাব একটু একটু কবিতা যোগ হইতে লাগিল। আমাব সমাধায়া বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যিনি পৰে বলাতে গিয়া ডাক্তাৰ হইয়া আসিয়াছিলেন) তখন ব্রাহ্মদেব নিকট সৰ্ব্বদা যাইতেন, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়েৰ কথা আমাকে আসিয়া বলিতেন, এবং ব্রাহ্মদেব প্রকাশিত পত্রিকাৰ আনিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন, কিন্তু আমাকে ব্রাহ্মদেব কাছে লইতে চাহিলে লজ্জাতে যাইতে চাহিতাম না। একদিনেৰ কথা শ্রবণ হয়। উমেশ আমাকে ও যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (যিনি পৰে যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন) ভজাইয়া কেশববাবুৰ কলুটোলাৰ বাড়ীতে লইয়া গিয়া দেখা কবাইয়া দিতে চাহিলেন। আমি কেশব বাবুৰ বাড়ীৰ দ্বাৰ পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু বাড়ীৰ মধ্যে পা বাড়াইতে পাবিলাম না ; উমেশেৰ হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেলাম। আর-একবাৰ

উমেশ ও আমি চিংপুৰ বোড দিয়া আসিতেছি, এমন সময় বৃষ্টি আসিল তখন কেশববাবু চিংপুৰ বোডে “কলিকাতা কলেজ” নামে একটি কলেজ খুলিয়াছিলেন। আমবা বৃষ্টিৰ ভয়ে ঐ কলেজের বাবাণ্ডাব নীচে গিয়া দাঁড়াইলাম। উমেশ আমাকে ভিতবে যাইবাব জন্ত পীড়াপীড়ি কৰিতে লাগিল, আমি লজ্জাতে ভিতবে যাইতে পাবিলাম না। এমন সময় একটি পশ্চিমে বেহাৰা উপব হইতে নামিয়া আসিল। আমবা কেশববাবুব কথা জিজ্ঞাসা কৰাতে সে বলিতে লাগিল, “কেশববাবু মানুষ নয়, দেবতা, তাঁব কাছে চল, হুটী কথা শুনলে প্রাণ জুড়িবে যাবে।” তাব প্রভু-ভক্তি দেখিয়া তাহা পবীক্ৰা কৰিবাব জন্ত আমবা কেশববাবুব কলিত নিন্দা আবন্ত কৰিলাম। তাহাতে সে অতিশয় নিবন্ত হইল, এবং অবশেষে আকাশেব দিকে দুই হাত তুলিয়া কেশববাবুব দীৰ্ঘজাবনেব জন্ত ঈশ্ববেব নিকট প্রার্থনা কৰিতে লাগিল। আমি দেখিয়া স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বলিলাম, “উমেশ, এ সামান্য মানুষ নয়, যাব চাকব এত দূৰ আকৃষ্ট হতে পাবে।” তখন উমেশ আবাব আমাকে কেশববাবুব নিকট যাইবাব জন্ত চাপিয়া ধবিল, কিন্তু আমি লজ্জাবশতঃ যাইতে পাবিলাম না।

ইহাব পবে উমেশ যোগেন্দ্ৰ ও অপবাপব ক্লাসেব ছেলেদেব সঙ্গে আমি আমাদের পূৰ্ব্বতন সহাধ্যায়ী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোবনাথ গুপ্ত এই বন্ধুদ্বয়েব বাসাতে মধ্যে মধ্যে যাইতে লাগিলাম। ইহাঁরা এক সময় আমাদের সঙ্গে একশ্রেণীতে পড়িতেন; কিন্তু তখন ব্রাহ্ম-ধৰ্ম্ম-প্রচাবক হইয়াছিলেন। একদিন বাত্রে বিজয় ও অঘোব আমাকে আব ভবানীপুবে যাইতে দিলেন না, নিজেদেব বাসাতে বাধিলেন। আমাব স্মবণ আছে যে, সে বাত্রে তাঁহাদেব বাসাতে অন্তজাতীয়া স্ত্রীলোকের রাঁধা ভাত মাটির সানকে খাইয়া সমস্ত রাত্রি এত গা ঘিন্‌ঘিন্ কৰিয়াছিল যে ভাল কৰিয়া ঘুমাইতে পাৰি নাই।

পিতার বিরাগ ।—প্রার্থনা আমাকে বল আনিয়া দিল যে বলিয়াছি, তাহাব অর্থ এই যে, মানুষের ভয় আমার মন হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল, এবং নিজ বিশ্বাস অনুসারে চালবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। পিতা কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যাইতেছি। একদিন আমাকে ডাকিয়া সমাজে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমি ধীরভাবে বলিলাম, “বাবা, আপনি জানেন আপনার আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করি নাই, আপনার সকল আজ্ঞা পালন করিতে বাজি আছি। কিন্তু আমার ধর্মজীবনে হাত দিবেন না। আমি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যাওয়া ত্যাগ করিতে পারিব না।” পরের বাসাতে পিতা আব কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু এই উত্তর তাহাব এমনি নূতন ও ভয়ানক লাগিল যে, পবে শুনিয়াছি, সেদিন অনেক কাঁদিয়াছিলেন; আব চুই তিন দিন তাহাব কলিকাতাতে থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু তৎপব দিনই দেশে চলিয়া গেলেন।

পবে শুনিয়াছি, তিনি বাড়ীতে পৌছিলে তাহাব বিষয় মুখ দেখিয়া আমার মা ভীত হইয়া গেলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাব মুখ এত স্নান কেন, ছেলে কেমন আছে?” বাবা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “সে মবেছে।” অমনি আমার মা, “কি বলগো। ওগো ক বলগো।” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহাব ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পাশের বাড়াব মেরেবা ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া বলিতে লাগিলেন, “কৈ, শিবুব ব্যায়বামের কথা ত শুনি নাই।” তখন বাবা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “সে মবার মধ্যে। সে ব্রাহ্মসমাজে যেতে আরম্ভ কবেছে; আমি বাবণ করলেও শুনবে না।”

প্রার্থনার বল ।—যাহা হউক, প্রার্থনার দ্বাৰা যেমন বল পাইলাম, তেমনি আশাও পাইলাম। আমার অন্তবাস্তা বলিতে লাগিল, ঈশ্বর আমাকে পাপী বলিয়া ত্যাগ করিবেন না। আমার বোধ হয়, পার্কারের

সবস ও আশান্বিত ভক্তি এবিষয়ে অনেক পৰিমাণে সাহায্য কৰিয়া থাকবে। বাগ হউক, ব্যাকুল প্রার্থনা বিফলে যায় না তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। ভগবানের প্রেৰণা প্রাণে পাইয়া মন আনন্দে মগ্ন হইতে লাগিল। তদবধি প্রার্থনাতে আমাব দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তৎপৰে আমি অনেক প্রলোভনে পড়িয়াছি, সময়ে সময়ে পাতত হইয়াছি, অনেক অন্ধকাৰ দেখিয়াছি, কিন্তু প্রার্থনাতে বিশ্বাস আমাকে পৰিত্যাগ কৰে নাই। সকল সংগ্রামেৰ মধ্যে দুৰ্বলতাতে বল, নিবাণাতে আশা, নিবানন্দে আনন্দ লাভ কৰিয়াছি। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সেই মঙ্গলময় পুৰুষ তাহাব দুৰ্বল সন্তানকে হাতে ধৰিয়া লইয়া যাইতেছেন। যে ছেলেটা চলিতে পাৰে না, বাববাব পড়িয়া যায়, তাব ধবাব অপেক্ষা না বাঁধিয়া যেমন পিতা বা মাতাকে নিজেই সে ছেলের হাত শক্ত কাঁবয়া ধৰিতে হয়, তেমনি যেন মনে হয়, সেই মঙ্গলময় পুৰুষ দোখিয়াছেন যে, এ পাপী ও দুৰ্বল মানুষটা নিজে ধৰিয়া চলিতে পাৰে না, যখন তাহাকে ভুলিতেছে, তখন পতিত হইতেছে; তাই তিনি বাববাব ধূলা কাঁড়িয়া চক্ষুৰ জল মুছাইয়া তুলিয়া ধৰিতেছেন।

গ্রামে আসিয়া ঠাকুর পূজা কবিতাে অসম্মতি ও তাহাব ফল।—বল ও আশা পাইয়া আমি নিজ বিশ্বাস অনুসাবে চলিবাব জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। এই বাব আমাব কঠিন সংগ্রাম আসিল। ইহাব পূৰ্বে গ্রাণ্বেৰ ছুটীতে বা পূজাব বন্ধে বাড়ীতে গেলেই আমাকে ঠাকুর পূজা কবিতাে হইত। আমাদেব কুলক্রমাগত কতকগুলি ঠাকুর ছিল। * বাবা সচবাচব তাহাদেব পূজা কবিতেন। আমি বাড়ীতে গেলে তিনি সেই কাৰ্য্যভাব আমাব উপৰ দিয়া অপবাপব গৃহকাৰ্য্য কৰিবাব জন্ত অবসর লইতেন। যে বাবে আমাব হৃদয় পৰিবৰ্ত্তন হইয়া আমি বাড়ীতে গেলাম,

সেবাব প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলাম যে আব ঠাকুর পূজা করিব না। গিয়াই মাকে সে সংকল্প জানাইলাম। মা ভয়ে অবশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, একটা মহা সংগ্রাম আসিতেছে। আমাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক অল্পবোধ করিলেন; আমি কোনও মতেই প্রস্তুত হইতে পারিলাম না। “ধর্ম্মে প্রবন্ধনা বার্থতে পারিব না” বলিয়া কবঘোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করিলাম। অবশেষে সেই সংকল্প যখন বাবাব গোচর কবা হইল, তখন আশ্চর্যগিবিব অধ্যুদ্যমমনেব জায় তাঁহাব কোথাগি জলিয়া উঠিল। তিনি কুপিত হইয়া আমাকে প্রহাব করিবা* ঠাকুরঘবেব দিকে লইয়া যাটনাব জন্ত লাঠি হস্তে ধাবিত হইয়া আসিলেন। আমা দৌবভাবে বলিলাম, “কেন বুধা আমাকে প্রহাব করিবেন? আমি অকাতবে আপনাব প্রহাব সহ্য করিব। আমাব দেহ হইতে এক একথানা হাড় খুলিয়া লইলেও আব আমাকে ওখানে লইতে পারিবেন না।” এই কথা শুনিয়া ও আমাব দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন, এব° প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কুপিত কণীব জায় স্থলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাকে পূজাব কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নিজে পূজা করিতে বসিলেন।

সেই দিন হইতে আমাব মুক্তিপূজা বর্জিত হইল। আমি সত্যস্বরূপেব উপাসক হইলাম। কিন্তু আমাদেব পারিবারিক আন্দোলন গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজনবে মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আমাকে সকলেই নির্গাতন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তৎপবে বাবা আমাকে গ্রামস্থ ব্রাহ্মদিগেব সহিত মিশিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমি অল্প সময়ে মিশিতাম না; কিন্তু যে দিন তাঁহাবা সকলে উপাসনা করিবেন বলিয়া সংবাদ দিতেন, সেদিন বাবা গাত্ৰোত্থান করিবার পূর্বেই গিয়া উপাসনাতে যোগ দিতাম; আসিয়া তিরস্কার ও গল্পনা সহ্য করিতাম। তখন কেহ ব্রহ্মোপাসনা করিবে শুনিতে চাষি পাঁচ মাইল হাঁটিয়া গিয়া যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না।

১৮৬২-৬৭] শাঁকারিটোলায় জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে বাস ১১৩

অথচ এই সময়ে গ্রামেব কতিপয় ব্রাহ্ম, ভবানীপুরের দুই চারিজন ব্রাহ্ম ও বিজয় অঘোর ভিন্ন আর কোনও ব্রাহ্মের সহিত আমার আশ্বাসিতা ছিল না; কাহারও সঙ্গে মিশিতাম না, লজ্জাতে কাহারও সঙ্গিত আলাপ কবিতে চাহিতাম না।

শাঁকারিটোলায় জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে বাস ও তাঁহাদের স্নেহ।—১৮৬৭ সালের শেষভাগে আমি ভবানীপুরের চৌধুবী মহাশয়দিগের বাটী হইতে ঐ স্থানের একটা ভদ্রপরিবারের অনুরোধে তাঁহাদের সহিত কলিকাতা শাঁকারিটোলাতে এক বাড়ীতে আসিয়া বাস কবিতে লাগিলাম। তাহার ইতিবৃত্ত এই। জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটা ভদ্রলোক ভবানীপুরে বাস কবিতেন। মহিম নামে তাঁহার একটা ছেলে সংস্কৃত কলেজে পড়িত ও আমাদের সঙ্গে এক গাড়িতে কলেজে যাইত। সেই সূত্রে জগৎবাবু সহিত আমার পরিচয় হয়। জগৎবাবু সাধুতা সদাশয়তা সৌজন্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে; আমার প্রতিও তাঁহার পুত্রবৎ স্নেহ জন্মে। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাঁহার গৃহিণীর সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন।

আমি অগ্রেই বলিয়াছি, পঠদশাতে সহরে থাকিতে আমার সহাধ্যায়ীদের কাহারও কাহারও মাকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম, এবং মাসীর ছায় স্নেহ পাইতাম। বলিতে কি, সে সময়ে আমাকে ঘেরূপ কুসঙ্গের মধ্যে বাস করিতে হইত, স্মরণ করিলে এই মনে হয় যে, সেই মাসীদের স্নেহের গুণে ও তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবেই আমি এই-সকল কুসঙ্গের অনিষ্টকল হইতে বাঁচিয়াছিলাম। বাহা হউক, আমি জগৎবাবুর পক্ষীকেও মাসী বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমাকে ইহারা স্বামী-স্ত্রীতে যে কি ভালবাসিতে লাগিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না।

শেষে এমনি দাঁড়াইল যে, আমি হুই চারি দিন দেখা না করিলে মাসী ডাকিয়া পাঠাইতেন ; এবং আমাকে কঠিন ছেলে বলিয়া তিরস্কার করিতেন ; এটা ওটা খাওয়াইতেন ; ঘরকন্না কথা কত শুনাইতেন ; আমার নিকট কিছুই গোপন রাখিতেন না । আমি আপ্যায়িত হইয়া বাসায় কবিতাম ।

হায়, তাঁহাদের কঠিন ছেলে ব্রাহ্মসমাজের কাজে ও নানা বিষয়ে মাতিয়া কোথায় গিয়া পড়িল, তাঁহারা কোথায় গিয়া পড়িলেন ! মাসীকে আব কতকাল দেখিলাম না ! এখন ভাবিয়া দেখি, মাসী যে আমাকে কঠিন ছেলে বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিয়াছিলেন । আমি মানুষেব নিকট যতটা প্রেম পাইয়াছি ততটা প্রেম দিতে পাবি নাই । এ জীবনে যে আমি সর্বদা নানা সংগ্রামেব মধ্যে বাস কবিয়াছি, তাহা বোধ হয় আমাব প্রেমিক বন্ধুদেব প্রতি আমাব সমুচিত প্রেমেব অভাবেব একটা কারণ । নির্যাতন, বিদ্বেষ, বিবাদ প্রভৃতিব মধ্যে পড়িয়া মন উত্তাপেব মধ্যে বাস কবিয়াছে, প্রেমের স্ত্রীতল বায়ু সেবন কবিবার সময় পায় নাই ।

যাহা হউক, আমি এই মাসীব এত স্নেহের এই মাত্র প্রতিদান কবিতাম যে, তাঁহাদের মহিমকে বোজ কাছে আনিয়া পড়া বলিয়া দিতাম । ১৮৬৭ সালের শেষভাগে ইহাৰা কলিকাতাব শাঁকারিটোলাতে একবাড়ীতে গিয়া থাকিবেন বলিয়া স্থির করিলেন । তখন মাসী আমাকে সঙ্গে বাইবার জন্ত ধরিয়া বসিলেন । আমি তাঁহাদের অসুখরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না । আমরা আসিয়া শাঁকারিটোলাতে বাস করিতে লাগিলাম । আমি ও মহিম বাহিরবাড়ীতে এক দ্বিতীয়তল গৃহে বাস করিতাম । সে ঘবটী বাহিরবাড়ীতে চইলেও ঠাকুরদালানের ছাদের উপর দিয়া অন্তর মহল হইতে সে ঘরে যখন ইচ্ছা আসা বাইত । সুতরাং মাসী কাজকর্ম হইতে একটু অবসর পাইলেই আমার ঘরে

আসিয়া বসিতেন, এবং আমাব ও মহিমাব পড়া দেখিতেন, এবং নানা ভাল কথায় কাল কাটাইতেন।

জগৎবাবুর শ্যালকপুত্রী। বাল্যবিবাহের প্রতি স্থণা।—

আমবা এই বাড়ীতে আসাব পৰ মাসাব এক ভ্রাতৃপুত্রী, ১৫।১৬ বৎসরের বালিকা, তাঁহাদেব নিকট আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। সে ২।১ দিবে মধ্যই আমাকে দাদা কবিয়া লইল, এবং চুষকে যেমন লৌহ লাগে তেমনি যেন আমাতে লাগিয়া গেল। পিতামাতা ঐ বালিকাটিকে শৈশবে একজন পবিগতবয়স্ক বিপদ্বাক ব্যক্তিব সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বালিকাটি বোধ হয় পতিব নিকট বা পতিগৃহে ভাল ব্যবহার পাইত না। কাৰণ ঋগ্বেদাভীৰ কথা তুলিলেই দবদব ধাবে তাহাব ঢুই চক্ষে জলধারা বহিত ; এবং তাহা দেখিয়া বাল্যবিবাহেব প্রতি আমাব স্থণা বাড়িয়া যাইত। আমি সাবধান হইয়া বালিকাটাব নিকট তাহাব ঋগ্বেদাভীৰ কথা তুলিতাম না, তাকে পড়াশোনায় গল্পগাছায় ভুলাইয়া রাখিতাম। বালিকাটি প্রাতে গৃহকন্ডে পিসীব সহায়তা কবিত, আমাব নিকট আসিতে পাবিত না ; কিন্তু বৈকালে আমি ও মহিম কলেজ হইতে আসিলেই সে আমাদেব গৃহ আশ্রয় কবিত, সন্ধ্যাব পৰ আহাব কৰিয়াই আমাদেব ঘবে আসিত এবং বাক্তি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত থাকিত। আমি তাহাকে ও মহিমকে পড়াইতাম, লিখিতে শিখাইতাম ; ভাল ভাল গল্প শুনাইতাম ; আমাব সেই পূৰ্ব্বকালেব উদ্গাদিনীব অভাব যেন কিয়ৎ-পৰিমাণে পূৰ্ণ হইত। অনেক দিন একুপ হইত যে, আমি পড়িতে বসিতাম, সে ও মহিম ঘুমাইয়া পড়িত। আমি শয়নেব পূৰ্বে তাহাকে তুলিয়া বাড়াব ভিতর দিয়া আসিতাম। সে যেন অনিচ্ছাক্ৰমে বাড়ীর মধ্যে যাইত।

আমি এইখানে থাকিতে থাকিতে আমার বন্ধু যোগেন্দ্র (যিনি পৰে যোগেন্দ্র বিভাভূষণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বিবাহবিবাহ করেন এবং

আমি ইহাদিগকে পৰিত্যাগ করিয়া যোগেশ্বেৰ সঙ্গে থাকিবাব জন্ত যাই।
কিৰূপে সে বিবাহ ঘটে, পৰবৰ্ত্তী পৰিচ্ছেদে তাহা বলিতেছি। যাইবাব
সময় মাসীকে বিশেষতঃ সেই বালিকাটীকে ছাড়িয়া যাইতে বড় ক্লেশ
হইয়াছিল, সে জন্ত সে বিচ্ছেদটা মনে আছে। সে যেন আমাব স্নেহ
পাইয়া প্রাণ দিয়া আমাকে আঁকড়াইয়া ধৰিয়াছিল, সেই আলিঙ্গনপাশ
ছিঁড়িয়া যাওয়া আমাব পক্ষে ক্লেশকৰ হইয়াছিল। আমি যখন
তঁাহাদিগকে পৰিত্যাগ কৰিবাব সংকল্প জানাইলাম, তখন মেয়েটী কয়দিন
কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিল। অবশেষে যখন আমি জিনিসপত্ৰ
লইয়া বিদায় হই, তখন বলিল, “দাদা, একটু দাঁড়াও, একবাব ভাল কবে
প্ৰণাম কৰি।” এই বলিয়া তাহাব অঞ্চলটী গলায় দিয়া গলবস্ত্ৰ হইল
এবং আমাব চাবিদিকে প্ৰদক্ষিণ কৰিতে লাগিল। একবাব প্ৰদক্ষিণ
কৰিয়া আসে ও আমাব চবণে প্ৰণত হয় এবং ডাক ছাড়িয়া কাঁদে ;
আমিও তাব সঙ্গে কাঁদি।

সেই যে কাঁদিয়া বাল্যবিবাহকে ঘৃণা কৰিতে কৰিতে সে বাড়ী হইতে
বিদায় লইলাম, সেই ঘৃণা অজ্ঞাপি আমাব মনে জাগ্ৰত বহিয়াছে।
কেহ দশ এগাব বৎসৰেৰ মেয়েৰ বিবাহ দিতেছে দেখিলে মনে বড় ক্লেশ
হয়। কি আশ্চৰ্য্য। বাল্যবিবাহেৰ অনিষ্টফল পূৰ্বে কত দেখিয়াছিলাম ;
শান্তডৌৰ হাতে বোয়েৰ প্ৰাণ গেল, কতবাব শুনিয়াছিলাম ; বালিকা
পত্নী বিবাজমোহিনীকে হাত পা বাঁধিয়া সপত্নীৰ উপবে ফেলিয়া দিল
ইহাও দেখিয়াছিলাম ; কিন্তু ঐ মেয়েটির চক্ষেৰ জলে শিশু বালিকাদিগকে
হাত পা বাঁধিয়া দান কবাব উপবে আমাকে যেকৰূপ জাতক্ৰোধ কৰিল,
একৰূপ অগ্ৰে কবে নাই। কোন্ ঘটনাতে মানুষেৰ মনে কোন্ ভাব
আসে, তাবিলে আশ্চৰ্য্যান্বিত হইতে হয়।

হায় হায় ! ঘটনাচক্ৰে মেয়েটী কোথায় গেল, আমি কোথায় গিয়া
পড়িলাম ! তৎপরে বহু বৎসর পরে একদিন বিধবাবেশে মলিনবস্ত্ৰে

১৮৬২-৬৭] অগৎবাবুব শ্রালকপুত্রী ; বাল্যবিবাহের প্রতি স্থা ১১৭

দীন হীনাৰ ভায় শিশুকোলে তাহাকে ভবানীপুৰেৰ গলিতে কোনও
আত্মীয়ৰে বাড়ীতে যাইতে দেখিছিলোম। সে আমাকে দেখিরাই
“দাদা” বলিরা ডাকিরা উঠিল; কিন্তু আমাব চিনিতে বিলম্ব হইল।
দাঁড়াইয়া তাহাব হঃখেব কাহিনী শুনিলাম ও চক্ষেব জল ফেলিলাম
সেই দেখা শেষ দেখা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হৃদয় পরিবর্তনের ফল—দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আত্মনিগ্রহ

ও সমাজসংস্কারে কাম্পপ্রদান ।

১৮৬৮-১৮৬৯ ।

হৃদয় পরিবর্তনের প্রথম ফল প্রসন্নময়ীকে গ্রহণ, ও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পিতাকে সম্মত করা ।—বিতৌরবাব বিবাহেব পবই আমার হৃদয় পরিবর্তন হইলে, আমি নিরপবাধা প্রসন্নময়ীর প্রতি যে অত্যাচরণ হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্ত ব্যগ্র হই। সে মনের কথা কেবল আমার মাতামহী ঠাকুরাণীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম। প্রসন্নময়ীর পিত্রালয় আমাব মাতুলালয়ের সন্নিকট। সুতরাং তিনি লোক পাঠাইয়া প্রসন্নময়ীকে নিজ ভবনে আনিলেন। আমাকে সংবাদ দিবা মাত্র আমি গিয়া প্রসন্নময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করিলাম। তৎপরে বহুদিন প্রসন্নময়ী আমাব মাতুলালয়েই থাকেন। আমি শনিবার শনিবাব সেখানে যাইতাম।

আমি প্রসন্নময়ীর সহিত মিলিত হইয়াছি জানিয়া আমার পিতা প্রথমে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু পরে আমার অহুন্নর বিনয়ে ও মাতাঠাকুরাণীর অহুন্নর বিনয়ে আর্জ হইয়া প্রসন্নময়ীকে নিজ ভবনে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হন। ১৮৬৭ সালে তিনি আবার আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন।

প্রথম সন্তান হেমলতার জন্ম ।—১৮৬৮ সালের ১১ই আষাঢ় আমার পৈতৃক ভবনে আমার প্রথম সন্তান হেমলতার জন্ম হইল। হেম জন্মিলে বাবার সহিত আমার আর-এক মনোবাদের কারণ উপস্থিত হইল।

অগ্রেই বলিয়াছি, আমবা দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলজাত কুলীন ব্রাহ্মণ। আমাদের মধ্যে তখন কুলসম্বন্ধের প্রথা ছিল। তদনুসারে হেমলতার শৈশবেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির কবিবাব কথা। আমি সে, পথে বিরোধী হইলাম। তাহাব বিবাহ সম্বন্ধ কবিতে নিষেধ কবিয়া পিতাকে পত্র লিখিলাম। তাহাতে বাবা কুপিত হইলেন। আমার নিষেধ গ্রাহ্য কবিলেন না। আমার অজ্ঞাতসারে গোপনে একটা শিশু বালকের সহিত তাহাব বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন কবিলেন। আমি শুনিয়া অতিশয় হুঃখিত হইলাম।

হৃদয় পরিবর্তনের দ্বিতীয় ফল, আত্মনিগ্রহ।—ঈশ্বৰচরণে প্রাণনা দ্বাৰা আমার হৃদয়-পরিবর্তন ঘটিলে, আমার প্রাণে এক নূতন সংগ্রাম জাগিয়াছিল। সকল বিষয়ে আপনাকে ঈশ্বৰেচ্ছাব অনুগত কবিবাব জন্ত হৃদয় প্রতিক্ষা জন্মিয়াছিল। ইহাব ফল জীবনের সকল দিকেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকল বিষয়ে আপনাকে শাসন কবিতে আবশ্য কবিলাম। যে যে বিষয়ে আসক্তি ছিল তাহা ত্যাগ কবিতে এবং যে-কিছু অকচিকব তাহা অবলম্বন কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই সময়ে আমি প্রথমে মাংসাহাব পবিত্যাগ কৰি, প্রাণীহত্যা নিবারণের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু মাংসের প্রতি আসক্তি ছিল বলিয়া। মাংসাহাবে এমনই আসক্তি ছিল যে, ভবানীপুৰে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে বাসকালে প্রায় প্রতি ববিবাব প্রাতে যখন কালীঘাট হইতে জীবন্ত পাঠা আসিত, সে পাঠাব ডাক শুনিতেই আমার পড়া-শুনা বন্ধ হইত। তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া বাঁধিয়া পেটে না পূবিতে পারিলে আর কিছু কবিতে পারিতাম না। কবিতা পড়িতে ও কবিতা লিখিতে অতিরিক্ত ভালবাসিতাম বলিয়া কিছুদিন কবিতা পড়া বন্ধ কবিয়া দিলাম, কিন্তু লজিক পড়িতে আরম্ভ কবিলাম। বঙ্গদেব সহিত হালিঠাঙ্গী ও গল্পগাছা কবিতে ভালবাসিতাম, কিছুদিন মনের কাণ বলিয়া দিয়া

মোনব্রত ধরলাম। এই মনের কাণমলাটা তখন অতিরিক্ত মাত্রায় করিতাম।

হৃদয়ে ধর্মভাবের উন্মেষ হওয়া অবধি আমি কলেজের পরীক্ষাতেও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। তদবধি প্রতিবৎসর আমি কলেজে প্রথম স্থান অধিকার কবিত্তে লাগিলাম। আত্মনিগ্রহের উদ্দেশ্যে, পাঠ্যবিষয়ে মধ্যে মধ্যে অপ্রীতিকর বোধে যে যে বিষয় অবহেলা কবিতাম, তাহাতে অধিক মনোযোগী হইলাম। আমার মনে আছে, অগ্রে অঙ্কে অমনোযোগী ছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ পরীক্ষাতে কখনও একশতের মধ্যে বিশের উপর নম্বর পাইতাম না। ১৮৬৬ সাল হইতে তাহা বদলাইয়া গেল। অঙ্কে এরূপ মনোযোগী হইলাম যে ঐ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া সেকেণ্ড গ্রেড স্কলারশিপ্ পাইলাম; কলেজেও প্রথম হইলাম। তৎপরে সেই প্রতিজ্ঞাও সেই দৃঢ়ব্রত রহিয়া গেল। কি কঠিন সংগ্রাম করিয়া ১৮৬৮ সালে এল এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম ও ৫৯ টাকা স্কলারশিপ্ পাইয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা ক্রমশঃ করিতেছি। আমার নব ধর্মভাব আমাকে সেই সংগ্রামে শক্তি দিয়াছিল।

ফলাফলবিচার-রহিত দুর্জয় প্রতিজ্ঞা।—বলিতে কি, আমার ধর্মজীবনের আরম্ভ হইতে এই ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত কালকে শ্রেষ্ঠকাল বলিয়া মনে করি। এই সময় যে ভাবে যাপন করিয়াছিলাম, সেজন্ত মুক্তিদাতা প্রভু পরমেশ্বরকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ করি। বিনয়, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা, প্রার্থনাপরায়ণতা প্রভৃতি ধর্মজীবনের অনেক উপাদান এ সময়ে আমার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। আমার বক্তদূর স্মরণ হয়, তখন আমার মনের ভাব এইপ্রকার ছিল যে, আমার ধর্মবুদ্ধিতে থাকিয়া, ঈশ্বর যে পথ দেখাইবেন, তাহাতে চলিতে হইবে, কতি লাভ যাহা হয় ইউক। সকল বিষয়ে ও সকল কার্যে ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতাম, এবং যাহা একবার কর্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতাম, তাহাতে দুর্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত বশ্যমান

হইতাম। ফলাফল ও জীবন-মরণ বিচার করিতাম না। ইহার নিদর্শন স্বরূপ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবাবিবাহ দেওয়া, ও আমাব এল এ পবীক্ষার জন্ত গুরুতর শ্রম, প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ কবিতো পাবা যায়। সে সকল ক্রমশঃ বর্ণনা করিতেছি।

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবাবিবাহ দেওয়া।—প্রথম ঘটনা, যোগেন্দ্রের বিধবাবিবাহ। এই বিবাহ ১৮৬৮ সালের প্রথম ভাগে হয়। ইহাব ইতিবৃত্ত এই। ঈশানচন্দ্র রায় নামক নদীয়া-কৃষ্ণনগর-নিবাসী ও কলিকাতা-প্রবাসী একটা যুবক তখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পাঠ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মাতা ও একটা বিধবা ভগিনী ছিলেন। আমাব জ্ঞাতী দাদা হেমচন্দ্র বিহারী (যিনি পরে তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন) ঐ মেয়েটিকে পড়াইতেন। হেমদাদার নিকট আমি মেয়েটির প্রশংসা সর্বদা শুনিতাম। তিনি আমাকে বলিতেন যে, মেয়েটির ভাই তাহার আবাব বিবাহ দিতে চায়। আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবা-বিবাহের পক্ষ। আমি মনে মনে ভাবিতাম, আমার আলাপী কি কোনও ছেলে পাওয়া যায় না, যে মেয়েটিকে বিবাহ করিতে পারে ?

ইতিমধ্যে আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপন্ন হইলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর পরলোকগমনের দশ বাব দিনের মধ্যেই তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্ত অস্থির কবিতা তুলিলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া আমাকে সেই কথা জানাইলেন এবং আমার পরামর্শ চাহিলেন। আমি বলিলাম,—“যাও, যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। দশ বাব দিন হলো তোমার স্ত্রী মরেছে, ঐ মধ্যে বিবাহের কথা! আর বিয়েই যদি কর, একটা আট নয় বছরের মেয়ে বিয়ে করবে ত, তাতে আমার মত নেই; তোমার বা ইচ্ছে হয় কর।” যোগেন্দ্র সেদিন বিষম অসুস্থ হয়ে গেলেন। দুদিন পরে

আবার আসিয়া আমাকে ধবিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবাবিবাহ কবিবার জন্ত নাচাইয়া তুলিলাম। তিনি তাহাতে সন্মত হইলেন। তখন আমি হেমদাদাব সাহায্যে ঈশানচন্দ্র বায়েব সহিত সাক্ষাৎ কবিলাম। যোগেন্দ্র ও ঈশানেব ভগিনী মহালক্ষ্মী পবম্পাবেব সহিত পরিচিত হইলেন এবং বিবাহিত হওয়া স্থির কবিলেন।

মহালক্ষ্মীর বয়স তখন বোধ হয় ১৮ বৎসব হইবে। আমাদের অপেক্ষা ২।৩ বৎসবেব ছোট। বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই সংবাদ লইয়া বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি পূৰ্ব্ব হইতেই ঈশানকে ও তাহাব ভগিনীকে জানিতেন, এবং যতদূৰ স্বরণ হয় কিছু কিছু অর্থ সাহায্য কবিয়া আসিতেছিলেন। আমার মুখে মহালক্ষ্মীর সহিত যোগেনেব বিবাহেব সংবাদ পাইয়া তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দিবেন বলিলেন। বিবাহেব দিন স্থির কবিয়া দুই তিন জন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ কবিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিজ্ঞাসাগর মহাশয় বিবাহেব সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যতদূৰ স্বরণ হয়, কত্নাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন।

বিধবাবিবাহের কলে নির্যাতন।—এই বিবাহেব পবেই ভয়ানক নির্যাতন আবম্ভ হইল। যোগেন্দ্রেব আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পবিত্যাগ করিলেন। তাঁহাব স্কাবশিপ্ ও ঈশানেব স্কাবশিপ্ মাত্র ভবসা দাঁড়াইল। তদুপৰি চাকৰ চাকবাণী কেহই থাকে না, দিন চলা ভাব। এই অবস্থাতে তাঁহারা আমাকে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে অনুবোধ কবিলেন। আমি তখন শাঁকারিটোলায় জগৎ বাবুৰ বাটীতে থাকিতাম। যোগেন্দ্রেব ও ঈশানেব স্কাবশিপেব সহিত আমার স্কাবশিপ্ যোগ কবিলে, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পাবে, এবং আমি সঙ্গে থাকিলে অপবাগর নানা প্রকাবে সাহায্য হইতে পাবে, এই আশার তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে ধবিল বসিলেন। আমি বিবাহেব ঘটক, আমি তাঁহাদের

বিপদেব সময় কিরূপে সাহায্যদানে বিরত থাকি ? সুতরাং আমি বাবাকে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটলাম।

যোগেন্দ্রের সহিত বাস করিবার প্রস্তাবে পিতার ক্রোধ।—
বাবা এই সংবাদ পাইয়া অগ্নিসমান হইয়া উঠিলেন ; কারণ জ্ঞাতি কুটুম্ব ও গ্রামেব লোক এই সংবাদ পাইলে গোলযোগ করিবে। তিনি আমাকে ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জ্ঞাত আদেশ কবিয়া পত্র লিখিলেন। আমি অন্তরঃ ক্রোধ করিয়া লিখিলাম, যে-বিবাহের আমি ঘটক, সেই বিবাহ-নিবন্ধন বিবাহিত দম্পতী যখন ঘোর নির্যাতন ও দাবিদ্রোর মধ্যে পড়িয়াছেন, তখন সাহায্যেব উপায় থাকিতে সাহায্য না করা অধর্ম ; সুতরাং সেরূপ কাজ আমি করিতে পারিব না। বাবা সে যুক্তির প্রতি কণপাত করিলেন না ; পবিত্র লিখিলেন যে, তাহা হইলে তিনি আর প্রসন্নময়ীকে বাড়িতে বাধিতে পারিবেন না, এবং আমাকে সঙ্গীক গৃহ হইতে নির্বাসিত করিবেন।

মাতুলের অনুমোদন লাভ।—যখন এইরূপ চিঠিপত্র চলিতেছে তখন একদিন বড়মামা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি চাকড়াপোতা গ্রামে তাঁহার ভবনে গিয়া তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বাবার এক পত্র আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম, বাবা আমাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বড়মামার শরণাপন্ন হইয়াছেন। চিঠি পড়িয়া আমি ধীরভাবে সমুদয় ঘটনা মাতুলের নিকট বর্ণন করিলাম ; কিরূপ নির্যাতন, কিরূপ দারিদ্র্য, কিরূপ সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিলাম। বলিয়া তাঁহার উপদেশের অপেক্ষা কবিয়া রহিলাম।

মাতুলমহাশয় কিছুকাল ধীর গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, “না, তুমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পার না। তুমি তাহাদিগকে বিবাহে উৎসাহ দিয়া, বিশেষ সময় যদি তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে অধর্মের কাজ হইবে ; কাপুরুষতা হইবে ; আত্মার ভাগিনার মত কার্য হইবে না।”

আমার হৃদয় হইতে কে যেন দশ মণ বোঝা নামাইয়া লইল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, “আমার বাবাকে এই কথা লিখুন।”

তিনি বাবাকে লিখিলেন যে সে-প্রকার অমরোখ তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না। আমি তাহাদের সাহায্য করিতে বাধ্য।

গুরুতর শ্রম।—যোগেনদের বিবাহের পর তাহাদের জ্ঞাত আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। এই পরিশ্রমের মধ্যে একবার আমি কয়েক দিন বিশ্রাম করিবার জ্ঞাত যোগেন ও মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া মাতুলালয়ে গেলাম। দুই তিন দিন মাতুলালয়ে মাতামহীর ক্রোড়ে আছি, এমন সময় একদিন রাত্রি দশটার সময় ঈশানের এক জরুরি টেলিগ্রাম পাইলাম, “এখানে তোমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, অবিলম্বে এস।” তখন কি করি! রেলওয়ে স্টেশন মাতুলালয় হইতে দুই তিন মাইল দূরে। মাঠ দিয়া স্টেশনে যাইতে হয়; কিন্তু তখন সমুদয় মাঠ জলে প্লাবিত, পথ পাওয়া দুষ্কর। মাতামহী ঠাকুরাণী ও মামীমা বারণ করিতে লাগিলেন; আমি মহা চিন্তার মধ্যে পড়িলাম। কিন্তু বড়মামা বলিলেন, “জরুরি টেলিগ্রাম যখন করিয়াছে, তখন নিশ্চয় কোনও বিপদ ঘটিয়াছে, তুমি যাও। রাত্রি-শেষে ৩টা কি ৩।০ টার সময় একটা ট্রেন আছে, সেই ট্রেনে যাও।” আমি তাঁহার উপদেশে সেই রাত্রেই যাত্রা করিলাম। তিনি আমার সঙ্গে এক চাকর ও লষ্ঠন দিলেন। আমি জল ভাঙ্গিয়া কোন প্রকারে রাত্রি ১২ টার সময় স্টেশনে পৌঁছিলাম, এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিয়া শুনি, আমি মাতুলালয়ে গেলে তৎপর দিন যোগেনের মা হঠাৎ কলিকাতার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; যোগেনকে তাঁহার আত্মীয়-গণ ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, ও গত কল্যা প্রাতঃকাল হইতে কোনও না কোনও ছলে তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। সকলে মিলিয়া, এই গ্রীকে

পরিভ্রাণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তপূর্বক অপর একটি বালিকাকে বিবাহ করিবার জন্ত যোগেনকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। যোগেন মাতাকে লইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; এমন কি, তাঁহাব কাছে রাজিষাপন করিতে আবশ্য করিয়াছেন; তাঁহাকে ছাড়িয়া মহালক্ষ্মীর কাছে রাজিষাপন আসিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে মহালক্ষ্মীর কাছে থাকে কে? তাহাব মাতা কন্যাব পুনর্বিবাহেব প্রস্তাব শুনিয়াই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাম্বী চলিয়া গিয়াছেন; এদিকে ঈশানেরও হাঁসপাতালের নাইট ডিউটী উপস্থিত। তাই আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

আমি আসিয়াই যোগেনেব মাকে দেখিতে গেলাম, ও তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। তাঁহাকে বুঝাইয়া ও যোগেনকে বলিয়া, যোগেনকে মহালক্ষ্মীর নিকট রাজিষাপন করিতে প্রবৃত্ত করিলাম। তিনি সমস্ত দিন মাতার কাছে বাপন করিয়া বাত্রে বাড়ীতে আসিতে আবশ্য করিলেন। কিন্তু আসিতে অনেক বাত্ৰি করিতেন। ঐ সময় আমি আহাৰ্য্যে মহালক্ষ্মীর ঘবে বসিয়া তাঁহাকে বাঙ্গলা ও ইংরাজী পড়াইতাম এবং হৃদয়ে ধর্মবিষয়ে আলাপ ও উপাসনা করিতাম।

এইরূপে আমার গুরুতব শ্রম আরম্ভ হইল। যোগেন তাঁহার ভগ্নহৃদয় মাতা ও আত্মীয়স্বজনকে লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন; ঈশানেরও পাঠ ও নাইট-ডিউটীর হাল্কাভাবে অবসরভাব হইল; এদিকে চাকর চাকরাণী নাই; সুতরাং আমাকেই বাজার করা, তিনতালিতে কাঁধে করিয়া জল তোলা প্রভৃতি সমুদয় গৃহকর্ম করিতে হইত। এই-সকল স্মরণ করিয়া এখন আনন্দ হয়। এ-সকল শ্রম করিতে আমার কিছুই ক্লেশ হইত না, কারণ মহালক্ষ্মীর বিমল ভালবাসাতে আমাকে সবস রাখিত। মাঝে মাঝেবকে এত ভালবাসে না। যোগেনকে সর্বদাই আত্মীয়স্বজনের কাছে বাইতে হইত, সুতরাং আমিই তার সঙ্গী, তার শিক্ষক, তার সহায়, তার রান্নাঘরের চাকর, সর্বলি। আমি একদিন অজ্ঞত গেলে সে অস্থির হইয়া উঠিত।

ঈশান ও যোগেনের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ।—কলতঃ, এই কালকে যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বলিয়াছি, তাহাব কাবণ এই, এইকালের মধ্যে আমার অন্তরে ধর্ম্মভাব ও ব্যাকুলতা পূর্ণমাত্রাতে কাজ কবিতেছিল, অপবদিকে বন্ধুদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রাতে ভোগ কবিতেছিলাম । বস্তুতঃ, আমার প্রতি ঈশান ও যোগেনের প্রীতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও নির্ভবেব যেন সোমা ছিল না ।

লিখিতে লিখিতে একটা কথা মনে হইতেছে, তাহা ইহাব অনেক পবেব ঘটনা । তখন ঈশান বোধ হয় লক্ষ্মোএব বলবামপুৰ হাঁসপাতালে কর্ম্ম কবিতেন । সেই সময় একবাব ছুটি লইয়া আসিয়া কলিকাতাতে ছিলেন । একদিন সন্ধ্যাব পব আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলে, তিনি আমাকে আবদ্ধ কবিয়া বাধিলেন, আব বাড়িতে আসিতে দিলেন না । বলিলেন, “আমাব পবিবাব সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, তুমি থাক ।” এই বলিয়া তাঁহাব পত্নীব বিকল্পে আমার কাণে অনেক কথা ঢালিলেন । বলিলেন, “আমি আমার স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়াছি, কোনও ফল হয় নাই, তুমি একবাব বোঝাও ।” আমি বলিলাম, “তোমাব কথাতে কাজ হয় নাই, আমার কথাতে কি হবে ?” তিনি বলিলেন, “তোমাকে বড় ভালবাসে ও শ্রদ্ধা কবে, তোমাব কথাতে ওব উপকার হতে পারে ।” আমি অগত্যা ভূত্যেব দ্বাবা প্রসন্নময়ীকে সংবাদ দিয়া সে বাত্রি সেখানে যাপন কবিলাম । শয়নকালে গিয়া দেখি, ঈশানের শয়নঘরে এক স্বতন্ত্র খাটে আমার শয়নেব বন্দোবস্ত । শয়নকালে তাঁহাব পত্নী ঘবে আসিলে, তিনি বলিলেন, “আমাব কাছে আজ তোমাব শুইয়া কাজ নাই, তুমি শিবনাথের কাছে গিয়া শোও ; ও তোমাকে কিছু কথা বলিবে । আমি দুমাই, তুমি কথা শোন ।” আমি হাসিয়া বলিলাম, “তোমাব অদ্ভুত কথা, আমার কাছে শোবে কি রকম ?” তিনি সেকথা গ্রাহ্য কবিলেন না, পাশ কিরিয়া শুইয়া অকাতবে নিদ্রা গেলেন । আমি অনেকক্ষণ তাঁহার জীব সহিত তাঁহাদের

দাম্পত্য বিবাদ বিষয়ে কথাবার্তা কহিলাম। তৎপরে তিনি অস্ত্র ধরে ছেলেদের নিকট শয়ন করিতে গেলেন। আমিও নিজা গেলাম।

বন্ধুদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির বিষয় যখন শ্রবণ করি, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কারণ ইহাদের সম্ভাব প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয় মনের অনেক উপকার হইয়াছিল।

দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে পুনরায় বিবাহ দিবার প্রস্তাব।—এই সময় আমার মাথায় যত রকম আজগুবি মংলব আসিত, ভারত-উদ্ধারের যত রকম ঐশ্বর্য প্রসূত, সকলের উৎসাহদায়িনী ছিলেন মহালক্ষ্মী। এ জীবনে আমার অনেক চেলা জুটিয়াছে; কিন্তু মহালক্ষ্মীর মত চেলা অল্পই জুটিয়াছে। এই সময়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থ পড়িয়া যোগেন কিছুদিনের জ্ঞান নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহা লইয়া আমার সঙ্গে রোজ তর্ক ও ঝগড়া চলিত। আমি তাঁহাকে আশ্বিত্য করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু ঝগড়ার ফল এই হইত যে তিনি আরও দৃঢ়তার সহিত নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিতেন, “স্বামীজীকে তো চেলা করিয়া লইয়াছ, যত পার ধর্ম তাহাকে ভজাও; আমাকে ছাড় না।” আমি যোগেনকে না পারিয়া মহালক্ষ্মীকেই ভজাইতাম। হৃদয়ে প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করিতাম।

আমরা তিনটা প্রাণী এমনি “রিকশ্মার” হইয়া উঠিয়াছিলাম যে, আমরা তিনজনে পরামর্শ করিয়াছিলাম যে আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিয়া পুনরায় তাঁহার বিবাহ দিল। তখনও আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি একবার তাঁহাকে আনিতে যাই। তখন তিনি ১১।১২ বৎসরের বালিকা। বোধ হয় আমার পিতা-মাতার পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা পাঠাইলেন না। যাহাকে বিবাহ দিব তাবিতেছি, তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ কর) কর্তব্য নয় বলিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতাম না।

তাঁহাকে যে আনিয়া মহালক্ষ্মীর কাছে বাধিতে পাবিলাম না, এজন্ত মহা
দুঃখ হইল।

এল এ পরীক্ষার জন্ত দুঃখ শ্রম।—তাবপব, আমাব এল-এ
পবীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া। যোগেনের বিধবাবিবাহেব ফলস্বরূপ আমাদিগকে
কিরূপ নির্যাতন ভোগ কবিতে হইয়াছিল, অগ্রেই তাহাব বর্ণনা কবিয়াছি।
বিবাহেব কিছুদিন পবেই মহালক্ষ্মীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে লাগিল; চাকব
পাওয়া যায় না, বাঁধুনী পাওয়া যায় না, সেই অবস্থাতেই তাহাকে
রাধিতে হয়। এদিকে, যোগেন আত্মীয়-স্বজনেনব নির্যাতনে অস্থির
হইয়া পড়িলেন ও ঈশান মেডিকেল কলেজেব ডিউটী লইয়া সর্বদা
অস্থাপস্থিত থাকিতেন বলিয়া চাকবেব অনেক কাজ আমাব উপব পড়িয়া
যাইতে লাগিল, বাজাব কবা, কাঁধে কবিয়া তিনতালার জল তোলা
প্রভৃতি কাজ আমাকেই কবিতে হইত, —এসকল পূর্বেই বলিয়াছি। এই-
সকল কবিয়া আমি পড়িবাব সময় বড় পাইতাম না। সম্মুখে বৎসবেব
শেষে পবীক্ষা আসিতেছে, কিন্তু তাহাব জন্ত প্রস্তুত হইতে পাবিতেছি
না। এইরূপে ১৮৬৮ সালেব সেপ্টেম্বব মাসেব শেষে আসিয়া উপস্থিত
হইলাম। সংস্কৃত কলেজেব তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী
মহাশয় আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি বিতাসাগব মহাশয়েব
বন্ধু ছিলেন। তিনি এই বিধবাবিবাহে সন্তোষ প্রকাশ কবিয়াছিলেন,
কিন্তু আমাব লেখাপড়া সব গেল দেখিয়া দুঃখিত হইতেছিলেন। তিনি
অক্টোববেব প্রথমে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি একটা ভাল কাজে
আছ, কিছু বলিতে পাবি না; কিন্তু আমি তোমার জন্ত চিন্তিত হয়েছি।
তুমি আগামী পবীক্ষাতে কলেজেব মুখ বাধবে বলে মনে আশা করছিলাম,
কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে, তুমি স্কলার্শিপ পাওয়া দূবে থাক, পাস হও কি না
সন্দেহ।” তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল, আমি যেন কোন পাহাড়ের
কিনারায় দাঁড়াইয়াছি; আমার সম্মুখে গভীর গর্ভ, আব এক পা বাড়াইলেই

তাহাব মধ্যে পড়িব! আমার সম্মুখে যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত তাহা এক নির্মমের মধ্যে চক্ষের সমক্ষে আসিল। মনে হইল, স্ফলারশিপি যদি না পাই, তাহা হইলে যাহাদের জন্ত এতটা সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাদের আর সাহায্য করিতে পারিব না। যোগেন ও মহালক্ষ্মী সাহায্যের অভাবে কষ্ট পাইবেন তাবিয়া চক্ষে জল আসিল। “ঈশ্বর রাখ, এই বিপদে রাখ,” বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; এক মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্যাপথ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। সর্বাধিকারী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ধীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি আমার প্রতি একটা অনুগ্রহ করিতে পাবেন? তাহা হইলে একবার জীবন মরণ পণ করিয়া দেখি।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি অনুগ্রহ?” আমি বলিলাম, “আমি মনে করিতেছি, কলিকাতা হইতে পলাইয়া ভবানীপুরে থাকিব; বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কলেজে আসিব না; একাগ্রচিত্তে পাঠে মন দিব এবং পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইব। কলেজে না আসার জন্ত যদি আমার স্ফলারশিপি না কাটেন, তাহা হইলেই এইরূপ করিতে পারি।” তিনি বলিলেন, “তুমি কলেজে আসবে না, অথচ স্ফলারশিপি কাটা হবে না, এটা কলেজের নিয়মবিরুদ্ধ। ডিবেক্টবকে জিজ্ঞাসা না কবে এরূপ করিতে পারি না। কি হয় তোমাকে দুদিন পবে বলব।” তৎপরে তিনি সমুদয় বিবরণ খুলিয়া লিখিয়া ডিরেক্টরের নিকট হইতে অনুমতি আনিলেন, এবং আমাকে ছুটি দিলেন।

আমি যোগেন ও মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া আমার শৈশবের আশ্রয়দাতা ভবানীপুরের মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদিগের নিকট আড়াই মাসের জন্ত একটা ঘর চাহিলাম, যে ঘরে আমি একাকী থাকিব। তাঁহারা দয়া করিয়া তাহা করিয়া দিলেন। আমি সেই ঘর আশ্রয় করিয়া পাঠে একেবারে মগ্ন হইলাম। প্রাতে একবার জানাহারের সময় বাহিরে বাইতাম ও রাতে আহানের সময় আধুটীর জন্ত বাইতাম। নতুবা দিনরাত্রি ঐ ঘরে বাপন

কবিতাম। এই আড়াই মাসেৰ মধ্যে শয্যাতে যাউ নাই। সন্ধ্যাব সময় চাকবেবা আলো জালিয়া দিয়া যাউত, সেই আলো সমস্ত বাত্ৰি থাকিত। বড় ঘুম পাইলে দুই চাৰি ঘণ্টা পুস্তক মাথায় দিয়া সেই ঘবেট ঘুমাইতাম। যতদূৰ শ্রবণ হয়, পাঠেৰ ঘণ্টা এইকপ ভাগ কবিয়া লইয়াছিলাম,—অঙ্ক ছয় ঘণ্টা, (দুই ঘণ্টা গ্রন্থ পড়া ও চাৰ ঘণ্টা অঙ্ক কৰা), ইতিহাস ছয় ঘণ্টা ইংৰাজী তিন ঘণ্টা, সংস্কৃত এক ঘণ্টা, লজিক দুই ঘণ্টা, সৰ্বশুদ্ধ প্ৰায় আঠাৰ ঘণ্টা এইকপ পড়িতে পড়িতে শৰাব ও মন সময় সময় বড় অবসন্ন হইবা পড়িত। তখন পড়া ফেলিয়া দিয়া বাহিৰে যাউতে ইচ্ছা কৰিত। সেই সময়ে যোগেন ও মহালক্ষ্মীৰ মুখ মনে কবিয়া মনে হুবস্তু প্ৰতিজ্ঞা আসিত। ভাবিতাম, যাহাদেব প্ৰধান উৎসাহদাতা হইয়া এই সংগ্ৰামেৰ মধ্যে ফেলিয়াছি, তাহাদেব সাহায্য কৰিতে না পাবিলে কিৰূপে নিশ্চিন্ত থাকিব ? প্ৰাণ থাক্ আব যাক, একবাৰ মৰণ-বাচন চেষ্টা কবিয়া দেখিতে হইবে। অমনি মনে প্ৰাৰ্থনাৰ উদয় হইত, “হে ঈশ্বৰ, এই সংগ্ৰামে আমাব সহায় হও।” তখন দিনেৰ মধ্যে বহুবাৰ প্ৰাৰ্থনা কবিতাম। লোকে যেমন শ্ৰমেৰ মধ্যে বাৰবাৰ চা খাইয়া সবল হয়, আমি তেমনি বাৰবাৰ প্ৰাৰ্থনা কবিয়া সবল হইতাম।

এইকপ শ্ৰম কৰিতে কৰিতে যখন আড়াই মাস পবে পৰীক্ষাব সময় আসিল, তখন দেখিলাম, এক ঘবে আড়াই মাস বন্ধ থাকিয়া ও নীচেৰ ঘবে শুইবা শুইবা কোমবে বাত ধৰিবাব উপক্ৰম হইয়াছে। পৰীক্ষা দিতে বাইবাব সময় একটা বালকেৰ কাঁধে হাত দিয়া পৰীক্ষাব হলে গেলাম ও পৰীক্ষা দিয়া আসিলাম। তখন ডিসেম্বৰেৰ শেষে পৰীক্ষা হইত।

মহালক্ষ্মীৰ মৃত্যু।—বোধ হয় ১৮৬৯ সালেৰ জানুৱাৰীৰ শেষভাগে পৰীক্ষাৰ ফল বাহিৰ হইল। তখন আমবা মহালক্ষ্মীৰ পীড়া লইয়া ঘোৰ সংগ্ৰামেৰ মধ্যে আছি। হঠাৎ ওলাউঠা পীড়া হইয়া মহালক্ষ্মী মৃত্যুশয্যাৰ শয়ানা। তাঁহাৰ পীড়া হইলে আমি বিভাসাগৰ মহাশয়েৰ পত্ন লইয়া

ডাক্তাৰ মহেন্দ্ৰলাল সবকাৰেব শবণাপন্ন হইলাম। তিনি আমাকে পূৰ্ণ হঠতেই জানিতেন ও ভালবাসিতেন। আমাৰ ব্যাকুলতা দেখিৱা প্ৰতিদিন মহালক্ষ্মীকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাৰ সাধো যতদূৰ হয় তাহা কবিতো বাকি বাখিলেন না। অবশেষে কয়েকদিনেৰ পৰা মহালক্ষ্মীৰ প্ৰাণ গেল। তখন তিনি ৮।৯ মাস কাল সসজ্জা। এইকপ অবস্থাতে মৃত্যু হওয়াতে প্ৰাণে বড়ই আঘাত লাগিল। মহালক্ষ্মীৰ মা ইহাৰ কিছু পূৰ্বে কাশী হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন আমাৰ গলা জড়াইয়া ধৰিবা “বাবা বে, এত কবেও বাঁচাতে পাবলি না বে,” বলিয়া চীৎকাৰ কৰিয়া কাঁদিত লাগিলেন, যোগেন বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া বহিলেন, এবং ঈশান পাগলেৰ মত ঘৰ হইতে বাহিৰ, বাহিৰ হইতে ঘৰ কবিতো লাগিলেন, তখন আমি আব মহালক্ষ্মীৰ জন্ত কাঁদিব কি ? ইহাদিগকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সেই ক্ষেত্ৰেই সংবাদ আসিল যে, আমি এল-এ পৰীক্ষাৰ ইউনিভাৰ্চিটীৰ First grade স্কলাৰশিপ ৩২, ইংৰাজী ও সংস্কৃত ইউনিভাৰ্চিটীতে সৰ্বোচ্চ স্থান অধিকাৰ কৰাতে (Duff) ডফ স্কলাৰশিপ ১৫, ও সংস্কৃত কলেজেৰ প্ৰথম স্কলাৰশিপ ১২, সৰ্বসমেত ৫৯ টাকা বৃত্তি পাইয়াছি। যাহাদিগেৰ জন্ত সংগ্ৰাম কবিতোছিলাম জগদীশ্বৰ তাহাদিগকে সবাইয়া লইলেন ভাবিয়া আমাৰ চক্ষে জলধাৰা বহিতে লাগিল। কিন্তু তখন বুঝিনাই যে তিনি অজ্ঞ এক সংগ্ৰামেৰ জন্ত পূৰ্ণ হইতেই উপায় বিধান কৰিলেন। সে সংগ্ৰাম ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মে দোক্ষা ও পিতৃগৃহ হইতে নিৰ্ভাসন। তাহাৰ বিবৰণ পৰে বলিব।

মহালক্ষ্মী চলিয়া গেলে, যখন তাহাৰ মা আমাৰ গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, “বাবা, তুমিও কি আমাদিগকে ছেড়ে বাবে ?” তখন আব তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পাবিলাম না। ভবানীপুৰ ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহা-দেৰ সঙ্গে আবাৰ কয়েক মাস বহিলাম। কিন্তু ইহাৰ কিছুদিন পৰেই যোগেনেৰ বাসা তালিয়া গেল, আমাৰ স্বতন্ত্ৰ স্বতন্ত্ৰ স্থানে পড়িলাম,

আমাদের জীবনের গতিও পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল। মহানন্দ্রীর শোকটা আমার বড়ই লাগিয়াছিল।

গুরুতর শ্রমের ফলে পাড়া।—মহানন্দ্রী চলিয়া গেলে, পাঠে গুরুতব শ্রমেব ফলস্বরূপ আমার একপ্রকার পীড়া দেখা দিল। অতিবিক্ত দুর্কলতার সঙ্গে সর্বোচ্চে সাদা সাদা চাকা চাকা একপ্রকার ফোলা মাংস দেখা দিল; সে গুলিতে আঘাত কবিলে বেদনা অল্পভব কবিতে পারিতাম না। কোন কোন ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, কুষ্ঠব্যাধি হইবার উপক্রম। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সবকাল আমাকে অতিবিক্ত শ্রমেব জগ্ন তীব্রত্ব কবিয়া ছয়মাস কাল তন্ননস্ক হইয়া চিকিৎসা কবিলেন, এবং আমাকে বোগমুক্ত কবিয়া তুলিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবাবিবাহ দেওয়া।—অতঃপব উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবা-বিবাহেব বিবরণ লিখিতেছি। এই ঘটনাটি বোধহয় ১৮৬৮ সালের মধ্যভাগে ঘটিয়াছিল। হাইকোর্টের উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস তখন কলিকাতায় যুবক বিকস্মাবদেব মধ্যে, একজন প্রধান ব্যক্তি। তৎপূর্বে তিনি মাস্ত্রাজ হইতে ফিবিয়া আসিয়া Indian Radical League নামে একটা সভা স্থাপন কবিয়া তাহাব সভাপতিরূপে কার্য্য কবিতেছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, কোনও পাবিবাবিক কাবণে স্বীয় পিতাব সহিত বিবাদ কবিয়া উপেন্দ্র মাস্ত্রাজে পলায়ন কবেন। মাস্ত্রাজ হইতে আসিয়া উৎসাহেব সহিত যুবক সংস্কারকদিগেব নেতা হইয়া দাঁড়ান। যোগেন যখন বিধবা-বিবাহ কবিলেন, তখন উপেন যোগেনকে ও আমাকে একদিন নিজ সভাতে উপস্থিত কবিয়া সর্বসমক্ষে বিশেষ সম্মানিত কবিলেন। যুবকগণের করতালিৰ ধ্বনিতে আমাদের লাঙ্গুল ক্ষীত হইয়া উঠিল। আমবা মন্ত একটা বিকস্মার হইয়া দাঁড়াইলাম। উপেন সংস্কৃত কলেজেব ছেলে, আমরাও সংস্কৃত কলেজেব ছেলে, সুতবাং এই সময় হইতে উপেনেব সহিত আমাদের একটা ঘনিষ্ঠতা

জন্মিল। যোগেন উপেনেব কাছে যাইবাব জন্ত সময় বড় পাইতেন না, কিন্তু আমি ও উমেশচন্দ্র মুখুয্যে দুজনে সৰ্ব্বদা তাঁহাব বাড়ীতে বাইতাম, ও উপেনেব মুখনিঃসৃত ইয়ুবোপীয় ফিলজফী ও সংস্কাৰেব স্নসমাচার হাঁ করিয়া গলিতাম। সময়ে সময়ে আমি উপেনেব বাড়ীতে যাত্ৰিযাপন কৰিতাম।

তাঁহাব সহিত একটু বিশেষ যোগ হইবাব কাৰণ ছিল। আমাব দ্বিতীয়া পত্নী বিবাজমোহিনীকে পুনৰ্বাব বিবাহ দিবাব যে খেয়াল এ সময়ে আমাব মাথাৰ ঘূৰিতেছিল, উপেন সে খেয়ালেব অংশী হইয়া সৰ্ব্বদা নানাপ্রকাৰ পৰামৰ্শ কৰিতেন। একদিন বাত্ৰে আমি উপেনেব বাড়ীতে শুইয়াছি, উপেন বাত্ৰে আমাকে বলিলেন, “অত কেন ভাবিতেছ ? তোমাব দ্বিতীয়া পত্নীকে ঢাকা কি কাশী কি লাহোৰ কোনও দূৰ দেশে লইয়া অবিবাহিত বলিয়া বিবাহ দিয়া এস। তাবপৰ তাৰা সেই দিকেই থাকুক। হলোই বা বেআইনি কাজ ?” আমি বলিলাম, “সে যে মিথ্যা ও প্ৰবঞ্চনা হয়।” উপেন বলিলেন, “মিথ্যা দুই প্ৰকাৰেব আছে, white lies and black lies ; ওটা white lie ।” “White lie, black lie” কথা আমি সেই প্ৰথম শুনিলাম। আমি আশ্চৰ্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলাম, “উপেন, মিথ্যাৰ আৰাব white black কি বকম ?” তখন তিনি আমাব নিকটে white lieএব ব্যাখ্যা কৰিতে প্ৰবৃত্ত হইলেন। সে সকল কথা আমাব মনঃপূত হইল না। আমি বলিলাম, এইৰূপ প্ৰবঞ্চনা কৰিতে পাবিব না।

আমি জীবনে আৰ-একজন মানুহকে white liesএর সমৰ্থন কৰিতে শুনিয়াছি। তিনি মাডাম দ্বাভাট্‌স্কি। তিনি আমাব একজন বন্ধুৰ সমক্ষে white lies সমৰ্থন কৰিয়াছিলেন, তাহা বিশিষ্টৰূপে অবগত আছি, এইজন আত্মবক্তিকৰূপে এ কথাৰ এখানে উল্লেখ কৰিতেছি যে, যে-দুই ব্যক্তিকে white lies সমৰ্থন কৰিতে শুনিয়াছিলাম, সেই দুইজনকেই পৰিণামে যোৱা প্ৰবঞ্চনা অপৰাধে অপৰাধী দেখিয়াছিলাম।

মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি মহাশয়কে নামে চিঠি জাল কবির অপবোধে অপরাধী হইয়া এদেশ ত্যাগ কবিতো বাধ্য হন ; উপেন্দ্রনাথ দাস এদেশে অনেক প্রকাব প্রবঞ্চনা কবিতা বিলাতে গিয়া সেই অপবোধে কয়েদ হন। যাহাহউক, তখন উপেনেব white liesএব সমর্থন শুনিয়া প্রতিবাদ কবিতাছিলাম বটে, কিন্তু উপেনকে পবিত্যাগ কবি নাই।

বেঞ্চহর এই ১৮৬৮ সালেব মধ্যভাগে উপেনেব প্রথম জীব হঠাৎ মৃত্যু হইল। কল্পে মৃত্যু হইল, বুকিতে পাবা গেল না। কাবণ ডাক্তাব দেখাইবাব সময় হইল না। উপেনেব মুখে শুনিলাম, হঠাৎ কলেবা হইয়া কয়েক ঘণ্টাব মধ্যে মাবা গেলেন।

শোকটা পুৰাতন হইতে না হইতে একদিন দুপূব বেলা উপেন কাঁতপয় বন্ধু সহ সংস্কৃত কলেজে আসিয়া আমাকে এল-এ ক্লাস হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, “তুমি শুনিয়া সুখা হইবে, আমি এক বধবাকে বিবাহ করতে যাচ্ছি। মেয়েটি ভবানীপুবে আছে, চুবি কবে আনতে হবে। তার মায়ের মত আছে, কিন্তু মামা অভিভাবক, তাঁর মত নাই।” মেয়ে এইরূপে চুবি কবা ভাল কি না, আনিয়া কোথায় বাখা হইবে, কবে কল্পে বিবাহ হইবে, এ-সকল প্রশ্ন মনে উঠিল না ; মেয়ে চুবি কবিতাই বিধবা-বিবাহ দেওয়া যাইবে, এই উৎসাহেই কলেজ হইতে বিদায় লইয়া তাঁহাদের সহিত যাত্রা কবিতাম।

আমবা তিনটা যুবক, গাড়িতে মেয়েটাব জায়গা মাত্র আছে। গাড়ি গিয়া ভবানীপুবে এক গলিব মোড়ে দাঁড়াইল। কথা ছিল, মেয়েটাব জোষ্ঠা ভগিনী দিবা দ্বিপ্রহবেব সময় তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া যাইবে। তাহা হইল না, আমরা অনেককাল দাঁড়াইয়া বহিতাম, মেয়েটা আসিল না। পরে সংবাদ পাওয়া গেল, মেয়েটি দিনের বেলা আসিতে পারিল না, সন্ধ্যার পরে আবার আসিয়া অপেক্ষা কবিতো হইবে। কর্কোঙ্কার না কবিতা বাড়ীতে ফেরা হইবে না, এই পরামর্শ ছিল হওয়াতে আমরা গাড়ি ফাঁকাইয়া

ইডেন গাৰ্ডনে গেলাম, এবং পাঁউৰুটি ও কলা কিনিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া উত্তমৰূপে টিফিন কৰিলাম। সন্ধ্যা অতীত হইলে আৰাব গাড়ি কৰিয়া সেই গলিব মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্ৰায় বাত্ৰি দশটা বাজিয়া গেল, মেয়েৰ দেখা নাই। অবশেষে ত্ৰইটা স্ত্ৰীলোক আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম, তাহাব একজন ঐ মেয়ে এবং অপৰ জন ঐ মেয়েটীৰ জ্যেষ্ঠ সহোদৰ। মেয়েটী আমাদেৰ গাড়িতে উঠিলেন। যেই উঠা অমনি আমবা উৰ্দ্ধ্বাসে গাড়ি হাঁকাইলাম।

উপেনেৰ আদেশক্ৰমে গাড়ি গিয়া তাঁহাব সম্পাদিত সন্ধ্যাপত্ৰেৰ প্ৰেস ও আপীসেৰ দ্বাৰে লাগিল। মেয়েটীকে সেখানে গিষা নামান তইল। সেটা আপীস ও পুৰুষদেৰ বাসা, স্বালোকেৰ বাসেৰ যোগ্য নহে। আম দেখিলাম মেয়েটী কাপিতেছে। তখন আমাব হাঁস হইল। আমি উপেনকে জিজ্ঞাসা কৰিলাম, “কবে বিয়ে হবে, আব ততদিন এঁকে কোথায় বাখা হব?” উপেন বলিলেন, “বিবাহ কাল বাত্ৰে হবে, আব শুঁকে সে পৰ্য্যন্ত এখানেই বাখা যাবে।” তখন আমি বাগিয়া উঠিলাম, বলিলাম, “তা কখনই হবে না, এমন জান্‌ল আমি একাজে থাক্‌তাম না। এই পুৰুষেৰ দলে ও মাতালেৰ মধ্যে একে বাখা হবে, তা হইতে পাবে না।” এখানে বলা কৰ্ত্তব্য, উপেন সুৰাপান কৰিতেন না, সুৰা দুৰে থাক, চুৰুট পৰ্য্যন্ত কখনও খাইতে দেখি নাই। এ সকল বিষয়ে তাঁহাব আশ্চৰ্য্য সংবম ছিল। কিন্তু তাঁব বন্ধুদেৰ মধ্যে সুৰাপায়ী ছিল। যতদূৰ স্মৰণ হয়, সেই ভবনেই আব-এক ঘৰে সুৰাপান চলিতেছিল। তাহা দেখিয়া মেয়েটীকে সেখানে বাখা বিষয়ে আমাব মনে ঘোৰ আপত্তি উঠিল। অবশেষে অনেক তৰ্ক-বিতৰ্কেৰ পৰ উপেন আমাকে বলিলেন “তবে তুমি যেখানে পার, একবাত্ৰেৰ জন্ত এঁকে ৰেখে এস।” আমি মুৰ্ছিলে পড়িলাম, সংস্কারক দলেৰ কোনও পৰিবাৰেৰ সহিত আমাব সন্মত আপাত ছিল না। মেয়েটীকে কোথায় লইয়া যাই? কলিকাতাৰ ব্ৰাহ্মনেতাৱিগেৰ মধ্যে কিছুদিন পূৰ্বে

শুক্ৰচৰণ মহলানবিশ মহাশয়েৰ সহিত পৰিচয় হইয়াছিল। তাঁহাকে অভ্যাগ্ৰসব সংস্কাৰক দলেৰ লোক বলিয়া জানিতাম। সেই বাত্ৰি ত্ৰিপ্রহবেৰ সময় সেই কত্থাকে গাড়ি কবিয়া লইয়া মহলানবিশ মহাশয়েৰ পৰিবাবে বাখিতে গেলাম। তিনি আত্মপুৰ্ণিক সমুদয় বিবৰণ শুনিয়া কত্থাটাকে এক বাত্ৰিব জন্ত স্থান দিলেন।

তুৎপবদিন খিচুড়ী বিবাহ হইল। একুপ শোনা গেল, মেয়েটী কায়স্থজাতীয়া, যদিও পবে জানা যায় যে তাহা নহে, তদপেক্ষা নিম্নজাতীয়া। কায়স্থদেব কত্থা, ইহা শুনিয়া উপেনেৰ মনে হইল, তবে বিত্ৰাসাগৰ মহাশয়েৰ মতে বিবাহ কবিলে আইনসিদ্ধ হইতে পাৰে। সুতৰাং পবদিন প্ৰাতেই বিত্ৰাসাগৰ মহাশয়েৰ মতে বিবাহেৰ বন্দোবস্ত হইল। তদনুসাৰে, পুৰোহিত ও ঠাকুৰ আসিয়া একটা বিবাহক্ৰিয়া হইল। আবার এদিকে উপেন সহবেৰ বড় বড় লোকদিগকে নিমন্ত্ৰণ কবিয়া এক মহাসভাৰ আয়োজন কবিয়াছিলেন। সেথানকাৰ জন্ত ত কিছু কৰা চাই। স্থিৰ হইল সেখানে একটু ঈশ্বৰোপাসনা হইবে, ও বৰকত্থা উভয়ে একটা লেখাপড়াতে স্বাক্ষৰ কৰিবেন। কিন্তু উপাসনা কৰিবে কে? আমি অথবা উমেশ মুখ্যে; কাৰণ, এই দুইটা ঐ যুবকদলেৰ ব্ৰাহ্ম বলিয়া পৰিচিত। আমাদেৰ সঙ্গে আৰ একজন ব্ৰাহ্ম ছিলেন, তিনি প্যাৰীমোহন চৌধুৰী, যিনি পবে আচাৰ্য্য কেশবচন্দ্ৰ সেন মহাশয়েৰ প্ৰেৰিত দলে প্ৰবেশ কবিয়াছিলেন। এই তিনজন ব্ৰাহ্মেৰ মध्ये কেন যে আমাব দ্বাৰা উপাসনা কৰান সকলেৰ মত হইয়াছিল, তাহা আমাব স্মৰণ নাই। যতদূৰ মনে হয়, এ পৰামৰ্শ বিবাহেৰ কিঞ্চিৎ পূৰ্বে স্থিৰ হয়, এবং আমি শেষ মুহূৰ্ত্ত পৰ্য্যন্ত জানিতে পাৰি নাই।

আমি ওদিকে কত্থা আনিতে গিয়া একদল মাতালেৰ হাতে পড়িয়া টানটানিৰ মধ্যে আছি। আমি যে গাড়িতে কবিয়া কত্থাকে আনিতে-ছিলাম সেই গাড়ি ও আৰ-একখানি গাড়ি একটা ছোট গলিৰ মধ্যে দুই

দিক হইতে আসিয়া পাশাপাশি পাব হইতে গিয়া চাকায় চাকাষ আটকাইয়া গেল। কোনও খানি বাহিব হয় না। আমি গাড়ি হইতে নামিয়া চাকা টানাটানি কবিতেছি, এমন সময় একদল মাতাল আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন আমার পবিচিত। মাতালেবা আমাকে জিজ্ঞাসা কবিল, “একি বাবা। বাস্তা আটকেছ কেন?” যখন কাবণ নির্দেশ কবিলাম, তখন সকলে কাঁধ দিয়া গাড়ি ছাড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। একবার জিজ্ঞাসা কবিল, “Is there any gentlewoman, বাবা?” আমি বলিলাম, “হাঁ।” তাব পবে আব কেহ গাড়িব দ্বাবেব কাছেও যায় না, এতই সস্ত্রম দেখাইতে লাগিল। সকলে পড়িয়া কাঁধ দিয়া গাড়ি ত ছাড়াইয়া দিল; কন্ডাব গাড়ি চাকবেব সহিত বিবাহ-সভা অভিমুখে ছুটিল; এদিকে মাতালেবা চাবি পাঁচ জনে পড়িয়া আমাকে ধবিল, “এত কবে গাড়ি ছাড়ালাম, বাবা, কিছু দিতে হবে।” তখন আমার মনে ছিল না যে, আমার পকেটে একটা টাকা আছে। আমি অনেক অনুন্য বিনয় কবিলাম, বিবাহ-সভাতে যাইতে বলিলাম, কিছুতেই বাজি নয়, আমার চাদব কাড়িয়া লইতে উত্তত। আধঘণ্টা টানাটানিব পব মনে হইল যে সঙ্গে একটা টাকা আছে। টাকাটা দিয়া নিষ্কতি পাইয়া, বিবাহসভাতে যেই গিয়া উপস্থিত, অমনি শুনিলাম, আমাকে সভামধ্যে উপাসনা কবিতে হইবে, সকলে উৎসুক অন্তবে অপেক্ষা কবিতেছে।

সে কি উপাসনা কবিবাব অনুকূল অবস্থা? আমি শুনিয়া অস্বীকৃত হইলাম। কিন্তু শোনে কে? তৎপূর্বে কখনও প্রকান্ত স্থানে উপাসনা কবিয়াছিলাম, এক্রপ স্রবণ হয় না। যে লাজুক ছিলাম, বোধ হয় করি নাই। লাজুক ছিলাম, এই কথাটি পড়িয়া বন্ধুদেব অনেকে হয় ত মনে মনে হাসিবেন। কাবণ তাঁহাবা আমাকে এ-সকল বিষয়ে ও অস্তান্ত বিষয়ে চিবিদিন বেপবোয়া ও বেহায়া দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তখন আমি উপাসনাদি বিষয়ে বাস্তবিক বড় লাজুক ছিলাম। সেই মাজুক্ ধরিয়া

লইয়া যখন সভামধ্যে চেয়াবে বসাইয়া দিল, তখন কি হইল, তাহা সকলেই অনুভব কবিতে পাবেন। প্রথমেই গিয়া শুনিলাম, গান হইতেছে, “মনে কব শেষেব সে দিন ভয়ঙ্কর; অগ্রে নাক্য কাব, কিন্তু তুমি ববে নিকন্তব।” যেমন উপাসনাব আয়োজন, তেমনি গান। পবে শুনিলাম, যাহাকে গান কবিবাব জ্ঞাত ধরিয়া আনিয়াছিল, সে ব্যক্তি ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে বামমোহন বায়েব গানই জ্ঞানিত, তাই গাইতৌছিল। গান শেষ হইলে আমি প্রার্থনা কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার প্রার্থনাব মধ্যে সভাস্থল হইতে কবতালিৰ চটপটা ধ্বনি উঠিতে লাগিল। এই জ্ঞাত এ বিবাহ-অনুষ্ঠানকে খিচুড়ীবিবাহ বলিয়াছি। উপাসনাব পব এক কাগজে ববকথা স্বাক্ষর কবিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, সাক্ষ্যদেব মধ্যে শ্রদ্ধেয় বন্ধু আনন্দমোহন বসু একজন ছিলেন। তখন কিন্তু তাহাব সহিত আমার আলাপ পাঁচয় হয় নাই।

বিধবাবিবাহের পর উপেন্দ্রনাথ দাসেব সহিত সম্বন্ধ।—বিবাহেব পব উপেনেব সহিত ও তাহাব নবপরিণীতা স্ত্রীৰ সহিত আমার সম্বন্ধ আবও গাঢ় হইল। আমি সৰ্ব্বদাই তাহাদিগেব সংবাদ লইতাম, এবং কিছু কাজ পড়িলে কবিয়া দিতাম। এই সময় হইতে উপেনকে নানাপ্রকাৰ প্রবঞ্চনা-দোষে লিপ্ত দেখিতে লাগিলাম। ঋণশোধেব প্রতি দৃষ্টি না বাঁখিয়া ধাব কবা, বাড়ীভাড়া কবিয়া ভাড়া না দিয়া বাতাবাতি পলাইলা অথ বাড়ীতে যাওয়া, ইত্যাদি। দুই একবাব নিজে কর্জ কবিয়া টাকা দিয়া একরূপ অবস্থা হইতে তাহাকে সপবিবাবে উদ্ধার কবিতে হইল। তথাপি তাহাব প্রতি বিশ্বাস ভাঙিতে অনেক দিন গিয়াছিল। একবাব বাত্রি দুইটাব সময় উপেন সপবিবাবে পলাইয়া কলিকাতা হইতে অমৃতবাজ্রাবেব শিশিবকুমাব ঘোষেব বাড়ীতে যান। তখন শিশিববাবুবা অগ্রসব সংস্কারক ও ব্রাহ্ম ছিলেন। সেই বাত্রে আমি যোগেন ও উমেশ মুখুয্যে সশস্ত্র হইয়া তাঁদেব স্ত্রীপুত্রকে আগুলিয়া নাবিকেলডাক্তার খালে নৌকায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। এখন মনে হইলে হাসি পায়



পণ্ডিতবৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর

ইহাব পব ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র কিছুদিনেব জন্ত নিজ ব্যয়ে উপেক্ষ ও তাহার স্ত্রীকে কাশীতে নিজভবনে লইয়া যান, এবং তাহাদেব ভরণ পোষণ নির্বাহ কবিতে থাকেন। এইরূপে এক বৎসবেব অধিক কাল গত হয়। সেখানে উপেন গোপনে দেনা কবিয়া লোকনাথবাবুকে ঋণগ্রস্ত করিয়া পীড়িত অবস্থায় কলিকাতায় আসেন। আসিয়া কিছুদিন আমাব বাড়ীতে থাকেন। ইতা যদিও পরবর্ত্তী কালের ঘটনা তথাপি এখানেই তাহার বিবরণ দিতেছি। আমি তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনেব নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া, পিতাকর্তৃক গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, কলিকাতায় কলেজ স্কোয়াবেব উত্তবে একটা গলিতে একজন ব্রাহ্ম-বন্ধুব সতিত একগৃহে বাস কবিতেছিলাম। আমাব কলেজেব স্কলারশিপ মাত্র ভবসা। তাহাতে একটা ঘব ভাড়া কবিয়া কোনও রূপে চালাইতেছিলাম। ইহাব মধ্যে উপেক্ষনাথ আমাকে সংবাদ না দিয়া, গুরুতব পীড়া লইয়া স্ত্রী ও একটা শিশু পুত্র সহ কাশী হইতে আসিয়া আমার বাসাৰ দ্বাবে উপস্থিত। আমি সংবাদ পাইয়া উপেনকে সপরিবারে গাড়ি হইতে নামাইয়া, নিজেব ঘবে আনিলাম। একজন বন্ধু আমাব পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি এই বিপদেব অবস্থা দেখিয়া তাঁহাব ঘর ছাড়িয়া দিয়া অন্ত্র গেলেন। আমি উপেনের চিকিৎসাব জন্ত অন্নদাচরণ খাস্তগিব মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি বিনা পরসায় উপেনেব চিকিৎসাব ভাব লইলেন।

বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের মহামুভবতা। (১) পিতা পুত্রে মিলন সংঘটন।—এইসময় বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের সদাশয়তার এক নিদর্শন পাই, তাহা স্মরণ বাধিবার যোগ্য। আমার বাড়ীতে আসিয়া উপেনের পীড়া বৃদ্ধি পাইল। এমন কি, তাহার জীবনেব সম্বন্ধে আমবা নিরাশ হইতে লাগিলাম। এই অবস্থাতে উপেন একদিন আমাকে বলিলেন, “যদি আমাব বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিলে দিতে পাব, বড় ভাল হয়। আমি বোধ হয় পাই

বেশী দিন বাঁচব না।” শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ পৰিচয় ছিল না, স্মৃতবাং আমি নিজে গিয়া অম্বুবোধ কবিত্তে পাবি না ; কি কৰি ? এই চিন্তায় প্ৰবৃত্ত হইলাম। অবশেষে মনে হইল, বিজ্ঞাসাগৰ মহাশয়ের দ্বাৰা শ্রীনাথ দাস মহাশয়কে ধৰিষা আনিতে হইবে। তাই একদিন প্ৰাতে বিজ্ঞাসাগৰ মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি যে উপেনেব গুট চৰিত্ৰের কথা পূৰ্বেই শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়া তাহাব প্ৰতি হাতে চটিয়া ছিলেন, আমি তাহা জানিতাম না। আমি উপেনেব সংশ্ৰবে থাকি ও তাহাকে বাড়াতে স্থান দিয়াছি শুনিষাই তিনি আমাকে অনেক তিবন্ধাব কবিলেন ; বলিলেন, “কি। যাকে দেখ্লে পা থেকে মাথা পৰ্য্যন্ত জুতা মাৰতে ইচ্ছা কবে, তাব হয় তুই আমাকে অম্বুবোধ কবিস্ ?” আমি বলিলাম, তাঁহা দ্বাৰা এ কাজ হইবে না। আমি বলিলাম, “আপনি বাপ-বেটায় দেখা কবিয়ে না দিলে আব কারু দ্বাৰা হবে না। তবে আমি যাঠ। কি আব কব্ব। উপেনেব শেষ অম্বুবোধটা বাধ্তে পাবা গেল না।” এই বলিয়া উঠিতে প্ৰবৃত্ত হইলাম। আমাকে বিবস বদনে উঠিতে দেখিয়াই বিজ্ঞাসাগৰ মহাশয় বলিলেন, “যাস্নে, বোস্ ; মবলকালে বাপকে দেখ্তে চেয়েছে, শুভবুদ্ধি হব্বেছে, এটাও ভাল ; দেখি কিছু কবতে পাবি কি না।” একটু চিন্তা কবিয়াই বলিলেন, “কাল প্ৰাতে ৭টা ৮টাৰ মধ্যে তাব বাপকে তোব বাড়ীতে আন্ব, তুই ঘবে থাকিস্।” আমি চলিয়া আসিলাম।

তৎপৰ দিন বিজ্ঞাসাগৰ মহাশয় যে কবিয়া শ্রীনাথ দাস মহাশয়কে আমার বাসাতে আনিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাব বিববণ এই। সেই দিন প্ৰাতে সাতটাৰ সময় বিজ্ঞাসাগৰ মহাশয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়া শ্রীনাথ বাবুকে বলিলেন, “শ্রীনাথ, তোমাব গাড়ি যুততে বল দেখি, তোমাকে এক জায়গায় বেতে হবে।” শ্রীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কোন্ জায়গায় ?” বিজ্ঞাসাগর

মহাশয় বলিলেন, “আঃ চল না ; বাস্তায় বন্দব ।” শ্রীনাথ বাবু গাড়ি যুতিতে আদেশ করিলেন । দুই জনে গাড়িতে বসিয়া শ্রীনাথ বাবুদেব গলি হইতে বাহির হইয়া বড় বাস্তায় আসিলে বিজ্ঞাসাগব মহাশয় বলিলেন, “কোথায় নিয়ে যাচ্ছি জান ? তোমাব ছেলে উপেন পীড়িত হয়ে কাশী থেকে এসে এক বন্ধুব বাসায় উঠেছে । তাব ব্যায়বাম বড় শক্ত, বাঁচে কি না সন্দেহ । সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে তোমাকে দেখতে চেয়েছে । তাই তাব বন্ধুব অনুবোধে তোমাকে নিতে এসেছি ।” এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু বাগিয়া উঠিলেন । বলিলেন, “কোচম্যান গাড়ি ফেবাও ।” তাহা শুনিয়া বিজ্ঞাসাগব মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, “গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও, আমি নাম্ব ।” কোচম্যান গাড়ি থামাইলে তিনি যখন নামিতে যান, তখন শ্রীনাথ বাবু তাঁব হাত ধরিয়া বলিলেন, “এ কি ? তুমি নাম যে ?” বিজ্ঞাসাগব মহাশয় বলিলেন, “আমায় ছাড়, ছাড় ! তোমাব সঙ্গে আমার এই শেষ বন্ধুতা । ছেলে যতই বিবাগভাজন হোক, সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে বাবাকে দেখতে চেয়েছে , তুমি কিরূপ বাপ যে এমন সময়ও দেখা দিতে চাও না ।” এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু ধীর হইয়া বসিলেন, এবং কোচম্যানকে গাড়ি চালাইতে বলিলেন । ক্রমে তাঁহাবা আমাব বাড়ীতে আসিলেন । শ্রীনাথ বাবু পুত্রকে দেখিয়া চলিয়া গেলে বিজ্ঞাসাগব মহাশয়ের মুখে এই বিববণ শুনিলাম ।

যাহা হউক, পিতা-পুত্রে দেখা হইল । উপেন পিতাকে কি বলিলেন, জানি না । আমি সেখানে ছিলাম না । শুনিলাম, মাপ চাহিয়াছিলেন । তাহাব প্রমাণও দেখিলাম , তাহাব পবে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন । শ্রীনাথ বাবু চলিয়া গেলে বিজ্ঞাসাগব মহাশয় ঠাড়াইয়া আমাকে উপেনেব আর্থিক অবস্থাব বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । তাহার কর্দক মাত্রও সঞ্চল নাই শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন । আমাব হাতে ১০৭ টাকা দিয়া বলিয়া গেলেন, “দেখিস, ওর দ্বী পুত্র যেন না ক্রেশ পায় ।

টাকাৰ অভাব হলে আমাকে বলি। তুই কিৰূপে এত ব্যয় দিবি ?” যাব প্ৰতি এত জাতক্ৰোধ ছিলেন, তাহাবই দ্ৰুতবে কথ। শুনিয়া তাহাব চক্কে জলধাবা পড়িল, কি দয়া।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য আছে। এই সময়ে আমি সৰ্বদা উপেনেব সাহায্যেৰ জন্ত বন্ধপৰিকৰ হইতাম বলিয়া আমাকে অনেক উপহাস বিৰূপ ও ভৎসনা কৰিতেন। তাহাবা তাহাব বিৰুদ্ধে গোপনে কি শুনিয়াছিলেন, তাহা তখন জানিতাম না, কিন্তু উপেনেব পত্নীৰ মুখেৰ দিকে চাহিয়া সকল প্ৰতিবাদ যেন ভুলিয়া যাইতাম। তামিতাম, এই মেয়েকে এই পথে আনিবাব বিষয়ে আমি সাহায্য কৰিয়াছি, এখন ক্ৰেশেৰ মধ্যে দুবে দাঁডান কি আমাব পক্ষে উচিত হয় ? এই জন্ত পুত্ৰ সহ বাড়ীতে তাহাকে স্থান দিতাম, নিজে ঋণ কৰিয়া উপেনেব ঋণ শুধিবা তাহাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে বাঁচাইতাম, সৰ্বদা তাহাদেব বাড়ীতে সংবাদ গইতাম ; কিছুতেই আমাকে বিচলিত কৰিতে পাবিত না। তখন তাহাদেব জন্ত যে ঋণ কৰিয়াছিলাম, তাহা শুদ্ধিতে আমাব বহুদিন গিয়াছে। তাহাদেব বিষয়ে আমাব দায়িত্ব যখন শ্ৰবণ কৰিতাম, তখন যথাসাধ্য সাহায্যেৰ জন্ত বন্ধপৰিকৰ হইতাম। ইহাব কয়েক বৎসৰ পবে উপেন বিলাতে যান, ও সেখানে প্ৰবঞ্চনা-দোষে লিপ্ত হইয়া কয়েদ হন। এদেশে ফিবিয়া দেশীয় বক্তৃত্বমিৰ অভিনেতা ও অভিনেত্ৰীদিগেব সহিত মিলিত হইয়া কোনও প্ৰকাৰে কিশিৎ অৰ্থোপাৰ্জ্জনেৰ প্ৰয়াস পান। এই সময়ে তাঁৰ পুৰাতন বন্ধুবা সকলে তাঁহাকে পবিত্যাগ কৰেন। আমিও সেই সঙ্কে উপেন হইতে দুবে পড়ি।

বিজ্ঞানাগৰ মহাশয়েৰ মহানুভবতা। (২) ছুতৰেৰ বিধবা মেয়ে।
—এইখানে বিজ্ঞানাগৰ মহাশয় সংক্ৰান্ত আৰ একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যোগেন ও মহানুভৱীৰ সহিত একত্ৰ বাসকালে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। যোগেনেৰ বিবাহেৰ কিছুদিন পবে আমবা চাপাতলাৰ দ্বিতীয় পূৰ্ববৰ্ত্তী

একটা বাড়ীতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলাম। সেখানে বিদ্যাসাগর সপ্তাহে দুই তিন দিন আসিয়া আমাদেরকে দেখিতে লাগিলেন এবং আবশ্যকমত সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেই পাড়াতেই পাশের বাড়ীতে একটা ছুতব জাতীয় * বিধবা স্ত্রীলোক থাকিত, তাব একটা ছয় সাত বৎসর বয়স্কা মেয়ে ছিল, সেটাও বিধবা। তাব মা যখন শুনিল যে আমরা মহালক্ষ্মীর বিধবা-বিবাহ দিয়াছি, তখন তাহাব ইচ্ছা হইল যে নিজের বিধবা মেয়েটাব আবাব বিবাহ দিবে; আমাদেরকে সেই ইচ্ছা জানাইল। মেয়েটা সকাল বিকাল আমাদের বাড়ীতে আসিতে ও আমাব সঙ্গে যাপন করিতে লাগিল। আমাদের দাদা বলিয়া ডাকিত এবং আমার গলা জড়াইয়া আমাব কোলে বসিয়া থাকিত। একদিন প্রাতে সে আমার গলা জড়াইয়া কোলে বসিয়া আছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিলেন। মেয়েটাকে অগ্রে তিনি দেখেন নাই; আমার কোলে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “ও মেয়েটা কে হে? বাঃ বেশ সুন্দর মেয়েটা ত।” আমি বলিলাম “ওটা পাশের বাড়ীর একটা ছুতরের মেয়ে, আমাদের দাদা বলে, আমার কোলে বসিতে ভালবাসে। ওটা বিধবা, ওব মা ওর বিয়ে দিতে চায়, তাই আমাদের কাছে দিয়েছে।” এই কথা শুনিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় চম্কাইয়া উঠিলেন; “বল কি! এইটুকু মেয়ে বিধবা!” তাবপর তাকে ডাকিলেন, “আয় মা, আমার কোলে আয়।” সে ত লজ্জাতে বাইতে চায় না, আমি কোলে করিয়া

গ্রন্থকার Modern Review পত্রিকার Men I have Seen শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিবার সময় বিন্যস্তবশতঃ এই স্ত্রীলোকটাকে নাপিত জাতীয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তৎপরে আশ্চর্যজনক লিখিবার সময় এই প্রসঙ্গোপলব্ধ করেন। Men I have Seen পুস্তকে (1919 Edition, page 12) পত্রিকার প্রবন্ধের সেই ভুল রহিত পিরাছে।—(সম্পাদক)

ঠাহার কোলে বসাইয়া দিলাম। বিষ্ণুসাগর মহাশয় তাহাকে বুক ধরিয়া আদব করিতে লাগিলেন; শেষে বাইবার সময় মেয়েটাকে ও তাহার মাকে পাল্‌কী করিয়া তৎপবদিন বৈকালে ঠাহার ভবনে পাঠাইবার জন্ত অহুবোধ করিয়া গেলেন, এবং আমাকে বলিয়া গেলেন, “মেয়েটাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দেও, মাহিনা আমি দেব।”

পরদিন বৈকাল বেলা মেয়েটাকে ও তার মাকে পাল্‌কী করিয়া বিষ্ণুসাগর মহাশয়ের বাটীতে পাঠান গেল। তাহাবা সন্ধ্যাব সময় আসিয়া বিষ্ণুসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী দেবীর যে প্রশংসা করিল, তাহা শুনিয়া আমাদের মন পুলকিত হইয়া উঠিল। শুনিলাম, ভগবতী দেবী ছুতবেব মেয়ে বলিয়া তাহাদিগকে স্মরণ করা দূরে থাকুক, মেয়েটাকে কোলে জড়াইয়াছেন, কাছে বসিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়াছেন, এবং আসিবার সময় দুজনকে কাপড় দিয়াছেন। হৃৎকের বিষয়, এই মেয়েটাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করিবার পূর্বেই সেই বাড়িতে বিষম কলেবা বোগে মহাশয় মৃত্যু হইল; আমাদের বাসা ভাঙ্গিয়া গেল; আমবা ছড়াইয়া পড়িলাম; মেয়েটাব মাও পাশের বাড়ী হইতে উঠিয়া গেল; মেয়েটা আমাদের হাতছাড়া হইল।

ছুতরের মেয়েটির পরবর্তী জীবন।—ইহার বহুদিন পরে মেয়েটির সহিত আমার আবার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা এই সঙ্গেই বলা যাউক। তখন আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, এবং ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি গৃহে বাস করি। একদিন একজন ভৃত্য কোনও স্ত্রীলোকের একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত। খুলিয়া দেখি, সেখানি ঐ মেয়েটির পত্র। সে আমাকে লিখিয়াছে, “বহু বৎসর পূর্বে চাঁপাতলার দিবার কোণের এক বাড়ীতে পাড়ার একটা গাচ বৎসরের বালিকা আপনাকে দাদা বলিত ও কোলে পিঠে উঠিত, আপনার হস্ত মনে আছে। আমি সেই হতভাগিনী। আমি বিপদে পড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছি। একবার দয়া করিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।” আমি মনে করিলাম, বিশেষ বিপদে না

পড়িলে এতদিন পবে আমাকে স্ববণ কবে নাই, আমাব যাওয়াই কৰ্ত্তব্য । এই ভাবিয়া তাহাব বাড়ীতে গেলাম । গিয়া যাতা শুনিলাম, তাহা এই । আমবা ও তাহাব মা চাপাতলা পবিত্যাগ কৰিলে তাহাব মা আব বিস্তাসাগৰ মহাশযেব নিকট যায নাই । সে বড় হইবা উঠিলে তাহাব মা তাহাকে পাপ পথে লইয়া গেল । সেই অবস্থা হইতে ক্ৰমে সে এক ব্যক্তিব উপপত্নী ৰূপে বাস কৰিতে লাগিল ও তাহাব দুইটা পুত্ৰ সন্তান জন্মিল । তাহাদিগকে লইয়া বিবাহিতা স্ত্ৰাব গ্ৰায় সূখেই তাব কাল কাটিতে ছিল । যে ব্যক্তি তাহাকে বাখিয়াছিল, সে তাহাকে একখানি বাড়া কিনিয়া দিয়াছিল, এবং লেখাপড়া কৰিবা তাহাকে কয়েক হাজাব টাকাব কোম্পানিব কাগজও দিয়াছিল । কিন্তু পুত্ৰদ্বয় বয়ঃপ্ৰাপ্ত হইবাব পূৰ্বেই সে ব্যক্তি তাহাবই বাড়ীতে গুৰুতৰ পাডায় আক্ৰান্ত হইল । এই অবস্থাতে সে ব্যক্তি কোম্পানিব কাগজেব লেখাপড়াগুলি ছি । ডয়া ফেলিয়া নিজেব বিবাহিতা স্ত্ৰী পুত্ৰেব কাছে গিয়া আশ্ৰয় লইল । কেবল মাত্ৰ বাড়ীখানি এই মেয়েটিব বহিল ; ছেলে দুইটি লইয়া সে বিপদ সমুদ্রে ভাসিল । এই অবস্থাতে সে আমাকে স্ববণ কৰিয়াছিল ।

আমি তাহাব বাড়াতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত কৰিতে আবস্ত কৰিলাম । কিছুদিন পবেই দেখিলাম, তাহাব এই অবস্থাতে বন্ধুতা দেখাইয়া কুলোক তাহাকে ঘিৰিতেছে । তখন আমি তাহাকে, সে বাড়ী ভাড়া দিয়া আমাব নিৰ্দিষ্ট অশ্ব কোনও স্থানে উঠিয়া আসিবাব জন্ত অশ্ববোধ কৰিতে লাগিলাম । কিন্তু সে তাহা কৰিল না ; সেই বাড়ীৰ বাহিৰেব অংশ ভাড়া দিয়া ভিতবেব অংশে পুত্ৰ সহ থাকিতে লাগিল । একদিন গিয়া দেখি, একটা ১৯২০ বৎসবেব মেয়ে কোথা হইতে জুটিয়াছে ; তাহাব একটা ইতিবৃত্ত আমাকে বলিল, তাহা এখন স্ববণ নাই ; কিন্তু ঐ মেয়েৰ ঘৰে কবাস বিছানা তাকিয়া বাধা হুঁকা প্ৰভৃতি দেখিলাম । তখন মনে হইল, নিজেব ৰূপ যৌবন গত হওয়াতে তাহাকে অৰ্ধোপাৰ্জনেব আশয়ে

আনিয়াছে। তখন আমি বলিলাম, “এই আমার তোমার ভবনে শেষ আসা।” আমার এই ভগিনীকে অনেক দিন পবিত্যাগ করিয়া আসিযাছি, কিন্তু তাহাব বিষয় স্মরণ করিয়া এখনও হুঃখ হয়। সে এতদিন পবে দাদা বলিয়া স্মরণ করিল, তাহাকে যে হাতে ধাবয়া বিপথ হইতে স্পৃগথে আনিতে পাবিলাম না, এই বড হুঃখ বহিয়া গেল।

ঝি ও ‘ভালমানুষ বাবু’।—মহালক্ষ্মী বাচিয়া থাকিতে থাকিতে আব একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাগ অত্মাপি স্মৃতিতে উজ্জ্বল বহিয়াছে। একদিন মহালক্ষ্মীব ভাই ঈশান আসয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের হাঁসপাতালে একটি স্থালোক আসিযাছে, তাহাব গলায় ঘা হইযা গলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গলদেশে ছেদা করিয়া তদ্বাবা আহাব কবান হইতেছে। তৎপবে আব একদিন বলিলেন যে, সে-স্থালোকটি কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিয়াছে, “দাদা ঠাকুব, আমাকে বক্ষা কব, একটা কাজ জুটিয়ে দাও, স্ত্রু হ’য়ে আমাকে যেন আব পূর্বেব স্থগিত ব্যবসারে প্রস্থত হ’তে না হয়।” শুনিয়া আমার বড হুঃখ হইল। আমি ঈশানকে বলিলাম, “তাব একটা কাজেব যোগাড় ক’বে দাও, সে যখন বাঁচতে চায় তাকে বাঁচাও, এটা একটা অবশ্য কর্তব্য কর্ম।” শুনিয়া ঈশান হাসিয়া বলিলেন, “হাঁঃ। আমার আব কাজ নেই, আমি ওব চাকুবী খুঁজতে বেকই!” আমি বলিলাম, “আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে চাকবাণী ক’বে আন না কেন?” ঈশান সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

কিন্তু আমার মনটা স্ত্রুস্থি বহিতে পারিল না। আমি ঈশানের মাকে ও মহালক্ষ্মীকে ব্রাঠিয়া তাহাকে আমাদের বাড়ীতে চাকবাণীব কাজে আনিলাম। সে বোধ হয় মেয়েদের নিকট শুনিল যে আমিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া তাহাকে আনিয়াছি; কারণ, দেখিতে লাগিলাম যে আমার দিকে তাব বিশেষ মনোযোগ। সে আমার নাম রাখিল ‘ভাল মানুষ বাবু’। এই ‘ভাল মানুষ বাবু’ নাম আমার অনেক দিন ছিল।

আমি বান্ধুসমাজে প্রবেশ কবাব পব প্রসন্নমবীকে যখন আনিলাম, তখন তিনিও এই ঝিৰ মুখে শুনিয়া আমাকে 'ভালমানুষ বাবু' বলিয়া ডাকিতেন।

এই ঝিৰ কথা। এই জন্ত মনে আছে যে, আমাব প্রতি তাৰ ভালবাসাৰ গভীৰতা দেখিয়া একবাব আমাব মা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। একবাব তিনি মহালক্ষ্মীৰ মৃত্যুৰ পব চিকিৎসাৰ জন্ত কলিকাতায় আসেন। তখন তাঁহাকে একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাধিয়া ঐ ঝিকে তাঁহাব পৰিচর্যাৰ জন্ত দি। একদিন মা আমাকে বলিলেন, “ওবে দেখ্, তোকে আমার চেয়েও কেউ ভালবাসে, এটা আমাব সহ হব না।”

‘আমি (বিস্মিতভাবে)। সে কি। তোমাব চেয়ে ত কেউ আমাকে ভালবাসে না।

মা। না বে, তোব ঝি আমাব চেয়ে তোকে ভালবাসে।

আমি (হাসিয়া)। এমন কথাও তুমি বল! এ কথা তোমাব কেন মনে হ’ল?

তখন শুনিলাম, মা দেখিয়াছেন যে, তিনি ঝিকে একপ্রকাৰ বাজাধ কবিয়া আনিতে বলেন; সে সে-পবামর্শ ভাঙ্গিয়া চুবিয়া আব একপ্রকাৰ কবিয়া আনে। কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে বলে যে ‘ভালমানুষ বাবু’ ঐ সব ভালবাসেন। কেবল তা নয়, মা বাঁধিতে বলিলে সে বান্ধাঘৰেৰ দ্বাব চাপিয়া বসে, এবং ‘এই বকম ক’বে বাঁধ’, ‘ঐ বকম ক’বে বাঁধ’ বলিয়া অন্তবোধ কৰিতে থাকে। মা হাসিয়া বলেন, “ও বে, আমাব পেটেব ছেলে, ও কি ভালবাসে না বাসে তা কি আমি জানি না?”—পবে আমবা কলিকাতা ত্যাগ কবিলে এই ঝি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিল।

সাধে কি আমি নারীজাতিকে ভালবাসি! যে পাপে ভুবিয়াছিল, পাপ বাব দৈনিক আচৰণ হইয়াছিল, তাহাবও জনয়ে এই প্রেমের শক্তি”

তাঁহাবও এই কৃতজ্ঞতা। আমাব চাকর-ভাগ্য চিবদিনই ভাল। ইহাব প্রমাণ পবে আবও প্রদত্ত হইবে।

সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের অভিনয়।—১৮৬৯ সালের বসন্ত কালে আমবা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ মিলিয়া শোভাবাজারের বাজবাড়ীর নাটমন্দিরে সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের অভিনয় কৰিলাম। তাঁহাব বিবরণ এই। সেবাবে বি-এ পরীক্ষাতে সংস্কৃত বেণীসংহার পাঠ্য ছিল। আমাদের কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা মনে কৰিলেন, সংস্কৃত বেণীসংহার অভিনয় কৰিয়া দেখাইলে বি-এ ক্লাসের ছেলেরা বিশেষ উপকার হইতে পাবে। এই ভাবিয়া তাঁহাবা বেণীসংহারের অভিনয়ের যোগাড় কৰিতে লাগিলেন। অগ্রে তাঁহাবা আমাকে সে সংবাদ দেন নাই, অথবা আমাকে তাঁহাদিগের পৰামর্শের অঙ্গী কবেন নাই। যখন তাঁহাদের কাজটা কিয়দূর অগ্রসব হইয়াছে, তখন আসিয়া আমাকে তাঁহাতে যোগ দিবার জন্ত ধবিলেন। আমাব পৰামর্শটা মন্দ বোধ হইল না। বিশেষতঃ অভিনয় দেখা আমাব বাতিক। বর্তমান বঙ্গ বঙ্গভূমি-সকলে বাবাজনা অভিনেত্রী প্রবিষ্ট কৰিবার পূর্বে আমি প্রায় প্রতি শনিবার অভিনয় দেখিতে যাইতাম। শ্রবণ আছে যে সোমপ্রকাশের প্রতিনিধিরূপে হবিনাভি হইতে অভিনয় দেখিতে কলিকাতায় আসিতাম। বাবাজনা অভিনেত্রী যেদিন হইতে আসিল, সেদিন হইতে আমাব অন্তর্দ্বান।

সে বাহা হউক, সহাধ্যায়ী ছাত্রেরা যখন আমাকে ডাকিল, তখন তাঁহাদের কমিটিতে থাকিতে বাজি হইলাম এবং নিজে একজন অভিনেতা হইতে প্রস্তুত হইলাম। আমি হইলাম যুধিষ্ঠির, আমাব বন্ধু যোগেন্দ্র হইলেন অর্জুন, ও অপব বন্ধু উমেশ হইলেন অশ্বখামা। কলেজের নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি স্কলার স্কলার ছেলেকে মেয়েদের পার্ট দেওয়া গেল। আমবা মোহাড়া দিয়া, সকলকে উত্তমরূপে শিখাইয়া, শোভাবাজারের বাজবাড়ীর নাটমন্দির

ঠিক কবিতা, কলিকাতা হুগলী কৃষ্ণনগৰ প্ৰভৃতি কলেজ-সকলেৰ বি-এ ক্লাসেৰ ছাত্ৰদিগকে টিকিট প্ৰেৰণ কবিতা নিমন্ত্ৰণ কবিতাহি, এমন সময়ে এই অভিনয়েৰ বিকল্পে আমাদেৰ কলেজেৰ মধ্যই মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পণ্ডিত মহাশয়েৰা বলিতে লাগিলেন যে ছেলেৰা পড়াশুনা ছাড়িয়া কেবল অভিনয় লটুয়া মাতিয়াছে। আব বাস্তবিক তাঁহাদেৰ অভিযোগ কবিবাব কাৰণও ছিল। আমবা যাহাদিগকে অভিনেতা কৰিষাছিলাম, তাহাবা কিছু বাড়াবাড়ি কবিতো লাগিল। যাহাকে ধৰ্ম্যোদন কবিতাছিলাম সে ভানুমতীকে ক্লাসেৰ মধ্যই প্ৰেয়সী বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং তাহাব কণ্ঠালিঙ্গন কবিতা চুখন কবিতো লাগিল, ইত্যাদি। এই-সব কাৰণে পণ্ডিত মহাশয়দিগেৰ আপত্তি প্ৰবল হইয়া উঠিল। আমি ইহাব মধ্য আছি জানিয়া তাহাবা একদিন আমাকে ডাকিষা পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখি যে সভাতে আমাদেৰ প্ৰিন্সিপাল, বড় বড় অধ্যাপকগণ, আমাব মাতুল মহাশয়, ও অপবাপৰ পণ্ডিতগণ সকলেই সমাসীন আছেন। আমি ত দেখিষাট কঁপিয়া গেলাম। দণ্ডাই অপবাসীৰ ছায় তাঁহাদেৰ সম্মুখে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইলাম। প্ৰিন্সিপাল সৰ্বাধিকাৰী মহাশয় তাঁহাদেৰ মুখপাত্ৰস্বৰূপ হইয়া বলিলেন, “আমাদেৰ কাহাবও ইচ্ছা নয় যে, তোমবা এই অভিনয় কব; ছেলেৰা খাবাপ হইয়া বাইতেছে, তুমি ইহাব ভিতৰ কিৰূপে গেলে ?”

আমি। আন্তে, আমি আগে ইহাব ভিতৰ ছিলাম না, পৰে গিয়াছি। এবাব বেনীসংহাৰ বি-এ কোৰ্চে আছে; অভিনয় কবিতা দেখাইলে আমাদেৰও উপকাৰ, অন্ত ছেলেদেৰও উপকাৰ।

প্ৰিন্সিপাল। তাহা হইলেও কলেজেৰ ছেলে খাবাপ কবা কি ভাল ?

আমি। বা কিছু দেখিতেছেন দুদিনেৰ অন্ত; তাৰ পৰ সব ধাৰিয়া যাইবে।

একজন অধ্যাপক। না না, তাহা হইবে না। ওসব বন্ধ কৰিয়া দাও

আমি। মহাশয়দেব অনভিমতে আমাব কিছু করিবাব ইচ্ছা নয়। আপনারা নিষেধ করিলে এখনি ও-সব থামিয়া যাওয়া উচিত। তবে মহাশয়দিগকে একটা কথা ভাবিতে বলি। অভিনয়ের আর তিন চাব দিন আছে। হুগলী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কলেজের ছেলেদের নিমন্ত্রণ কবা হইয়াছে, এখন না করিলে আমাদের বড় লজ্জাব কথা। অন্ততঃ একবাব অভিনয়েব জন্ত অমুমতি দিন।

প্রিন্সিপাল। আচ্ছা তুমি যাও, আমরা বিবেচনা কবি, তার পর তোমায় আবার ডাকিব।

আমি ত “যে আজ্ঞা” বলিয়া গ্রহণ কবিলাম। বন্ধুদলে আসিয়া সংবাদ দিলে মহা উত্তেজনা দৃষ্ট হইল। তাহাদিগকে থামাইতে অনেক সময় গেল। অবশেষে অধ্যাপকগণ আবাব ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা একবাব মাত্র অভিনয় কবিতে পাব। তবে তোমাকে তিনটা কাজ করিতে হইবে। প্রথম, নিম্নশ্রেণীর যে-সকল বালককে অভিনয়ে লইয়াছ, তাহাদেব অভিভাবকদের অমুমতি আনিতে হইবে। দ্বিতীয়, অভিনয়স্থলে গায়ক ও বাদকদের সঙ্গে কলেজেব ছেলেদিগকে মিশিতে দিবে না। তৃতীয়, নিম্নশ্রেণীর ছেলেদিগকে ঘরে পাঠাইয়া তবে তুমি সেস্থান ত্যাগ করিবে।” আমি “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাহাতেই সন্মত হইলাম।

বথাসময়ে রাজবাড়ীতে অভিনয় হইল। অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় বেশ হইল, কিন্তু আমার সেদিন গুরুতর দারিদ্র্যভারে আমোদ করিবার সময় হইল না। গায়ক ও বাদকদিগকে প্লাটফর্মের নীচে বসাইয়া বেড়া দিয়া দিয়াছিলাম; নিজে সমস্ত সময় সাজঘরের ভিতর ছিলাম, কেবল নিজের অভিনয়ের সময় বাহিরে আসিয়াছিলাম; এবং রাজি একটার সময় অভিনয় শেষ হইলে, প্রায় রাজি তিনটা পর্যন্ত বসিয়া ছিলাম, সকল

অভিনেতাকে গাড়ি আনাইয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া তবে নিজে
বাড়ীতে গিয়াছিলাম। এই জন্ত এই অভিনয়েৰ কথাটো এতদিন স্মৰণ
বহিয়াছে।

ষষ্ঠ পৰিচ্ছেদ

ব্রাহ্মধৰ্ম্মে দীক্ষা, উপবীতত্যাগ, পিতৃগৃহ হইতে

তাড়িত হওনা, ব্রাহ্মদলে সমাদৰ ।

১৮৬২, ১৮৭০ ।

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের বিবরণ ।—এখন আমাৰ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশৰ বিবৰণ বদি । ১৮৬৫ সালে আমাৰ হৃদয়-পৰিবৰ্ত্তনেৰ দিন হইতে, আমি কিকপে আল্ল অল্ল ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া, ব্রাহ্মসমাজেৰ দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলাম, তাহা অগ্ৰেই বৰ্ণনা কৰিয়াছি । বাস্তবিক, তদবধি এই ১৮৬৮ সালেৰ শেষ পৰ্য্যন্ত আমাৰ হৃদয়ে ব্যাকুলতা অগ্নিব মত জলিতেছিল । আমাৰ অনেক পুৰাতন কুৎসিত অভ্যাস তাগ কৰিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম । যাহাতে নীতি বা ধৰ্ম্মেৰ উপদেশ আছে, একপ কোনও গ্ৰন্থ পাইলেই তাহা অতি উপদেশ বোধ হইত, এবং তাহা আব ছাডিতে ইচ্ছা হইত না । এই কাৰণে বড়লোকদিগেৰ জীবনচৰিত পডিতে ভাল লাগিত ।

জীবনচৰিত ও সদগ্ৰন্থ পাঠে রুচি ।—এই জীবনচৰিত পডাব বাতকটা এখনও আছে । আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, ধৰ্ম্মবিজ্ঞান (theology) অপেক্ষা ধৰ্ম্মজীবনেৰ (practical religion) প্রতি আমাৰ চিৰদিন অধিক দৃষ্টি । অথচ ভাবিতে ক্লেশ হয়, লিখিতে চক্কে জল আসিতেছে, এই practical religion এই আমি সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক হাবিয়া গিয়াছি । আমাৰ আকাঙ্ক্ষা চিৰদিন আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ দিকে বড়িয়াছে, কিন্তু প্রবৃত্তি-সকলকে সকল

সময়ে সে আঁকাঙ্ক্য বশীভূত কবিতো পাৰি নাই। নিজেৰ নানা প্ৰকাৰ দুৰ্ভাগ্যতাৰ সহিত মহাসংগ্ৰামে বাস কবিতো হইয়াছে।

যাহা হউক, এই কয়েক বৎসৰেৰ মध्ये আমি অনেক জীবনচৰিত পঢ়িয়া ফেলি। স্বৰ্ণ আছে যে, প্ৰতিদিন বৈকালে কলেজ হইতে আসিগা Beeton's Biographical Dictionary হইতে বড় বড় লোকেৰ জীবনচৰিত পড়িতাম। মানুহ সংগ্ৰাম কবিতা, প্ৰতিকূল অবস্থাৰ মध्ये দাঁড়াইবা নিজেৰ জীবনেৰ মহত্ব সাধন কবিতাছে, ইহা দেখিলেও আমাৰ আনন্দ হয়, ভাবিতো সুখ হয়; আমি তাহাৰ মध्ये মানবজীবনেৰ দায়িত্ব ও ঈশ্বৰেৰ কৃপাৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন পাই। জীবনচৰিত ভিন্ন আৰও কয়েকখানি গ্ৰন্থে এই উপকাৰ পাঠিছিলাম। গিণ্ডোৰ পাৰ্কাৰেৰ গ্ৰন্থাবলাৰ উল্লেখ অগ্ৰেই কবিতাছি। নিউম্যানেৰ Soulও বোধ হয় এই সময় পড়িয়া থাকিব। তৎপৰে আমাদেৰ এল-এ কোর্সে Arthur Helpsএৰ Essays Written in the Intervals of Business ছিল, তাহা দ্বাৰা এত উপকৃত হইছিলাম যে, সেই শ্ৰেণী হেল্পেৰ Friends in Council আনিতা পড়ি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বাক্য কবিতোছি, আমাৰ ধন্যজীবনেৰ সেই প্ৰথমোক্তমে আমি উভয় গ্ৰন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাই। তৎপৰে মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেৰ মৌখিক ও লিখিত উপদেশ; তাহাতে আমাকে কি শক্তি কি সাহায্য দিত তাহা বলিতে পাৰি না। এক এক দিন তাঁহাৰ উপদেশ শুনিয়া দশ বাৰ দিন সেই নেশাতে থাকিতাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ঐ সময় আৰ্হাৰ জ্ঞানেৰ বুদ্ধিকা অতিশয় প্ৰবল ছিল। যখনই কোনও ভাল গ্ৰন্থ হাতে পাইতাম, অমনি স্মৃতি ব্যাঘ্ৰ যেনন আমিষধেওৰ উপৰে পড়ে, সেইভাবে তাহাৰ উপৰে পড়িতাম।

সাধাৰণ ব্ৰাহ্মসমাজেৰ গঠন কাৰ্য্যে যে কয়েক বৎসৰ ব্যাপ্ত

ছিলাম, সে কয়েক বৎসর কার্যেব ভিড়ে পড়িয়া আমার এই বৃত্তাক্ষকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারিতাম না। আবার এতদিনেব পবে সেই বৃত্তাক্ষ প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু হায়! আব সে শক্তি নাই। এখন মনে হয়, আবার যদি যৌবনেব শক্তি পাঠ ও মনেব মত লাঠিত্রেবী পাঠ, একবার প্রাণ ভরিয়া পড়ি।

১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজেব দিকে আকর্ষণ।—
আমাব ব্রাহ্মদন্ড ও ব্রাহ্মসমাজেব প্রতি আকর্ষণ ১৮৬৫ সাল হইতে জন্মিলেও আমি এতদিন পর্য্যন্ত লজ্জাবশতঃ কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে দূরে থাকিতাম, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। যতদূর মনে হয়, ১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত বিবাদ-পবায়ণ উন্নতিশীল দল অপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদিসমাজেব দিকেই আমার অধিক আকর্ষণ ছিল। আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমার জ্ঞাত দাদা হেমচন্দ্র বিজ্ঞাবহ (যিনি আদি সমাজেব ব্রাহ্ম ও তত্ত্ববোধিনীৰ সম্পাদক ছিলেন, এবং আমার নিকট সর্বদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলেব নিন্দা করিতেন,) তিনিই এই আকর্ষণেব প্রধান কাৰণ ছিলেন। আমার মাতুল স্বর্গীয় স্বাবকানাথ বিজ্ঞাভূষণও উন্নতিশীল দলের পক্ষে ছিলেন না; তাহাও একটা কাৰণ হইতে পারে। সেই কাৰণে উন্নতিশীলদেব কথাবার্তা কাক্ষকর্ষ যেন ভাল লাগিত না। বস্তুতঃ উন্নতিশীল দলেব সঙ্গে আমি অধিক সংশ্রব বার্থিতাম না। তবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম।

১৮৬৮ সালে উন্নতিশীল দলের মাঘোৎসবে যোগদান।—
১৮৬৮ সালের প্রারম্ভ অবধি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত যোগ করিষ্ণু গাঢ়তব হয়। তাহা এই প্রকাৰে ঘটে। ঐ বৎসবেব প্রাবস্তে শুনিলাম, মাঘোৎসবেব সময় উন্নতিশীল দল আপনাদেব উপাসনা-মন্দিবেব ভিত্তিস্থাপন করিবেন এবং তত্পলক্ষে নগর-কীৰ্ত্তন হইবে। এই সংবাদে আমার মাতুল

মহাশয় তাঁহাব কাগজে ও কথাবার্তাতে ইহাদেব প্ৰতি অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰিও লাগিলেন, “এ নেড়ানেড়ী কাণ্ড কেন ?” তত্ত্বিন্ন হেমচন্দ্ৰ বিদ্যাবদ্ধ মহাশয়ও অনেক উপহাস বিদ্রূপ কৰিতে লাগিলেন। সৰ্বোপৰি আমি শান্ত বংশৰ ছেলে, বৈষ্ণৱদেব কীৰ্ত্তনেৰ প্ৰতি পূৰ্বাবধি অতিশয় অশ্ৰদ্ধা ৷৭৮। এমন কি, কোন যাত্ৰা গান শুনিতে গিয়া যদি দেখিতাম খোল কব তাল আগিল ও কীৰ্ত্তন আবন্ত হইল, অনেক সময় সে স্থান পৰিত্যাগ কৰিতাম। আমি ভাবিলাম, উন্নতিশীল দল বাস্তৱতে চলাচল কৰিতে যাউতেছে। এই ভাবিয়া বিবৰুচিতে ১১ই মাঘ সকালবেলা সে দলেৰ দিকে না গিয়া আদি সমাধেৰ উপাসনাতে গেলাম। উপাসনান্তে আদি সমাজেৰ সি ডি দিয়া নামিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে কথেক জন বাবু আসিতেছেন ; তাঁহাবা বলিতে বলিতে আসিতেছেন, “মহাশয়, দেখলেন না তো, কেশৱ সহব মাত্ৰয়ে তুলেছেন।” নগব-কীৰ্ত্তনে হাত্মাস্পদ না হইয়া কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন, এই কথাটা বড় নূতন লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা কৰিলাম, “মহাশয়, সে কি বকম ?” তখন তাঁহাবা আমাব ৰুন্তে নগব-কীৰ্ত্তনেৰ কাগজ দিলেন। আমি সেই সিঁ ডিতে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে আছে —

তোবা আসবে ভাই, এত দনে হুঃখেৰ নিশি হলো অবসান,

নগবে উঠিল ব্ৰহ্মনাম।

নবনাবী সাধাবণেৰ সমান অধি ৷৮৮।

যাব আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচাৰ।—ইত্যাদি।

এই আহ্বান-ধ্বনি আমাব প্ৰাণে বাজিল, আমাব যেন মনে হইল, আমাকে ডাকিতেছে। ইহাতে ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মেৰ যে আদৰ্শ আমাব নিকট ধৰিল, তাহাতে আমাব প্ৰাণ মুগ্ধ কৰিয়া ফেলিল। আমি জিজ্ঞাসা কৰিলাম, “ইহাদেব উৎসৱ হবে কোথায় ?” শুনিলাম, সিদ্ধুবিয়াপটীস্থ গোপাল মল্লিকেৰ বাড়ীতে ; আমি সেই দিকে চলিলাম। উপাসনাৰ পৰ প্ৰাতে

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েব ভবনে আত্মাবেব নিমন্ত্রণ ছিল, তখন আব তাহা মনে থাকিল না। গোপাল মল্লিকেব বাড়ীতে গিয়া দেখি, কেশব বাবুব জ্যেষ্ঠ সহোদব নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় বাড়ী সাজাইতেছেন। তখনও উন্নতিশীল দলেব লোকেবা সেখানে আসিয়া পৌছান নাই। তখন আবাব কলুটোলা কেশব বাবুব ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখি, কেশববাবুবা সদলে সবে ফিবিয়া আসিয়া ভিক্ষাব ঝুলিতে শুয়ে টাণা পাইয়াছেন তাহা শুণিতেছেন। আমাব পূবাতন সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সে সঙ্গে আছেন। গোসাইজী আমাকে দেখিয়াই “কি ভাই।” বলিয়া আসিয়া আমাব কণ্ঠালিঙ্গন কবিলেন। সেই আমাকে উন্নতিশীল দলেব সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন। তৎপরে আমি তাঁহাদেব সঙ্গে গোপাল মল্লিকেব বাড়ীতে গেলাম। তাহাবা সেদিন আহাব কবিলেন না, আমাবও আহাবেব কথা মনে বহিল না। উৎসব-মন্দিবে গিয়া সমস্ত দিন উৎসব চলিল। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে এক কোণে যে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই কোণেই সমস্ত দিন ও বাত্রি দশটা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া যোগ দিলাম। সমস্ত দিন যে-কিছু কাজ হইল আমি যেন তাহাব ভিতব নিমগ্ন বহিলাম।

সায়ংকালে গবর্ণব জেনারেল লর্ড লবেন্স আসিলেন। সেদিন কেশববাবু Regenerating Faith বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এরূপ উপদেশ আমি অল্পই শুনিদাছি। ধর্মবিশ্বাস যদি নবজীবন আনিয়া না দেয় তবে তাহা ধর্মবিশ্বাস নয়, এই সত্য আমাব সমক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্ত একটা নূতন দ্বার যেন খুলিয়া দিল। আমি উন্নতিশীল দলেব সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বাঁধা পড়িলাম।

অথচ শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে ইহার পরও আমি তাঁহাদিগেব সঙ্গ হইতে লজ্জাবশতঃ দূবে থাকিতাম। তখন আমি প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা কবিতাম (যদিও উপবীতটা তখন ছিল), কিন্তু ব্রাহ্মদেব

সঙ্গ বড় মিশিতাম না। মধ্য মধ্যে ববিবাবে প্রাতে কেশববাবুব বলুটোলাব বাড়ীতে উপাসনাতে যোগ দিতে যাইতাম। বিস্ত কাক্তনেব সময় বান্ধদিগেব অনেকে গড়াগড়ি দিতেন, নানাপ্রকাব চাৎকাব কবিতেন, ওৎৎৎপবে পা ধবধবি কবিতেন, কেশববাবুব পায়ে পড়িতেন, এজন্ত ভাল কাঁবয়। উপাসনাতে যোগ দিবাব ব্যাঘাত হইত; সেই কাণে সৰ্ব্বদা যাইতাম না, মধ্য মধ্যে যাইতাম মাত্র।

নবপূজাব আন্দোলন।—এই ১৮৬৮ সালেব অক্টোবৰ মাসে মুজিব হুত ব্রাহ্মসমাজে নবপূজাব আন্দোলন উঠে। আমাদেব বন্ধুত্ব বাবু যত্ননাথ চক্রবর্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংবাদপত্রে প্রচাব কবিয়া দেন যে, বান্ধেবা কেশববাবুকে “প্রভু ত্রাণকর্তা” প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন কৰিতেছেন, তাহাব চবণে ধাবধা পবিত্রাণেব জন্ত প্রার্থনা কবিতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা লইয়া দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং যত্ননাথ চক্রবর্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেশবেব দলকে পবিত্রাণ কবিয়া যান। গৌসাইজী নিজেব শাস্তিপুবেব বাটীতে গিয়া চিকিৎসা কাৰ্য্য আবস্ত কৰিলেন। আমাব স্বৰণ হয়, আমি এই বৎসবেব মধ্যে শাস্তিপুবে তাহাব সহিত সাক্ষাৎ কৰিতে গিয়াছিলাম। পূৰ্বেই বলিয়াছি, তান আমাব সহাবাধা; তাহাব মুখে সমুদয় শ্রবণ কবা উদ্দেশ্য ছিল।

আমাব স্বৰণ আছে, উন্নতিশীল দলে এই বিবাদ বাধাতে আমি মৰ্মাস্তিক দুঃখিত হইয়াছিলাম। ইহাতে কেশববাবু হইতে অস্বাভাবিক চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই; তাহাদিগকে নবপূজা অপবাধে অপবাধী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে নাই; ব্রাহ্মদিগেব আচরণকে কেবলমাত্র ভক্তিপ্রকাশেব আতিশয্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু কেশববাবুব পত্রিকাতে প্রতিবাদকাবীদেব কথাব উক্তব যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকে লোকচক্ষে হীন কবিবাব জন্ত যেক্রপ প্রয়াস পাওয়া হইয়াছিল, তাহা সত্য ও শ্রায়েব অঙ্গুগত ব্যবহাব নয় বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছিল। বাহা

হউক, ১৮৬৯ সালে প্রাপ্ত গৌসাইজী তাহাব ভুল স্বীকার করিয়া যখন আবাব কেশববাবু সহিত সাক্ষাতি হইতে চাহিলেন, তখন যেন আমাব দদয়েব একটা ভাব নামিয়া গেল। এই পুনর্জীবন উপলক্ষে বাণাধাটেব সন্নিহিত কলাইঘাটা নামক স্থানে ভাবতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিব প্রতিষ্ঠাব পূর্বে একটা উৎসব হয়। ঐখানে গৌসাইজী তখন সপরিবারে বাস করিতেন। আমি অপবাধে ব্রাহ্মব সহিত সে দিন সেখানে গমন করি। তৎপূর্বে কেশব বাবু সহিত সাক্ষাৎভাবে আমাব আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেই উৎসবক্ষেত্রে আলোচনাস্থলে নবপৃষ্ঠাব আন্দোলনেব প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমি বলি, “মিবারে ও শ্রমতত্ত্ব কে লেখেন তাহা আমি জানি না, কিন্তু উক্ত উভয় পত্রিকাতে যে ভাবে গৌসাইজী ও যদুবাবু কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা শ্রাব ও ভদ্রতার অনুরূপ ব্যবহার নহে।” ইহাতে কেশববাবু কানে-কানে ভাব একজনকে আমাব বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিয়া দিলেন, “সোমপ্রকাশ-সম্পাদক ছাবকানাথ বিজ্ঞানভূষণেব ভাগিনা।” এটা মনে আছে, কেশববাবু সেই দিন হইতে আমাকে বিশেষভাবে দেখিলেন ও চিনিলেন। আমি সে যাত্রা কেশব বাবু স্নানস্নান সবল ও স্বাভাবিক ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যাব পৰ তিনি শিশ্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকাযোগে চুর্ণী নদীতে বেড়াইতে গেলেন। আমবা যাই নাই; প্রাতে উঠিয়া দেখি, কেশববাবু ব্রাহ্মদেব পায়েব তলাতে একপাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন। আহাব করিতে বসিয়া দেখিতাম, তাহাব বড়মানুষী কিছুই নাই, সামান্য ডালভাত মনেব আনন্দে আহাব করিতেছেন। এ সকল আমাব বড় ভাল লাগিত।

দীক্ষাপ্রাপ্তি।—ক্রমে ১৮৬৯ সালের ৭ই ভাদ্র (২২ শে আগষ্ট) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিব প্রতিষ্ঠাব দিন আসিল। তখন কয়েকজন যুবকে দীক্ষিত করিবাব প্রস্তাব হইল। আমার কোন কোন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা

বালেন, আমি দাক্ষিত্য হইতে প্রস্তুত কি না। আমি বলিলাম, প্রকাশ্যে দাক্ষিণ্য তো বাডাব ভাগ, আমি ত ব্রাহ্মই আছি। যাহা উৎসব, অপবাপব যুবকসহিত আমিও উক্ত দিবস দীক্ষাগ্রহণ কবিব এইকণ স্থির হইল। তদনুসারে আমবা ১১ জন যুবক দাক্ষিত্য গ্রহণ করিলাম। তন্মধ্যে কেশববাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মবিহারী সেন, অক্ষয় নন্দানিহিত বন্ধু আনন্দমোহন বসু, পবলোকগত বন্ধু বজ্রনীনাথ বসু, শঙ্কর বন্ধু শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা চিৰদিন ব্রাহ্মব্রহ্মণ ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা কবিয়াছেন ও কবিতেছেন।

উপবীত ত্যাগ।—প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মব্রহ্মণ দীক্ষিত হইলে, তাহাওটা আৰ বাধিব কি না, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। তৎপূৰ্বে উপবীত কখনও আমাব গলায় থাকিত, কখনও থাকিত না, সে সময়ে ছিল না। আমি স্থির কবিলাম, আৰ লইব না। কিন্তু এই বিষয় লইয়া আত্মীয়স্বজনসহিত বিবোধ উপস্থিত হইল।

আমি চিৰদিন দেখিতেছি, কোনও একটা গুরুতব কৰ্ত্তব্য স্থির কবিলে তাহা কবয়া উঠিতে আমাব বিলম্ব হয়। তত্পযোগী বল আমাব প্রকৃতিতে এক বাবে আসে না। বাববাব উঠি ও পড়ি, প্রযুক্তিকুলেব সহিত প্রবল সংগ্রাম কৰিতে হয়; কখনও তাহাবা জয়লাভ কৰে, কখনও আমি জয়লাভ কৰি, অবশেষে কিছুদিনেব পৰ বলা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াই। এক লক্ষ্মে স্বৰ্গে উঠা, এক উত্তমে নিষ্কৃতিলাভ কৰা, এক প্রতিজ্ঞাতে প্রযুক্তি দমন কবিয়া ফেলা, আমাব ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির কবিয়াছি, আমি যখন উঠিতে চাহিতেছি, তখনও যে পড়িয়া যাই, ইহাতে জৈব আমাকে দেখাইতে চান যে, বেশক্ৰম হস্তে আমি অগ্রে আত্মসমর্পণ কবিয়াছি, তাহাব শৃঙ্খল হঠাৎ ভগ্ন কৰা কত কঠিন। ইহাতে

যে-পাপ ত্যাগ কবিতেছি তাহার প্রতি স্বর্ণা বাড়ে, এবং ব্যাকুলতাও বাড়ে।

পিতা মাতা ও মাতুলের ক্লেশ।—বাগা হউক, আমি উপবীত রাখিব না, একপ সংকল্প করিয়াও তাহা ত্যাগ কবিতে কিছুদিন গেল। প্রথমে মাতা ঠাকুবাণা এই সংবাদ পাইবামাত্র মাতুলালয়ে আসিয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া উপবীতটা আমার স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়া গেলেন। তৎপবে যাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, সেট উপবাত ফেলাব বিরুদ্ধে বলে। আর আমি ভাবিতে গেলেও সম্মুখে বড় বিপদ দেখি। আমি পিতামাতার একমাত্র পুত্র। উন্মাদিনা গত হওয়ার পব আর তিনটা ভগিনী হইয়াছে, তাহারা সকলেই ছোট। আমি পিতা-মাতার একমাত্র অবলম্বন। লোকে যখন বলে, মা মরিবে, বাবা পাগল হইয়া যাইবেন, তখন কিছুই বিচিত্র মনে হয় না। কি করিব, কি করি, এমন কঠিন সমস্যা আমার জীবনে কখনও উপস্থিত হয় নাই। এদিকে উপবাত রাখিয়া উপাসনা করিতে যাই, উপাসনা কবিতে পারি না। কে যেন হৃদয়ে থাকিয়া ছি ছি বলে। কে যেন আমাকে চায়, কে যেন আমাকে ডাকে। এইরূপ মানসিক আন্দোলনে আমার শবাব ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; হজম-শক্তি নষ্ট হইয়া দারুণ উদ্বাময়ে ধরিল। অবশেষে আমি অনগ্রগতি হইয়া ঈশ্বর-চরণে পড়িলাম; আপনার বিচার ও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিলাম; প্রার্থনাতে বাব বাব বলিতে লাগিলাম, “তুমি আমাকে লইয়া যাহা হয় কর।” কি আশ্চর্য! কিছুদিনের মধ্যে হৃদয়ে আশ্চর্য্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। এত যে ভয় বিভীষিকা, কোথায় যেন পলাইয়া গেল! আমার মনে অভূতপূর্ব বল ও উৎসাহ আসিল! উঠিতে, বসিতে শুইতে, জাগিতে, কি এক অপূর্ব আশ্বাসবাণী শুনিতে লাগিলাম! কে যেন বলিতে লাগিলেন, “তোমার কাজ আছে, তোমাকে চাই, তুমি



১৭৮১ (সোবনব'না)

অগ্রসর হইয়া চল।” আমি তখন আমার পত্রে পিতাকে এই কথা লিখিয়াছিলাম ; তিনি পড়িয়া নিশ্চয়ই হাসিয়া থাকিবেন। আমি উপবীত ফেলিয়া দিলাম, কিরূপে বাধ্য হইয়া একাজ কবিলাম, তাহা পিতাঠাকুর মহাশয়কে লিখিলাম। তিনি সে পত্র আমার মাতুলের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে ডাকাইয়া কথা কহিতে অনুবোধ কবিলেন।

মাতুল মহাশয় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইয়া, সাধারণ ভাবে আমার সহিত উপবীত ত্যাগ সম্বন্ধে ও ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে তর্ক কবিলেন। এই স্থানে এলা কর্তব্য, আমার মাতুল অতিশয় ধর্ম্মভীরু ও উদারচেতা মানুষ ছিলেন, কাহারও ধর্ম্মভাবের উপরে হাত দেওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি বাগ উয়া প্রভৃতি কিছুই কবিলেন না ; বন্ধুতে বন্ধুতে যেকূপ কথাবার্ত্তা হয়, সেইরূপ সৌজন্তের সহিত আমার সঙ্গে কথা কহিলেন। পরে আমি চলিয়া আসিলে আমার পিতাকে লিখিলেন, “মানুষের অনেক প্রকার অন্ধতা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ধর্ম্মান্ধতাও একপ্রকার। ইহা ধর্ম্মান্ধতা হইয়াছে, বলপ্রয়োগে যে কিছু হইবে একপ মনে হয় না।” আমি পিতার ফাইল হইতে সে পত্র পরে দেখিয়াছি।

একমাস বাড়ীতে আবদ্ধ থাকা।—কিন্তু পিতাঠাকুর মাতুলের পরামর্শ গুনিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন, এবং প্রায় একমাস কাল আমাকে একপ্রকার নজরবন্দী করিয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলের একে উপবীত ত্যাগ তখন তৎপ্রদেশে নূতন কথা, কেহ কখনও শোনে নাই। সুতরাং এই সংবাদে সমুদয় গ্রামের লোক ভাজিয়া পড়িল। এমন কি, ছই চাবি ক্রোশ দূর গ্রামের চাষার মেয়েরা পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহারা তখন আমার বিষয়ে কি ভাবিত, তাহা ভাবিলে এখন হাসি পায়। একদিন প্রাতে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় কয়েকটা চাষার মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মিথ্যাস পড়ে কি না পড়ে,

এমনি তন্ময়স্থ। আমাব হস্তপদেব প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য কবিতোছে। কিয়ৎক্ষণ পবে আমি যখন বলিলাম, “মা, একটু তেল দাও, নেয়ে আসি।” তখন একটা স্ত্রীলোক বলিষা উঠিল, “মা ঠাকরণ, কথা কষ?” মা বলিলেন, “কথা কবে না কেন?” শুনিয়া আমাব ভয়ানক হাসি পাইল। ভাবিলাম, আমি যেটা কর্তব্যবোধে কবিতোছি, সেটা ইহাদেব নকট পাগলামি! শিক্ষাতে কি প্রভেদই ঘটাইযাছে। আব একদিন বৈকালে একটা স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক আসিয়া দেখেন যে আমি মুড়ি খাইতোছি। দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইষা বলিলেন, “ওমা, এই যে মুড়ি খাষ, কে বলে আমাদের মধ্যে নাই?” তাঁহাবা ভাবিষাছিলেন, আমি কিছুতকিমাকাব হইয়া গিয়াছি।

যাহা হউক, আমাব বাবা আমাকে মাসাধিক কাল আবদ্ধ কবিষা বাখিলেন। এই সময়ের মধ্যে দিবাষাত্র লোকেব সমাগম, ও একই কথা, একই তর্ক, একই যুক্তি, একই আপত্তি, একই গালাগালি। কতই বা তর্ক কবিব, কতই বা উত্তর দিব? আমি একেবাবে মৌনব্রত অবলম্বন কবিলাম। যিনি যাহা বলিতেন, বা তিবক্তাব কবিতেন, দ্বিরাুক্তি কবিতাম না। শেষে বাবা আব আমাকে আবদ্ধ বাখা বিফল বোধে আমাকে বিদায় দিলেন। সেদিনেব কথা মনে হইলে আব চক্ষেব জল বাখিতে পাৰি না। তিনি অতি সহৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁহাব ভিতবে নীচতা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি আমাব প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র দিয়া নিজব্যয়ে আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। তখন কুখি নাই, যে আমাকে জন্মেব মত বর্জন কবিবাব জন্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। সেই অবধি ১৮ কি ১৯ বৎসর আমার মুখদর্শন কবেন নাই, বা আমাব সহিত বাক্যালাপ কবেন নাই।

পিতৃগৃহ হইতে ভাড়িত হওয়া।—আমার পিতা আমাকে গৃহ হইতে বিদায় দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমার মুখদর্শন করিবেন

না। কিন্তু আমি জননীর জন্ত বাডাতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমার মা তখন কি দশাতে বাস করিতেছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। আমি তাহাকে দেখিতে যাইতাম, কিন্তু আমার পিতাব ইচ্ছা নয় যে, আমি গ্রামে পদার্পণ করি। আমি তাহাকে গোপন করিয়াই তাহাব অন্তঃস্থিতিকালে বাডাতে যাইতাম। তিনি লোকমুখে, আমি মাঝ কাছে গিয়াছি শুনিলেই, আমাকে প্রহাৰ করিবাব জন্ত গুণ্ডা ভাড়া করিব লইয়া আসিতেন। পাডাব ছোট ছেলেবা আমাকে বড় ভালবাসিত, বাবা লাঠিয়াল লইয়া আসিতে-ছেন দেখিলেই তাহাবা গোপনে দোঁড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাঁত, আব অমনি আমা মাতাব চবণধূল লইয়া খিড়্‌কীৰ দ্বাৰ দিয়া পলা-ইতাম। পলাইয়া আসিয়া আমাব গ্রামবাসী ব্রাহ্মবন্ধু কালীনাথ দত্ত মহাশযেব বাডাতে আশ্রয় লইতাম। আমি পবে শুনিয়াছিলাম, বাবা এককপে কয়েক বৎসবেব মধ্যে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবাব জন্ত ২২ টাকা খৰচ করিয়াছিলেন। দৰিদ্ৰ ব্রাহ্মণেব পক্ষে আমাকে মাঝিবাব জন্ত ২২ টাকা ব্যয় কৰা সামান্য প্রতীজ্ঞাব দৃঢ়তাৰ কথা নয়। বাবাব প্রতীজ্ঞাব এই দৃঢ়তা আমাতে কিছু অধিক মাত্রায় থাকিলে ভাল হইত।

শেষে বাবা কেন যে সে সংকল্প ত্যাগ কবলেন, বলিতে পারি না। শুনিয়াছ, গ্রামেব মেয়েবা বিবোধী হওয়াতে তাহাকে সে সংকল্প ত্যাগ কাৰণে হইল। গ্রামেব লোকে ১৮দিন আমাকে ভালবাসে। আমি পিতাকে লুকাইয়া গ্রামে যাইতাম বটে, কিন্তু গ্রামেব আত্মীয়গণেব সহিত দেখা করিতাম; বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া মেয়েদেব সঙ্গে দেখা করিতাম। মেয়েবা আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি মেয়েদিগকে ভাল বাসিতাম। শেষে মেয়েদেব ভাব দেখিয়া গ্রামেব লোকে বাবাকে বলিতে লাগিল, “তুমি তাকে বাড়ীতে যেতে না দিতে পার, কিন্তু গ্রামে আসিতে দেবে না, এ কেমন কথা? তুমি কি গ্রামেব মালিক?”

গ্রামেব লোকেব অহুকুলতাৰ দেখিয়া ক্রমশঃ বাবাও অহুকুলতাৰ

ধবিলেন। তখন আমি অবাধে গৃহে গিয়া মাতাকে দোঁধনা আসিতে লাগিলাম। আমাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলে বাবা নিজে বাড়ী পবিত্যাগ করিয়া বাহিবে যাইতেন, আমি গৃহে আছি জানিলে সেদিকে আসিতেন না। আমাকে দেখা ন। আমার সঙ্গে কথা কহা বন্ধ রাখিলেন, কিন্তু আমাকে বাড়ীতে থাকিতে ও থাইতে দিতে আপত্তি করিতেন না। বরং নিজে বাজাবে গিয়া যে-সকল দ্রব্য আমি ভালবাসি তাহা কিনিয়া আনিতেন, মাকে বলিতেন, “কলা-ভোঁদ ঘাবে এসেছে, কলা কিনে এনেছি, খেতে দাও।” এইরূপ কিছুকাল চলিতে লাগিল।

পত্নী প্রসন্নময়ীকে কলিকাতায় লইয়া আস।—আমি পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া যেন অব্যবস্থায় ভাসিলাম। সৌভাগ্যে বিষয় বড় স্বলব্ধিশিপটী ছিল, সেজন্ত অন্নবন্দেব চিন্তাতে অভিভূত হইতে হইল না। আমি আসিয়া পটলডাঙ্গা মিবজাকবস লেনে, শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল সবকাবের সহিত একত্র বাসা করিলাম। তিনি বামতন্তু লাহিড়ীর নাতুন্দ্রী শ্রীমতী অন্নদায়িনীকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন। অন্নদায়িনীর ভগিনী কুমারী বাধাবানী লাহিড়ী তখন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। ইহাদের সংশ্রবে থাকিয়া আমি বড়ই উপকৃত হইতে লাগিলাম। ইহাদিগকে দেখিয়া আমার নাবীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গেল। বিশেষতঃ ইহাদিগের সহিত সখ্যবন্ধনে বামতন্তু বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া, তাঁহাতে আমি সাধুতাব যে আদর্শ দেখিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। আমি স্বপ্নবকুল হইতে প্রসন্নময়ীকে আনিয়া ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম।

প্রসন্নময়ী কলিকাতাতে আসিয়া গৃহদর্শে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। আমার স্বলব্ধিশিপ্ মাত্র অবলম্বন, এদিকে আবার বি-এ পরীক্ষার বৎসর উপস্থিত। সাংসারিক চিন্তা, বোগীর সেবা, শিশুকল্যাণ হেমলতার রক্ষণাবেক্ষণ, এই-সকল



পদ্মা পদ্মা প্রসন্নময়ী দেবী

কাৰণে আমাৰ পাঠেৰ সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সময় স্বৰ্গীয় ডাক্তাৰ অন্নদাচৰণ খাস্তগিৰ মহাশয় ও অপৰাপৰ কতিপয় ডাক্তাৰ বন্ধু সহায় না হইলে, এই বিপদ-সাগৰ উত্তীৰ্ণ হইতে পাবিতাম না।

দ্বিতীয়া কথ্য তবঙ্গিনীৰ জন্ম।—১৮৭০ সালেৰ ৮ই শ্ৰাবণ আমাৰ দ্বিতীয়া কথ্য তবঙ্গিনীৰ জন্ম হইল। সে সাতমাসে জন্মিয়াছিল। তাহাকে তুলাৰ বিছানা কৰিয়া কৃত্ৰিম তাপ দিয়া বাঁচাইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহাৰ নাম তুলা হইয়া গিষাছে, এবং তাহাই অদ্যাপি আছে। তাহাৰ জাৱন বক্ষা খাস্তগিৰ মহাশয়েৰ চিকিৎসাপাৰদৰ্শিতাৰ একটী উজ্জল প্ৰমাণ। সে যে বাঁচিবে, কেহই তাহা মনে কৰে নাই। ছই এক মাস পাৰহঁ বায়ু পৰিবৰ্ত্তনেৰ জন্ত, কলাইঘাটাৰ যে কুঠীতে উৎসব হইয়াছিল, এণ্ড যথানে তদবধি আমাদেৰ ব্ৰাহ্মবন্ধু নীলকমল দেব ছিলেন, সেখানে প্ৰসন্নময়াকে বাখিয়া আসি, এবং আমি ৩৩ নং মুসলমানপাড়া লেনে, যে বাসাতে বজ্জনানাথ বায়, নন্দলাল বায়, সাবদানাথ হালদাৰ, শ্ৰীনাথ দত্ত, কাণীপ্ৰসন্ন চক্ৰবৰ্ত্তী প্ৰভৃতি সহদাক্ষিত ব্ৰাহ্মবন্ধুগণ বাস কৰিতেছিলেন, সেই বাসাতে তাহাদেৰ সঙ্গে গিয়া বাস কৰিয়া বি-এ পৰীক্ষাৰ জন্ত প্ৰস্তুত হইতে থাকি।

গণেশসুন্দৰীৰ খ্ৰীষ্টধৰ্ম্ম গ্ৰহণ ও পৰে ব্ৰাহ্মসমাজে আগমন।—এ সময়ৰে একটী শ্বৰণীৰ ঘটনা গণেশসুন্দৰীৰ খ্ৰীষ্টধৰ্ম্ম গ্ৰহণ ও তৎপৰে ব্ৰাহ্মসমাজে আগমন। গণেশসুন্দৰী কলিকাতা-নিবাসী এক বৈষ্ণৱ-পৰিবাৰেৰ বিধবা কন্তা। মিশনাৰী মহিলাগণ তখন হিন্দু গৃহস্থদিগেৰ বাড়ীতে বাড়ীতে অন্তঃপুৰবাসিনী হিন্দু-লগনাদিগকে পড়াইয়া বেড়াইতেন। অতি অল্প ব্যয়েই তাঁহাদিগকে পাওয়া বাইত। এইজন্ত অনেক তত্ৰলোক নিজ গৃহে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া স্বীয় স্বীয় তবনেৰ মহিলাদিগকে পড়াইতে দিতেন। আমিও প্ৰসন্নময়ীকে আনিয়া প্ৰথমে এইদৰে

পড়াইবাব বন্দোবস্ত কবিয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে একটা কোতুৰ্দ্ধকব গল্প মনে আছে। তাহা এইস্থানে বলিতে ইচ্ছা কবিতোছে। যে মেম প্রসন্নময়ীকে পড়াইতেন, তিনি সপ্তাহে দুই দিন আসিতেন। একবার আসিয়া মেম মানবেব আদি পিতা মাতা আদম ও হবাব (Adam and Eve) বিবরণ মুখে মুখে প্রসন্নময়ীকে বলিয়া গেলেন। তাৎপৰ্য্য গৃহকক্ষে ব্যাপ্ত হইয়া প্রসন্নময়ী আদম-হবাব কথা সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিনে আসিয়া মেম জিজ্ঞাসা করিলেন, “বো, মানবেব তাদি পিতা-মাতা কে ছিল?” প্রসন্নময়ী ত অন্ধকাব দেখিলেন, আদমও হবাব মনে আসিল না। তখন মেম বিবস্ত্র কবিয়া বলিয়া গেলেন, “তোমাব বাবুকে জিজ্ঞাসা কবিতো পাব না?” মেম পুনৰ্য্য আসিবার দিন প্রাতে প্রসন্নময়ী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁ গো, মানুষ আগে কি কবে হলো?” আমি বলিলাম “তা কে জানে? তবে একজন পণ্ডিত বলেছেন যে আগে মানুষ বানব ছিল, বানব হতে মানুষ হয়েছে।” সেদিন মেম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মানুষ কেমন কবে হলো?” প্রসন্নময়ীৰ আবাব আদম-হবাব মনে নাই। তখন বিবস্ত্র হইয়া বলিলেন, “তোমাব বাবুকে জিজ্ঞাসা কব না কেন?” প্রসন্নময়ী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, “তাকে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম, তিনি বলেছেন, “বানব হতে মানুষ হয়েছে।” মেম বলিলেন, “তোমাব বাবু বড় দুষ্ট, তোমাকে তামাসা কবেছে।” প্রসন্নময়ী বলিলেন, “না, তামাসা কবেন নি, সত্যি সত্যি বলেছেন।” সেদিন ঘটনাক্রমে আমি অশ্রু ঘবে ছিলাম, মেম ষাইবাব সময় আমাব নিকট আসিলেন। তখন ডাক্তারীনেব নূতন মত সম্বন্ধে সমুদয় কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি প্রসন্নময়ীকে পবে বলিয়া-ছিলেন, “তোমার বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা কবো না।” শুনিয়া আমি অনেক হাসিয়াছিলাম।

এইরূপ একজন মিশনাবী মেম গণেশমুন্দরীকে পড়াইতেন। একদিন

গণেশসুন্দরী স্বীয় বিধবা মাতাকে ও ভ্রাতৃগণকে কিছু না বলিয়া মিশনারী-দিগেব আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। পরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, মেম যখন তাঁহাকে বলিতেন যে, তিনি অনন্ত নরকের ধাবে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন ভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত এবং তিনি স্ববায় যীশুর আশ্রয় লইবাব জন্ত ব্যগ্র হইতেন। যাহা হউক, যে কারণেই হউক, তিনি মিশনারীদিগেব আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। ইহা লইয়া সহরে তুমুল আন্দোলন ও হাইকোর্টে মোকদমা উপস্থিত হইল। মোকদমায় গণেশসুন্দরী ভ্রাতৃগণ হারিয়া গেলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত ও স্বৈচ্ছাক্রমে আসিয়াছে বলিয়া স্থির হইল। আন্দোলন ও সংবাদপত্রেব গালাগালি চলিতে লাগিল। কেবল সংবাদপত্রেব গালাগালি নহে; একদিন হত্যাকাণ্ডও হইল। সেদিন পাদরী ভন (Vaughan) সাহেব, যাহার আশ্রয়ে গণেশসুন্দরী ছিলেন, কলেজ স্কোয়ারেব কোণে প্রচাব করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। কোথা হইতে গণেশসুন্দরীর ভ্রাতা চন্দ্র সদলে যুবকযুগেব ছায় আসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পাদরী সাহেব ঘুষি ঢিল ঢেলা খাইয়া ধাবিত হইয়া সংস্কৃত কলেজের সম্মুখস্থিত শ্রামাচরণ দে বিখাস মহাশয়েব ভবনে আশ্রয় লইয়া নিবাপদ হইলেন। ঐ বাড়ীর লোকে আক্রমণকাবী যুবকদিগকে তাড়া করিল, তাহারা কোন্ গলি দিয়া কোথায় পলাইল। তখন পাদরী সাহেব বলিলেন, “কি বলিব, পুৰোহিত, নতুবা আমি তিন ব্যক্তি নিপাত কবিতে পারিতাম।” শুনিয়া আমরা অনেক হাসিয়াছিলাম।

যাহা হউক সংবাদপত্রেব আন্দোলন থামিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মযুবকগণ গণেশসুন্দরীর ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টীয়দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত লাগিল। শোনা গেল, তিনি খ্রীষ্টীয়গণের নিকট স্মৃণে নাই; আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন এবং স্বীয় জনতার নিকট আসিতে চাহিতেছেন; কিন্তু তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া

জননী লইতে সাহস করিতেছেন না। এই অবস্থাতে উদ্ধারকারী ব্রাহ্মগণ আসিয়া গণেশসুন্দরীকে স্বীয় পরিবারে লইবাব জন্ত আমাকে ধরিলেন। আমি তখন নূতন সংসার পাতিয়া ঘরকন্না করিতেছি। আমি বালিকাটির অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া “না” বলিতে পাবিলাম না। ভাবিলাম, আমাদের আহ্বারের যদি দুমুটা জুটে ত তারও জুটিবে। গণেশসুন্দরী আবার পলাইয়া খ্রীষ্টীয়দিগের আশ্রয় হইতে আমার ভবনে আসিলেন। আমার বাড়ীতে তিনি আমার ভগিনীর ছাত্র হইয়া আমাদের কষ্টের অংশ লইয়া কয়েক বৎসর ছিলেন। তৎপরে জৈব-কুপায় ঐতি উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত (রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আমার এক শ্রদ্ধের বন্ধুর সহিত) বিবাহিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার গণেশসুন্দরী নাম তুলিয়া দিয়া তাঁহার অপর নাম মনোমোহিনীই প্রবল করিয়াছি। তিনি সেই নামে এখনও আমার ভগিনী বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে পরিচিতা।

ব্রাহ্মসমাজে পাপবোধ ও আনন্দবাদী দল :—কলিকাতাতে সকল দলের ব্রাহ্মরাই আমাকে বন্ধু ভাবে ডাকিতেন। তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মধ্যে “আনন্দবাদী দল” নামে একটি দল হইয়াছিল, অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই দলের নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। ১৮৬৬ সালে কেশববাবু “Jesus Christ, Asia and Europe” নামে সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেন; তাহাতে গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স তাঁহার প্রতি প্রীত হন, এবং তাঁহার সঙ্গে কেশববাবুর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তদবধি কেশববাবুর দলের লোকদিগের যীশু-খ্রীষ্টের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক হইয়া পড়ে। বড়দিনের সময় যীশুর ধ্যানে দিন যাপন করা, বাইবেল পড়া, বাইবেলের ব্যাখ্যা করা, খ্রীষ্টীয় মিশনারীদিগের সহিত মিশামিশি করা ইত্যাদি হইতে থাকে। একথা এখানে বলা আবশ্যক যে, বাইবেল পাঠ ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীদিগের সহিত মিশামিশি

কৃষ্ণক বৎসর পূর্বে হইতেই চলিতেছিল; এখন সেই ভাবটা কিছু প্রবল হয়। ইহার ফলস্বরূপ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্যভাব যে অমুতাপ ও প্রার্থনা, তাহা উন্নতিশীল দলকে প্রবলরূপে অধিকার করে; পাপবোধ নব্য ব্রাহ্মদের সকলের অন্তবে প্রবল হইয়া উঠে; অমুতাপ-ব্যঙ্গক সংগীতাদি রচিত হইতে থাকে। ইহাব উপবে, বোধ হয় ১৮৬৭ সালে, গোসাইজী উজ্জ্বলী হঠাৎ তাঁহাব জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া আনিয়া উন্নতিশীল দলকে বৈষ্ণব সংকীর্তন শুনান। ৭ তদবধি সংকীর্তন-প্রথা ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল উদ্বেগনাব ফলস্বরূপ ১৮৬৮ সালে নবপূজার হাজামা উপস্থিত হয়। এই পাপবোধ ও ব্যাকুলতার ভাব হইতেই ব্রাহ্মেরা কেশববাবুর চরণে পড়িয়া বাদিতেন।

যখন একদিকে অমুতাপ, ব্যাকুলতা ও প্রার্থনাব তবঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তখন অপবদিকে ব্রাহ্মদের মধ্যে একদল লোক বলিতে লাগিলেন, “এত অমুতাপ ও ক্রন্দন কেন? প্রেমময়ের গৃহে এত ক্রন্দনেব বোল কেন? আনন্দময়ের প্রেমমুখ দেখিয়া আনন্দিত হও।” এই দলকে ব্রাহ্মেরা তখন “আনন্দবাদী দল” বলিতেন। শিববাবু ইহাদের অগ্রণী ছিলেন। নবপূজাব হাজামা দেখিয়া ইহারা আমাদের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলেন। ১৮৬৯ সালের মাঘোৎসবে একজন মুন্দের হইতে সমাগত ব্রাহ্ম, উপাসনাস্তে কেশববাবুর চরণে ধরিয়া কি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিববাবুর দাদা হেমন্তবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া, এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। জৈলোক্যনাথ সাম্রায় মহাশয়কেও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বাহিরে বাইতে দেখিলাম। এই মাঘোৎসব ভারতবর্ষীর ব্রহ্ম মন্দিরের অসম্পূর্ণ বাড়ীতে চাঁদোয়া খাটাইয়া সমাধা করা হইয়াছিল।

ইহার পরে অমৃতবাজারের দলকে আর আমাদের উপাসনাস্তে বহু আসিতে দেখিতাম না। কলিকাতা, পটলভাঙ্গা, পটুয়াটোলা মেনে

বশোরের লোকদের এক বাসা ছিল। শিশিরবাবু সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি আসিলেই আনন্দবাদী দলের সমাগম হইত। তাঁহারা আমাকে ডাকিতেন। সে সময়ে প্রধানতঃ সংগীত ও সংকীৰ্ত্তন হইত। টাকোনিবাসী শ্রদ্ধেয় বঙ্কু হবলাল রায় সেই কীর্ত্তনে গড়াগড়ি দিতেন। শিশিরবাবু চমৎকাব কীর্ত্তন কবিত্তে পাবিতেন। তাঁহার কীর্ত্তনে আমরাগিকে পাগল কবিত্তা তুলিত। সেখানে নূতন ধ্বংগব সংগীত হইত। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত কবিলে তাঁহার ভাব হৃদয়ঙ্গম কবিত্তে পারা যাইবে। একটী সংগীতে ঈশ্বরকে সম্বোধন কবিত্তা বলা হইত,

“তোমাব বাগে রাঙ্গা নয়ন তলে বহে দেখি প্রেমধাব।”

আর-একটী সংগীত যাহা তাঁহাদের মুখে সৰ্ব্বদা শুনিতাম তাহা এই,—

“মা যার আনন্দময়ী তাব কিবা নিবানন্দ ?

তবে কেন বোগে শোকে পাপে তাপে বৃথা কান্দ ?

মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তার চাবিপাশে,

ভাসাইয়াছেন প্রেমময়ী প্রেমনীবে।

একবার বাহতুলে “মা মা” বলে নৃত্য কব সন্তানবৃন্দ।”

এই গান কবিত্তা সকলে নৃত্য করিতেন।

একদিকে যেমন অসুখতাপ ও ক্রন্দন শুনিতাম, অপরদিকে উহাদের কাছে গিয়া আনন্দ ও নৃত্য দেখিতাম, তখন ইহা বেশ লাগিত। শিশির বাবুদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিত্তা মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার পবেই তাঁহারা কলিকাতা হিদেরাম বাঁড়ুয়ের গলিতে আসিত্তা বাসা কর্ত্তিয়া থাকেন। সে সময়ে তাঁহাদিগকে সৰ্ব্বদা দেখিত্তাম। শিশির বাবুব অমারিকতা দেখিত্তা আমার মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। একদিনের কথা স্মরণ আছে, তিনি সেদিন আমাকে আহ্বার কবিত্তে নিমন্ত্রণ করিত্তাছিলেন। আহ্বারের সময় উপস্থিত হইলে বলিলেন, “কি পরের মত বাহিরে বসে থাকে! চল, রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলি, হাঁড়ি হতে গরম গরম ভাত

তব্ধাবি মাৰ হাতে না খেলে সুখ হয় না।” এই বলিয়া দুজনে গিয়া বান্ধাঘৰে আহাবে বসিলাম। যতদূৰ স্বৰণ হয়, তাঁৰ জননী গবম গবম ভাত তব্ধাবি দিতে লাগিলেন, ও আমবা আহাব কবিতে লাগিলাম। ইহান পৰ হইতে শিশিৰ বাবুবা অল্লে অল্লে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সবিন্না পড়িলেন।

ব্রাহ্মদলে সমাদব ও তাহার ফল।—কিন্তু একটা কাৰণে এই সময় কিছুদিন ধৰিয়া আমাব আধ্যাত্মিক অবস্থা বড়ই অসন্তোষকৰ হইয়া গিয়াছিল। সে কাৰণটী এই। যতদিন আমি ব্রাহ্মদেব পশ্চাতে ছিলাম ও আপনাবে অনেকাংশে হান বলিয়া মনে কবিতাম, ততদিন আমাব হস্তবে পিনয ও ব্যাকুলতা ছিল। আমি আপনাকে সাধাবণেৰ মধ্যে ব্রাহ্মৰূপে পৰিচিত হইবাব অযোগ্য বলিয়া মনে কবিতাম। কিন্তু দীক্ষাব দিন হইতে সে অবস্থা চলিয়া লে। আমি যেন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম; এবং হঠাৎ যেন একজন বড় ব্রাহ্ম বলিয়া পৰিচিত হইলাম। আমি তখন ব্রাহ্মদলেৰ মধ্যে সৰ্ব্বত্রই সমাদব পাইতে লাগিলাম। সে সমাদবেৰ উপযুক্ত আমি ছিলাম না। বোধ হয় এতটা সমাদব পাইবাব দুইটী কাৰণ ছিল। প্রথম, ১৮৬৮ সালেৰ শেষে আমাব “নিৰ্ৰাসিতেৰ বিলাপ” গ্রন্থাকাৰে প্রকাশিত হয়; প্রকাশিত হইবামাত্র উহা লোকেৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ও সৰ্বত্র প্রশংসিত হয়। তদন্তুসাবে আমি একজন উদীয়মান কবিরূপে পৰিচিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, আমাব দীক্ষাব সময় হইতে আমাব মাতুল উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলকে “কৈশব দল” নাম দিয়া সোমপ্রকাশে ভাৰাদেব প্রতি গোলাগুলি বৰ্ষণ আবন্ত কবেন, তাহাতেও আমাব নামটা সাধাবণেৰ মুখে উঠে। যে কাৰণেই হউক, আমি তখন হইতে লোকচক্ষুৰ গোচৰ হইয়া একজন মন্ত ব্রাহ্ম হইয়া দাঁড়াই। ইহাতে কিছুদিন আমাব বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। আমাব পূৰ্ব্ৰকাৰ ব্যাকুলতা অনেক পৰিমাণে হ্রাস হইয়া আমি কিছু অসাবধান হইয়া পড়ি; যে

সকল দুর্বলতা ও কদভ্যাস অনেক চেষ্টাতে দমনে রাখিয়াছিলাম, তাহা আবার মাথা জাগাইয়া উঠে।

কিন্তু আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ দয়া বলিতে হইবে যে, আমি অচিরকালের মধ্যে আত্মদৃষ্টির সাহায্যে নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারি ও তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হই। দীক্ষার সময় ও এই সময় কয়েকটা কবিতাতে নিজের মনেব ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, সেগুলি ধর্ম্ম-তত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে উক্ত পত্রিকাব ফাইলে পাওয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র দুই চার পংক্তি স্মৃতিতে আছে। পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া লিখিয়াছিলাম,—

ভাসায়ে জীবন-তরী বিপত্তির সাগরে,

যাই দেব ! দেখ দেখ রক্ষা কর আমারে ;

মোর পক্ষ ছিল যাবা,

বিপক্ষ হইল তারা,

ঘেঁবিল সকল দিক অপবাদ-আধারে,

বহিল প্রলয়-ঝড় মস্তকের উপরে।

অগ্রে যে আধ্যাত্মিক অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম,—

নিজ দলে গেলে পরে সমাদর পাঠি হে,

আপনারে বড় ভাবি তাই হে !

কিন্তু কি যে বড় আমি

জান তুমি অন্তর্যামী,

তব অগোচর প্রভু কোন কথা নাই হে।

যাহা হউক, দীক্ষা ও সাধারণ সমাদরের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে কিছুদিন গেল। আমি যে ব্রাহ্মদলে হঠাৎ বিরূপ সমাদৃত হইয়া পড়িলাম, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমাব দীক্ষাব কয়েক মাস পবেই শ্রামবাজার ব্রাহ্মসমাজেব বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হইল। তখন উক্ত সমাজেব প্রতিষ্ঠাকর্তা কাশীশ্বৰ মিত্র মহাশয় জীবিত ছিলেন। তিনি আমাব নিকট লোক পাঠাইয়া অনুবোধ করিলেন যে, আমাকে উক্ত উপাসনাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যানাথ পাকডাশী মহাশয়দেব সহিত বেদীতে বসিতে হইবে ও উপদেশেব ভার লইতে হইবে। আমি ভয়ে সঙ্কুচিত হইলাম, কিন্তু তাঁহাবা কোনও মতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে বাজি হইলাম। কিন্তু তাঁহাবা চলিয়া গেলে, বেদান্তে বসিতে হইবে ভাবিয়া লজ্জা ও ভয়ে মন অতিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু কি করি, কথা দিয়াছি। তখন অন্তোপায় হইয়া উপদেশটি লিখিতে বাসলাম। লিখিয়া একপ্রকাব দাঁড় কবাইলাম। উপাসনাস্থলে সেইটী ভয়ে ভয়ে পাঠ কবিলাম। কিন্তু বেদী তইতে নামিলেই দ্বিজেন্দ্রবাবু কোলাকুলি কবিয়া আমাব উপদেশেব অনেক প্রশংসা করিলেন। সভাস্থলেও অনেকে সন্তোষ প্রকাশ কবিতে লাগিলেন।

পৰদিন কলেজে বি-এ ক্লাসে পড়িতেছি, এমন সময় ভূতপূৰ্ণ ডেপুটী মার্জিষ্ট্রেট ঈশ্বৰচন্দ্র ঘোষালেব নিকট হইতে কলেজেব অধ্যক্ষেব নামে এক পত্ৰ আসিয়া উপস্থিত, “শিবনাথ ভট্টাচার্য্য নামে তোমাদেব বি-এ ক্লাসে এক ছাত্র আছে, তাহাকে আমি কিছুকণেব জ্ঞাত চাই।” তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্কাদিকাবী মহাশয় আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঈশ্বৰ ঘোষাল তোমাকে ডাকিয়াছেন কেন?” আমি বলিলাম, “কিছুই জানি না; তাঁহাব সহিত আলাপ পবিচয় নাই।” তখন তিনি আমাকে পাঠাইবাব পূৰ্বে ঈশ্বৰ ঘোষাল সৰ্ব্বক্কে অনেক কথা বলিয়া দিলেন; বলিলেন, “সাবধান, তিনি তোমাকে খ্রীষ্টীয় ধৰ্ম্ম ভজাইবেন।” সর্কাদিকাবী মহাশয় বাহা বলিয়াছিলেন, গিয়া তাহাই শুনিলাম। ঘোষাল মহাশয় পূৰ্ণদিনে শ্রামবাজারেব উপাসনাতে উপস্থিত ছিলেন, এবং আমাব উপদেশে প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে খ্রীষ্টীয় ধৰ্ম্মের

মহৎভাব দেখাইবার জন্ত আদিম প্রফেটদিগেব ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত পববর্তী ঘটনা তুলনা কবিয়া দেখাইতে লাগিলেন, এবং আমাকে একখানি বাইবেল উপহাৰ দিলেন ; আমাব প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ প্রদর্শন কবিয়া বিদায় কবিলেন । আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম, “ইনি কেন খ্রীষ্টীয় ধম্মে দীক্ষিত হন না ?”

শ্রামবাজাবেব উপদেশেব ধাক্কা এখানেও থামিল না । কবেকদিন পবেই ‘সিন্দুবিয়াপটী পারিবারিক-সমাজ’ হইতে ক্ষেত্রনাথ শেঠ নামে একজন সভ্য আসিয়া উপস্থিত । আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, উক্ত পারিবারিক-সমাজেব সকলেব ইচ্ছা যে, আমি তাহাদেব সমাজেব আচার্যেব ভাব গ্রহণ কবি । অগ্রে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় সেই সমাজেব আচার্যেব কার্য্য কবিতেন ; কিন্তু কায্যবাহুল্য নিবন্ধন তিনি সেট ভাব পবিত্যাগ কবিন্নাছেন, এখন আমাকে গ্রহণ কবিতে হইবে । পাকড়াশী মহাশয়েব প্রতি আমাব প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল । আমি তাহাব উপদেশে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি । আব বাস্তবিক ব্রাহ্ম আচার্য্যদিগেব মধ্যে চিন্তাশীলতা মৌলিকতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিষয়ে একপ অল্প লোক দেখিনাছি । তাহাব পবিত্যক্ত বেদী আমি গ্রহণ কবিব, ইহা ভাবিয়া সন্তুচিত হইলাম । কিন্তু তাহাদেব তাত এড়াইতে পারিলাম না । শেষে, এক গুরুবাবে গিয়া উপাসনা কবিতে স্বাকৃত হইলাম । এবাবেও উপদেশ লিখিয়া লইয়া গিন্নাছিলাম । এই একবাব উপদেশ দিয়া আমাব বিপদ দশগুণ বাড়িয়া গেল । তাহাবা আমাকে নাছোড়-বান্ধা হইয়া ধবিলেন । কাজেই আচার্যেব ভাব আমাকে গ্রহণ কবিতে হইল । এই ভাব আমাব প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতির ও আচার্যেব কার্য্যশিক্ষাব উপায়স্বরূপ হইল । আমি কয়েক বৎসব এই কাজ কবিন্নাছিলাম । যেখানেই থাকি, গুরুবাব সন্ধ্যাব সময় সিন্দুরিয়াপটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম ; কি বলিব, সে বিষয় সপ্তাহকাল ভাবিতাম ; উপাসক-মণ্ডলীর অভাব নিজ চিত্তে ধারণ



श्वर्गीय ज्ञानकानाथ शास्त्री

কবিবাব চেষ্টা কবিতাম ; প্রত্যেকেব স্থখে স্থখী, দুঃখে দুঃখী হইবাব চেষ্টা কবিতাম ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আচার্য্যেব দায়িত্ব অনেকটা অন্তঃকবিতাম । এই দায়িত্বজ্ঞানই আমাকে ফুটাইয়াছে ।

ক্রমে সেই ক্ষুদ্র উপাসক-মণ্ডলীর সকলেব সঙ্গে ভালবাসা জন্মিয়া গেল । সে সম্বন্ধ বহুকাল বহিয়াছে । গোপালচন্দ্র মল্লিক, নেপালচন্দ্র মল্লিক, সিন্দুবিধাপটী-পবিবাবেব দুই ভাই যতদিন জীবিত ছিলেন, আমাকে বিধিমতে নানা বিষয়ে সাহায্য কবিয়াছেন । শেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে গোপালচন্দ্র মল্লিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে প্রবেশ করেন ও ব্রাহ্মমতে বিবাহ কবিয়া স্বীয় পিতা কতক পবিত্রীকৃত হন । তাঁহাব পিতা স্বর্গীয় মণিলাল মল্লিক আদিসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন । তিনিই ঐ পাবিবাবিক-সমাজ স্থাপন করেন ।

পুত্রের জন্ম ।—১৮৭১ সালেব ১৪ই আষাঢ় আমাব পুত্র প্রিয়নাথের জন্ম হয় ।

দ্বাবকানাথ গাঙ্গুলীর সহিত মিলন ।—এই সময়েব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অবলাবান্ধব-সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়েব সহিত মিলন । তখন ঢাকা সমাজ-সংস্কারেব প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল । এই সময়ে “মহাপাপ বালাবিবাহ” নামে এক পত্রিকা ঢাকা হইতে বাহির হয় ; তাহাতে সেখানকাব যুবকদের উপরে আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মে । এই বঙ্গভূমিতে “অবলা-বান্ধব” দেখা দিল । আমরা ভাবিলাম, এ কে বঙ্গদেশেব এক কোণ হইতে নাবীকুলের হিতৈষী হইয়া দেখা দিল ? অবলা-বান্ধবেব সম্পাদককে তখন চিনিলাম না, কিন্তু তাঁহাব তাজা তাজা কথা শ্রাণ হইতে আসিতেছে বোধ হইত, ও আমাদের বড় ভাল লাগিত । ক্রমে ঢাকার প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অভয়াচরণ দাসেব পুত্র প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতার আসিয়া আমাকে ও অপবাপর কয়েকজনকে তাহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া

গেলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমি কুমারী রাধারানী লাহিড়ীকে বলিয়া কহিয়া তাহাকেও লেখিকা কবিতা ছিলাম। অবলাবান্ধবে আমার গল্পপড়াশ্রবণ প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয়, উক্ত পত্রিকার একখানি ফাইল খুঁজিয়া পাই নাই।

অবলা-বান্ধবেব সহিত যোগ রহিয়াছে, সেই সময়ে একদিন কলেজে পড়িতেছি, এমন সময়ে উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া আমাকে বলিল “ওবে ভাই, অবলা-বান্ধবেব এডিটাব কলিকাতায় এসেছে, আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে এসেছে।” অমনি আমি আমাদের “হিরো”কে দেখিবাব জন্ত বাহির হইলাম। গিয়া দেখি এক দীর্ঘাকৃতি একহারা পুরুষ স্কুল-মাষ্টারের মত লম্বা চাপকান পরা, দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি স্বাক্ষরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেদিন আর অধিক কথা হইল না। সে যাত্রা বোধহয় তিনি কয়েক দিন পরেই দেশে চলিয়া গেলেন; কিন্তু কিছুদিন পরেই “অবলা-বান্ধব” লইয়া কলিকাতায় আসিলেন; এবং পূর্ববঙ্গীয় যুবকদিগেব নেতাস্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে জাতীয়তাবাদ পতাকা উড্ডীন করিলেন।

এই সময় ঢাকা হইতে তাঁহার, ও বরিশাল হইতে স্বর্গীয় বঙ্কু হুর্গামোহন দাসের কলিকাতাতে আগমন, জাতীয়তাবাদ পক্ষে যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। ইহার ফল পরে বলিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের সহিত যোগ। ভাৰত-আশ্রমে বাস কালে
যোগ বৃদ্ধি। দ্বিতীয়া পক্ষী বিবাহমোহিনীৰ আগমন।
নগেন্দ্রবাবুৰ আগমন। জ্ঞা-স্বাধীনতাৰ আন্দোলন।
কেশবচন্দ্রের সহিত মতভেদ।

১৮৭০-১৮৭২

কেশবচন্দ্র সেনের সহিত যোগ।—দীক্ষাব পৰ কেশবচন্দ্র সেনের
সহিত আমাব বনিষ্ঠতা হয়। তাঁহাতে আমাতে এমন একটা কি
ছিল, বাহাতে তিনি আমাকে দেখিলেই শ্রীত হইতেন, আমি তাঁহাকে
দেখিলে শ্রীত হইতাম। আমাব সঙ্গে তাঁব হাসি ঠাট্টা বসিকতা চলিত।
একবার একজন আমাকে বলিয়াছিলেন, “কেশববাবুৰ মনেব একটা চাবি
তোমাব কাছে আছে।” তাঁহাব নিকট আমাব মনেব ভাল মন্দ কোনও
কথা বলিতে সংকোচ বোধ হইত না। অবাধে সকল কথা তাঁব কানে
চলিতাম। এমন কি, তাঁহাব যে কথা আমাব মনেব সঙ্গে না মিলিত
তাহাও তাঁহাকে জানাইতে আমাব সংকোচ-বোধ হইত না।

তাঁহাব সহিত আমাব কিরূপ হাসিঠাট্টা চলিত তাহাব কয়েকটা দৃষ্টান্ত
এখানে উল্লেখ কৰা মন্দ নহয়। একবার হবিনাভি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক
উৎসবে প্রাতঃস্থালীন উপাসনাতে আচার্য্যের কাৰ্য্য কবিবাব জন্ত আমি
তাঁহাকে বাজি কৰি। আমি তখন হবিনাভি স্কুলেব হেডমাষ্টার। তিনি
প্রত্যুৰে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া প্রাতে গিয়া আমার বাড়ীতে
উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাব প্রাতঃরাশের জন্ত কিছু খাবার
প্রস্তুত বাধিরাছিলাম। আমি জানিতাম, তিনি প্রাতে অশ্রুপাশ

জিনিসের মধ্যে ভিজা ছোলা ও আদা খাইয়া থাকেন। সুতরাং ভিজা ছোলা ও আদা প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। ভিজা ছোলা দেখিয়াই তিনি ভার খুঁসি হইলেন। বলিলেন, “বাঃ, আমি যে প্রাতে ভিজা ছোলা খাই, তাহা জানিলে কিরূপে ?” আমি বলিলাম, “এ আবার আশ্চর্যের বিষয় কি ? আপনাব দৈনিক রীতির যদি এতটুকুও না জান্লাম, তবে আপনার সঙ্গে কি মিশ্লাম ? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি এত ভিজা ছোলা ভাল-বাসেন কেন ?” তিনি হাসিয়া বলিলেন, — “ভিজা ছোলা খাবনা ! গাড়ীতে যুতে টানাও কেমন ?” বলিয়াই হাসিয়া আবার বলিলেন, “শুধু গাড়ীতে যুতে টানান নয়, চাবুক মারতেও ত কসুর কব না।” তখন আমবা মধ্যে মধ্যে তাঁর কাজের সমালোচনা করিতাম। এই চাবুক মাবার অর্থ তাহাই। শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, “বে-আদবী মাপ করবেন ; আপনি বেদীতে বসে চাট মারতেও ত ছাড়েন না।” এই কথা লইয়া খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল।

আব-একবার আমার একটা বন্ধুর কণ্ঠার নামকরণে তাঁহার উপাসনা করিবার কথা। সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে এইরূপ স্থির ছিল। আমরা বসিয়া আছি, তিনি আব আসেন না। তিনি গবর্ণর জেনারেলের বাড়ীতে এক সাক্ষ্যসমিতিতে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, তিনি একবার দেখা দিরাই চলিয়া আসিবেন। এদিকে ৮টা বাজিয়া গেল, ৯টা বাজিয়া গেল, তাঁহার দেখা নাই। অবশেষে প্রায় ৯টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, “আপনি বড়-লোকদের ল্যাজ খুঁসি কেন বেড়ান ? কই, আপনাকে ত কোন টাইটেল দেয় না ?” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “কেন, হে বাবু ? K. C. S.—। (অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেন আমি), আমার টাইটলে অগ্রভুল কি ?”

আব-একবার আমি তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি, তিনি ঘুমাইতেছেন, কিন্তু চোখে চশমা আছে। আমি বলিলাম, “বদি ঘুমাইছেন,

তবে চোখে চশমা কেন ?” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “ওহে বাপু, স্বপ্নম ত দেখতে হয়।”

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড যাত্রা।—১৮৭০ সালের প্রারম্ভে তিনি যখন ঠংলণ্ড যাত্রা কবিলেন, তখন একদিন আমাদের অনেককে একত্র কবিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বিদেশে যাইতেছেন, কি হয় শঙ্কিত নাই; তাঁর অবর্তমানে তাঁর যে-সকল মত হইয়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সে-সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটা কথা মনে আছে। তিনি মহাপুরুষের মতেব উল্লেখ কবিয়া বলেন যে, তিনি মহাপুরুষদিগকে মনে কবেন যেন চশমা,—অর্থাৎ চশমা যেমন চক্ষুকে আবরণ কবে না, কিন্তু দৃষ্টিব উজ্জলতা সম্পাদন কবে, তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরদর্শনের ব্যাঘাত কবেন না, কিন্তু ঈশ্বরদর্শনের সহায়তা কবেন। অথবা মহাপুরুষেরা যেন দাবান ; দাবান যেমন আগন্তুক ব্যক্তিকে প্রভুব সমীপে উপনীত কবিয়া দেয়, তৎপরে আর তাঁর কাজ থাকে না, তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর-চরণে মানবকে উপনীত কবিয়া দেন, নিজেরা আর মধ্যে থাকেন না। আমার মনে হইতেছে, আমি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, “মহাপুরুষেরা চশমা, তাহা ঠিক; কিন্তু কাহাকেও যাদ বাববাব বলা যায়, ‘দেখ, দেখ, ঐ তোমার চোখে চশমা, ঐ তোমার চোখে চশমা,’ তাহা হইলে দ্রষ্টব্য পদার্থ হইতে তাহার দৃষ্টিকে তুলিয়া, সে দৃষ্টিকে চশমার উপবেই কেলিয়া দেওয়া হয়। তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বরদর্শনের সহায় হইলেও, ‘ঐ মহাপুরুষ, ঐ মহাপুরুষ’ কবিয়া যদি তাঁহাদের প্রতিই দৃষ্টিকে অধিক আকর্ষিত করায়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে পশ্চাতে ফেলা হয়।”

যাহা হউক, তাঁহার বিচ্ছেদে আমি বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলাম, এবং তৎকালের তার প্রকাশ করিয়া একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম; ইংরেজি তাঁহার পদ্যের উক্তিহে। তাহা বোধ হয় শব্দলারাজ্যে কি অল্প

কোনও পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কেশববাবুর নিকট অনেক শিখিয়াছি। কি ভাবে ঈশ্বরের কাজ করিতে হয়, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া শিখিয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর কাহাকে বলে, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া জানিয়াছি।

ইংলণ্ড হইতে কিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্রের নানারূপ কার্যের প্রবর্তন।—কেশব বাবু কয়েক মাস পরে ইংলণ্ড হইতে কিরিয় আসিলেন। তিনি আসিয়াই নানা নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। Indian Reform Association নামে একটা সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে Temperance, Education, Cheap Literature, Technical Education প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাঁহার অনুসরণ করিতাম। আমি সুস্থাপন বিভাগেব সভ্যরূপে “মদ না গবল” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির কবিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকাৰিতা প্রতিপন্ন করিয়া গত্ত-পত্তময় প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। সে-সমুদয়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম। তন্নির্ভর “সুভ সমাচার” নামক এক পয়সা মূল্যের যে সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতেও লিখিতাম।

এই সময়ে কেশববাবু পুরাতন Society of Theistic Friendsকে পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহাতে আমাকে বক্তৃতা করিতে বলেন। তদনুসারে আমি ইংবাজীতে এক বক্তৃতা করি; কেশব বাবু সভাপতি ছিলেন। সে বক্তৃতার দিনেব অল্প কথা অধিক মনে নাই। এইমাত্র মনে আছে, আমেবিকার ইউনিটেরিয়ান মিশনারী সুপ্রসিদ্ধ ড্যাল সাহেব সেদিনকার সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপনাকে Brahmo follower of Christ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেশববাবু তাঁহাকে উপহাস করিলেন।

এই Indian Reform Association এর পক্ষ হইতে কেশব বাবু

আর-একটা কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এক মুদ্রিত পত্র দ্বারা দেশের প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের নিকট হইতে, এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত কাল কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদন্তের অধিকাংশ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ডাক্তার ১৬ বৎসরের উর্দ্ধে সেই কালকে নির্দেশ করেন। কেবল ডাক্তার চার্লস চতুর্দশ বর্ষকে সর্বনিম্ন বয়স বলিয়া নির্দেশ করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সালের তিন আইনে চতুর্দশ বর্ষকে বালিকার সর্বনিম্ন বিবাহের বয়স বলিয়া নির্দেশ করা হয়। তিন আইনের এই আন্দোলনে আমরা সকলেই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলাম।

এই সময়েই বা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে আদি সমাজের ভূতপূর্ব সভাপতি ভক্তিবান্ধন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” বিষয়ে একটা বক্তৃতা করেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার তদানীন্তন সম্পাদক ও বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রিকার পত্র প্রেরক জেম্‌স্ রুটলেজ (Routledge) সাহেব তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ টাইম্‌স্ পত্রিকাতে প্রেরণ করেন। তাহার ফলস্বরূপ এদেশে ও সেদেশে সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে চর্চা উপস্থিত হয়। সেই বক্তৃতাতে রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মধর্মকে উন্নত হিন্দুধর্ম বলিয়া প্রতিপাদন করেন। উন্নতিশীল দল এ মতের বিরোধী ছিলেন। কেশব বাবু আমাকে ও পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়কে এ বিষয়ে ছুইটা প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িতে আদেশ করেন। তদনুসারে আমি ইংরাজীতে ও গৌর বাবু বাঙ্গালাতে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। কেশব বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ভারত-আশ্রম স্থাপন।—এই সময়কার সর্বপ্রথম কার্য ভারত-আশ্রম স্থাপন। কেশব বাবু ইংলণ্ডে ইংরাজের গৃহকর্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্বদা বলিতেন, middle class English home এর ভার institution পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল, কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া কিছু দিন সময়ে আহার, সময়ে শিক্ষা, সময়ে কাজ, সময়ে উপাসনা, এইরূপ নিয়মাবলী রাখিয়া, পৃথকানত

কাজ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা সেই ভাব লইয়া গিয়া চারিদিকের ব্রাহ্মপরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে। এই ভাব লইয়া তিনি ভারতাপ্রস্তু স্থাপন করিলেন। তাঁহার অল্পগত প্রচারকগণ সৰ্বাগ্রে গেলেন। তৎপরে আমরাও অনেকগুলি পরিবার বাহির হইতে গেলাম। আমরা কেশব বাবুর মনের ভাবটা কাজে করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম।

ভারত-আশ্রমে কেশবচন্দ্রের বিমল সহবাস।—ভারতাপ্রস্তু স্থাপিত হইলে কেশব বাবু কলুটোলার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়া থাকিতে লাগিলেন। কলিকাতা ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে (বর্তমান সিটি স্কুলের ভূমিস্থিত ভবনে) প্রথমে কিছুদিন থাকিয়া পবে সহরের বাহিরে কোন কোনও বাগানে গিয়া থাকা হয়। প্রথম বেলঘরিয়ার এক বাগানে, তৎপরে কাঁকড়াগাছির এক বাগানে কিছুদিন বাওয়া হয়। এই-সকল স্থানে গিয়া আমরা কেশব বাবুর বিমল সহবাসে থাকিবার অবসর পাইলাম। স্বীয় স্বীয় ব্যয়ের অংশ দিয়া সকলে একান্নভুক্ত পরিবারের ত্রায় থাকিতাম। একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে কলা, একসঙ্গে বেড়ান,—সুখেই কাল কাটিত। সহরে বাহাদের কাজ থাকিত, তাঁহারা দিনের বেলায় সহরে গিয়া কাজ করিয়া আসিতেন। গ্রীষ্মে ও শীতকালে একসঙ্গে উপাসনা ও একসঙ্গে ধর্ম্মালাপ চলিত। আমরা সকল বিষয়েই কেশব বাবুর পরামর্শ ও সহপদেশ পাইতাম।

আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে আপনাকে অর্পণ করিব বলিয়াই ভারতাপ্রস্তু কাল করিতে গিয়াছিলাম। আমার অগ্রে অভিপ্রায় ছিল যে, আমি কলিকাতা হইতে উদ্ভূত হইয়া ওকালতী করিব, সেইজন্য উকীল বন্ধুদের পরামর্শে তিন বৎসর 'ল লেকচার' শুনিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কতকগুলি স্মরণ হয়, আমার বি-এল্ দিবার ইচ্ছা হইবার আর-একটা কারণ ছিল। তদানীন্তন লেকটেন্যান্ট গভর্নর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল প্রমথচন্দ্রের সর্বাধিকারী, মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমি Judicial

Serviceএ তোমাদের কলেজের ছেলে চাই, কাষণ তাহা বা Hindia Law বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়।” তদনন্তর সর্বাধিকারী মহাশয় আসিয়া আমাদেরকে বি-এল পবীক্ষা দিবাব নিমিত্ত উৎসাহিত করেন ; এবং আমাব ভক্তিতাজন মাতুল মহাশয়ও সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে আমি ‘ল লেকচার’ শুনিতে আবন্ত কবি। কিন্তু বি-এ পাশ পরীক্ষাই অন্তবিধ আকাজকা আমাব হৃদয়ে আসিল। আমি কেশব বাবুব পদানুসরণ কবিত্তা ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার-কার্যে আমার জীবন দিব, এই বাসনা হৃদয়ে উদয় হইল। গোপনে পত্র দ্বাৰা কেশব বাবুকে একুপ অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি আমাকে গোপনে বলিলেন, “তুমি আস্তে আস্তে ক্রমে আমাদের সঙ্গে যোট, তাব পব দেখা যাবে কি হয়” ; এবং আমি ১৮৭২ সালের প্রাবস্তে এম-এ পাশ কবিত্তা ‘শাস্ত্রী’ উপাধি পাইয়া কলেজ হইতে বাহিব হইবামাত্র, তাহাব নব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা-বিদ্যালয়ে আমাকে শিক্ষকতা-কার্য দিয়া আশ্রমে সপরিবাবে থাকিতে আদেশ কাবলেন। আমাব নামে বেতন কুপে বাহা দেওয়া হইত, তাহা প্রচারকগণেব চিব পবিচারক প্রক্লাপ্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্রেব হস্তে জমা হইত, তিনি আমাব জীপুত্রেব ভবণপোষণ দেখিতেন ; তাহাব সহিত আমাব কোনও সংগ্রব থাকিত না। বলা বাহুল্য, তখন প্রচারকগণ সকলে ও তৎসঙ্গে আমি, সপরিবাবে ঘোব দাবিদ্র্যে বাস কবিতাম।

• আমি কেশব বাবুব আশ্রমোৎসাহেব মধ্যে প্রাপন্ন ঢালিলা দিয়াছিলাম। সে সময়ে আশ্রমেব আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ হয় ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সে সময়ে কেশব বাবুব ও তাঁহাব পত্নীৰ যে সাধুতা ও ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিবাব নয়। প্রতিদিন দুপুরবেলা আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগকে লইয়া কুল কবা হইত। আমি ঐ কুলে পড়াইতাম। একদিন কেশব বাবু, তাঁহাব পত্নীকে উদ্দেশ কবিত্তা আমাকে

বলিলেন, “ওহে, তুমি শুকে ইংরাজী শেখাও ত।” তখনসত্ত্বে তিনি আমার হাজী হইলেন। কেশব বাবু তাঁহার প্রকৃতির সরলতা জানিডেন। তিনি বিলাত হইতে কতকগুলি Children’s Magazine ও reading books আনিয়াছিলেন। তাহাব একখানি তাঁহাকে পড়াইবার জন্ত দিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, “এ যে ছোট ছেলেদের বই।” তিনি বলিলেন, “আরে, উনি প্রথম ইংরেজী পড়বেন ত ? হুই বা ছোট ছেলেদের বই ; তুমি পড়াতে আবস্ত কর না, দেখবে উনি মনে ছোট ছেলেই আছেন।” কাজেও তাহার প্রমাণ পাইলাম। তাঁহাব পাঠ্যপুস্তকে একটা ছোট মেয়ের ছবি ছিল, তাহার মাথার কৌকড়া কৌকড়া চুল ; মেয়েটি দেখিতে সুন্দর, কিন্তু বড় ছুট। ওই ছবির সঙ্গে তাহাব ছুটামির অনেক গল্প আছে। আচার্য্য-পত্নী তাহার জীবনে এত ছুটামির কথা বোধ হয় শোনে নাই। তিনি পাড়িয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া গেলেন ; ছবিটা পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষের শূল হইয়া দাঁড়াইল। একদিন পড়িবার জন্ত যেই বই খুলিয়াছেন, অমনি সেই ছবিটা বাহির হইল। তিনি দেখিয়া রাগিয়া গেলেন ও নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “মা গো মা ! কি ছুটু মেয়ে ! দেখলেই রাগ হয়।” আমি শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম, “বাগেন কার উপরে ? ও যে ছবি। আর ও-সব যে কল্পিত গল্প।” তিনি সেদিকে কান দিলেন না। তাঁহার বিত্তীয় কথার উল্লেখ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার চুলগুলো কি কেটে দেবো ? তারও চুলগুলো ঠিক এমনি কৌকড়া কৌকড়া, দেখলে ঐ ছবিটা মনে পড়ে।” আমি শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম।

আর-একদিনের আর-একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন আমি কেশব বাবুর সহিত কোন বিশেষ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্ত তাঁহার ঘরে গেলাম। তখন তাঁহার বিশ্রাম করিবার সময়। কিন্তু দেখিলাম, তিনি ঘরে নাই। তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করাহেতু তিনি বলিলেন,



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সহপাঠিনী ।

“আমাকে কোন কাৰণে বাগ্‌তে দেখে, তিনি প্রথমে বল্লেন, ‘তাই হ, তুমিও বেগে উঠলে?’ এই বলে এই ঘবেই কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে বহিলেন, যেন পাষণেব মূৰ্ত্তি; তাৰ পৰ বাহিৰ হয়ে গেলেন। খুঁজে দেখুন, বোধ হব বাগানেব কোন গাছতলায় চোখ বুজে বসে আছেন।”

শুনযা আমি হাসিতে লাগিলাম। তিনি বল্লিলেন, “হাসেন কি? ওই চোখ বুজে বুজেই আমার সেবে আনছেন। আমি কিছু অন্য় কব্লেই বাগ নাই, উন্য় নাই, চোখ বুজে একেবাৰে পাষণ-প্ৰতিমা হয়ে যান। আমি লজ্জায় মৰে যাই। ভবিষ্যতে যাতে আব ওকপ না কৰি, তাৰ জন্ত ঈশ্বৰ-চৰণে বাব বাব প্ৰাৰ্থনা কৰতে থাকি।”

আমি শুনিয়া ভাবতে গাঁগলাম, যাহাব বাহিৰে এত তেজ, বক্তৃতাত্তে যিান অগ্নি উদ্ভাবণ কৰেন, যাহাব মনুষ্যত্বের প্ৰভাবে ধৰা কাম্পিত হয়, গৃহেব মধ্যে তাহাব এই আত্মসংযম। বাস্তবিক, কেশবচন্দ্রের আত্মসংযম-শক্তি অতি অদ্ভুত ছিল। বাদ বসম্বাদ, তকয়ুদ্ধে আমবা অনেকেই অনেক সময় উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইতাম, কিন্তু তিনি ধীৰ ও স্থিৰ থাকিয়া আপনাব বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিতেন। মনে হয় ত গভীৰ বিবক্তিব দাবিৰ্ভাব, কিন্তু বাহিৰে তাহাব প্ৰকাশ নাই। স্মৃতিপৰম্পৰা দ্বাবা শ্ৰোতাকে কোণঠাসা কৰিয়া ধৰিতেন। দীৰ্ঘকাল একত্ৰ বাস কৰিয়া কেবল দুই এক স্থলে মাত্ৰ তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়াছি। নতুবা তিনি সৰ্ব্বত্ৰ সৰ্ব্বকালে ও সৰ্ব্ববিষয়ে আমাদেব নিকট সংঘমের আদৰ্শ স্বৰূপ থাকিয়াছেন। একথা যখনঃ শ্রবণ কৰি, হৃদয় উন্নত হয়, এবং নিজেদের দৈনিক ব্যৱহাবেব জন্ত লজ্জা হয়। তাঁহাব সংঘমেব এই দৃষ্টান্তটী চিৰশ্রবণীয় হইয়া বহিয়াছে। উপসংহাবে বক্তব্য যে, কেশব বান্ৰব ঘব হইতে বাহিৰ হইয়া বাগানে তাঁহাকে অন্বেষণ কৰিতে গিয়া বাস্তবিক দেখিলাম যে, তিনি এক বৃক্ষেব তলে নয়ন মুদ্রিত কৰিয়া গভীৰ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন।

আচার্য্য-পত্নীৰ সবলতা ও আমাব প্রতি অকপট ভালবাসাব আব একটি নিদর্শন মনে হইতেছে, তাহা বলিয়া ফেলি। আমি একদিন স্কুলে পড়াইবাব সময় দেখিলাম, তিনি পড়া কবিয়া আসেন নাই। তাই তাঁহাকে বলিলাম, “ছপুব বেলা খাওয়াব পব ঘবে গিষে শয়ন কব্লে আপনি ত আপনাব পতিব নিকট কঠিন বিষয়গুলো জেনে নিতে পাবেন, পড়া তয়েব কবে আস্তে পাবেন।” তদনুসাবে তিনি তৎপৰদিন ছপব বেলা পড়া জানিতে বসেন। কেশব বাবু এটা ওটা বলিষা দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাব পত্নী বলিয়া উঠিলেন, “যাও যাও, তুমি শিবনাথ বাবুব মত পড়াতে পাব না।” এই কথায কেশব বাবু খুব হাসিতে লাগিলেন। তৎপব দিন তাঁহাবা যখন পতি-পত্নীতে একত্ৰ আছেন, এমন সময়ে কোনও কাজেব জন্ত আমি সেখানে গেলাম। আমাকে দেখিষা কেশব বাবু হাসিয়া বলিলেন, “শিবনাথ। তুমি আমাব সমক্ষে পড়াও ও, আমি দেখি। তুমি এমন পড়া কি পড়াও বে আমাব পড়ান ঔব মনে লাগে না? আমাকে বলেছেন, “তুমি শিবনাথ বাবুব মত পড়াতে পাব না।” আমি হাসিয়া বলিলাম, “বুঝলেন না, আমাকে ভাৰি ভালবাসেন কি না, তাই আমি যা কবি ভাল লাগে। আপনাকে জেনেছেন সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেষ্টা, আমাকে জেনেছেন সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক। যা হোক, এ কথা শুনে আমাব শ্রমটা সার্থক বোধ হচ্ছে।”

এই ভাবতান্ত্রমে বাসকালে আচার্য্য-পত্নীৰ পতিভক্তি ও শিশু-সুলভ সবলতাৰ আব-এক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এখানে উল্লেখ কবা ভাল। আশ্রম স্থাপিত হইয়া প্রথমে কিছুদিন ১৩ নম্বৰ মিৰ্জাপুৰ ষ্ট্রীট ভবনে ছিল। তখনও ‘বয়স্থা-মহিলা-বিজ্ঞালয়’ স্থাপিত হয় নাই। সে সময়ে কেশব বাবু খ্রীষ্টীয়-মন্দি-প্রচাৰিকা কুমাবী পিগটকে (Piggot) অনুবোধ কবিয়াছিলেন যে, তিনি সপ্তাহেব মধ্যে কয়েকদিন বৈকালে আসিয়া আশ্রমবাসিনী মহিলাদেব সঙ্গে বসিবেন, তাঁহাদেব লেখা পড়া

১৮৭০-৭২] বিবাজমোহিনীৰ পিতৃমাতৃবিয়োগ ও কলিকাতায় আগমন ১৮৭

দেখিবেন, ও তাঁহাদেৰ সঙ্গে নানা হিতকৰ বিষয়ে আলাপ কৰিবেন। কুমাৰী পিগট কেশব বাবুকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা কৰিতেন, এই অনুবোধ কৰিবামাত্ৰ তিনি আসিতে লাগিলেন। একদিন মহিলাদেব সহিত অপবাপৰ কথাৰ মধ্যে কুমাৰী পিগট বলিলেন, “আমবা বিশ্বাস কৰি যাহাবা খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ না কৰে তাহাদেৰ অনন্ত নবকবাস হইবে।” আচাৰ্য্য পত্নী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি শুনবা চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “ওমা সে কি গো। যে সবলভাবে বিশ্বাস করতে পাবছে না, তাৰ সাজা অনন্ত নবকবাস ?” কুমাৰী পিগট বলিলেন, “হাঁ, আমাদেব ধৰ্ম্মে তাই বলে। এমন কি তোমাব পতিও যদি খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম্মে দাক্ষিত না হন, তাঁব ভাগ্যেও নবকবাস।” এই কথা শুনিয়া আচাৰ্য্য-পত্নী গম্ভীৰ মুক্তি ধাবণ কৰিলেন, তাঁব চক্ষে দৰ দৰ ধাবে অশ্রু পড়িতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পৰেই তিনি উঠিয়া নিজ গৃহে গেলেন। তৎপৰে কুমাৰী পিগটেব নিকট আসা ত্যাগ কৰিলেন। আমবা বুঝাইয়া আনিতে পাবিলাম না, কেশব বাবুও নিজে বুঝাইয়া বাজি কৰিতে পাবিলেন না। তিনি বলিলেন, “কুমাৰী পিগটেব মুখ আৰ দেখিব না।” কত বলা গেল, “খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম্মে যাহা আছে তাহাই তিনি বলিয়াছেন, কেশব বাবুৰ প্ৰতি ঘৃণা প্ৰকাশেৰ জন্ত কিছু বলেন নাই।” তখন শুনিলেন না। কিছুদিন পৰে বোধ হয় কুমাৰী পিগটেব সহিত পুনৰ্মিলিত হইয়াছিলেন।

বিবাজমোহিনীৰ পিতৃমাতৃবিয়োগ ও কলিকাতায় আগমন।—

ইতিমধ্যে আমাব পাৰিবাৰিক জীবনে এক স্তম্ভহং পৰিবৰ্ত্তন উপস্থিত হইল। আমাব দ্বিতীয়া পত্নী বিবাজমোহিনীকে আনিতে হইল। ইহাব দুই বৎসৰ পূৰ্বে তাঁহাব পিতা মাতা তাই ভগিনী প্ৰভৃতি সমুদয় অকালে গত হন। তিনি একাকিনী তাঁহাব পিতৃবাগণেৰ গলগ্ৰহ হন। তদনন্তৰ তাঁহাব পিতৃব্য মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে আনিবাব জন্ত আমাকে আগ্ৰহেৰ সহিত অনুবোধ কৰেন। আমি তাঁহাব পুনৰায় বিবাহ দিবাৰ

আশায় তাঁহাকে অগ্রে কয়েকবার আনিতে গিয়া বিকল-মনোবধ হইয়া সে চেষ্টা কিছুদিনেব জন্ত পবিত্যাগ কৰিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাব পিতৃব্যেব অমুবোধে পুৰাতন কৰ্ত্তব্য-জ্ঞানটো আমাব মনে প্ৰবল হইয়া উঠিল। কিন্তু আমাব ব্ৰাহ্মবন্ধুদিগেব মধ্যে অনেকে তাঁহাকে আনিবাব প্ৰস্তাবেব প্ৰতিবাদ কৰিয়া বলিতে লাগিলেন, “ব্ৰাহ্ম দুই স্ত্ৰী লইয়া একত্ৰ বাস কৰিবে, ইহা বড়ই খাবাপ কথা। বহুবিবাহেব প্ৰতিবাদ আমাদেব এক প্ৰধান কাজ। দুই স্ত্ৰী লইয়া একত্ৰ থাকিলে তুমি বহুবিবাহেব প্ৰতিবাদ কৰিবে। কৰূপে ?” আমি বলিলাম, “আমি ত দুই স্ত্ৰী নিজে ঘবকল্পা কৰ্ব্ব বলে আনুতে যাচ্চ না। সে বেচাৰিৰ অপবাদ কি যে, পিতা মাতা গত হওবাব পৰেও তাকে আশ্ৰয় দিব না ? এ বহুবিবাহেব অপবাদ ত তাব নয়, সে অপবাদ আমাব। আমি তাকে এনে দেখাপড়া শিখাব, সে বাজি হলে তাব আবাব বিয়ে দেব বলে আনুতে যাচ্চি।” এই মতভেদ লইয়া আমি কেশব বাবুৰ শবণপন্ন হইলাম। তিনি বিবাজ-মোহিনীকে আনিতে পৰামশ দিয়া বলিলেন, “বাল্যবিবাহেব দেশে বহুবিবাহে মেয়েদেব অপবাদ কি ? একজন যদি দশটী মেয়ে বিবাহ ক’বে ব্ৰাহ্ম হয়, পৰে সে দশজনকে আশ্ৰয় দিতে বাধ্য। এমন কি, আশ্ৰয় না দেওয়াতে উক্ত স্ত্ৰীলোকদেব কেহ যদি বিপথে যায়, তাব জন্ত সে দায়ী।”

পুনৰ্বিবিবাহেব প্ৰস্তাবে বিবাজমোহিনীৰ ঘৃণা।—আমি কৰ্ত্তব্য-বোধে ১৮৭২ সালেব মধ্যভাগে বিবাজমোহিনীকে আনিতে গেলাম। তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্ৰহণ কৰিব না, কিন্তু পুনঃপৰিণীতা না হওয়া পৰ্য্যন্ত বক্ষা ও শিক্ষাব বন্দোবস্ত কৰিব, যতদূৰ মনে হয় এই ভাবেই আনিতে গিয়াছিল। আশ্ৰমে বাধিব ও মহিলা-বিদ্যালয়ে ভৰ্ত্তি কৰিয়া দিব ; পৰে তিনি যদি পুনঃপৰিণীতা হইতে না চান, লেখা পড়া শিখিলে কোন ভাল কাজে বসাইয়া দিব ; তিনি সুখী হইবেন, ও আত্মরক্ষা কৰিতে পাৰিবেন ;



গ্রন্থকাব ও তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী দেবী (১৯০৩)

--উহা ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ হইতে লাগিল। প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে আনিতে গেলাম। আনিয়া আশ্রমে প্রসন্নময়ীর সহিত রাখিলাম। বিবাজমোহিনীর বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসব হইবে। বিবাজমোহিনীকে বলিলাম, “আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ কবি নাই, তাহাব কাৰণ এই যে, আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অল্প কালকেও বিবাহ কবিত্তে চাও, কবিত্তে দিব। আব, যদি লেখাপড়া শিখিয়া কোন ভাল কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পাবিবে, এজ্ঞা তোমাকে স্কুলে দিতেছি; তুমি এখন লেখাপড়া কব।” এই বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি কৰিয়া দিলাম; কিন্তু দিলে কি হয়? তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, “মাগো। মেবে মাহুষেব আবাব ক’বাব বিয়ে হয়!” তাঁহাব ভাব দেখিয়া, পুনৰ্বিবাহেব প্রতি দাবী দেখিয়া, আমার এতদিনেব পোষিত মাথাব ভূত এক কথাত্তে নামিয়া গেল। আমি বলিলাম, দ্বিতীয় প্রস্তাবই কাৰ্য্যে পৰিণত কৰিতে হইবে। ৫

নূতন পরীক্ষা।—কিন্তু আব-এক দিক দিয়া আমার আর এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ী ও বিবাজমোহিনী যখন এক ভবনে একত্রে বাস কবিত্তে লাগিলেন, অথচ আমি বিবাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ কবিত্তে বিবত বহিলাম, তখন প্রসন্নময়ী হইতেও সেই সময়েব জ্ঞাত আমার স্বতন্ত্র থাকা উচিত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তখন তাঁহার সঙ্গে বহুদিনেব স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ বহিয়াছে; তৎপূৰ্বে হেমলতা, তরঙ্গিনী ও প্রিয়নাথ তিন জন জন্মিয়াছে। তাঁহা হইতে দুবে থাকা আমার পক্ষে ঘোর সংগ্রামেব বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ীর পক্ষেও তাহা অতীব ক্লেশকর হইল। আশ্রমে স্কুল-ঘর ও কেশব বাকুর আশীস-ঘর তিন অধিক বাহিবেব ঘর ছিল না। স্নাত্তে প্রসন্নময়ীর ঘৰে না গুইলে গুই কোথায়? প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া বিদায় লইয়া এখানে তখননে গুইতে আরম্ভ কৰিলাম। অবশেষে ঘটনাক্রমে এক উপায় আবিষ্কার

করিলাম। হিন্দু কলেজের বারাণ্ডাতে দপ্তরীদের একটা টেবিল পড়িয়া থাকিত। রাত্রে তাহাতে জিনিসপত্র কিছু থাকিত না। রাত্রে আহারের পর একখানা পুস্তক লইয়া সেখানে গিয়া সেই পুস্তক মাথায় দিয়া টেবিলে শুইয়া বেশ নিদ্রা যাইতাম। দিঘীর মাঠের হাওয়ার বেশ নিদ্রা হইত। প্রাতে আসিয়া স্নান করিয়া কেশব বাবুর উপাসনাতে যোগ দিতাম, বন্ধুদের সহিত আহার করিতাম, আহারান্তে মহিলা-স্কুলে পড়াইতাম, অপরাহ্নে বন্ধুদের সহিত ধন্দলাপে কাটাইতাম, সন্ধ্যার পর আহার করিয়া আবার হিন্দু কলেজের বারাণ্ডায় টেবিলের উপর গিয়া শুইতাম। সেখানে আমার সময় বড় ভাল যাইত। গভীর রাত্রের নিজ্জনে অনেক দিন ঈশ্বর-চিন্তাতে যাপন করিতাম। রজনী প্রভাত হইবার পূর্বেই আমাকে উঠিতে হইত। উষাকালের সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত আমাব পক্ষে বড়ই স্পৃহণীয় ছিল।

আমি জানিতাম, আমি যে গোলদিঘীর ধারে টেবিলের উপরে রাত্রি যাপন করি, তাহা কেহ জানেন না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী উভয়েই সে কথা জানিতে পারিলেন। শুইবার স্থানাভাবে কলেজের বাবাণ্ডায় পড়িয়া থাকি শুনিয়া প্রসন্নময়ী কাঁদিতে লাগিলেন। বিরাজমোহিনী মনে করিলেন, তিনিই এই-সমুদয় কষ্টের কারণ, ইহা ভাবিয়া ঘোর বিবাদে পতিত হইলেন; তাঁহারও চক্ষু জলধারা বাহতে লাগিল।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আগমন — এই সময় আবার আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণনগর হইতে কর্ণ ছাড়িয়া প্রচারক দলে যোগ দিবেন বলিয়া আসিলেন। তাঁহার আসিবার কথা যেদিন স্থির হয়, সেদিন কাস্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত কেশব বাবুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিনের কথা কখনই ভুলিব না। কাস্তি বাবু আসিয়া বলিলেন, “নগেন্দ্র আসিতে চাহিতেছেন, কি করা যাবে?”

কেশব বাবু—সে ত ভালই, তিনি আনন্দন। কথা যাবে কি, কেন ভাবছ ? আবার কথা যাবে কি ?

কান্তি বাবু—কিরূপে চলবে ?

কেশব বাবু—তা ভাববাব তোমার অধিকার কি ? যিনি আনছেন, তিনিই তার উপায় কব্বেন।

তাঁহাব এরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর্যেব ভাব অনেক স্থলে দেখিয়াছি। নগেন্দ্রবাবু কৃষ্ণনগরে তাঁহাব জননীকে বাধিয়া একটা পুত্র ও পত্নী সহ আশ্রমে আসিলেন।

কিন্তু তাঁহাব আসিবাব অচিবকালেব মধ্যে কেশব বাবুব অহুগত প্রচারক দলেব সহিত আমাব ও নগেন্দ্রবাবুব অপ্রীতি জন্মিতে লাগিল।

স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন।—আমাব প্রতি অপ্রীতি জন্মিবাব দুই কাবণ। প্রথম কাবণ, এই সময়ে স্ত্রী-স্বাধীনতাব আন্দোলন উপস্থিত হইল। ১৮৭২ সালে আমাব বন্ধু ছাবকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস, রজনীনানথ স্মার, অন্নদাচরণ খাস্তগিব প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্ম কেশব বাবুকে বলিলেন যে, তাঁহাবা তাহাদেব পবিবাবস্থ মহিলাদিগকে লইয়া মন্দিবে পব্দাব বাহিবে বসিতে চান। কেবল এ কথা যে বলিলেন তাহা নহে, একটা কিছু স্থির হইতে না হইতে একদিন অন্নদাচরণ খাস্তগিব ও দুর্গামোহন দাস স্বীয় স্বীয় পত্নী ও কন্তাগণ সহ পব্দাব বাহিবে সাধারণ উপাসকদিগেব মধ্যে গিয়া বসিলেন। এইরূপ কয়েকবাব বসিতেই উপাসক-মণ্ডলীর অপরাপর সভ্যগণ আন্দোলন উপস্থিত কবিলেন। অনেকে এতদূব গেলেন যে, কেশব বাবুকে বলিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মন্দিবে আসা ত্যাগ কব্বিতে হয়। ঐ সময়ে একদিন সমাগতা মহিলাদিগকে পব্দাব বাহিবে বসিতে নিষেধ কবা হইল; তাহাতে উন্নতিশীল হল বাধিয়া গেলেন। কেশব বাবু বিপদে পড়িলেন। কিরূপে উত্তর পক্ষ দক্ষা হয়, সেই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী দল বিলম্ব সহ্য না করিয়া মন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন, এবং প্রথমে বহুবাজার স্ট্রীটে খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে ও তৎপবে অপর স্থানে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার একবাব মহর্ষিকে আনিয়া আপনাদেব সমাজে উপাসনা করাইলেন। আমাব বহু দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই স্ত্রী-স্বাধীনতাপক্ষের প্রধান নেতা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক দিন আমি এক বাড়ীতে এক প'রবারে বাস করিয়াছিলাম। হৃদয়ে হৃদয়ে একটা প্রীতির যোগ ছিল। আমি তাঁহাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা-দলের একজন পাণ্ডা হইলাম না বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত আমাব মনের যোগ ছিল। স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে বসিতে দিতে আমার আপত্তি ছিল না। বরং, যখন তাঁহারা বসিতে চাহিতেছেন, তখন বসিতে দেওয়া উচিত, এই মনে করিতাম; তবে ষ্মারিক বাবুব জ্বার মনে কবিতাম না যে, বাহিরে বসিতে দিলেই পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। তখন আমাব এই প্রকার ভাব ছিল। বাহা হউক, তাঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিয়াই সেখানে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিবার জন্ত আমাকে ধরিলেন। আমি জানিতাম, ইহাতে কেশব বাবু অসন্তুষ্ট হউন বা না হউন, তাঁহার অনুগত প্রচারকদের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা-পক্ষীয় সকলেই আমার বহু, এবং তাঁহাদের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ; উপাসনা করিবার অনুরোধ কিরূপে লজ্বন করি? কাজেই সম্মত হইলাম, এবং তাঁহাদের সমাজে উপাসনা করিতে লাগিলাম। ইহা প্রচারক মহাশয়দিগের সহিত আমার মতভেদের একটা কারণ হইল।

ক্রমে কেশব বাবু তাঁহার ব্রজমন্দিরের এক কোণে পদ্মদার বাহিরে অগ্রসর দলের মহিলাদের জন্ত বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। তখন স্ত্রী-স্বাধীনতার দল স্বতন্ত্র সমাজ তুলিয়া দিয়া আবার মন্দিরে আসিতে লাগিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে মত ভেদ ।—মন্দিরে মহিলাদের বসিবার স্থান লইয়া যে বিবাদ তাহা মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে কেশব বাবুর সহিত এই অগ্রসর দলের যে মতভেদ ঘটিয়াছিল, তাহা এরূপ সহজে মিটিবার জিনিস ছিল না। আশ্রমে যে মহিলা-বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে কেশব বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দিবার বিরোধী ছিলেন। এমন কি, জ্যামিতি পড়ান লইয়াও তাঁহার সহিত আমার তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। আমি জ্যামিতি লজিক ও মেটাক্সিক্লিস্ পড়াইতে চাহিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, এ-সকল না পড়াইলে প্রকৃত চিন্তাশক্তি ফুটিবে না। কেশব বাবু বলিলেন, “এসকল পড়াইয়া কি হইবে? মেয়েরা আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি করিবে? তদপেক্ষা elementary principles of science মুখে মুখে শিখাও।” আমি scienceএব মধ্যে mental science আনিলাম। তখন আমি তাজা কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, mental scienceএ মাথা পুরিয়া রহিয়াছে, আমার ছাত্রীদিগকে তাহা না পড়াইলে কি থাকিতে পারি? আমি মুখে মুখে mental science বিষয়ে ও logic বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীরা লিখিয়া লইতেন। সে সকল note এখনও আমার পুরাতন ছাত্রীদের কাহারও কাহারও নিকট থাকিতে পারে। আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন তিনজন, রাধারাণী লাহিড়ী, সোদামিনী খাস্তগির (বিনি পরে Mrs. B. L. Gupta হইয়াছিলেন,) ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন। ইহারা সকলেই তখন বয়স্কা ও জ্ঞানানুরাগিনী; ইহাদিগকে পড়াইতে আমার অতিশয় আনন্দ হইত।

আদর্শবাদ বিষয়ে মতভেদ ।—স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলন ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মতভেদ ব্যতীত আমার প্রতি বিরক্তির আরও একটি কারণ ছিল। আমি কেশব বাবুর কোনও কোনও মত লইয়া সর্বদা তর্ক উপস্থিত করিতাম। এই তর্ক অনেক লম্বাঘেঁষা কেশব বাবুর সন্তোষভে

হইত। তন্মধ্যে আদেশের মত লইয়া বড় তর্ক হইত। কেশব বাবু তাঁহাব সমুদয় কাৰ্য্য যেকপ ঈশ্বাদেশ বলিয়া উপস্থিত কবিতেন, এবং সকলকে ঈশ্বাদেশ বলিয়া গ্রহণ কবিতে হইবে এবং তদনুসঙ্গ আচরণ কবিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন, তাহাতে আমাব মনে ভয় হইত যে, তাঁহাব সঙ্গে লোকেব চিন্তাব স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। হয় তাঁহাব আদেশ যত্ন কবিতে হইবে, নতুবা নিজের হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাব হাতে আপনাকে দিতে হইবে। আমি কেশব-বাবুকে বলিতাম, “আপনি আদেশ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সেই ভাবে কাজ কবিয়া যান; আমবা আদেশ বলিয়া লইতেছি কি না, দেখিবেন না।” তিনি আমাব কথাব প্রতি কর্ণপাত কবিতেন না। ইহা লইবা তাঁহাব সঙ্গে মুখে ও চিঠিপত্রে তর্ক হইত। আমি মানব-চিন্তাব স্বাধীনতা বক্ষাব জন্ত ব্যগ্র হইতাম। তাঁহাকে বলিতাম, “মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ত তাঁহাব সকল কাজ ঈশ্বাদেশ বলিয়া নিষাহ কবিয়াছেন; কৈ, তিনি ত তাহা অপবেব ঘাড়ে চাপাইবাব চেষ্টা কবেন নাই; অস্ত্রে সে ভাবে না লইলে তাঁহাদেব প্রতি বিবেক প্রকাশ কবেন নাই?”

কেশব বাবু যখন আশ্রম স্থাপন কবিলেন, তখন ইহাকে ঈশ্বাদিষ্ট কাৰ্য্য বলিয়া স্থাপন কবিলেন। কেবল তাহা নহে; ঈশ্ববেব আদেশ বলিবা গ্রহণ কবিবাব জন্ত ব্রাহ্মদিগকে আহ্বান কবিলেন, এবং সেভাবে বাঁহাবা গ্রহণ কবিলেন না, তাঁহাদেব প্রতি বিবাগ প্রদর্শন কবিতে লাগিলেন। কেহ কেহ প্রথমে ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ কবিতে পারিলেন না। অধিক কি, যতদূব শ্রবণ হয়, প্রজ্ঞানন্দ প্রতাপচন্দ্র মজুমদাব মহাশয়ও প্রথমে ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ করিলেন না। আমবা সপরিবাবে আশ্রমে গেলাম, কিন্তু তিনি Indian Mirrorএ আবদ্ধ থাকাতে বাইতে পারিলেন না। তিনি ভয় পাইতে লাগিলেন যে, আশ্রমকে এগ্নিপে ঈশ্বাদেশ বলিয়া ঘোষণা কবিলে সমাজে বিরোধ উৎপন্ন হইবে।

আমাব বেশ স্মরণ আছে যে, আমরা বেলঘরিয়া বা কাঁকুড়গাছির উদ্ভান-ভবনস্থ আশ্রম হইতে আসিয়া কলিকাতার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কবিলে, তিনি বিক্রপ করিয়া বলিতেন, “কি হে, তোমাদের স্বর্গবাস্য কতদূর এল ?” যদিও পরে তিনি আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এ কারণে তিনি সে সময়ে কিছুদিনের জন্য প্রচাবকগণের নিন্দা ও তিরস্কারের পাত্র হইয়াছিলেন।

নগেন্দ্র বাবুর প্রতি প্রচারক মহাশয়দিগের অপ্রীতি।—
নগেন্দ্র বাবুর প্রতি প্রচারকগণের অপ্রীতি জন্মিবার আর এক প্রকার কাণ ছিল। নগেন্দ্র বাবু তখন একপ্রকার শিরঃপীড়া ছিল, বাহাতে তিনি সময় সময় লোকেব সঙ্গে সহ কবিতে পারিতেন না ; একাকী একাকী থাকিতে ভালবাসিতেন, অথবা নিজের অন্তরঙ্গ কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে থাকিতে। আশ্রমের উপাসনায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন বটে, কিন্তু অপরাপর অনেক সময়ে প্রচারকগণের সহিত বসিতেন না। তাঁহার যখন দশজনে কেশব বাবুর নিকট বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, তখন হঠাৎ তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু খ্যাতনামা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে শয়ন করিয়া তাঁহার মুখে জ্ঞানের কথা শুনিতেছেন। নগেন্দ্র বাবু আব-একটা স্নায়বীয় দুর্বলতা এই ছিল যে, যে-কেহ বিকৃতভাবে তাঁহার সমালোচনা কবে, তিনি তাহাব দিক দিয়া বাইতেন না। আমি দেখিতে লাগিলাম যে, নগেন্দ্র বাবুর সহিত প্রচারক মহাশয়দিগের বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। আমি অনেক সময় তাঁহাকে বলিতাম, বাহাদের সঙ্গে কাজ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে হইতে এরূপ দূরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু বলিলে কি হয়, মানুষের প্রকৃতিতে বাহা আছে, তাহা কি হঠাৎ চলিয়া যায় ?

তিনি যে একাকী বেড়াইতেন, অনেক সময় গভীর আত্মচিন্তাতে বাপন করিতেন। একদিনের কথা মনে আছে। একদিন আমরা

সকলে কাঁকুড়গাছিব বাগানে ভাবতাপ্রমে সায়ংকালীন উপাসনাব পৰ কেশব বাবুব সহিত নানাপ্রকাৰ কথাবার্তাতে আছি, এমন সময় কেশব বাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, “নগেন্দ্ৰ কৈ ?” অমনি নগেন্দ্ৰবাবুব অনুসন্ধান হইল। জানা গেল যে তিনি বৈকাল হইতে নিকল্দেশ আছেন। বাজি প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল, তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। আমি তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলাম, “আপনাব খোঁজ হইয়াছিল, আপনি কোথায় ছিলেন ?” তিনি বলিলেন, “আজ মনটা বড খাবাপ আছে, তাই তিন চাৰি ঘণ্টা মাগিকতলাৰ খালের ধাৰে নেড়াইতেছিলাম ও একটা গান বাঁধিয়া গাইতেছিলাম। এই বলিয়া গানটা গাইয়া আমাকে শুনাইলেন। সেটা এট,—

“আমি কি বলে প্রার্থনা বল কবি আব ?

আমাব সকল কথা ফুৰাইল, ফিৰিল না মন আমাব।

তুমি দেখ সব থেকে অন্তবে, তোমায় কথাষ কে ভুলাতে পাবে,

প্রাণের প্রাণ, বল কি আন ? কি আব আছে বলিবার।

ওহে, প্রাণ যদি চাহে তোমাৰে, তুমি থাকিতে কি পাব দুনে,

আপ্নি এস পাৰ্পীৰ দ্বাবে, তাই পতিত-পাবন নাম তোমাব।”

আমি শুনিয়া ভাবিলাম, নগেন্দ্ৰ বাবু যে সন্ধ্যাব সময় আমাদের সঙ্গে না বসিয়া একলা ছিলেন, সে ভালই হইয়াছে। কিন্তু প্রচাবক বন্ধুগণ সকল সময়ে সেকপ ভাবিতে পাৰিতেন না। তাঁহাবা মনে কবিতেন, নগেন্দ্ৰ যখন আমাদের সহিত কাজ কবিতে আসিয়াছেন, তখন আমবা বেক্সেপে বসি দাঁড়াই, তাঁহাকেও সেইরূপ কবিতে হইবে। তাঁহাবা দিন দিন নগেন্দ্ৰ বাবুব উপব চটিতে লাগিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের সহিত আমাব বিবাদ হইতে লাগিল। আমি নগেন্দ্ৰ বাবুব পক্ষ হইয়া তাঁহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলাম। তাঁহাবা আমাকে আলস্তের প্রত্নরদাতা বলিয়া তিবন্ধার করিতে লাগিলেন।

নিয়মতন্ত্র প্রণালী লইয়া মতভেদ ।—আব একটা বিষয়ে একটু মতভেদ ঘটিল। কেশব বাবু ইংলণ্ড হইতে আসিয়া, অপবাপব কাজেব আয়োজনের মধ্যে ভাবতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিবেব উপাসকদিগকে ডাকিয়া একটা ঘননিবিষ্ট মণ্ডলা কবিবাব চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। কিন্তু উপাসকদিগকে ডাকিলেই তাঁহাবা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ কবিতে লাগিলেন, অনেক বিষয়ে মতভেদ ও তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল; যুবকদলেব অনেকে উপাসকমণ্ডলীব কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনেব জন্ত উৎসুক হইলেন। সেটা স্বাভাবিক; কিন্তু কেশব বাবু বোধ হয় তাহা পছন্দ কবিলেন না। কাবণ, কিছুদিনেব মধ্যেই দোর্দণ্ডপ্রায়ে, উপাসকমণ্ডলীব সভাগণকে মধ্যে মধ্যে ডাকা বহিত হইল। বৎসবান্তে একবাব একটা সম্মিলিত সভাব মত হইত, এই মাত্র অবশিষ্ট বহিল। অনেক যুবক ব্রাহ্ম, উপাসকগণেব ঘননিবিষ্ট মণ্ডলা গঠনের জন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন; তাহাব মধ্যে আমি একজন। নিয়মতন্ত্র প্রণালী মতে কাজ হয়, তাহাও আমবা কয়েক জনে চাহিতেছিলাম; সে আকাজক্ষাও একবাব জাগিয়া আবাব ভগ্নাচ্ছাদিত বহিব ত্রায় বহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ভারতাত্মম ত্যাগ ও হরিনাভি গমন । সুহাসিনীর
জন্ম । হরিনাভির স্কুল, মিউনিসিপ্যালিটি, দাতব্য
চিকিৎসালয়, ব্রাহ্মসমাজ । প্রকাশচক্র
রায় । লক্ষ্মীমণি ।

১৮৭৩, ১৮৭৪

পীড়িত মাতুলের আহ্বান * —এই-সকল মতভেদের মধ্যে
১৮৭৩ সালের প্রথমে আমার পূজ্যপাদ মাতুল, সোমপ্রকাশ-সম্পাদক
দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়, পীড়িত হইয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ।
কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল,
তিনি আর কাজ করিতে পারিতেছিলেন না । স্বরায় পেন্সন লইয়া

* গ্রন্থকারের Men I have Seen পুস্তকে (1919 Edition, pp. 56—59)
এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট বলিয়া এখানে তাহা হইতে কিয়ৎংশ অন্তর্বাদ করিয়া দেওয়া
হইতেছে । “১৮৬১ সালের প্রথম ভাগে আমাকে কৃত্তিবীর সহিত এক-এ পরীক্ষার
উদ্ভীর্ণ হইতে দেখিয়া আমার মাতুল মহাশয়ের মনে পুরায় এই আশার সঞ্চার হইল
যে, বর্ধবিরয়ে তাঁহারিণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলে থাকিলেও শীঘ্রই আমি তাঁহার
জরুর কার্যভারের অংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার জন্মের লাভব সম্পাদন করিতে পারিব ।

* * * অতঃপর আমি কবে এম্-এ পাস হই, সেই বিষয়ের লক্ষ্য
তিনি ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে,
আমি এম্ এ পাস হইলেই আমাকে তাঁহার হরিনাভি স্কুলের হেড্‌ মাস্টারের পদে
প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ও সোমপ্রকাশের কার্যে নিজের সহকারী করিয়া লইবেন । আমি
এম্ এ পরীক্ষার উদ্ভীর্ণ হইলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মাতুল মহাশয়ের আশা ভগ্ন

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকতা হইতে বিদায় লইয়া, বায়ু পবিবর্তনের জন্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার সংকল্প কবিরাজিহলেন। কিন্তু তাঁহার সোমপ্রকাশ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গ্রামস্থ সংস্কৃত-ইংবাজী স্কুল, তাঁহার বিষয়, তাঁহার পবিবাব-পবিজনেব দেখিবাব ভাব কে নেয়? আমার মাতুল-পুত্রদিগেব মধ্যে কেহই কাজেব লোক ছিল না। বড়মামা আমাকে নিজেব চক্ষেব উপবে মাহুষ কবিরাজিহলেন। আমি বাল্যাবধি তাহাব দৃষ্টান্ত না দেখিলে, ধর্ম ও নাতিব ভাব বাহা হৃদয়ে পাঠিলছি,

করিয়া তাঁহাকে পূর্বাপেক্ষাও অধিক রেশ দিতে হইল। আমি ব্রাহ্মসমাজের কার্যে নিজকে অর্পণ করিব এই সঙ্কল্প করিয়া কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে গোপনে পত্র লিখিলাম। * * * ইহার পর যখন মাতুল মহাশয়ের নিকট বাইতাম, তিনি ধীর গভীর হইয়া থাকিতেন; আশাহত হইয়া জয়রে যে আঘাত পাইয়াছেন, সে বিষয়ে কিছু বলিতেন না; তাঁহার বৈবরিক ব্যাপারের কথা উত্থাপন করিলে সে প্রশ্ন এড়াইয়া বাইতেন, প্রশ্ন করিলে অস্পষ্ট উত্তর দিতেন। এইরূপে আর এক বৎসর গত হইলে আমি সংবাদ পাইলাম যে, তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে ও তিনি অতি কষ্টে তাঁহার কাজগুলি চালাইতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ চাকড়িপোতার গিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি অস্থির; তাঁহাকে এত অধিক ভগ্ন আর কখনও দেখি নাই। তাঁহার দ্ব্যাপার্যে দণ্ডায়মান হইয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ মনে এই ভাব আসিল যে, এ সময়ে মাতুল মহাশয়ের সাহায্যার্থে অত্রস্থ হওয়া ও অবিলম্বে তাঁহাকে শ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়া বায়ুপরিবর্তনের জন্ত বাহিরে যাইবার উপায় করিয়া দেওয়া আমার কর্তব্য। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মহিলা-বিত্তালয়ে আমার এক বৎসরের কার্য আর শেষ হইয়া আসিতেছিল। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম, স্তম্ভ বৎসর হইতে সে কার্য ত্যাগ করিয়া কিছুকালের জন্ত চাকড়িপোতার আসিয়া বসিয়া মাতুল মহাশয়ের কার্যভার নিজ স্বহস্তে লইয়া তাঁহার স্থানান্তরনের সুবিধা করিয়া দিতে পারি। আমি তাঁহার নিকটে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি অতিশয় বিচলিত হইলেন, এবং এত দিগের আশঙ্কাজবিত রক্ত মনের প্রশ্ন এই প্রশ্ন আমার কাছে উদ্ভিত প্রকাশ করিলেন।”

তাহা পাঠিতাম কি না সন্দেহ। মামা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, এখন তুমি আসিয়া আমার স্কন্ধেব সব ভাব না লইলে আমি বায়ু পবিতৰ্ত্তনেব জন্ত যাইতে পাৰি না।

আমি বিপদে পড়িমা গেলাম। কেশব বাবুৰ অনুবোধে একটা কাজেব ভাব লইয়াছি। আবাব মামাব অনুবোধ অপব দিকে। প্রথম দিনে কোনও উত্তৰ না দিয়া ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতায় আসিলাম। আসিয়া মনে অনেক চিন্তা কৰিলাম, নগেন্দ্ৰ বাবু প্ৰভৃতিৰ সহিত অনেক পৰামৰ্শ কৰিলাম। সকলোই মামাব সাহায্যার্থ যাঠিতে বলিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তাব পৰ কেশব বাবুকে গিয়া বলিলাম, “নূতন বৎসৰ আবন্ত হইতেছে, এখন মহিলা-স্কুলে আমাব স্থলে পড়াইবাব ভাব অপব কাছাবও উপৰ দেওয়া যাইতে পাৰে; সেইৰূপ বন্দাবস্ত ককন। আমাকে আমাব মাতুলেব সাহায্যেব জন্ত যাইতে হইবে।” তিনি কিছু বলিলেন না, মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন কি না, তখন বুঝিতে পাৰিলাম না; পৰে বুঝিয়াছি যে, আমাব চলিয়া যাওবা তিনি পছন্দ কৰেন নাই। আমি প্ৰচাব-কাৰ্য্যে জীবন দিবাব জন্ত আসিয়া বিষয়কৰ্ম্মে গেলাম, ইহা তাহাব ভাল লাগে নাই।

মাতুলেৰ সাহায্যার্থ হৰিনাভিতে গমন।—বাৰা হউক, আমি মাতুলেব সাহায্যেব জন্ত হৰিনাভিতে গেলাম। গিয়া মাতুলেব সোম-প্ৰকাশেব সম্পাদক, স্কুলেব সম্পাদক ও হেডমাষ্টাৰ, তাঁহাব বিষয়েব তত্ত্বাবধায়ক, ও তাঁহাব পৰিবাব-পৰিজনৰ বন্ধক ও অভিভাবক হইয়া বসিলাম। বড় নামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কানীতে গেলেন।

দুই এক দিনেব মধ্যেই একদিন কেশব বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমাব দুই পত্নীকে যে ভাবে আশ্ৰমে বাধিয়াছি, তাহা আব চলিবে না। তিনি ভয় কৰেন যে বিৰাজমোহিনী আত্মহত্যা কৰিবেন; যদিও আমাব মনে সে প্ৰকাৰ ভয় ছিল না, কাৰণ,

আমি কলিকাতায় আসিলেই তাঁহাকে বুঝাইতাম। যাহা হউক, অনেক তৰ্কবিতৰ্কৰ পৰ স্থিৰ হইল যে, প্ৰসন্নময়ী আমাৰ সঙ্গে হবিনাভিতে থাকিবেন, এবং বিবাজমোহিনীকে আশ্ৰম হইতে অল্প কোথাও বাধা হইবে, আমি শনিবাবে সেখানে আসিয়া ববিবাব তাঁহাৰ সঙ্গে যাপন কৰিব।

অতঃপৰ প্ৰসন্নময়ী আমাৰ সহিত হবিনাভিতে গেলেন। নগেন্দ্ৰ বাবু আশ্ৰম ছাড়িয়া আব-এক স্থানে কতিপয় বন্ধুৰ সহিত বাসা কবিলেন; বিবাজমোহিনী তাহাদেৰ সঙ্গে গেলেন। আমি প্ৰতি শনিবাব কলিকাতায় আসিয়া ববিবাব তাঁহাৰ সঙ্গে যাপন কৰিতে লাগিলাম।

তখন আমি যে প্ৰণালীতে কাৰ্য্য কৰিব বলিয়া স্থিৰ কৰিলাম, তাহা এট। বিবাজমোহিনী আমা হইতে বিযুক্ত হইতে চাহিগেন না, দেখিয়া এই স্থিৰ কৰিলাম যে, যখন তিনি ও প্ৰসন্নময়ী একত্ৰ থাকিবেন তখন আমি উভয় হইতে বিযুক্ত থাকিব; আৰ যখন তাঁহাবা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে গৰম্পৰ হইতে পৃথক থাকিবেন, তখন পতিভাবে মিলিব। তদনুসাৰেই কাৰ্য্য আবস্ত হইল। প্ৰসন্নময়ীৰ জীৱিতকালে বহুবৎসব এই প্ৰণালীতে কাৰ্য্য চলিবাছে।

তৃতীয়া কন্যা সুহাসিনীৰ জন্ম।—এই ১৮৭৩ সালেৰ ২৫শে ডিচেম্বৰ বডদিনেৰ দিন, হবিনাভিতে আমাৰ তৃতীয়া কন্যা সুহাসিনীৰ জন্ম হইল।

হবিনাভিতে কাৰ্য্যেৰ আৰম্ভ।—হবিনাভিতে আমি মহাকাৰ্য্যেৰ আৰম্ভেৰ মধ্যে পড়িলাম। প্ৰথম, মামাৰ স্কুলটীৰ ভাব লইয়া দেখি যে, তৎপূৰ্বে কয়েক বৎসৰ গোমে ম্যালেরিয়া জবেৰ আবিৰ্ভাব হওৱাতে, স্কুলেৰ ছাত্ৰসংখ্যা হ্ৰাস হইয়া স্কুলেৰ আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। ইহাৰ ফল এই হইল যে, আমি নামে হেডমাষ্টাৰ ৰূপে একশত টকা পাইতে লাগিলাম বটে, কিন্তু তাহা হইতে সেক্ৰেটাৰী ৰূপে মাসে ৪০।৫০ টকা অপৰাপ্য শিক্ষকেৰ বেতনেৰ সাহায্যেৰ জন্ম দিতে লাগিলাম। ওদিকে, সোমপ্ৰকাশেৰ কাৰ্য্যভাৰ প্ৰধানতঃ আমাৰ উপৰ পড়িলা যাওৱাত সংবাদ-

পত্রাদি পাঠে ও লেখাতে অনেক সময় দেওয়া আবশ্যক হইল। তাহাব উপর, মধ্যে মধ্যে বড়মামাব তালুক দেখিবাব জন্ত লবণাস্ত্রপূর্ণ স্নানববনাব মধ্যে গিয়া ছই এক দিন বাস কবিতে লাগিলাম। ইহাব উপবে আমাকে ম্যালেরিয়াতে ধবিল। ঘন ঘন জ্বব হইয়া লিভাবে বেদন। দাঁড়াইল। লিভাবে ত্রিষ্টাব দিয়া, ম্যালেরিয়াব চিকিৎসা কবিয়া তত্পরি পূর্বোক্ত কার্য্য-সমুদয় চালাইতে লাগিলাম।

মিউনিসিপ্যালিটি-সংস্কারের চেষ্টা।—পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন আমাকে আবও কয়েক প্রকাব সংগ্রামেব মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। প্রথম, আমি সোমপ্রকাশেব কার্য্যভাব হাতে লইয়াই দেখিতে পাইলাম যে, রাজপুব হবিনাতি প্রভৃতি গ্রামগুলি কয়েক বৎসব পূর্ব হইতে কলিকাতাব দক্ষিণ উপনগববর্তী বেহালা প্রভৃতি গ্রামেব সহিত এক মিউনিসিপ্যালিটিতে আবদ্ধ হইয়াছে। তদবধি প্রাব দশবৎসব কাল হবিনাতি, রাজপুব, চাকড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামেব প্রজাগণ বীতিমত মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিবা আসিতেছে, যথাসময়ে ট্যাক্স না দিলে তাহাদেব ঘটি বাটী নিলাম হইতেছে, কিন্তু দশবৎসবেব মধ্যে তাহাদেব অনেক বাস্তাতে এক মুঠা মাটী পড়ে নাই; এমন কি, এই দীর্ঘকালে অনেক নরুদ্যমা হইতে একমুঠা মাটী তোলা হয় নাই। অল্পসঙ্কানে জানিলাম, মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে বেহালা ও তৎসম্মিকটবর্তী স্থানেব লোক অধিক হওয়াতে অধিকাংশ টাকা সেই দিকেই ব্যয় হইতেছে।

ইহা আমাব বড় অন্তায় বোধ হইল। আমি এই অবস্থা ঘূচাইবাব জন্ত সংকল্প কবিয়া সোমপ্রকাশে লেখনী ধারণ কবিলাম; সোমপ্রকাশেব বাহিরেব পাঠকগণ বিবস্ত হইয়া যাইতে লাগিলেন। কাগজে লিখিয়া সঙ্কট না হইয়া আমি স্কুলগৃহে গ্রামবাসীদিগকে ডাকিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন আবস্ত কবিলাম। বহুজনেব স্বাক্ষব কবাইয়া কর্তৃপক্ষেব নিকট এক আন্দোলন প্রবেণ কবিলাম। যদিও এই সকল আন্দোলনেব ফল

হরিনাভি ত্যাগ করিবার পূর্বে আমি দেখিয়া আসিতে পারি নাই, তথাপি স্বথের বিষয় এই যে, ইহারই ফলে রাজপুর প্রভৃতি গ্রাম বেহালা হইতে পৃথক হইয়া এক স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি রূপে পরিণত হইয়াছে এবং গ্রামেব অবস্থা অনেক ফিবিয়াছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়।—আমি এই সময়ে আর-এক বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করি, এবং ঈশ্বর-রূপায় তাহাতেও কৃতকার্য হই। সোমপ্রকাশে লিখিতে আরম্ভ করি যে রাজপুর প্রভৃতিব গ্রাম ম্যালেরিয়া-প্রদীড়িত গ্রামসকলের মধ্যে একটি গবর্ণমেন্ট চ্যাবিটেব্ল ডিসপেন্সারি থাকা উচিত। আমি হরিনাভিতে থাকিতে-থাকিতেই গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। প্রথম ডাক্তার ও ঔষধের বাক্স আমার নামে প্রেরিত হয়। আমি ডাক্তার মহাশয়কে ও ঐ ডাক্তারখানাকে হরিনাভির এক ভদ্রলোকেব বাহির-বাড়ীতে স্থাপন করি। পরে সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

স্কুল সংস্কার।—তৃতীয় এক বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিতে হয়। সেটি আমার স্কুলটিকে স্থায়ী ভূমির উপব দণ্ডায়মান বিবার চেষ্টা করা। মামা স্কুলটি স্থাপন করিবাব সময় একটা অবিবেচনার কার্য্য কবিয়াছিলেন। তাঁহার মনে বোধ হয় ছিল যে স্কুলটি উচ্চশরের স্কুল হইবে। সেজন্য তিনি শিক্ষকদিগের বেতনের হার চড়াইয়া বাধিয়াছিলেন; যথা, প্রথম পণ্ডিতের বেতন ৪০ টাকা। কিন্তু ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে কেহই তৎপূর্বে ঐ উচ্চহারে বেতন পান নাই; হেডপণ্ডিত মহাশয় তৎপূর্বে পাঁচ বৎসর মাসে ২৫ টাকাই পাইয়া আসিতেছিলেন। এইরূপ অপরেরাও স্কুল-প্রতিষ্ঠাকালে নিষ্কিষ্ট বেতন অপেক্ষা অনেক কম বেতন পাইতেন। বেতনের হার বড় রাখার ফল এই হইয়াছিল যে, যখন ছাত্রসমূহ বেতন হইতে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা ঐ উচ্চহারের হুকিতে বাইত। বছরদিন হইতে বেশ, ম্যাগ, মোব, লাইব্রেরী, প্রভৃতির

জ্ঞাত কিছু বায় কবা হইত না। এ-সকলেব অতীব অভাব ছিল, অথচ তাহা পূর্ণ হইত না। শিক্ষকদিগেব বার্ষিক বেতনেব হাব কমাইয়া আমি স্কুলটাব উন্নতি কবিবাব জ্ঞাত কৃতসংকল্প হইলাম; এবং সৰ্ব্বাঙ্গে আমাব বেতন ১০০ হইতে ৮০ কবিয়া অপবাপব শিক্ষকগণ তৎপূৰ্বে পাঁচবৎসব যাতা পাটয়া আসিতেছিলেন, তাহাই তাহাদেব নির্দিষ্ট বেতন বলিয়া স্থিৰ কবিবাব জ্ঞাত ইন্সপেক্টাবেকে লিখিলাম। শিক্ষকদিগেব মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমাব মাতাব জাঠতুতো ভাই কৈলাসচন্দ্র চকবৰ্ত্তী মহাশয় তখন স্কলেব হেডপণ্ডিত ছিলেন; তিনি এই আন্দোলনে প্রধান নেতা হইলেন। শিক্ষকদিগেব মধ্যে কেহ কেহ স্কুল ভাঙ্গিয়া আব-এক স্কুল কবিবেন বলিয়া ভয় প্রদৰ্শন কবিতে লাগিলেন। আমি কিছুদিন চুপ কবিয়া থাকিলাম, তাঁহাদিগকে গোপনে বুঝাইলাম; আমাব উদ্দেশ্য স্কুলটাব উন্নতি কবা, ইহা ভাল কবিয়া দেখাইয়া দিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাহাবা থামিলেন না। অবশেষে একদিন ছুটাব পবে সমুদয় শিক্ষকেকে একত্র কবিয়া ঘড়ি খুলিয়া তাহাদেব সম্মুখে বসিলাম। বলিলাম, “যিনি স্কুল ছাড়িয়া যাউতে চান, ও স্কলেব বিকল্পে আন্দোলন কবিতেছেন, তাহাদিগকে দশ মিনিট সময় দিতেছি; ইহাব মধ্যে স্থিৰ কবিয়া বলিতে হইবে, তিনি থাকিবেন কি যাইবেন। যদি থাকেন, স্কলেব বিকল্পে আন্দোলন কবিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা কবিয়া থাকিতে হইবে।” সকলেই নিকন্তব বহিলেন; দশ মিনিটেব পব সকল আন্দোলন থামিয়া গেল। কিন্তু অনেকে মনে মনে আমাব প্রতি বিবস্ত্র বহিলেন। কি কবিব, কণ্ডবাবোধে লোকেব অপ্রিয় হইতে হইল।

আব-একটি আন্দোলন ইহা অপেক্ষাও গুরুতব হইয়া দাঁড়াইল। আমি স্কলেব ভাব লইয়া দেখি, স্কলেব কয়েকটি শিক্ষক গ্রামস্থ সখেব যাত্রাব দলে সং সাজেন। একজন “ভগি দিদী” সাজেন, আব-একজন আব একটা কি সাজেন। ঐ সখেব যাত্রাব দলটি কতকগুলি নিকৰ্মা ধনিসন্তানের

কথা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সুবাসন্ত এবং অপবাপব
 তাম্বাওয়া লগ্ন ছিলেন। স্কুলের শিক্ষক দুইটা সেই দলে থাকাত্তে
 যাক্কাণ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞাব চক্ষু দেখিত। স্কুলের বোর্ডে লিখিয়া
 বাখত, “ভগি দিদি। চটো না”, ইত্যাদি। ইহা আমাব পক্ষে
 অসহনায় বোধ হইতে লাগিল। আমি এক সাকুল্লাব জাৰি কৰিলাম
 যে, স্কুলের কোনও শিক্ষক সখেব দলের অভিনেতাব মধ্যে থাকিলে
 গাত্ৰ তাহাব পক্ষে শিক্ষকতাব অনুপযুক্ত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে।
 তাত্তে ঐ দুই শিক্ষক যাত্রাব দল ত্যাগ কবিত্তে বাধ্য হইলেন। সখেব
 দলের ইবাবেৰা আমাব প্রতি হাড়ে চটিয়া গেল।

এই ক্রোধ তাহাবা বহুদিন হৃদয়ে পোষণ কৰিয়া, অবশেষে ১৮৭৪
 সালের চৈত্র মাসেব শেষে গোষ্ঠিবাত্রাব সময় সুবাব বোঁকে সদলে
 আমাব বাড়ী আক্রমণ কবিল ; ও আমাব সঙ্গেব একটা যুবকেব
 মাথা ফাটাইয়া দিল। যে কাৰণে তাহাবা দাঙ্গা কবিত্তে আসিল
 গাঃ এই। গোষ্ঠিবাত্রাব সময় গ্রামেব জমিদাব-বাবুদেব বাড়ীতে
 মহাসমাবোহে ঐ উৎসব সম্পন্ন হইত, এবং স্কুলেব সম্মুখস্থিত বাস্তাতে
 তাহাদেব বাড়ী পর্য্যন্ত হাট বসিত। আমি স্কুলবাড়ীৰ ভিতৰ-দিকেই
 পাবাবাবে থাকিতাম। ঐ দিন বৈকালে স্কুলেব পাঠগৃহে বসিয়া
 পাড়তেছি, এমন সময়ে সম্মুখেব হাট হইতে একটা ছেলে
 আসিয়া বলিল যে, এক তাসথেলাব দোকানদাব তাহার এক
 সহাধ্যায়ীকে তাসেব খেলা দেখাইয়া ঠকাইয়া তার সমুদয় পয়সা লইয়াছে,
 ছেলেটা কাঁদিতেছে। ইহা শুনিয়া আমি ঐ তাসথেলাৰ দোকানে
 গেলাম, এবং ছেলেটাকে প্রহাব করাব জন্ত তাসওয়ালাকে তিবস্কাব
 কবিত্তে লাগিলাম। বলিলাম, “একুপ প্রবঞ্চনাব খেলা আইন-বিরুদ্ধ,
 আমি পুলিস ইন্স্পেক্টরকে জানাইব।” এই বলিয়া চলিয়া আসিলাম।
 পবে শুনিলাম, সেই দোকানদাব আমাব নামে নালিশ কৰিবাব জন্ত

জমিদার-বাবুদের বাড়ীতে গেল। তাঁহারা তখন বন্ধু বান্ধব লইয়া মজলিসে বসিয়া আছেন; তাহার মধ্যে এষ্ট সংবাদ পাইয়া, বলিতে লাগিলেন, “কি, এত বড় আশ্চর্য! আমাদের গ্রামে চাকুরী কর্তে এসে, আমাদের কাজেব উপর হাত! একবার গিয়ে শোন ত কি বলেন।” আর কোথায় যায়! অমনি সেই বাড়ীর কয়েকটা যুবক লাঠি সোটা লইয়া স্কুলবাড়ীৰ অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা আসিতেছে শুনিয়া আমি আমার নিকটস্থিত একটা ছাত্রকে বাড়ীৰ ভিতরের দিকে একটা তালা লাগাইতে বলিলাম। মনে কবিলাম, ভিতবে তালা লাগান থাকুক, উদ্ভেজনা ধামিয়া গেলে জমিদার-বাবুকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিব। ছেলেটা তালা দিতে গিয়াছে, ওদিকে আক্রমণকাবী দল উপস্থিত। তাহারা লাঠি মাঝিয়া ছেলেটাব মাথা ফাটাইয়া দিল; পরে স্কুলবাড়ীতে প্রবেশ কবিল। আমি আশ্চর্যকর জন্ত প্রস্তুত হইয়া নির্ভয়ে গিয়া তাহাদের সমক্ষে দাঁড়াইলাম। তাহাবা আমাকে মারিল না। একজন আসিয়া তাহাদেরব কানে কানে কি বলিল, তাহারা একে একে বাহির হইয়া গেল। আদালতে মোকদ্দমা তুলিলে ইহাদের বিশেষ শাস্তি হইত, কিন্তু তাহা করা হইল না। ভালই হইল, কারণ ইহার পর জমিদার-বাবু আমার প্রতি ও স্কুলের প্রতি বিশেষ সন্তাব দেখাইতে লাগিলেন।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ; প্রকাশচন্দ্র রায়।—এই সকল কাজেব মধ্যে হরিনাভিতে পদার্পণ করিয়াই আমি হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজকে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করি। কতকগুলি যুবক এই সময় হইতে আকৃষ্ট হইয়া সমাজে যোগ দেন। আমার অনুরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন উভয়েই হরিনাভি সমাজের উৎসবে গিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। এই সময়ে আমার বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায়কে আমি স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার নিযুক্ত করি। তিনি আমার সহিত স্কুলবাটীতেই থাকিতেন। প্রেসন্নময়ী তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের জ্ঞান দেখিতেন। প্রকাশের



৭২ক।৭ ও স্বগীয় পকাশচন্দ্র বায় .৯০৫।

নাথ ব্যাকুলাত্মা আমি অতি অল্পই দেখিরাছি। আমাদের পারিবারিক উপাসনা হইত। তত্ত্ব প্রকাশ ও আমি ধর্মজীবনের গভীর তত্ত্বসকলের আলোচনাতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ যাপন করিতাম। ফলতঃ ওঁহাব সহবাসে আমি ও প্রসন্নময়ী এই সময়ে বিশেষ উপকৃত হইলাম। চন্দ্রবর্ধ প্রকাশচন্দ্রেব সহিত এরূপ গাঢ় বন্ধুতা জন্মিয়াছিল যে, তাহা পুনর্বর্তী সমাজবিপ্লবেও নষ্ট হয় নাই। এই সময়ে প্রকাশের পত্নী হৃদযোবকামিনী কিছুদিন হরিনাভিতে গিয়া আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাহাকে দেখিয়াও উপকৃত হইলাম।

লক্ষ্মীমণি।—এই হরিনাভি-বাসকালের আর-একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে লক্ষ্মীমণি আমাব আশ্রয়ে আসে। লক্ষ্মীমণি ঢাকা সহবেব একটি পতিতা নারীর কন্যা। তাহার মাতা তাহাকে বাল্যকালে একটি বালিকা-নিষ্ঠালয়ে পড়িতে দিয়াছিল। লক্ষ্মীমণি ঐ স্থলে একজন খ্রীষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রী ও এক ব্রাহ্ম শিক্ষকের সংশ্রবে আসে। ইহাদের সংশ্রবে আসিয়া, তাহার মাতা যে জীবন যাপন করিতেছিল, তাহাব প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মে। লক্ষ্মীর বয়ঃক্রম যখন ১৩।১৪ হইল, তখন তাহার মাতা তাহাকে নিজ বৃত্তিতে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার জননী প্রথমে প্ররোচনা অহুরোধ প্রভৃতি করিয়া অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে বলপ্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। একদিন বেচারিকে একটি পুরুষের সঙ্গে এক ঘরে সমস্ত দিন বন্ধ করিয়া রাখিল। আঁচড়, কামড়, হাত পা ছোড়ার দ্বারা যতদূর হয়, লক্ষ্মী সমুদয় করিয়া সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করিল। সন্ধ্যার সময় একবার দ্বার খোলা পাইয়া লক্ষ্মী সরিয়া পড়িল এবং একেবারে সেই ব্রাহ্ম শিক্ষকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে লইয়া একটি ব্রাহ্ম পরিবারে রাখিলেন। লক্ষ্মীর মাতা দুই লোকের প্ররোচনায় কল্যাণাভের জন্ত আদালতে নালিশ উপস্থিত করিল। সৌভাগ্যক্রমে, একজন ইংরাজ বিচারকের

নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, লক্ষ্মীকে মাতার ভাত হইতে লইয়া সেই ব্রাহ্ম অভিভাবকেব হস্তে অর্পণ করিলেন।

লক্ষ্মীর মাণী মোকদ্দমাতে হারিয়া আর এক প্রকারে লক্ষ্মীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে আবশ্য করিল। লক্ষ্মীকে দৌখিতে আসিতে আবশ্য করিল, বাবণ করিলে স্থানও না। এইরূপে, যে-গৃহস্থেব গৃহে সে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে একপ্রকার অস্থির করিয়া তুলিল। তখন উদ্ধারকারী ব্রাহ্মগণ লক্ষ্মীকে নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আনিলেন। আনিয়া, রাখিবার উপযুক্ত স্থান না পাওয়া, চাবনাতে আমাব নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি প্রসন্নমণ্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মীকে আশ্রয় দিলাম। এখানে বলা আবশ্যক যে গণেশচন্দ্র বা মনোমোহিনী ভৎপূর্বেই বিবাহিত হইয়া আমাদের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

পরে একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকেব সাহায্যে লক্ষ্মীমাণব বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু সে বেচাৰি অধিক দিন বিবাহিত জীবনেব সুখ ভোগ করিতে পাবে নাই। বিবাহেব পর তাহারা উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়িতে গিয়া বাস করিয়াছিল। সেখানে এক বৎসরের মধ্যে তাহাব মৃত্যু হয়।

নবম পরিচ্ছেদ ।

ভানাপুৰে সাউথ সুবাৰ্ৰন স্কুলেৰ হেড মাষ্টাৰ । ভবানীপুৰে ব্ৰাহ্মসমাজ
স্থাপন । ভাবতবৰ্ষীয় ব্ৰাহ্মসমাজে নানা আন্দোলন । বঙ্গমহিলা
বিদ্যালয় । প্ৰচাৰকগণ বিচাৰেব অতীত কি না ? কেশবচক্ৰেৰ
মতেৰ সমালোচনা । “সমদৰ্শী” । বামকৃষ্ণ পৰমহংস ।
ব্ৰহ্মময়ী । নগেন্দ্ৰ বাব । হেয়াৰ স্কুলেৰ কাৰ্য্যপ্ৰাপ্তি
ও ভবানীপুৰ ত্যাগ ।

১৮৭৪-১৮৭৬

ভবানীপুৰ সাউথ সুবাৰ্ৰন স্কুলেৰ হেড মাষ্টাৰ ।—আমি যখন
গাবনাভিতে বাস কৰি তখন সে স্থানে ম্যালেৰিয়াৰ প্ৰথম আবিৰ্ভাব ;
গাহাব প্ৰকোপ তখন অত্যন্ত অধিক । সেখানে যাইবাব কিছুদিন
পৰেহ আমাকে ম্যালেৰিয়া জ্বৰে ধৰে, ও বাব বাব জ্বৰ হইয়া আমাকে
বড কাহিল কৰিয়া ফেলে ; তাহাব উপৰে পূৰ্বোক্ত সকল কাৰণে
গুৰুতৰ পৰিশ্ৰম কৰিতে হইত ; তাহাতে দেড়বৎসৰেৰ মধ্যেই আমাৰ
শবাব ভাঙ্গিয়া গেল । আমাব এই অবস্থা দেখিয়া আমাব শুভানুধ্যায়ী
গুংকালান স্কলসমূহেৰ ডেপুটী ইনস্পেক্টাৰ বাৰ্ধিকাশ্ৰমৰ মুখোপাধ্যায়
আমাকে ভবানাপুৰেৰ নবপ্ৰতিষ্ঠিত সাউথ সুবাৰ্ৰন স্কল নামক ইং সং স্কুলেৰ
হেডমাষ্টাৰ কৰিয়া আনিলেন । যতদূৰ স্মৰণ হয়, আমি ১৮৭৪ সালেৰ
শেষভাগে ঐ স্কুলে আসিলাম ।

আমাৰ স্বপ্ৰাণবাসী ও আমাব জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতৃসম ভক্তিতাজন উমেশচন্দ্ৰ বসু
মহাশয় আমাব স্থানে হৰিনাভিৰ হেডমাষ্টাৰ হইয়া গেলেন । বিয়াজ-
মোহিনী তাঁহাদেৰ সহিত হৰিনাভিতে গিয়া তাঁহাদেৰ পৰিবাৰে বাস

কবিতা লাগিলেন। প্রসঙ্গময়ী লক্ষ্মীমণি সহ আমার সঙ্গে ভবানীপুৰে আসিলেন। আমি শনিবার হবিনাভিতে যাইতাম, ববিবার সোমপ্রকাশ সম্পাদন কবিতাম, সোমবারে ভবানীপুৰে ফিৰিয়া আসিতাম। এইরূপে কিছুদিন গেল। অবশেষে আমি আমার কাজেব সুবিধাব জন্ত মাতুলেব কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুৰে তুলিয়া আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফৰ্মা ইংৰাজী সংযোগ কৰিয়া ইহাব উন্নতি সাধন কৰিবাব চেষ্টা কবিতা লাগিলাম। প্রেসেবও অনেক উন্নতি কৰিলাম।

ভবানীপুৰে নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন।—এতদ্বিন্ন ভবানীপুৰে আসিয়াই কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুব সহিত সমবেত হইয়া একটা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন কৰিলাম। আমার নিজ ভবনেই এই সমাজেব সাপ্তাহিক উপাসনা হইত। আমাকেই অধিকাংশ দিন আচার্য্যেব কাৰ্য্য কবিতা হইত। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে নগেন্দ্ৰ বাবু প্রভৃতি কোনও কোনও বন্ধকে আনিয়া উপাসনা কবাইতাম।

সিন্দুৰিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজেব আচার্য্যেব যে ভাৱ ছিল, তাহা আমি হবিনাভিতে থাকিবাব সময়েও বাখিয়াছিলাম, এবং অনেক সময় জলে ঝড়ে দুৰ্যোগে হবিনাভি হইতে আসিয়া সম্পন্ন কবিতাম; তাহা এই সময়ে আমার বন্ধু কেদাৰনাথ বায়েব প্রতি অৰ্পণ কৰি। তিনি ইহাব পৰ অনেক দিন ঐ কাৰ্য্য কৰিয়াছিলেন।

কলিকাতা ভারতবৰ্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে নানা আন্দোলন।
স্তৌশিক্ষা।—আমাব হবিনাভি বাসকালে, কলিকাতাতে ভাৰতবৰ্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নানা আন্দোলন চলিতেছিল। ভবানীপুৰে আসিয়া আমি সেই আন্দোলন-স্রোতে পড়িয়া গেলাম। ইহাব কোন কোন আন্দোলন আমি ভাৱতাপ্রমে থাকিবাব সময়েই প্রথম উদ্ভিাছিল। মন্দিবে পুৰদাৰ বাহিৰে মেয়েদেৱ বলা ও মেয়েদেৱ শিক্ষা, এই দুই বিষয়ে কেশব বাবুৰ সহিত হাৱকানাথ গাঙ্গুলী, হৰ্গামোহন দাস, ৰজনীনাথ ৱাৰ, অন্নদাচৰণ

শাস্তিগিব প্রভৃতি একদল ব্রাহ্মণ ককণ মতভেদ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাব বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। স্বাক্ষরানাত গাঙ্গুলীৰ দল ভাবতাপ্রমেব পূৰ্বোক্ত মহিলা বিদ্যালয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া মহিলাদেব উচ্চশিক্ষাব উদ্দেশ্যে আব একটা স্কুল স্থাপন কৰিতে অগ্রসব হইলেন।

বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়।—প্রথম তাঁহাবা হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয় নামে একটা বিদ্যালয় স্থাপন কৰিলেন। বিলাত হইতে নবাগতা কুমাবা এক্সয়েড হতাব তত্ত্বাবধায়িকা হইলেন। কয়েক বৎসবেৰ মধ্যে কুমাবা এক্সয়েড 'এবাহিতা হওয়াতে ঐ বিদ্যালয় বঙ্গ-মহিলা-বিদ্যালয় নামে পৰিবৰ্ত্তিত হইয়া কেছুদিন পবে বেথুন কলেজেৰ সহিত মিলিত হয়।

বালিগঞ্জে একটা বাড়ী ভাড়া কৰিয়া এই স্কুল খোলা হইল। গাঙ্গুলী ভাষা নিজে একজন শিক্ষক হইলেন। শিক্ষক কেন, তিনি দিন বাত্ৰি বশ্রাম না জানিয়া ঐ স্কুলেব উন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ কৰিলেন।

আমি ভবানীপুৰে আসিয়া দেখিলাম যে ঐ স্কুল চলিতেছে। গাঙ্গুলী ভাষা চাড়াবাব লোক ছিলেন না। আমি তাঁহাকে অন্তবেব সহিত প্ৰীতি ও শ্ৰদ্ধা কৰিতাম। এমন সাঁজা সত্যানুবাগী লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। পূৰ্বেই বলিয়াছি গাঙ্গুলী-ভাষা স্বা-স্বাধীনতাৰ নেতা ছিলেন। আমি জ্ঞা-স্বাধীনতাৰ ভাবটা তাঁৰ মত না লই, জ্ঞাতিব উন্নতি হয় ইহা অন্তবেব সহিত চাহিতাম। আমি ভবানীপুৰে আসিলেই গাঙ্গুলী-ভাষা আমাকে 'চনা জোঁকেব মত ধৰিয়া বসিলেন যে, আমাব কত্ৰা হেমলতাকে বঙ্গমহিলা-বিদ্যালয়ে দিতেই হইবে। স্মৃতবাং হেমলতাকে বঙ্গমহিলা-বিদ্যালয়ে দিলাম।

প্ৰচাৰকগণের কার্যের বিচার হইতে পারে কি না?—

এই সময়ে আব-এক আন্দোলন উঠিল। আমাব হরিনাভি-বাম-কাল্বেৰ মধ্যে কেশব বাবুৰ প্ৰতিষ্ঠিত ভাবতাপ্রমে এক ঘটনা ঘটে। ঐ সময়ে আমাব স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্ম ভ্রাতা হৰনাথ বঙ্গ মহাশয় সুপরিবারে ভাৰতাপ্রমে থাকিতেন। হৰনাথ বাবু, মন-খোলা, মহোৎসাহী মাছুষ

ছিলেন। আর অল্প ও ব্যয় বহু হওয়াতে তাঁহার আর-বায়ের সমতা কখনই ছিল না। তিনি সপরিবারে আশ্রমে ছিলেন, কিন্তু দেনদাব হইয়া পড়িয়াছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় পীড়াপীড়ি কবাত্তে তিনি আশ্রম হইতে স্ত্রীপুত্রদিগকে নিজের ঋণবাবাডী প্রেবণ কৰা স্থির কবিলেন। কিন্তু যাইবাব সময় আশ্রমের দেনা দিয়া যাঠতে পাবিলেন না। তাঁহার পত্নী বিনোদিনী পুত্র কল্যা সহ গাডি কবিয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যাঠতেছেন, এমন সময় আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয়ের আদেশক্রমে ভৃত্যবা আসিয়া দ্বাবে গাডি অববোধ কবিল, দেনা শোধ না কবিলে গাডি যাঠতে দিবে না। বিনোদিনী আপনাকে অপমানিতা বোধ কবিয়া কাঁদতে লাগিলেন, এবং আপনাব গাত্র হইতে গহনা খুলিয়া দিলেন। তৎপবে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

হবনাথবাবু উত্তেজিত হইয়া বিনোদিনীৰ নাম দিয়া এই ঘটনাৰ বিবৰণ “সাপ্তাহিক-সমাচাব” নামক এক ব্ৰাহ্মবিবোধী সাপ্তাহিক পত্ৰে প্ৰকাশ কবিলেন। দেশীৰ সংবাদপত্ৰ-সকল একে চায়, আবে পায়। তাহাবা একেবাবে আশ্রমের ও কেশববাবুব দলেব বিৰুদ্ধে, ঘোব আন্দোলন তুলিয়া দিল। সময় বুঝিয়া উন্নতিশীল দলেব এক ব্ৰাহ্ম যুবক আশ্রমের প্ৰতি কটাক্ষ কবিয়া এক ঘোব কুৎসাপূৰ্ণ পত্ৰ সাপ্তাহিক-সমাচাবে প্ৰকাশ কবিলেন। তখন কেশব বাবু বাধা হইয়া সাপ্তাহিক সমাচাবেব বিৰুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত কবিলেন। যতদূৰ শ্ৰবণ হয়, সে মোকদ্দমা আপোবে নিষ্পত্তি হইল। এই বিবাদেব সময় আমি হবনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্ৰীকে সংবাদপত্ৰে বাওয়ার জন্ত অনেক তিবন্ধাৰ কবিয়াছিলাম; এবং মোকদ্দমাৰ বিষয়ে কেশব বাবুব পক্ষে ছিলাম।

কিন্তু এই আন্দোলন হইতে আব-এক আন্দোলন উদ্ভিয়া পড়িল। বিনোদিনীকে দ্বাবাবোধ কবিয়া অপমান কবাত্তে যুবক ব্ৰাহ্মদৰ্শ, বিশেষতঃ গাভুলী ভায়াৰ দল, আশ্রমের প্ৰতি চটিয়া গেলেন; এবং

এই কার্যের বিচারের জন্ত কেশব বাবুকে সভা আহ্বানের অনুরোধ কবিতো লাগিলেন। ইহাব উত্তরে, ধর্মতত্ত্ব-পত্রিকাতে প্রকাশ হইল যে, প্রচারকগণ ঈশ্বর-নিযুক্ত; ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের বিচারক হইতে পাবেন না। ইহাতে সমাজের কার্যপ্রণালী ও শাসন সম্বন্ধে এক নূতন আন্দোলন উঠিয়া পড়িল।

দ্বাবকানাথ গাঙ্গুলী-প্রমুখ দল এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। আমি ভবানীপুরে আসিয়া দেখিলাম, কেশব বাবুর মত ও কার্যের প্রতিবাদ করিবার জন্ত একটা দল গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি আসিবামাত্র ইহঁরা আমাকে আপনাদের মধ্যে লইলেন; কাবণ, সমাজের কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন বিষয়ে এবং কেশব বাবুর কোনও কোনও মতের প্রতিবাদ বিষয়ে, ইহঁদের সহিত পূর্বে হইতে আমার মতের ঐক্য ছিল।

কেশবচন্দ্রের মতের সমালোচনা।—ইহাব পব আমার ভবনে এবং অপবাপব স্থানে এই প্রতিবাদী দলের ঘন ঘন মীটিং হইতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিবার জন্ত সমব ঘোষণা করা স্থির হইল। এই সমব ঘোষণা দুই প্রকারে আবস্ত হইল। প্রথমে কলিকাতা ট্রেনিং-একাডেমী নামক স্থলের গৃহে কেশববাবুর বিরুদ্ধে দুইটা বক্তৃতা হইল। একটি আমি দিলাম, অপবটা আমার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিলেন।

আমার বক্তৃতা সমুদয় কথা স্মরণ নাই। আমি প্রধানতঃ কেশববাবুর কতকগুলি মতের সমালোচনা করিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে এইমাত্র স্মরণ আছে যে ববিবাসবীয় মিভাবে কেশববাবু তাহার উল্লেখ করিয়া তাহার উদ্ভার ভাবের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা তাঁহাদের বড়ই অপপ্রীতিকর হইল। নগেন্দ্র বাবু সমাজের কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন

যে, কেশব বাবুকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। নেপোলিয়ন যেমন সাধাবণতন্ত্রেব পক্ষে হইয়া যুদ্ধ আবশ্য কবিয়া, সাধাবণতন্ত্রেব নিশান লইয়া কার্যা কবিয়া, অবশেষে সম্রাটের মুকুট নিজ মস্তকে লইয়াছিলেন, তেমনি কেশববাবু ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভা স্থাপন কবিয়া আদি-সমাজেব সঙ্গে বিবাদ আবশ্য কবিয়া পৰিণেষে যথেষ্টাচারী বাজা হইয়া বসিয়াছেন। এই কথাতে কেশব বাবুৰ প্রচাবকদল আমাদের উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন।

“সমদর্শী”।—একদিকে বহুতা আবশ্য হইল, অপবদিকে ১৮৭৪ সালের নভেম্বর মাস হইতে “সমদর্শী” নামক দ্বিভাবী এক মাসিক পত্রিকা বাহিব হইল। বহুগুণ আমাকে তাহার সম্পাদক কবিলেন। স্মৃতবাং সাধাবণেব চক্ষে আমি এই দলেব নেতা হইয়া দাঁড়াইলাম। সমদর্শীতে আমবা কেশববাবুৰ কোনও কোনও মতেব প্রতিবাদ কার্যতাম ও স্বাধীন ভাবে ধর্মতত্ত্বেব আলোচনা কার্যতাম। সমদর্শী কিছুদিন চলিয়াছিল, পবে বন্ধ হইয়া গেল; কিন্তু সমদর্শীদল বহিয়া গেল, এবং সমাজেব কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনেব জন্ত যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা চলিতে লাগিল।

কন্তা সরোজিনীর জন্ম; আর একটি নিরাশ্রয় মেয়ে।—
ভবানীপুৰ-বাস-কালের কতকগুলি পারিবারিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে আমার সর্বকনিষ্ঠা কন্তা সরোজিনী জন্মগ্রহণ কবে। দ্বিতীয় ঘটনা, একদিন আমি স্থূল হইতে আসিয়া দেখি, একটা নিরাশ্রয় মেয়ে তাহার বোঁচকা-বুঁচকী সহ আসিয়া আমার ভবনে অবতীর্ণ হইয়াছে; তাহার আর হাইবাব স্থান নাই, সে আশ্রয় চায়। সে নিজের জীবনেব একটা ইতিবৃত্ত বলিল, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। মহা মুক্তি; পুরুষ নয় যে অজ্ঞ এক স্থান দেখিতে বলিব। মেয়েছেলে, বাস্তব দাঁড়াইতে বলিতে পারি না। ক্লিষ্টতঃ প্রসন্নময়ী অতি দয়ালু ছিলেন,

নিবাসন্ন দীনদৰিদ্ৰেৰ প্ৰতি তাঁৰ দয়া দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। মেয়েটী আসিয়া মা বলিয়া ডাকিয়াছে, আব কোথায় যায়? অমনি তাহাকে কোণে টানিয়া লইলেন। অগ্ৰে ছিল লক্ষ্মীৰ্মণ, এখন আসিল সেই মেয়ে; তাঁহাৰ নিজেৰ এক পুত্ৰ ও চাৰি কন্যা বাদে আব দুইটা কন্যা বাউল। মেয়েটী প্ৰসন্নমণীৰ ক্ৰোড়ে থাকিয়া গেল।

খ্ৰীষ্টীয় হাই চৰ্চেৰ সাহিত্য পাঠ।—ভবানীপুৰ-বাসকালেৰ আব দুটটা স্ববণীয় বিষয় আছে। প্ৰথম, এই সময় একজন খ্ৰীষ্টীয় পাদবীৰ সহিত আমাৰ বিশেষ বন্ধুতা হয়। তিনি হাইচৰ্চেৰ বড় গোড়া ছিলেন। আমি তাহাৰ ভবনে অনেক সময় যাপন কৰিতাম। তাঁহাৰ প্ৰবোচনাৰ আৰ্হি এই সময় হাইচৰ্চেৰ অনেক পুস্তক পড়ি। তাহাৰ মध्ये জন হেন্ৰী নিউম্যানৰ একখান গ্ৰন্থ (*Apologia pro Vita sua*) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমি বড়ই উপকৃত হই। দুই তিন মাস তাহাৰ প্ৰভাব আমাৰ মনে জাগৰুক ছিল। নিউম্যান কিৰূপে সত্যানুবাগ দ্বাৰা চালিত হইয়া কোন্ ভ্ৰমে গিয়া পড়িলেন তাহা দেখিয়া আমাৰ মনে বিৰাটমিশ্ৰিত এক আশ্চৰ্য্যেৰ ভাব হয়।

বামকৃষ্ণ পৰমহংসেৰ সহিত যোগ।—এটকুপে একদিকে যেমন খ্ৰীষ্টীয় শাস্ত্ৰ ও খ্ৰীষ্টীয় সাধুৰ ভাব আমাৰ মনে আপে, অপৰদিকে এই সময়তই বামকৃষ্ণ পৰমহংসেৰ সহিত আমাৰ আলাপ হয়। তাহাৰ ইতিবৃত্ত এই। আমাদেৰ ভবানীপুৰ সমাজেৰ একজন সভ্য দক্ষিণেৰে বিবাহ কৰিয়াছিলেন। তিনি মध्ये মध्ये শ্বশুৰবাড়ী হইতে আসিয়া আমাকে বলিতেন যে, দক্ষিণেৰেৰে কালোৰ মন্দিৰে একজন পুত্ৰাৰি ব্ৰাহ্মণ আছেন, তাঁহাৰ কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মানুহটো ধৰ্ম্মসাধনেৰ জন্ত অনেক ক্ৰেশ স্বাকাৰ কৰিয়াছেন। শুনিয়া বামকৃষ্ণকে দেখিবাব ইচ্ছা হইল। ঘাইৰ ঘাইৰ কৰিতেছি, এমন সময় মিত্ৰাৰ কাগজে দেখিলাম যে, কেশবচন্দ্ৰ সেন মহাশয় তাঁৰ সঙ্গে দেখা কৰিতে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহাৰ সহিত

কথা কহিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল। আমার সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করিয়া একদিন গেলাম।

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোনও মানুষ ধর্মসাধনের জন্ত এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি না, জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পূজারি ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্মসাধনার্থ তাঁহারা যিনি যাহা বলিতেন, সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি, এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদ-গ্রস্ত ছিলেন। তস্তিন্ন তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি; এমন কি, অনেক দিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন।

সে যাক্। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম এক; রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথার কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটা নিদর্শন উজ্জলরূপে স্মরণ আছে। একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খ্রীষ্টীয় পাদরী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম; তিনি আমার মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম, “মশাই, এই আমার একটা খ্রীষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।” অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা দিয়া বলিলেন, “বীণ্ড খ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।” আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি

আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাই যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন?”

উত্তর - কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি বলিলেন,—ঈশ্বরের অবতার কিরূপ? কৃষ্ণাদির মত?

রামকৃষ্ণ—হাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধু—আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন?

রামকৃষ্ণ—সে কেমন তা জান? আমি শুনেছি, কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মত হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ। অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কাৰণে কোনও এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবাব ছোঁবার মত হলো। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সাক্ষাভৌমিকতার ভাব বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

ইহার পর রামকৃষ্ণের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন দিনও গিয়াছে আমাকে অনেক দিন দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আসিয়াছেন।

ব্রহ্মময়ী।—এ সময়ের আর একটা স্মরণীয় বিষয়, আমার বন্ধু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথম পত্নী ব্রহ্মময়ীর ভালবাসা, ও তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের ক্লেশ। দুর্গামোহনবাবু এ সময় ভবানীপুরের সন্নিকটে বাস করিতেন, সুতরাং তাঁহার ভবনে সর্বদা যাইতাম। ব্রহ্মময়ী আমার আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন; তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন।

তাঁহাব সেই সবল পবিত্রতামাখা মুখখানি যেন স্মৃতিতে জাগিতেছে। প্রসন্নময়ীর ছায়, তাঁবও সম্ভানেব ক্ষুধা যেন নিজ সম্ভান দিয়া মিটিত না। তিনিও কতকগুলি নিবাস্রয় বালিকাকে নিজ ভবনে আশ্রয় দিয়া পালন কৰিতেছিলেন।

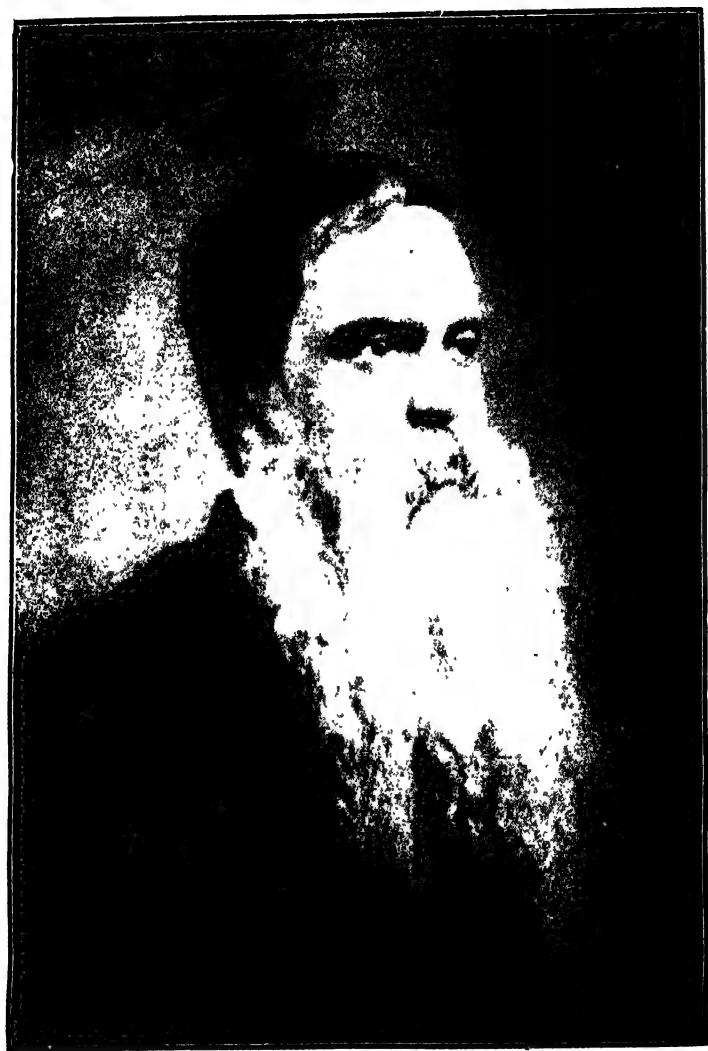
ব্রহ্মময়ী আমাব সৰ্ববিধ সদল্লভানেব উৎসাহদায়িনী ছিলেন। তাহাব একটা নিদৰ্শন মনে আছে। একবাব “ভবানাপুৰ ব্রাহ্মসমাজেব” অশ্রুতম সভা শিতিকৰ্ণ মল্লিক ও আমি পবামৰ্শ কৰিলাম যে ভবানাপুৰে একটা লাইব্রেরী ও পাঠাগাৰ কৰিলে ভাল হয়। এই পবামৰ্শ কৰিয়া আমবা একদিন দুৰ্গামোহনবাবুব নিকট টাকা ভিক্ষা কাণতে গেলাম। দুৰ্গামোহন-বাবু অৰ্থসাহায্য কৰিতে অস্বাকৃত হইলেন, তাহা লইয়া তাঁহাব সঙ্গে অনেক বাদবিতণ্ডা চলিল। আমি বলিলাম, “আপনাব নিকট হইতে যদি কিছু টাকা আদায় না কৰি, তবে আমাব নাম শিবনাথ শাস্ত্রী নয়।” তিনি বলিলেন, “আমাব নিকট হতে যদি কিছু আদায় কৰিতে পাৰ, তবে আমাব নাম দুৰ্গামোহন দাস নয়।” ইহাব পৰ শিতি বাবুব সহিত তাঁহাব তৰ্ক বাধিল। আমি ইতিমধ্যে সবিন্না পড়িয়া একেবাবে উপব তালায় ব্রহ্মময়ীৰ নিকট গেলাম। প্রস্তাবটী বেশ কৰিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, “জ্ঞানেব চৰ্চা বাড়ে সে ত ভালই। আপনাবা কি মেয়েদেব পড়্‌বাব মত বৈ বাঞ্ছবেন? অল্প কিছু জমা দিয়ে, ভদ্রলোকেব মেয়েবা কি ভাল ভাল বাজলা বই নিয়ে পড়তে পাব্বে?”

আমি বলিলাম, “হ্যাঁ, তা পাব্বে।”

ব্রহ্মময়ী—“তবে আমি এককালীন ৫০ টাকা, ও মাসে মাসে ৪ টাকা কবে দেব।”

আমি বলিলাম—“তবে এই কাগজে নামটা স্বাক্ষৰ করে দিন।”

এইরূপে একটা কাগজে পূৰ্বোক্ত প্রতিজ্ঞা লিখিয়া তাহাতে তাঁর নাম



স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস

স্বাক্ষব করাইয়া, নীচের তলায় গিয়া হুর্গামোহন বাবু নাকের কাছে কাগজখানা ধরিলাম। হুর্গামোহন বাবু ব্রহ্মময়ীর স্বাক্ষরটা দেখিয়া বলিলেন, “ও রাস্কেল, এই জন্তে তোমাব এত জোর ; তুমি আমাব কাছে হেবে বিলেত আপীল করবে ভেবে এসেছিলে”, অমনি একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। হুর্গামোহন বাবু উপবে গিয়া ব্রহ্মময়ীকে বলিলেন, “ওগো, তুমি আমাকে না জিজ্ঞেসা কবে এই হতভাগাদেব কোনও কথা কানে নিয়ো না। এই যে শ্রীহস্তে স্বাক্ষব কবেছ, এখন আমাব টাকা না দিয়ে পাব নাই।”

ব্রহ্মময়ী বলিলেন, “বেশ ত, ঔবা ত ভাল কাজ করতে যাচ্ছেন। ময়েদেব ব্যবহারেব মত একটা লাইব্রেরি হয়, সে ত ভালই।”

ব্রহ্মময়ীর আমাব প্রতি ভালবাসাব একটা নিদর্শন মনে আছে। একবার আমাব টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল। সেই মাসের শেষ দিকে ছেলেবা প্রসন্নময়ীর চুল বাঁধিবাব আয়নাখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। প্রসন্নময়ী এ কথা আব আমাকে জানাইলেন না। ভাবিলেন, মাসেব শেষ কয়টা দিন কোনও প্রকারে চালাইবেন, পরমাসের প্রথমে আয়না কেনা হইবে। ইতি মধ্যে একদিন ব্রহ্মময়ী অপবাহুে আমাদেব বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, প্রসন্নময়ী জলের জালার নিকট দাঁড়াইয়া জলে মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মময়ী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, “ও হেমের মা, ও কি ! জলের জালার কাছে কি করছ ?”

প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন, “ওগো, আয়নাখানা ছেলেরা ভেঙে ফেলেছে। ঔর বড় টাকার টানাটানি যাচ্ছে, তাই ঔকে জানাই নি। মাস গেলে কিনবো ভেবে জালার জলে মুখ দেখে চুল বাঁধছি।”

ব্রহ্মময়ী হাসিয়া,—“ও মা, এ ত কখনও শুনি নি !”

প্রসন্নময়ী—“দেখলেন, কেমন একটা নূতন বিবর দেখালাম।”

দুইজনে এই লইয়া হাসাহাসি হইতেছে, এমন সময় আমি স্কুল হইতে আসিয়া উপস্থিত। আমিও এই কথা শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলাম। প্রসন্নময়ীকে বলিলাম, “তোমাব মত স্ত্রী নিষে ঘব কবা কিছুই কষ্টকব নয় ; বেশ বুদ্ধি বাব কবেছ ত। যা হোক, আমাকে বল্লে আমি আয়না এনে দিতে পাৰ্তাম।”

প্রসন্নময়ী “তোমাব টাকাব টানাটানি যাচ্ছে কিনা, তাই বলি নি।”

কিষ্কণ্ণ পবেই ব্রহ্মময়ী চণিয়া গেলেন। আমবা ভাবিলাম তিনি বাড়ী গেলেন। কিন্তু এক ঘণ্টাব মধ্যেই এক প্রকাণ্ড আয়না লইয়া আসিয়া উপস্থিত। বাঁললেন, “এটা আমাব উপহাৰ ; নিতেই হবে।” এমন ভাবে এমন আগ্ৰহেব সজিত এ কথা বলিলেন যে, আমবা আব ‘না’ বলিতে পাৰিলাম না ; মন একেবাবে মুগ্ধ হইয়া গেল। পবে জানিলাম, আমাদেব বাড়ী হঠতে আব বাড়ীতে যান নাই, একেবাবে বেষ্টিক ষ্টীটে গিয়া এক জানা দোকান হইতে আয়নাখানি কিনিয়া আনিয়াছেন।

ব্রহ্মময়ীৰ জ্ঞাত দুৰ্গামোহন বাবুব বাড়ী আমাব জুড়াইবাব স্থান ছিল। সপ্তাহেব মধ্যে প্রায় প্রতিদিন বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়া ব্রহ্মময়ীৰ কাছে যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, বসিবাব ঘব চেয়াব কোঁচ টেবল্ প্রভৃতি দিয়া স্নন্দবৰূপে সাজান, কিন্তু ব্রহ্মময়ীৰ সেদিকে দৃষ্টি নাই, তিনি মেজ্বেব উপবে মাটিতে বসিয়া সমাগত কয়েকটা মেয়েকে পাশে বসাইয়া গল্প কৰিতেছেন।—একদিনকাব একটা ঘটনা বলি। একদিন একটা মেয়ে গল্পচ্ছলে বলিলেন, মিউনিসিপ্যাল মাৰ্কেটে বেশ লিচু উঠিয়াছে, তাঁবা আনাইয়া খাইয়াছেন। ইহাব পর কথাবাত্তাব মধ্যে ব্রহ্মময়ী একবার উঠিয়া গিয়াছিলেন, স্বরায় আসিলেন ; তৎপরে আবাব কথাব বাৰ্ত্তাৰ হাসাহাসিতে সময় বাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যাল মাৰ্কেট



স্বর্গীয়া ব্রহ্মবরী দেবী (ভূগামোহন দাসের পত্নী)

হঠাৎ বড় বড় লিচু আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মময়ী মেয়েদিগকে বলিলেন, “খাও, লিচু খাও।” ইহা লইয়া হাসাহাসি পড়িয়া গেল।

তঁাহাব বাড়ীতে পদার্পণ করিলেই তিনি তঁাহাব আশ্রিতা মেয়েদের কাহাব জ্ঞাত কি কবা কর্তব্য, আমাব সঙ্গে সেই পবামর্শে প্রবৃত্ত হইতেন। অধিকাংশ দিন সন্ধ্যার সময় নিজের হাতে আমাকে কিছু না খাওয়াইয়া চাড়িতেন না।

ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু।—এই ব্রহ্মময়ী ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে আমাদিগকে পবিত্যাগ কবিয়া গেলেন। তঁাহাব মৃত্যুতে আমবা সকলেই, ‘বশেষতঃ আমি, মর্মান্বিত হইলাম। তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তাঁব এই একল সদাশয়তাব স্মৃতি আমাব মনে জাগিতে লাগিল এবং আমাকে শোকাক্ত কবিতে লাগিল। তঁাহার স্বর্গাবোহণেব পর আমবা একমাসকাল, প্রতিদিন সন্ধ্যাব সময়, তঁাহাব ভবনে মিলিত হইয়া তঁাহাকে স্মরণ কবিয়া বক্ষোপাসনা কবিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমি উপাসনাব অমুকুল অনেকগুলি শোকস্মৃচক সঙ্গীত বাঁধিয়াছিলাম। তাহার অনেকগুলি গাথাবণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মময়ীর শ্রাদ্ধবাসবে দুর্গামোহন বাবু বাহিরের কাহাকেও নিমন্ত্রণ কবেন নাই। আমাদের গ্রাম কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যাঁহারা ব্রহ্মময়ীকে ভালবাসিতেন, এবং তঁাহাব পীড়ার মধ্যে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তঁাহাদিগকেই লইয়া উপাসনা করেন। কিন্তু উপাসনান্তে চক্ষু খুলিয়া দেখি, অনিমন্ত্রিত হইয়াও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আসিয়া উপাসনাতে যোগ দিতেছেন। ব্রহ্মময়ীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা তঁাহার উদ্দেশ্য ছিল।

নগেন্দ্রবাবুর অর্থকষ্ট।—আমার ভবানীপুরে বাসকালে আমার শ্রদ্ধের বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। অগ্র্যেই বলিয়াছি তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত একযোগে কার্য্য করিবেন বলিয়া কলকাত্তনের কৰ্ম্ম ছাড়িয়া সপরিবারে

কলিকাতায় আসিয়া কেশব বাবুৰ ভাৰতাপ্রসঙ্গে উঠিয়াছিলেন ; কিন্তু কেশব বাবুৰ ও তাঁহাব অল্পগত ভক্তবৃন্দেৰ সহিত মতভেদ ঘটয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে বাহিৰ হইতে হইয়াছিল। তিনি কতিপয় ব্ৰাহ্মবন্ধুৰ সহিত কিছুদিন স্বতন্ত্ৰ বাসাৰ থাকিলেন, কিন্তু অতিকষ্টে তাঁহাব দিন নিৰ্ব্বাহ হইতে লাগিল। হৰিনাভিতে বাসকালে আমি আমাৰ দ্বিতীয়া পত্নী বিবাজমোহিনীকে তাঁহাদেৰ সঙ্গে বাখিয়াছিলাম, এবং প্ৰতি শনিবাৰ সেখানে আসিতাম। আমি যথাসাধা নগেন্দ্ৰবাবুৰ ব্যয়ৰ সাহায্য কৰিতাম, কিন্তু তাহাতে তাঁহাব চঃখ নিৰাবণ হইত না। তৎপৰে আমি যখন ভবানীপুৰেৰ সাউথ সুবৰ্দ্ধন স্কুলেৰ হেডমাষ্টাৰ হইয়া আসিলাম, তখন বিবাজমোহিনীকে হৰিনাভিতে সাধু উমেশচন্দ্ৰ দত্তেৰ নিকটে বাখিয়া, নগেন্দ্ৰবাবুকে সপৰিবাৰে আমাৰ ভবানীপুৰেৰ বাসাৰ আনিয়া বাখিলাম, এবং তাঁহাদেৰ সকল ব্যয়ভাৰ বহন কৰিতে লাগিলাম। এখানে তাঁহাব একটা সন্তান জন্মিল। কিছুদিন পৰে নগেন্দ্ৰবাবু কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতা হেয়ার স্কুলেৰ হেড পণ্ডিত।—ভবানীপুৰ সাউথ সুবৰ্দ্ধন স্কুল হইতে আমাৰ উৎসাহদাতা ও সহায় বাধিকাপ্ৰসন্ন মুখৰ্ঘ্যে মহাশয় আমাকে হেয়ার স্কুলে আনিলেন। ১২০ টাকা বেতনে হেয়ার স্কুলেৰ হেডপণ্ডিত ও ট্ৰান্স্‌প্ৰেশন মাষ্টাৰেৰ নূতন পদ সৃষ্টি হইল ; সেই পদে আমাকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হইল। বাধিকা বাবুৰ পৰামৰ্শে উড্ৰো সাহেব আমাকে উক্ত পদ দিলেন। শুনিলাম সাটক্লিক সাহেব অন্ত কাহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বহিত কৰিয়া ডিবেক্টেৰ উড্ৰো সাহেব আমাকে এই পদ দিলেন। পূৰ্বে উড্ৰো সাহেবেৰ সঙ্গে যে আমাৰ ঝগড়া হইয়াছিল, এবং উড্ৰো সাহেব আমাৰ প্ৰতি চটিকা আছেন, বাধিকা বাবু তাহা জানিতেন। অল্পমান কৰি, সদাশয় উড্ৰো সাহেবেৰ তাহা মনে ছিল না, অথবা বাধিকা-প্ৰসন্নবাবু কৌশলক্ৰমে সে বিৰোধেৰ কথা পশ্চাতে রাখিয়া, আমাৰ

প্রশংসা কবিতা উদ্ভাৱিত। সাহেবেৰ সন্মতি লইয়াছিলেন। যাহা হউক, উদ্ভাৱিত সাহেব সাটুৱিক্বেৰ প্ৰস্তাব অগ্ৰাহ্য কবিতা আমাকে হেয়াব স্কুলে বসাইলেন।

আমি বোধ হয় ১৮৭৬ সালেৰ প্ৰাৰম্ভে হেয়াব স্কুলে আসি। কিছুদিন ভবানীপুৰ হাইতেই গত্যাত কবিতাছিলাম, অবশেষে আমাৰ মাতুল দ্বাৰকানাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় পশ্চিম হাইতে স্কুল হইয়া কবিতা আসিয়া ভবানীপুৰে তাঁহাৰ সোমপ্ৰকাশ কাগজ ও প্ৰেসেৰ ভাৰ লইয়া বসিলেন। আমি তখন সপৰিবাৰে কলিকাতাৰ আমহাষ্ট ষ্ট্ৰীটে এক বাড়ীতে গিয়া প্ৰতিষ্ঠিত হইলাম।

দশম পরিচ্ছেদ ।

ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তনের দ্বিবিধ চেষ্টা । যুবকদলের উপর
কেশবচন্দ্রের প্রভাব হ্রাস । ভাবত-সভা । পঞ্চপ্রদীপ । থাকমণি ।

তৃতীয় যুবতী । হবিনাভিব উৎসবেব পব গুণতব পীড়া ।

পিণ্ডামাতাৰ সন্তানবাৎসল্য ও ভৃত্য খোদাইয়েব

প্রভুভক্তি । যুগ্মেবে কনিষ্ঠা কণ্ঠাব

মৃত্যু । “পুষ্পমালা” প্রকাশ ।

১৮৭৬, ১৮৭৭

ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তনের দ্বিবিধ চেষ্টা ।—

আমি কলিকাতাতে উঠিয়া আসলে আমাদের “সমদর্শী” দল আবণ্ড
জমাট হইল । ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তিত কবিবাব চেষ্টাও
ছুই প্রকাৰে চলিতে লাগিল । প্রথম, ভাবতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিবটী ট্রষ্টীদিগেব
হস্তে অৰ্পণ কবিবাব চেষ্টা কবা, দ্বিতীয়, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রতিনিধি-
সভা স্থাপনেব চেষ্টা কবা । কেশব বাব ব্রাহ্ম-সাধাবণেব বা উপাসক
মণ্ডলীব সভা আহ্বান কবা বন্ধ কবিয়াছিলেন, স্মৃতবাং আমবা সৰ্ব্বদা
এ আন্দোলন কবিবাব সুবিধা পাইতাম না । বৎসবেব মধ্যে একবাব
উৎসবেব সময় ব্রাহ্মদিগেব যে সম্মিলিত সভা হইত, তাহাতে আমবা ট্রষ্টী-
হস্তে মন্দিব অৰ্পণ কবিবাব প্রস্তাব উপস্থিত কবিতাম । একবাব কেশব বাব
এই বলিয়া আমাদের প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন যে, মন্দিবেব দেনা আছে,
দেনা থাকিতে উহা ট্রষ্টী হস্তে অৰ্পণ কবা যায় না । দ্বিতীয়বাৰ আমবা
ঋণশোধের জন্য সময় নির্দেশ কবিয়া কয়েক ব্যক্তিৰ প্রতি ভাব দিলাম ।
তৃতীয়বাৰ আমবা কয়েকজন দেনাৰ ভাব লইতে চাহিলাম । কোনও-
ক্রমেই কেশব বাবকে এ কার্যে রাজি করিতে পারা গেল না । আনন্দ-

মোহন বসু মহাশয় যদিও সমদর্শী দলে যোগ দেন নাই, একটু দূরে দূরেই ছিলেন, তথাপি তিনি এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিতেন। মন্দিবটা বাহাতে ঝুঁকী-হস্তে যায়, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল ; এবং কেশব-বাবু এত আপত্তি করাতে তিনি বিরক্ত হইতে লাগিলেন।

একদিকে এই চেষ্টা চলিল, অপর দিকে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা নামে একটি সভা গঠনের চেষ্টা চলিল। আমরা প্রস্তাবকর্তা, কিন্তু কেশব বাবু তাহাতে যোগ দিতে চাহিলেন। একটি কমিটী নিযুক্ত হইল, তাহাতে তিনি নাম দিলেন। কতকগুলি নিয়মাবলীও প্রণয়ন করা হইল।

যুবকদের উপর কেশবচন্দ্রের বিবাগ ও প্রভাব হ্রাস।—
এই সকল বিবাদেব মধ্যে কেশব বাবুর ভাব দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইতে লাগিলাম। তিনি সমদর্শী দলকে লক্ষ্য করিয়া রবিবাসরীয় মিরারে sceptics, secularists, unbelievers প্রভৃতি কটুক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি দুঃখিত হইয়া ঐ মিরারে হহার প্রতিবাদ করিলাম।

অতঃপর সংবাদ পত্রের এই-সকল উক্তি প্রত্যাঙ্কি, সমদর্শীর লেখা, ও যুবকব্রাহ্মদলের মধ্যে কেশব বাবুর আদর্শ সম্বন্ধে নানা আলোচনা উপহাস বিদ্রূপ, প্রভৃতির দ্বারা কেশব বাবুর অনুগত প্রবীণ ব্রাহ্মদল ও যুবক ব্রাহ্মদলের মধ্যে চিন্তা ও ভাবগত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে গািল।

এ বিষয়ে একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতে কেশব বাবু বৈরাগ্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে বৈরাগ্য কিরূপ তাহা একটু বলা ভাল। তিনি নিজের মৃত্যুভয় ভবনের ছাদে একটি খোলার ঘর বাঁধিয়া নিজে বাঁধিয়া থাইতে লাগিলেন। আহারের বে নিয়ম ছিল, তাহার বড় ব্যতিক্রম হইল না, কেবল জল পানের সময় হাতুনির্দ্দিত গ্লাসের পরিবর্তে মাটির গ্লাস ব্যবহার

করিতে লাগিলেন। ঝুলি লইয়া নিজের ভবনে ভিক্ষা মাগিতে লাগিলেন ; পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ খালার জল মালায় ঢালার জ্বায় মুষ্টিভিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি প্রচারক মহাশয়দিগের কেহ কেহ রাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই কোল্লগরের সম্মুখে একটা বাগান লইয়া কেশব বাবু তাহার “সাধনকানন” নাম রাখিলেন, এবং নিজে প্রচারকদের সহিত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে নিজ হস্তে রাঁধিয়া খাওয়া, জলতোলা, বাগানের মাটিকাটা প্রভৃতি বৈরাগ্য আচরণ পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। তাহা লইয়া কলিকাতার যুবক ব্রাহ্মদলে খুব হাস্যহাসি চলিতে লাগিল।

ফলতঃ, ইহার কিছুদিন পূর্বে হইতেই যুবকদের উপর কেশব বাবুর প্রভাব হ্রাস হইতেছিল। ব্রাহ্ম যুবকগণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে তিনি এক সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সতিত বিবাদ করিয়া ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা গঠন পূর্বক ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। তিনি এখন হয়ত মনে করিতেছেন যে, ধর্মসমাজের কার্যে সাধারণের হাত না থাকিয়া ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজনের হাত থাকা কর্তব্য ; এই কারণে তিনি সমাজের কার্যে, অগরের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে দিতে চান না, নিজে সর্বময় কর্তা হইয়া থাকিতে চান। এই সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে যুবকগণ তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে লাগিলেন। আমাদের মনের উপরে তাঁহার শক্তি অনেক পরিমাণে যেন হ্রাস হইতে লাগিল।

ভারতসভা স্থাপনের পরামর্শ।—যখন ব্রাহ্মসমাজে এই-সকল আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, তিনজনে আর-এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বাবু ১৮৭৩ খ্রীঃ হইতে আসার পর হইতে আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত

যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ত কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন খনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্তব্য নয়; অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রতাপিত্তি বেক্রপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটা রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমাদের তিন জনের কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কেও লওয়া হইল। মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে এই পরামর্শ চলিল। তাহার সকল পরামর্শে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কার্য্যান্তরে অগ্রত ছিলাম। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা আনন্দমোহন বাবু ও অরেন্দ্র বাবুর মুখে শুনিলাম।

যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, এতৎদ্বারা দেশের একটা মহৎ অভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্ত অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ করিলেন। কে কে এই উদ্যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, তখন বিজ্ঞাসাগর বলিয়া উঠিলেন, “হা! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?” আনন্দমোহন বাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরিলাম যে, বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। বাকে ভাল জানিবেন তাকে স্বর্গে দিবে; বাকে মন্দ জানিবেন

তাকে একেবারে নরকে দিবে। শিশিরবাবুদের প্রতি বোধ হয় কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আর তাঁদের নামও সহিতে পারেন না।

কি আশ্চর্য্য বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞতা! কি আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বশনের শক্তি! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। একটা সভা স্থাপন করা স্থির হইলেই, আনন্দমোহন বাবুর মুখে শুনিলাম, শিশির বাবুর দল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “এই সভার সম্পাদক হবেন কে?” মনোমোহন বাবু, সুরেন্দ্র বাবু, আনন্দমোহন বাবু সে বিষয়ে মনোযোগই দেন না। তাঁহারা বলেন, সে পরে স্থির হবে, যাকে সকলে মনোনীত করিবেন, তিনিই হবেন। “ভারত-সভা” স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার দুই এক দিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে, “ইণ্ডিয়ান-সীগ” নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্ত একটা রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিবার জন্ত এক সভা হইবে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় আচার্য্য রুক্ষমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া ঐ সভা স্থাপিত হইতেছে! আমরা একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলাম; কারণ শিশির আদি হইতে আমাদের পরামর্শের মধ্যেই ছিলেন।

ভারত-সভার জন্ম।—কিন্তু আমরা ভারত-সভা স্থাপনের সংকল্প ত্যাগ করিলাম না। ইণ্ডিয়ান-সীগ অগ্রে হইল, কি ভারত-সভা অগ্রে স্থাপিত হইল, মনে নাই। এই মাত্র মনে আছে, এলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারত-সভা স্থাপন করা গেল, এবং আনন্দমোহন বাবুকে তাহার সম্পাদক করা গেল। আর সেদিনকার কথা এই, মনে আছে যে সেদিন সুরেন বাবুর একটা পুত্রসন্তান মারা যায়, তিনি তৎসম্বন্ধে আসিয়া সভা স্থাপনে সাহায্য করিলেন। আনন্দমোহন বাবু

সম্পাদক, সুরেন বাবু সহ-সম্পাদক, আমরা কয়েকজনের কমিটির সভা, আমি প্রথম চাঁদা আদায়কারী সভা, এই লইয়া ভারত-সভা বসিল। আমরা ৯৩নং কলেজ ষ্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া করিয়া ভারত-সভার আপিস স্থাপন করিলাম। সে আপিস-ঘরের অবস্থা দেখিয়া স্বপ্রসিদ্ধ সুরসিক কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার প্রণীত “ভারত-উদ্ধার” কাব্যে লিখিলেন, “কড়ি আগে পড়ে কিম্বা দড়ি আগে ছেঁড়ে।” বাস্তবিক উহার দশা ঐ প্রকারই ছিল।

এই ৯৩নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনের ভিতর দিকে কতকগুলি ব্রাহ্মবন্ধু থাকিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম। তখন ভারত-সভার ঘরে কমিটির সম্মতিক্রমে “সমন্বয়” দলেরও বৈঠক চলিত। এখানে থাকিবার সময়ই আমি বিষয়-কর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবান্তে আত্মোৎসর্গ করি। যে চিরস্মরণীয় রাত্রে কেশব বাবুর নিকট প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণের প্রস্তাব নির্দ্ধারণ হয়, সে রাত্রে এই ভারত-সভার গৃহেই আমাদের বৈঠক হইয়াছিল। * বলিতে কি, ভারত-সভা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেন সমজ সহোদরের স্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। একই লোক-হৃদিকে, একই ভাবে উভয়ের কার্য চলিয়াছিল।

ভারত-সভা সংক্রান্ত অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া ফেলি। শিশির বাবু ইণ্ডিয়ান-লীগ নামক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সভা করিলেন ঘটে, কিন্তু তাহার কমিটিতে মনোমোহন ঘোষ ও আনন্দমোহন বস্তুকেও লইলেন। অল্পদিনের মধ্যে বৃদ্ধিতে পারিলেন ইহারা কমিটিতে থাকিলে শিশির বাবুরা তাঁহাদের সভাটিকে তাঁহাদের মনের মত চালাইতে পারিবেন না। তাই ইহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা হইতে লাগিল। আমি তখন আশায় মাতুল মহাশয়ের সোমপ্রকাশ কাগজ ও প্রেস ভবানীপুরে ডুপ্লিন্স

আনিয়া কাগজ চালাইতেছি। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও আমার সুপরিচিত এক ব্যক্তিকে তখন আমার সহকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার সহকারী মধ্যে মধ্যে অমৃতবাজার আপিসে যাইতেন। এক দিন তিনি আমাকে বলিলেন, “আজ শিশির ঘোষের অহুবোধে একটা খারাপ কাজ করে এলাম। ইঞ্জিনিয়ার লীগের এক মীটিংয়ে হাত তুলে আনন্দমোহন বসু ও মনোমোহন ঘোষকে পবাস্ত করি এলাম।” আমি বলিলাম, “সে কি? তুমি ত লীগের মেম্বর নও।” তিনি বলিলেন, “তাইতে ত বলছি খারাপ কাজ করে এলাম, শিশির বাবুর অহুরোধেই করেছি।” ইহার পর আনন্দমোহন বাবু ও মনোমোহন বাবু লীগ ত্যাগ করিলেন। লীগও ক্রমে উঠিয়া গেল। তদবধি শিশির বাবুদের প্রতি আমাব আস্থা চলিয়া গেল, কিন্তু আনন্দমোহন বাবু বহুদিন পুরাতন বন্ধুতা ভুলিতে পারিলেন না, কাজে কস্মে তাঁহাদের সহিত সন্ধর্ষ রাখিলেন।

“পঞ্চ প্রদীপ।”—এদিকে আমি, কেশবনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ত্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত ও ত্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, এই পাঁচজনে একত্র হইয়া ধর্মসাধনের জন্ত একটা ক্ষুদ্র দল করিলাম। আমরা পাঁচজনে একত্র বসিতাম, গ্রাণ খুলিয়া ধর্মবিষয়ে কথাবার্তা করিতাম, নানাস্থানে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতাম। মধ্যে মধ্যে ধর্মোপদেশের জন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যাইতাম। তিনি আমাদের নাম রাখিলেন “পঞ্চপ্রদীপ।” একদিন বলিলেন, লোকে পঞ্চপ্রদীপে যেমন দেবতার আরাতি করে, তেমনি তোমরা পঞ্চপ্রদীপে ঈশ্বরের আরাতি করিতেছ। নামটা আমাদের বড় ভাল লাগিল। আমরা আপনাদের মধ্যে আমাদের সন্মিলনকে পঞ্চপ্রদীপের সন্মিলন বলিতে লাগিলাম।

ধাকমণি।—এই সময়ের উল্লেখযোগ্য আর দুইটা ঘটনা আছে।

আমি যে লক্ষ্মীমণিকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দান করিয়াছিলাম সে সংবাদ বোধ করি কলিকাতায় প্রচারিত হইয়াছিল ; এই দুইটা ঘটনাই পরোক্ষ ভাবে সে সংবাদের সহিত জড়িত ।

একদিন আমার বন্ধু প্রচারক রামকুমার বিহারায় ও আমি দুইজনে মহর্ষি দেবেজনাথের চরণ দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছি । রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের বাড়ীর সম্মুখে আসিবার সময় একটা দ্বীলোকের পার্শ্ব দিয়া আসিলাম, কিন্তু তত লক্ষ্য করিলাম না ; তাহার মুখটা দেখিলাম না । তাহাকে অতিক্রম করিয়া কয়েক পা আসিয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে বামাকণ্ঠে শুনিলাম, “হাঁ গা শাস্ত্রীমশাই, তোমরা এখন কোথা থাক ?” হঠাৎ ফিরিয়া দেখি, একটা গৌরবর্ণা যুবতী একটা শিশু কস্তার হাত ধরিয়া আসিতেছে । মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলাম । ভবানীপুর বাসকালে আমি এক নির্জজন পল্লীতে বাস করিতাম, ঐ পতিতা নারী তাহার সন্নিকটেই থাকিত, ও আমাদের মেয়েদের সঙ্গে এক পুকুরে স্নানাদি করিত । সে যে আমাকে চিনিয়া রাখিয়াছে ও আমার নাম জানে, তাহা জানিতাম না । বাহা হউক, আমি ফিরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র সে হাসিয়া বলিল, “তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কাজ আছে । তোমার বাসা কোথায় বললে আমি গিয়ে দেখা করতে পারি ; নতুবা আমার বাসা অমুক নম্বর শিবঠাকুরের গলি, সেখানে তোমাকে একবার আসতে হবে ।”

ইহার পর বিহারায় ভায়া ও আমি দুইজনে বলাবলি করিতে লাগিলাম, “আমাকে এখন জানে, তখন আমি কি তত্ত্বের লোক তা-ও জানে । আমার সঙ্গে ওয় কি কাজ ?” কিছুই নির্ধারণ করিতে পারিলাম না, বড়ই আশ্চর্য্যবোধ হইল । আসিয়া আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়কে এই বিবরণ বলিলাম । তিনি এক সময়ে এই শ্রেণীর দ্বীলোকদের মধ্যে কাজ করিয়াছিলেন । তিনি বলিলেন, “ও- এখন খ্যাকুল হুর

তোমাকে ডেকেছে, তখন নিশ্চয় কোন বিষয়ে তোমার সাহায্য চায়। চল একবার শিবঠাকুরের গলিতে ওর বাড়ীতে যাই।” এই নির্দ্বারণ অনুরোধে পরবর্তী রবিবার প্রাতে আমরা দুজনে শিবঠাকুরের গলিতে তার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই বাড়ীটি এইরূপ জীলোকে পরিপূর্ণ। তখন বেলা ৯টা, তথাপি তাহাদের অধিকাংশ ঘরে ঘরে পড়িয়া ঘুমাটতেছে। অনেকে উঠিয়াছে, প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে।

এই মেয়েটার নাম থাকমাণ। থাকমাণ আমাদেরকে দেখিয়া আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া গেল। সে বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার নিমন্ত্রণে আমি ঐরূপ স্থানে যাইব। তাহার ভাবে এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখিলাম। সে রাস্তাতে আমার সহিত কথা কহিবার সময়, হাসিয়া চলিয়া তুমি তুমি করিয়া কথা কহিয়াছিল, কিন্তু সোদন আর-এক মূর্তি ধাবল। আপনি ও আপনারা বলিয়া কথা আরম্ভ করিল; এবং অতি গম্ভীর ও অমুতপ্ত ভাবে আপনার জীবনের বিবরণ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে বিবরণ সংক্ষেপে এই।—সে কলিকাতার সন্নিকটবর্তী কোনও স্থানের এক ভদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের কন্যা। তাহার মাতা ও ভ্রাতা তখনও জীবিত আছেন; এবং সে বিপদে পড়িয়া প্রার্থনা করিলে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। বালক-কালে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাহার অপর অনেকগুলি ভ্রাতৃ ছিল; সে কখনও পতিগৃহে যান নাই, কালে-ভদ্রে কখনও পতিকে দেখিয়াছে এই মাত্র। এই প্রকার অবস্থায় সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পাড়ার একজন পুরুষ তাহার পশ্চাতে লাগিল, এবং তাহাকে ফুসলাইয়া কুলের বাহির করিয়া আনিল। এই অবস্থাতে সে তৎকালীন চৌদ্দ আইনের ভয়ে, কিছুকাল ভবানীপুরের সেই নির্জন স্থানে লুকাইয়া ছিল। সেখানে থাকিবার সময় সে আমাদের দেখিয়াছে ও আমার বিষয় অনেক কথা শুনিয়াছে। সেইখানে

থাকিতে থাকিতে সে লক্ষ্মীমণিকে দেখিয়াছে, এবং ব্রাহ্মেরা কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আমার গৃহে রাখিয়াছে তাহাও শুনিয়াছে; তাই তাহার শিশু কন্তাটিকে আমার হস্তে দিবার জন্ত আমাকে ডাকিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মা ও ভাই আছেন, তাঁহাদের অবস্থা ভাল, তবে কেন তুমি এমন পথে পা দিলে?

থাক'—এখানে পার্ছেন না, বাদ্রামি করবার জন্ত।

আমি—এর মধ্যে তোমার বাদ্রামির আশ মিটলো?

থাক'—অনেক দিন মিটেছে। তবে কি করে ফিরব, বাবার ঘো নেই; গাই ভাবি, যার সঙ্গে ভেসেছি তাকেই আশ্রয় করে থাকি। তাই তাকেই আশ্রয় করে আছি, অল্প পুরুষ আসতে দিই না।

আমি—এরূপ অবস্থাতে এটাও ভাল।

থাক'—ভাল বটে, কিন্তু কষ্টও আছে। সে বেচারার জী আছে, ছেলে পিলে আছে, অল্প আয়, আমার সব খরচ দিয়ে উঠতে পারে না, আমাকে বড় কষ্টে থাকতে হয়।

কেদার—তুমি ত লক্ষ্মী মেয়ে, এত কষ্টে থাক, তবু অল্প পুরুষ আসতে দেও না।

থাক'—ঘর থেকে পা বাড়িয়ে ত এক পাপ করোছি। আর পাপের নাক্সা বাড়িয়ে কি হবে? আমার যা হবার হয়েছে, এখন ভাবি মেয়েটাকে এ পথ হতে কি করে বাঁচাই? শাস্ত্রীমশাই, আপনি লক্ষ্মীমণিকে বাঁচিয়েছেন, তাই আপনার চরণে শরণাপন্ন হচ্ছি।

আমি—তোমার মেয়ে বে এখনও মাই ছাড়ে নি। এত ছোট মেয়ে কি মা ছেড়ে থাকতে পারবে?

থাক'—সে একটা ভাবনার কথা বটে; তবে মনে হয়, একটু ভালবাসা হয় গেলে ক্রমে নাকে ভুলে যাবে। আপনার জীব ভালবাসার গুণে ও বশ হয়ে যাবে।

আমি—আচ্ছা আরও দুই তিন মাস যাক, মেয়েটা মাই ছাড়ুক, তখন অমুক ঠিকানায় আমাকে খবর দিও ।

এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম । হায় ! সে আর খবর দিল না ! ইহার পরে তাহার পীড়া হইয়া, সে বাসা ভাঙ্গিয়া গেল । আমি যুদ্ধে চলিয়া গেলাম, তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজে মাতিলাম, থাকমণি ও তাহার কন্যা স্মৃতি হইতে সরিয়া পড়িল । হয় ত তাহার মন বদলাইয়া গেল, না হয় আর আমার উদ্দেশ্য পাইল না । যে কারণেই হউক, থাকমণির উদ্দেশ্য আর পাইলাম না ।

খ্রীষ্টিয়া যুবতী ।—দ্বিতীয় ঘটনাটি এই । এই ঘটনায় উল্লিখিত নারীর উদ্দেশ্য অনেক অল্পসঙ্কানেও কেহ পাইবেন না, তাই ইহা লিপিবদ্ধ করিতেছি । হেয়ার স্কুলে কাজ করিবার সময় একদিন বেড়াইয়া কিরিয়া আসিয়া দেখি যে একটি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী যুবতী একটা পুত্রসন্তান সহ আসিয়া আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে । কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, তাহার পতি অতি হৃবৃত্ত, তিন দিন হইল তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে ; সে তিন দিন পুত্র সহ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমার শরণাপন্ন হইয়াছে । আমি লক্ষ্মীমণিকে আশ্রয় দিয়া কিরূপে রক্ষা করিয়াছি তাহা সে শুনিয়াছে ; সেই সাহসে আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে । স্ত্রীলোকটি আমার ভবনে থাকিয়া গেল । আমি পরে ভাবিলাম, সে খ্রীষ্টিয় ধর্মাবলম্বিনী, কোনও খ্রীষ্টিয় পরিবারে তাহাকে রাখিতে পারিলে ভাল হয়, তাহার পুত্রের সহিত শীঘ্রই মিলন হইতে পারে । এই ভাবিয়া আমার এক পাদরী বন্ধুকে গিয়া ধরিলাম । তিনি দয়া করিয়া তাহাকে পুত্র সহ এক খ্রীষ্টিয় বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন । সেখানে ঘরভাড়া ও মাতাপুত্রের আহারের ব্যয় আমাকে দিতে হইত ; আমি নিজ অর্থ হইতে এবং ভিক্ষা করিয়া সে ব্যয় চালাইতাম ।

তাহাদিগকে সেখানে স্থাপন করিয়াই তাহার পতিকে খুঁজিয়া বাহির

করিলাম, এবং আমার ভবনে ডাকাইয়া স্বীয় পত্নীকে লইবার জন্ত অত্মরোধ করিলাম। সে বলিল, “আপনার হাতে আছে, নিরাপত্তে আছে। অমনি কিছুদিন থাক, ভুগুক, চেতুক, সোজা হ’য়ে আসুক, পরে আমি নিয়ে যাব।” আমি মনে করিলাম, একটু ভোগা ভাল। সে সেইরূপ রহিল। আমি মধ্যে মধ্যে স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতাম।

এই সময়ে তাহার ব্যবহারে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রথম, আমি কিস্তিক্ষণ বাসিয়া উঠিতে চাহিলে সহজে উঠিতে দিত না। দ্বিতীয়, তাহার মুখে বিবাদের চিহ্ন কিছুই দেখিতাম না। একদিন সে একথা সেকথার পর আমাকে বলিল, “আপনি আমার কষ্ট নিবারণ কব্তে পারেন। আমি টাকা কড়ির কষ্টের কথা বলছি না, জ্বীলোকের আরও কষ্ট আছে, তারি কথা বলছি।” তখন আমার চোক যেন একটু ফুটিল। কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াই তাহার মুখ হইতে পরিষ্কার রূপে এ কথাটা বাহির করা গেল যে, সে আমাকে অবৈধ প্রণয়ের চক্ষে দোষভেদে। আমি তৎক্ষণাৎ উদ্গিয়া তাহার ঘরের বাহিরে আসিতেই, সে ভীত হইয়াই হউক কি যে কারণেই হউক, “আর একটা কথা আছে” বলিয়া আমার পথ রোধ করিল। আমার প্রথম মনে হইল, গর্জন করিয়া উঠি এবং জোরে তাহার হাত ছাড়াইয়া যাই। কিন্তু কোলাহল ও লোক জানাজানি হইলে একটা কলঙ্কের ব্যাপার হইবে, তাহা ইহার পক্ষে ভাল নয়, এই মনে করিয়া তাহা করিলাম না; বলিলাম, “তোমার কাছে বাঙ্গলা বাইবেল আছে?”

সে—আছে।

আমি—সেখানা আন দেখি?

সে—তাতে এখন কাজ কি?

আমি—আন না? একটু প্রয়োজন আছে।

সে অনিচ্ছাক্রমে বাইবেল খানা বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। যীশু যেখানে মানসিক পাপাচরণের নিন্দা করিতেছেন, সেই স্থানটা বাহির করিয়া পড়িতে দিলাম। সে কোনও মতেই পড়িবে না, অবশেষে আমি বার বার বলিতে পড়িল।

আমি—দেখ, তোমরা যাহাকে প্রভু মনে কর, তাঁর কি অমূল্য উপদেশ! তুমি এ উপদেশ কত বার পাইয়াছ, তবু কেন তোমাব এ প্রবৃত্তি? আর তুমি আমাকে এত খারাপ কিকপে ভাবিলে? তোমার স্বামী তোমাকে আমাব হাতে সঁপিয়া গিয়াছে। আমি কি এতহ ছোট লোক যে বিশ্বাসঘাতকতা কব্ব?

আমি সেহািন তাহাকে বেকপ চেজের সাহিত উপদেশ দিয়াছিলাম, জীবনে আর কাহাকেও বোধ হয় সেরূপ দিই নাই। তৎপর দিন তাহার পতিকে ডাকাইয়া বলিলাম, “তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও, ওকে বাহরে রাখা ভাল নয়।” সে তাহাকে লইয়া গেল।

হহার পর ঐ নারীকে আব একবার দেখিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর পরে সহরের সন্নিকটবর্তী কোনও পথ দিয়া যাইবার সময় পথের পাশ্বেবর্তী এক বাড়ী হইতে তাহার পুত্রটি বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে বলিল, “আমরা এই বাড়ীতে থাকি, মা আপনাকে দেখিতে পেয়েছেন, একবার দেখা কব্বার জন্য ডাক্চেন।” আমি বাড়ীতে প্রবেশ করিলে তাহার মাতা গলবস্ত্রে আমার পদে প্রণত হইয়া আমার বাড়ীর সমুদয় সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। আমি একটু দাড়াইয়া তাহাদের কুশল সংবাদ লইয়া চলিয়া আসিলাম।

হারিনাতি সমাজের উৎসব; রাজনারায়ণ ২য়।—ক্রমে আমরা ১৮৭৭ সালে উপনীত হইলাম। এই সালের প্রথমে হরিনাতি সমাজের উৎসবে যাই। সেখানে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মপণের সমাগম হয়। উক্ত অনুষ্ঠানকেন্দ্রে



স্বর্গীয় রাজন রত্ন বসু

আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার সরল অকৃত্রিম ভক্তি আমাকে মুগ্ধ করিত। তিনি তখন কার্যা হইতে অবসৃত হইয়া বৈষ্ণনাথ দেওঘরে বাস করিতেছিলেন। আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিমল সহবাসে কিয়ৎকাল যাপন করিবার জন্ত সেখানেও বাইতাম। তিনি স্মৃতি পরিহাসরসিক আমোদপ্রিয় পুরুষ ছিলেন; আমিও তজ্জপ, স্মৃতরাং এজনেব একত্র সমাগম হইলে উভয়ের “জিগল্লিষা”-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উদ্ভিত। হাসিতে হাসিতে লোকের নাড়ীতে বাথা হইয়া যাইত। এবারেও हरिनाभिते তাহা ঘটিল। একদিন রাত্রে সামাজিক উপাসনার পূর্ব আহারান্তে আমাদের দুইজনের গল্লেব কাটাকাটিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল। ব্রাহ্মদের নাড়ীতে বাথা হইল।

জুঃ ও বন্ধুকাশ।—সেই কারণেই হউক, কি हरिनाभित्तिর ন্যাংলিয়ারবশতই হউক, আমি কলিকাতায় আসিয়াই জরাক্রান্ত হইলাম। জঃএব সঙ্গে রক্তকাশ দেখা দিল। একজন ডাক্তার বলিলেন, হাঁপকাশের স্ত্রপাত; কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলিলেন, ক্লমকাশের স্ত্রপাত। সেইরূপ চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পীড়ার সময় পিতা মাতার ব্যবহার।—এই পীড়ার সময় আমার শতাব্দীর জনক-জননী কি করিয়াছিলেন, এবং আমার বিশ্বাসী অমুগত ভ্রাতা খোদাই কি করিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার উপযুক্ত। তৎপূর্বে আট বৎসরকাল আমার পিতাঠাকুর মহাশয় আমার মুখদর্শন করেন নাই। তিনি যে প্রথম প্রথম আমাকে গ্রামে প্রবেশ করিতে দিবেন না বলিয়া গুণ্ডা ভাড়া করিতেন, ও শেষে সে প্রয়াস ত্যাগ করিয়াও আমি বাড়ীতে কোনও ঘরে আছি জানিলেই সে ঘরের দিকে যাইতেন না, পথে আমাকে দেখিলে সে পথ পরিত্যাগ করিতেন, এ সকল অগ্রেই বলিয়াছি। আমি পীড়াতে পড়িয়া যখন বুঝিতে পারিলাম যে পীড়া

কঠিন, আমার জীবনসংশয়, তখন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করিলাম। রোগশয্যায় পড়িয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। পীড়ার সংবাদ দিয়া লিখিলাম, “যদি উচিত বিবেচনা করেন, আসিয়া দেখা দিয়া আমাকে পদধূলি দিয়া যাইবেন। তাহা না হইলে এই বিদায়, পরলোকে দেখা হইবে।” তৎপূর্ব্বে বাবা আমার চিঠিপত্র খুলিতেন না, ও উপরে আমার হস্তাক্ষর দেখিলে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। এ পত্র যে কেন পড়িলেন, বলিতে পারি না। অহুমান করি, লোকমুখে অগ্রেই আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, একদিন প্রাতে আমার ভবনের দ্বারে একখানি গাড়ি আসিয়া লাগিল। প্রসন্নময়ী জানালা হইতে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিলেন, “বাবা ও মা আসিয়াছেন।” মা উপরে আসিলেন, কিন্তু বাবা আর সে ভবনে প্রবেশ করিলেন না। মা আমার রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া কঁাদিয়া বসিয়া পড়িলেন। “বাবা আসিলেন না কেন?” জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, তিনি কবিরাজ ডাকিতে গিয়াছেন। অহুস্কানে জানিলাম, বাবা আমার চিঠি পাইয়া মায়ের গহনা বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আমার চিকিৎসার জন্ত আসিয়াছেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন না; আমার জ্ঞাতি-দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসাতে থাকিয়া আমার চিকিৎসা করাইবেন।

যথাসময়ে কবিরাজ আসিলেন। বাবা তাঁহাকে আমার ভবনে প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিজে পথপার্শ্বে দোকানে বসিয়া রহিলেন। কবিরাজ আমাকে দেখিয়া গেলে তাঁহার মুখে সমুদয় শুনিলেন।

তাঁহার এই ব্যবহারে আমার চক্ষে কত জল পড়িল। তৎপূর্ব্বে এই আট বৎসর সংসারের আপদ বিপদে জ্ঞাতসারে আমার এক পরসাপ্ত সাহায্য লন নাই। পরন্তু যদি কখনও জানিতে পারিয়াছেন যে, মায়ের হাত দিয়া গোপনে কিছু অর্থসাহায্য করিতে চাহিতেছি, তখন তুফল

কাণ্ড করিয়াছেন। তিনি আমাকে একেবারেই ত্যাজ্যপুত্র করিয়া ছিলেন। কিন্তু সেই পতিত পুত্র যখন বিপদে পড়িয়া স্মরণ করিল, তখন আর স্থিতির থাকিতে পারিলেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সম্বল নাই। বে সম্বল হাতের কাছে পাইলেন, তাহাই লইয়া ছুটিলেন। কি উদারতা! এই উদারতা তাঁহার প্রকৃতির এক মহা সঙ্গুণ।

তিনি আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া এক স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া মাকে আমার পরিচর্য্যার জন্য সেই বাড়ীতে রাখিয়া গেলেন। মাতা-ঠাকুরাণী বিরাজমোহিনীকে ও আমাকে লইয়া সেই বাড়ীতে রহিলেন। মাতাঠাকুরাণীর জপ তপ ব্রত নিয়ম উপবাসাদির মাত্রা অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। প্রায় প্রতিদিন দেড়মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গাইতেন; এবং ইষ্টদেবতার চরণে শত শত প্রণাম করিয়া এই অধম পুত্রের জীবনভিক্ষা করিতেন। তৎপরে গৃহে ফিরিয়া আমারই রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মাটি দিয়া শিব গড়িয়া পূজাতে প্রবৃত্ত হইতেন। আমি শুইয়া শুইয়া তাঁহার পূজার নিষ্ঠা দেখিতাম।

ওদিকে বাবা মাকে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া গ্রামের জ্ঞাতিকুটুম্ববর্গের মধ্যে কেহ কেহ দলাদলি আরম্ভ করিলেন। বাবা তখন বজ্রের ছায়া কঠোর হইয়া দাঁড়াইলেন। “একথরে করে করুক, আমার কর্তব্য কাজ আমি করেছি,” বলিয়া সে দলাদলির প্রতি জ্ঞেপও করিলেন না।* এই দলাদলিতে কিছুদিন গেল।

এদিকে মা আমার সেবাতে বিব্রত। আমার প্রপিতামহ রামজর শ্রাণালঙ্কার মহাশয় অতি সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি মায়ের মন্ত্রদাতা ‘শুক’ ছিলেন। তাঁর প্রভি আমাদের পরিবারই সকলের ও জ্ঞাতিকুটুম্বের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁর লাঠি, তাঁর জপমালা, তাঁর বোণপট্ট প্রভৃতি যে কিছু কিছু ঘরে ছিল সে-সমুদয়ের প্রতি মার এত ভক্তি যে

* পরিশিষ্ট দেখ।

বাড়ীর কাহাবও গুরুতর পীড়া হইলে, সেগুলি তাহার রোগশয্যাতে স্থাপন করা হইত, রোগমুক্তি না হইলে অন্তরিত করা হইত না। সেই নিয়মানুসারে জননী দেবী শ্রায়ালঙ্কার মহাশয়ের লাঠি মালা প্রভৃতি আনিয়া আমাব শয্যাতে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনমাস সেইরূপ রহিল, অন্তবিত কবিতো দিলেন না। আমাব পীড়ার উপশম হইলে তবে তুলিয়া লওয়া হইল।

বিশ্বাসী ভৃত্য খোদাই।—এই পীড়ার সময় আমাব জনকজননীৰ বেমন আশ্চর্য্য্য সন্তানবাংসল্য দেখিলাম, তেমনি আমাব বিশ্বাসী অনুগত ভৃত্য খোদাইয়ের অদ্বুত প্রভুভক্তিব পবিচয় পাইলাম। খোদাইয়ের স্বতি আমার মনে পর্ব্বিত্র প্রেমের উৎস স্বরূপ হইয়া বহিয়াছে। আমি তাহাকে আমাব “মেজবো” নামক উপাশ্রাসে অমর করিবাব চেষ্টা করিয়াছি। ভবানীপুরে হেড মাস্টারি করিবাব সময় খোদাইকে বাধি। তখন হইতে তাহার গুণাবলি দেখিয়া আমার মন তাহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হয়। আমাব প্রতিও তাহাব প্রগাঢ় প্রীতি জন্মে। সে আমার হিতৈষী বন্ধু, ও পরিবার পরিজনোর বন্ধক ছিল। আমি তাহার হাতে টাকা কড়ি ও সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম।

পীড়া হইয়া কৰ্ম্ম হইতে অর্দ্ধবেতনে বিদায় লইয়া যখন আসিয়া রোগশয্যা পড়িলাম, তখন খোদাইয়ের বেতন দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে এই ভাবিয়া, আমি আনন্দমোহন বহুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমার রোগমুক্তি পর্য্যন্ত অধিক বেতনে তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া দিলাম। যা যখন আমাকে লইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিয়া আছেন, তখন ঐকদিন প্রাতে দেখি, খোদাই আসিয়া উপস্থিত।

আমি—কি খোদাই, তুমি যে এলে ?

খোদাই—আপনার বেমারি বেড়েছে শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না, কৰ্ম্ম ছেড়ে এসেছি।

আমি—ভাল কর নি, তোমাকে খেতে দেবে কে ?

খোদাই—আপনি ভাববেন না, আমি বেতন চাই না। নারায়ণ আপনাকে বাঁচিয়ে তুললে আপনি পরে বেতন হিসাব করে দেবেন। ঘাব আপনি যদি না উঠেন, আমার বেতন থাক।

শুনিলে আমার চক্ষে জল আসিল। আমি কোন ক্রমেই এই সকল হইতে তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না, সে থাকিয়া গেল।

তৎপরে মা চলিয়া গেলে আমি আমার পূর্ব বাসায় গেলাম। তখনও ছুটিতে আছি, দিনের পর দিন যায়, দেখি প্রেসন্নময়ী আমার নিকট সংসারধরনের টাকা চান না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, কে জানে খোদাই কোথা হতে চালাচ্ছে, সে বলেছে ‘মা, বাবুক এখন বিরক্ত করো না, টাকা না থাকলে আমাকে বলো।’” পরে মনুষ্যকানে জানিলাম, খোদাই আপনার গলার সোনার দানা বাঁধা দিয়া টাকা আনিয়া প্রেসন্নময়ীর হাতে দিতেছে। ইহার পর আমরা বাবু পরিবর্তনের জন্ত মুন্সেফে বাই। খোদাই আমাদের সঙ্গে যায়। সেখানে গিয়া তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। আমি তাহার সমুদয় ঋণ শোধ করিয়া, তাহাকে টাকা দিয়া তাহার দেশে পাঠাইলাম। সেখানে গিয়া তাহার মুক্তা হইল।” সে যে কয় মাস জীবিত ছিল, আমি তাহার সমস্ত মাসিক বেতন তাহাকে পাঠাইয়া দিতাম। হার, অহাতে ত তাহার প্রেমের ঋণ শোধ হইল না ! শুনিলাম, মরিরবার সময় নিজ সন্তানকে বলিয়া গেল, ‘যদি কখনও কাজ করতে কলকাতার বাস, আমার বাবুর কাছে থাকিস্।’

মুন্সেফের সন্তোষজনীক মুক্তা।—আমি ছুটি-লইয়া বাবুপরিবর্তনের জন্ত মুন্সেফে গেলাম। সেখানে গিয়াই এক বিপদ ঘটিল। মুন্সেফের বাড়ীগুলির সোতলার বারান্ডার রেলিং বড় ছোট ছোট। আশাচক্ৰ পঁহছিবার পরদিন বৈকালে আমি কয়েকজন সমাগত বন্ধুর সহিত

বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় হুন্ করিয়া একটা শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি, আমার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা এক বৎসর দশ মাসের বালিকা সরোজিনী সেই বাড়ীর বাগাভার রেলিঙে উঠিয়া তাহা টপকুইয়া নীচের উঠানেব পাথরের মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছে। সে আর কাঁদিল না, নড়িল না, পাথরখানার মত অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। দৌড়িয়া নীচে গিয়া তাহাকে কুড়াইয়া আনা গেল; চেতনা কবিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা গেল, আর চেতনা হইল না। রাত্রি চারি দণ্ডের পর তাহার মৃত্যু হইল। বন্ধুরা তাহার মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে দাহ করিতে গেলেন। আমি প্রসন্নময়ীকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া, সমস্ত রাত্রি শয্যায় শোয়াইয়া রাখিলাম; কারণ তিনি উন্মত্তার মত ছুটিয়া রাস্তার ঘাইতে চাহিতে লাগিলেন। আমি শোক করিব কি, সেই সংগ্রামে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। আমার শোক একটা কবিতাতে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা ‘পুষ্পাঞ্জলি’তে প্রকাশিত হইয়াছে।

সরোজিনীর মৃত্যুর পর আমি কিছুদিন মুন্সেরে থাকিয়া, পরিবার-দিগকে সেখানে রাখিয়া কলিকাতার কর্ণস্থানে আসিলাম। এই সময় হইতে প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আমিও পূৰ্ব্ব নিয়মানুসারে তাঁহাদের উভয় হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে লাগিলাম। এই সংগ্রামে অনেক দিন গিয়াছিল।

“পুষ্পমালা” প্রকাশ।—বোধ হয় এই সময়েই আমার লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা সংগ্রহ করিয়া “পুষ্পমালা” নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। আমার রচিত পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়, তন্মধ্যে ‘পুষ্পমালা’ একখানি। ইহাতে আমার অনেক প্রাণের কথা আছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন । কর্ম্মত্যাগ । “সমালোচক” ও

“ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়ন” । “ব্রাহ্মসমাজ কমিটি” ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মীটিং । কেশবচন্দ্র

কর্তৃক পুলিশ সাহায্যে মন্দির অধিকার ।

স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপনের পরামর্শ ।

(১৮৭৮, জামুয়ারী হইতে মে মাস)

কুচবিহার বিবাহের প্রথম সংবাদ ।—মুজের হইতে কলিকাতার ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, কেশববাবু তাঁহার পৈতৃক ভবনের অংশ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে মিস্ পিগটের স্কুলের বাড়ী ক্রয় করিয়া তাহার নাম “কমল কুটীর” রাখিলেন, এবং সেখানে কুচবিহারপক্ষীয় ঘটকদিগকে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা দেখান হইল ।

কয়েকটা উৎসাহী ব্রাহ্মের বিশেষ ব্রত গ্রহণ ।—অপর দিকে এই সময়েই কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া আর-এক কার্যের স্বত্বপাত করিলেন । তাঁহারা একটা ঘননিবিষ্ট দল সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন । এইরূপ স্থির হইল, তাঁহারা কয়েকটা স্কল ন্যতাকে জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করিবেন, এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া একটা ঘননিবিষ্ট দলে বদ্ধ হইবেন । তন্মধ্যে কয়েকটি ব্রত প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য । প্রথম, তাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন । দ্বিতীয়, তাঁহারা গর্ভগমেষ্টের চাকুরী করিবেন না । তৃতীয়, পুরুষের ২১ বৎসর ও কস্তার ১৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে বিবাহ দিবেন না, বা সেসময় বিবাহে পৌরোহিত্য করিবেন না । চতুর্থ, স্ত্রীকে ভেদ রক্ষা করিবেন না ; পুত্রাদি আশ্রয় করিবেন না ।

ঐ দলে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইলাম। একদিন বিশেষ উপাসনার দিন স্থির হইল। ঐ দিন বিশেষ উপাসনানন্তর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, আশুদেব জালিয়া, ঈশ্বরের নাম লইতে লইতে তাহা প্রদক্ষিণ পূর্বক, আমরা ঐ অগ্নিতে আমাদের নিজ নিজ নাম অর্পণ পূর্বক, প্রার্থনানন্তর প্রতিজ্ঞাপত্র পুনরায় পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিলাম। সুখের বিষয় যে, ইহার পর আমি ও ঐ দলের আর-একজন গবর্ণমেন্টের চাকুরী পরিত্যাগ করি, এবং সেই-সকল প্রতিজ্ঞা চিরদিন পালন করিয়া আসিতেছি। বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুগণ ঐ দলে ছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, ময়মনসিংহের শরচ্চন্দ্র রায়ও ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন। যখন ইহারা ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে আশুদেবের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন এক আশ্চর্য্য বল ও আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া সেই ঝড়ে আমাদের ক্ষুদ্র দলটী বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। সে আন্দোলনে ইহারা সকলেই মহোৎসাহে কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই সময় হইতে আমার গবর্ণমেন্টের চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে দিবার প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইল। কিন্তু সে চাকুরী ত্যাগ করিয়া অল্প চাকুরী লইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। এ বিষয়ে আমি বন্ধুবর আনন্দমোহন বসু, মহাশয়কে পরামর্শদাতারূপে বরণ করিয়াছিলাম। আমার প্রচারকার্য্যে জীবন দেওয়ার বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সায় ছিল, কিন্তু আমার একটা উপায় না করিয়া কস্মি ছাড়া উচিত নয় বলিলেন—তিনি বাধা দিতে লাগিলেন।

কুচবিহার-বিবাহে কেশবচন্দ্রের সম্মতি ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উত্তেজনা।—এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে কুচবিহার-

বিবাহের ঝটিকা উপস্থিত হইল, এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল তাদিগ্না হুখান হইয়া গেল।

১৮৭৮ সালের জাহ্নবীরী প্রায়শ্চৈ কুচবিহারের ম্যাজিষ্ট্রেট, আমার প্রাচীন পরিচিত যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, নাবালক রাজার বিবাহের বিষয়ে সমুদয় কথা স্থির করিবার জন্য তারপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন। কালীর সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয় তখন কলিকাতাতে বাস করিতেছিলেন। বহুতাপ্ত্রে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভবনে বাইতাম; সেখানে যাদব বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। আমি তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, কেশব বাবু কস্তার বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্বে তাহাকে বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছেন; কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই-সকল কথাবার্তা চলিতেছে। সে-সকল কথাবার্তার প্রকৃতি কি, তাহা তিনি আমাকে বলেন নাই। ক্রমে শুনিলাম যে, পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য কুচবিহার হইতে রাজপুত্রোহিত আসিতেছেন। ক্রমে কি কি বিষয় স্থির হইল, তাহাও প্রকারান্তরে আমাদের কর্ণগোচর হইল। জানিলাম যে কস্তার ও বরের বরপ্রাপ্তির পূর্বেই বিবাহ হইবে, তবে বরপ্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিবেন; কেশব বাবু আভিচ্যুত বলিয়া কস্তা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কস্তা সম্প্রদান করিবেন; রাজপুত্রোহিতের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে, কেবল তাহাতে দেবদেবীর নামের পরিবর্তন স্বতন্ত্রের নাম লিখিত হইবে, রাজপুত্রোহিত বিবাহ দিবেন; ইত্যাদি।

আবার ইহাও শুনিলাম যে, যাদব বাবু বিবাহের প্রস্তাব লইয়া হর্গামোহন দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ব্রহ্মদেবী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “না, না, আমার মেয়ের রাজারাজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ দেখা হবে না। প্রথম ত হলে অপ্রাপ্তবয়স্ক; তারপর রাজারাজ্যের সঙ্গে কিম্বদ-সম্বন্ধ জাল মন, আমার মেয়ের মেয়ের রাজ্য বোঝার সই

ভাল করে মিশতে পারবে না।” যাদব বাবু সেখান হইতে নিরাশ হইয়া আসিয়া কেশব বাবুর কাছে গিয়াছেন।

এই সংবাদে কলিকাতার ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমরা স্থির করিলাম যে এই সঙ্কটে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত সভ্য-সকলকে জোর করিয়া ধরা আমাদের কর্তব্য, এবং তাহা করিবার জন্য কেশব বাবুর কার্যের প্রতিবাদ করা কর্তব্য। যে কেশব বাবু মহা আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বরকত্তার বিবাহের বরস নিষ্কার্য করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাহা ভাঙিতে যাইতেছেন, ইহা কেমন কথা? সুতরাং এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত কার্যপ্রণালী রক্ষা করিবার জন্য জোরে দাঁড়ান কর্তব্য। কিন্তু তৎপূর্বে বন্ধুভাবে একবার কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদায় কথা তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিবার চেষ্টা করা উচিত। তদনুসারে ২রা ফেব্রুয়ারী আমরা তিন বন্ধু মিলিয়া কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। যাইবার দিন প্রদ্যোক্ত ঐযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। তিনি বিশেষ কোনও সংবাদ দিতে পারিলেন না। বলিলেন, “আমি সবে বোম্বাই হইতে আসিয়াছি, আমি কোনও সংবাদ জানি না। তোমরা কেশব বাবুর কাছে যাও, আমিও পশ্চাতে আসিতেছি।” আমরা গিয়া কেশব বাবুর সহিত কথা কহিতেছি, তিনিও আসিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। কেশব বাবু কোনও মতেই বিশেষ সংবাদ দিতে চাহিলেন না। বলিলেন, “এখন কোনও সংবাদ দিতে পারি না।” আমি বলিলাম, “এই সংবাদে ব্রাহ্মদের মন অতিশয় উত্তেজিত; আপনার উচিত আমাদেরকে সকল সংবাদ দেওয়া। লোকের ত আপনার নিকট আসে না, আমাদেরকেই পথে বাটে ধরে, আমাদের সঙ্গে কলঙ্ক করে। আমরা উত্তর দিতে পারি, লোককে শান্ত করিতে পারি, এমন সংবাদ আমাদের কাছে থাকা আবশ্যিক।” তিনি কেবল

ক্রমেই কিছু বলিলেন না। অবশেষে আমি বলিলাম, “আমাদের শেখ যত্নবা এই যে, আপনারা খাস্তগির মহাশয়ের কন্যার বিবাহে তাঁহাকে ক্রিয়াকারী চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা মনে আছে। তাঁহার ঘাড়ের মাস ছিঁড়িয়া খাইয়াছিলেন। আপনার কস্তার বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কোনও নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ব্রাহ্মদের ছাড়িবে না।” যেই এই কথা বলা, অমনি কেশব বাবু বিরক্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া টেবিলের উপর উঠিয়া বসিলেন; কাখে একখানা গামছা ছিল, তাহা মাথার বাঁধিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, “আমারও ঘাড়ের মাস ছিঁড়ে থাকে, তার আর কি?” আমি পূর্বে কখনও তাঁহাকে এত উত্তেজিত দেখি নাই। দেখিয়া মনে হইল, আর তাঁহাকে বিরক্ত করা উচিত নয়। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, ‘আপনি বিরক্ত হইতেছেন, তবে এ কথা থাক।’ এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

অতঃপর আমাদের দলে মঙ্গলা চলিল। এইবার সমদলী দল, স্বাধীনতার দল, নিয়মতন্ত্রের দল, সকল দল এক হইল। এমন কি, বুদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মহাশয় পর্যন্ত আমাদের দলে যোগ দিলেন। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত। আমাদের মনে কি দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষাতে বর্ণনা করিবার নহে। আনন্দমোহন বাবু তখন মুন্সেরে পরিবার রাখিয়া আসিয়া হাইকোর্টের নিকট আপনার চেয়ারে বাস করিতেন। আমি সর্বদা তাঁহার নিকট বাইতাম, এবং দুজনে বলিয়া হার হার করিতাম। এমন কতদিন গিয়াছে, আমি, তাঁহার কোঠে বসিয়া আছি, তিনি কোঠের দুই পকেটে দুই ছাত্র দিয়া গভীর চিন্তাশ্রিতভাবে সেই একটুকু ঘরের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাদচারণা করিতেছেন। দুজনের মুখেই কথা নাই। বহুক্ষণ পরে এক একবার কোঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, “নিবারণ বাবু, কি হবে? কি করা যায়?”

কেশবচন্দ্রের নিকট প্রতিবাদপত্র প্রেরণ।—অবশেষে স্থির হইল যে সকলে একদিন একত্র বসি আবশ্যক। তদনুসারে ২৩ কলকাতা স্ট্রীট ভবনে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের হলে একদিন রাত্রে সকলে বসি গেল। * কেশব বাবুকে কিছু বলা উচিত কি না, যদি বলা হয়, কি বলা হইবে, কে কে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এই বিচারে রাজি প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। স্থির হইল, একখানি প্রতিবাদপত্রে কয়েক ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া কেশব বাবুর হাতে দেওয়া হইবে। কিন্তু সেই গভীর রাত্রে বন্ধুত্ব ভগ্নমোহন দাস ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি বলিলেন, “এই প্রতিবাদপত্র প্রেরণের অনিবার্য ফল, কেশব বাবু তাহার সমুচিত ব্যবহার না করিলে স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাহা করিতে তোমরা প্রস্তুত আছ কি না?” আনন্দমোহন বাবু ও আমি বলিলাম, “স্বতন্ত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠা এখনও আমাদের মনে নাই; সে বিষয়ে কথা দিতে পারি না। যেটুকু আপাততঃ কর্তব্য বোধ হইতেছে তাহাই করিতে যাইতেছি। ফলাফল জানি না।” দুর্গামোহন বাবু বলিলেন, “ছেলে খেলার মধ্যে আমরা নাই। যারা আমাদের সঙ্গে সমগ্র পথ যাইতে প্রস্তুত নন, তাঁদের সঙ্গে স্বাক্ষর করিব না।” এই বলিয়া তিনি ও দ্বারি বাবু চলিয়া গেলেন।

ইহারা দুইজনে চলিয়া গেলে প্রতিবাদপত্রে উল্লেখ্য বিষয়গুলি স্থির হইয়া গেল। পরদিন হইতে তাহাতে বিশিষ্ট ব্রাহ্মদিগের স্বাক্ষর লওয়া হইতে লাগিল। সকলের ভক্তিভাজন শিবচন্দ্র দেব মহাশয় স্বাক্ষর-কারীদের অগ্রণী হইলেন। কি জানি কি ভাবিয়া দুর্গামোহন বাবু ও দ্বারি বাবু দুই দিন পরে উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে ২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ দিবসের ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকাতে কুচবিহার-বিবাহ-

স্থানচিত্ত বলিয়া প্রকাশিত হইল। সেই দিবসই আমাদের নিযুক্ত তিন ব্যক্তি ২৬ জন বিশিষ্ট-ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত ঐ পত্র কেশব বাবুকে দিয়া আসিলেন। কেশব বাবুর প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাহা লইয়াছিলেন। আমরা পরে গুনিলাম, কেশব বাবু তাহা না পড়িয়া পা দিয়া দলাইয়াছিলেন এবং ছিঁড়িয়া ছেঁড়া কাগজের বাস্ত্রে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের স্বাক্ষর বাহাতে আছে, সে পত্র কেশব বাবু পা দিয়া দলাইয়াছেন, গুনিয়া আমরা মনে বড়ই ক্রোধ পাইলাম। সেই দিন মনে বুঝিলাম, এ বিবাদ সহজে মিটিতেছে না।

মকঃসল সমাজ সকলের মত গ্রহণ।—আমরা কেশব বাবুর নিকট প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াই তাহা মুদ্রিত করিয়া মকঃসলের সকল সমাজে প্রেরণ করিলাম, ও তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। চারিদিক হইতে কেশব বাবুর হস্তে প্রতিবাদপত্র আসিতে লাগিল।

কর্মত্যাগ।—এদিকে আমাব জীবনের দ্বিতীয় সঙ্কট উপস্থিত। প্রথম সঙ্কট গিয়াছিল, উপবীত ত্যাগের সময়, দ্বিতীয় সঙ্কট আসিল, কন্য ছাড়িবার সময়। আমি সেই বিশেষ প্রতিজ্ঞার দিন * হইতে গবর্ণমেন্টের চাকুরী ছাড়িব বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে দিব এই সঙ্কল্প ছিল; সে জন্মই কেশব বাবুর ভারতাপ্রসঙ্গে গিয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে মিশ খাইল না বলিয়া চুঃখিত অন্তরে কিছুদিন বিষয়কর্ম করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আত্মা শান্তিতে ছিল না। অন্তরাত্মা 'কি করি কি করি' ভাবিয়া সর্বদাই বিষন্ন হইত। অবশেষে ১৮৭৬ সালের শেষ হইতে কর্ম ছাড়াই স্থির করিয়াছিলাম। কেবল সকল কাজের সঙ্গী ও সকল

বিষয়ের পরামর্শদাতা আনন্দমোহন বসু মহাশয় ‘কিছুদিন বিলম্ব করুন, কিছুদিন বিলম্ব করুন’ বলিয়া আমাকে টানিয়া রাখিয়াছিলেন।

এখন সেই সঙ্কর আবার মনে জাগিয়া মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। আবার আমি সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইতে লাগিলাম। একদিকে কত চিন্তা, কত বিভীষিকা মনে আসে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে; বাহাদের মুখ চাহিব, এরূপ কেহ কোথাও নাই। বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা মনে হইতে লাগিল। তাঁহারা চিবদারিদ্র্যে বাস করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের একমাত্র পুত্র, তাঁহাদের দারিদ্র্যহুঃখ ঘুচিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার দুই স্ত্রী ও শিশু পুত্র কণ্ঠা, তাহাদিগকেই বা কে দেখিবে? আমার সংসারভার বহন করিব কিরূপে? এই চিন্তার মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের এই নব আন্দোলন আমাকে ঘেরিয়া লইতে লাগিল; আমার ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ করিতে লাগিল; আমি স্কুলের কাজেও ভাল করিয়া মন দিতে অসমর্থ হইতে লাগিলাম। কি করি কি করি, এই চিন্তাতে মন পূর্ণ হইয়া গেল। আমি আর ভাল করিয়া আহাৰ করিতে পারি না, বা ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতে পারি না। এই উদ্বেগের মধ্যে হজমশক্তি ধারাপ হইয়া শরীর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

অবশেষে আমার চিরদিনের বিপদের বন্ধ যে ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা, তাহার শরণাপন্ন হইলাম। জীবনের প্রধান প্রধান সঙ্কটে ব্যাকুল প্রার্থনা আমার জন্ত আলোক আনয়ন করে, আমি ঈশ্বরের বাণী শুনি। একদিন বড় ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিলাম। সে প্রার্থনার মর্ম্ম এই :—“নিষিদ্ধ প্রণয়ে আসক্তা, নারী যেমন তাহার প্রেমাস্পদের, জন্ত পিতা মাতা গৃহ পরিবার আত্মীয়স্বজন সকল ছাড়িয়াও পথের সন্মুখ বসিয়া আপনার অলঙ্কারের বাক্সটি সঙ্গে লয়, কিন্তু আবশ্যক

চলে তাহাও পথে ফেলিয়া চলিয়া যায়, তেমনি আমি সকল ছাড়িয়াও
 'যেটা ধরিয়া আছি, হে ভগবান, আবশ্যক হইলে সেটাও ছাড়াইয়া
 আমাকে লইয়া যাও।' এই প্রার্থনার পর আমার মনে এক অদ্ভুত
 পরিবর্তন ঘটিল; ভয় ভাবনা যেন কোথায় চলিয়া গেল। অন্তর
 হহতে "ছাড়" "ছাড়" বাণী আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল।
 বন্ধুগণের অনেকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি আর বিলম্ব
 করিতে পারি না। একটা দিন যায় যেন এক বৎসর যায়! মার্চের
 শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে হেয়ার স্কুলেব নিয়মানুসারে সে বৎসরের
 বোনাস্ (Bonus) স্বরূপে স্কলফণ্ড হইতে দুইশত কি তিনশত টাকা
 পাইতে পারিতাম, শিক্ষক বন্ধুগণ সেজন্ত বারবার অপেক্ষা করিতে
 বলিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরের বাণী অপেক্ষা করিতে দিল না। ১৫ই
 ফ্রেব্রুয়ারি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরেব হস্তে পদত্যাগপত্র দিয়া
 নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ১লা মার্চ হইতে স্বাধীন হইয়া এই
 আন্দোলনে ডুবিলাম। আমার পদত্যাগ পত্র পাইয়া প্রেসিডেন্সি
 কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ও ডিরেক্টার সাহেব আমাকে ডাকাইয়া
 সে পত্র ফিরাইয়া লইবার জন্ত অনেক বলিলেন, কিন্তু আমি কোন
 অহরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। বন্ধুরা যদি জিজ্ঞাসা করিতেন,
 "কিভাবে চলবে?" আমি বলিতাম, "কিছুই জানি না। আর থাকতে
 পাবছি না।"

তদবধি ঈশ্বর আমার ভার সুযুচিতরূপে বহন করিয়া আসিতেছেন।
 আমি তাঁহার করুণার কথা আর কি বলিব! তিনি যে কিরূপে
 আমার সকল অভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যাবত
 হইতে হয়। যে-সকল অভাব আমার কল্পনারও অতীত ছিল, তাহাও
 তিনি পূরণ করিবার উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধন্য তাঁর কৃপা!

"সমালোচক" ও "জ্ঞান গম্বলিক ওপিনিয়ন",—এদিকে

আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্য ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে “সমালোচক” নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ, ও ২১শে মার্চ হইতে “ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়ন” নামক এক ইংরাজি কাগজ বাহির করিলাম। দুর্গামোহন বাবু ও আনন্দমোহন বাবু উক্ত উভয় কাগজের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্গামোহন বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনমোহন দাস মহাশয় ইংরাজি কাগজের এবং আমি বাংলা কাগজের সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চাৰিদিকের ব্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল।

“ব্রাহ্মসমাজ কমিটি”।—এই-সকল মতামত ও সংবাদ প্রচার হওয়ায় কলিকাতাতে ও অপবাপর স্থানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন পাকিয়া দাঁড়াইল। আমরা গভীর চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। আমাদের বন্ধু-গোষ্ঠীতে এই পরামর্শ স্থির হইল যে এই মহা বাত্যার মধ্যে কাণ্ডাবীর কাজ করিবার জন্য সমাজের বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া “ব্রাহ্মসমাজ কমিটি” নামে একটি কমিটি নিয়োগ করা ভাল। তাঁহারা লোকের ভাব অবগত হইবেন, তাঁহারা কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন, তাঁহারা আন্দোলনকে চালাইবেন। এই কমিটি নিয়োগের মানসে আমরা মীটিং করিবার জন্য কেশব বাবুর নিকট ২৩শে ফেব্রুয়ারী এলবার্ট হল চাহিলাম, কারণ তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অস্বীকার দিলেন; কিন্তু আমরা মীটিং করিতে গিয়া দেখি, যে গ্যাস আলিবার জ্বলম্ব নাহি। কারণ শোনা গেল যে এলবার্ট হল ব্যবহার করিতে চাওয়াতে কেশব বাবু তাহার সম্পাদকরূপে সভা করিবার অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু গ্যাসের আলো ব্যবহার করিবার অধিকার না চাওয়াতে তাহা দেন নাহি। ইহা লইয়া মহা বিব্রাট উপস্থিত হইল। শত শত ভক্তলোক, বহুদূর অরণ্য হইয়া কতিপয় নারীও তার মধ্যে ছিলেন। সভাস্থলে সমাগত লোকেরা অন্ধকারে বসিবার স্থান নির্দেশ করিতে পারেন না। সকলের উদ্বেগজনক ভাব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাজার হইতে বাতি

কিনিয়া আনা হইল। কিন্তু অপর পক্ষীয় কতকগুলি যুবক এত চীৎকার ও গালাগালি করিতে লাগিল যে, মীটিং করিতে পারা গেল না। তৎপরে ২৮শে ফেব্রুয়ারী টাউন হলে ব্রাহ্মদের মীটিং করিয়া “ব্রাহ্মসমাজ কমিটি” নিয়োগ করা হয়।

এহ “ব্রাহ্মসমাজ কমিটি”র নিয়োগ সম্বন্ধে একটা কথা স্মরণ আছে। ‘রজোলিউশনটা’ লিখবার সময় কোনও কোনও বন্ধু এমন কঠিন ভাষা ব্যবহার করিতে চাহিলেন, যাহা ব্যবহার কবাব পর, আর কেশব বাবুর গাঠও একত্র থাকা সম্ভব নহ্ন। আমি ও আনন্দমোহন বাবু তাহাতে অস্বস্তিও করিয়া বলিলাম, “আমরা এখনও এমন কথা বলিতে পারি না যে কেশব বাবুকে ছাড়িবই, সুতরাং এমন কথা লেখা হইবে না যাহাতে আমাদেরকে ছাড়িতে বাধ্য করে।” আমাদের আপত্তিতে ভাষাটা নরম করিয়া দেওয়া হইল।

এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমাব হাত হইতে সমালোচক” তুলিয়া লইয়া দ্বারি বাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে মগ্নবশণ করিতে লাগিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, সে সময়ে দেবী-গঙ্গা বার চৌধুরী ৯৩ কলেজ ষ্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তিনি গাবকানাথ গাঙ্গুলির সহিত একযোগে সমালোচকের ভার লইলেন।

কম্পাসহ কেশবচন্দ্রের কুচবিহাব গমন।—কেশব বাবু ব্রাহ্মগণের গণ ও বাদের প্রতি দৃকপাতও না করিয়া কম্পা লইয়া কুচবিহারে বিবাহ দিতে গেলেন। কুচবিহারে আমাদের লোক ছিল, তাঁহার নিকট হইতে আমরা সমুদয় ভিতরকার সংবাদ পাইতে লাগিলাম, এবং সমালোচকে “সারস পাখীর উক্তি” বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলাম। সংবাদ পাওয়া গেল, প্রথম, কেশব বাবু কম্পা সম্ভ্রদান করিতে পাইলেন না; দ্বিতীয়, বিবাহে রাজপুত্রোহিত ব্রাহ্মগণ পৌরোহিত্য করিলেন, পৌরগোবিন্দ দাস উপস্থিত ছিলেন মাত্র, কিছু করিতে পান নাই; তৃতীয়, বিবাহে ব্রাহ্মপাসনা

হইতে পারিল না ; চতুর্থ, বিবাহে অগ্নি জালিয়া হোম হইল, বর সেখানে থাকিলেন, কন্যাকে উঠাইয়া লওয়া হইল ; পঞ্চম, বিবাহস্থলে রাজকুলের প্রথা অনুসারে হরগৌরী নামক ছইটি পদার্থ স্থাপন করা হইল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ঐক্যগণের বহু প্রতিবাদসত্ত্বেও তাহা অন্তর্হিত করা হইল না, ইত্যাদি ।

কেশবচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন । ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মাটিং । — ১৮ই মার্চ কেশব বাবু কন্যার বিবাহ দিয়া ফিরিয়া আসিলেন । সহরে ব্রাহ্মদলে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল । তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন । উক্ত সমাজের মাটিং ডাকিবার জন্য শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ ব্রাহ্মগণের এক আবেদনপত্র (requisition) তাঁহার নিকট গেল । তিনি মাটিং ডাকিতে স্বীকৃত হইলেন না, সে মাটিং ডাকার উপায় রহিল না । তাঁহাকে আচার্য্যের পদ হইতে অপসৃত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর মাটিং ডাকিবার অহুরোধ করিয়া এক আবেদন গেল । কেশব বাবু সে আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না, তদনুসারে মাটিং ডাকা হইল না । কিন্তু আবেদনকারীদের আবেদনের উল্লেখ না করিয়া তিনি নিজের নামে ২১শে মার্চ এক মাটিং ডাকিলেন । যে বিজ্ঞাপনে তাহা ডাকা হইল তাহা অঙ্কুত, Babu Keshub Chunder Sen will propose that Babu Keshub Chunder Sen be deposed । এরূপ অঙ্কুত বিজ্ঞাপনের মর্শ্ব আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না ।

যাহা হউক, যথাসময়ে দলে-বলে আমরা সভাতে উপস্থিত হইলাম । কার্য্যারম্ভেই মহা গোলযোগ উঠিল । সভাপতি হন কে ? — কেশব বাবুর বন্ধুরা তাঁহাকে সভাপতি করিতে চাহিলেন ; আমরা বলিলাম, “তাহা, কিরূপে হয় ? ধার্য্য কার্য্যের বিচার করিবার জন্য মাটিং, তিনি কিরূপে সভাপতি হন ?” আমরা দুর্গামোহন বাবুকে সভাপতি করিতে চাহিলাম,

তাহারা বাজি হইলেন না। কে সভাপতি হইবেন, এই বিচার লইয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। শেষে কেশব বাবু হুগামোহন বাবুকে সভাপতি করিতে বাজি হইলেন। কিন্তু ভোট দিবার সময়, কে সভ্য কে সভ্য নহ, এই বিচার আবাব উঠিল। কেশব বাবুব বন্ধুগণ বিরোধীদের অনেকের স্বক্ষে আপত্তি করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অবশেষে কেশব বাবুর সন্মতিক্রমে হুগামোহন বাবুকে সভাপতি করা হইল। তদনন্তর কেশববাবু নাজুব পদচ্যুতি স্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিলেন। হুগামোহন বাবু সতীকরণে সে প্রস্তাব উত্থাপনের ভাব আমাব প্রতি অর্পণ করিলেন। আমি যেই প্রস্তাব করিতে দাঁড়াইলাম, অমনি কেশববাবু সদলে সভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। এদিকে সেনবংশীয় বালকগণ ও তাহাদের বালক-সঙ্গীত টীংকার ও গোলমাল কবিত্তে লাগিল।

আমরা সেই গোলমালের মধ্যে কয়েকটা নির্দ্ধারণ (resolution) গুলি করিলাম। একটির দ্বারা কেশব বাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে নামান হইল, অপরটির দ্বারা কয়েকজন আচার্য্য নিয়োগ করা হইল।

কেশবচন্দ্র বলপূর্বক মন্দির অধিকার করিলেন।—এই গেল ১৮৭৮ চন্দ্রবাবরে। পরবর্ত্তী ববিবারে ২৪শে মার্চ সংবাদ আসিল যে কেশব বাবু মন্দিরের দ্বারে চাবি দিয়াছেন, এবং মন্দির রক্ষার জন্য কয়েকজন অহুচরকে নিয়োগ স্থাপন করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ভায়া আমাব নিকট আসিয়া উপস্থিত, “চলুন, আমরাও ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে তালা চাবি দিয়া আসি। মন্দির ত আমাদেরও, কারণ সকলে মিলিয়া টাকা দিয়াছি, কেশব বাবু একলা কেন বলপূর্বক অধিকার করিবেন?” আমি এসব বিবাদে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, তিনি অপর দুইজন বন্ধুকে লইয়া তালাচাবি দিতে গেলেন।

সেই তালাচাবি দেওয়ার ব্যাপার এক কৌতুককর ঘটনা। দ্বারকানাথ

গাঙ্গুলি ও দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী তালাচাবি লইয়া গেটে উপস্থিত হইয়া দেখেন তাহাতে তালাচাবি লাগান আছে, এবং ভিতরে কেশব বাবুর কয়েকজন অনুগত শিষ্য রহিয়াছেন। ইহারা গিয়া গেটের নিকট দাঁড়াইবামাত্র তাঁহারা ছুটিয়া অপরদিকে আসিলেন। তর্ক বিতর্ক ও বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। ইহারা বাগলেন, “মন্দির তো কেবল আপনাদের নয়, আমাদেরও। আপনারা কেন বলপূর্ব্বক অধিকার করিবেন? আপনারা ভিতরে চাবি দিয়াছেন, আমরা বাহিরে দিব।” এই বলিয়া দ্বাবি বাবু ও দেবীপ্রসন্ন বাবু চাবি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশব বাবুর বন্ধগণ ভিতর হইতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাত ঠেলাঠেলি, ধরাধরি, হুড়াহুড়ি চলিল। এই টানাটানির অবস্থাতে ভিতরকার কেশব-শিষ্যগণের একজনের হাতে বোধ হয় গেটের লোহার রেলের আঘাত লাগিয়া থাকিবে। বাহিরে কথা উঠিল, প্রতিবাদীরা হাতে কামড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। হহা লইয়া হাসাহাসি ও সংবাদপত্রে কিছুদিন ঠাট্টা তামাসা চলিয়াছিল।

এই সংবাদ সহরে ছড়াইয়া পড়তে সহদিন বৈকালে মন্দিরের দ্বারে সহরের লোক জড় হইল। আমাদের পক্ষীয় বন্ধুরা আবাব সন্ধার সময় সাজিয়া গুজিয়া আপনাদের নিযুক্ত আচার্য্য রামকুমার বিজ্ঞারত্নকে সঙ্গে লইয়া বেদী অধিকার করিবার জগ্ন গেলেন। আমাদের সঙ্গে যাইবার জগ্ন বিশেষ অনুরোধ করাতেও আমি গেলাম না। ব্রহ্মোপাসনার অধিকার স্থাপন করিতে বাগ্ম্য আমার ভাল লাগিল না। বন্ধুরা গিয়া দেখেন, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত অপরায় ৪টা হইতে বেদী অধিকার করিয়া বসিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহারা স্থিরভাবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে উপাসনার ঘণ্টা বাজিল, অঘোর বাবু নামিতেছেন, ওদিকে বিজ্ঞারত্ন ভায়া অগ্রসর হইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাছা ধরিল টানিয়া রাখিল। ওদিকে কেশববাবু

পুলিশ-বেষ্টিত হইয়া আসিয়া বেদী অধিকার করিলেন। অমনি প্রতিবাদীর দল, প্রায় ৭০।৮০ জন, মন্দির ত্যাগ করিয়া আসিলেন। আমি তখন মন্দিরের পার্শ্বে আমার পরিচিত এক বন্ধু ডাক্তার উপেক্ষনাথ বস্তব বাড়ীতে কি হয় জানিবাব জগ্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, লজ্জা ও সঙ্কটবশতঃ প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে যাই নাই। প্রতিবাদীর দল মন্দির হইতে গাড়িত হইয়া ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া আমি ব্রহ্মোপাসনা করিলাম।

এই আমাদের স্বতন্ত্র উপাসনা আরম্ভ হইল, উপাসনান্তে প্রতিবাদকারী দল আবার মন্দিরে অধিকার স্থাপন করিতে গেলেন। আমি সে সঙ্গে গেলাম না। গুনিলাম কেশব বাবুর উপাসনা এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার উপাসনা শেষ হইবামাত্র প্রতিবাদকারী দল নীচে বাসগ্রহ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। যেহ তাঁহাদের সঙ্গীত আরম্ভ হওয়া, অমনি উমানাথ গুপ্ত প্রভৃতি কেশব বাবুর কন্ঠকজন অল্পগত শিষ্য “দয়াল বল জুড়াক্ হিয়া রে” বলিয়া চোঁচাইতে চোঁচাইতে ও খোল করতালের ধ্বনি করিতে করিতে ধাবিত হইয়া আসিলেন, এবং অপর পক্ষের সঙ্গীত চাপা দিয়া ফেলিলেন। পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কালীনাথ বসু নদলে আসিয়া প্রতিবাদকারী দলের মানুষদিগকে বাহিয়া বাহিয়া ধরিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন। এই ঘটনা এমন শোচনীয় হইয়াছিল যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় যত্ননাথ চক্রবর্তী মহাশয় এক কোণে চক্ষু মুদ্রিয়া উপাসনার ভাবে ছিলেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে দেখাইয়া পুলিশকে বলিলেন, “এই একটা বদমায়েস”; তাঁহাকে দ্বারদ্বা বাহির করা হইল।

স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপনের পরামর্শ।—ইহার পরে পত্র চালাচালিতে কিছুদিন গেল। ওদিকে ব্রাহ্মসমাজ কমিটি সমুদয় বিবরণ দিয়া কলিকাতার ও মফঃসেলের ব্রাহ্মগণের আভিপ্রায় জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অধিকাংশই স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে পরবর্তী ২২ জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) দিবসে টাউন হলে ব্রাহ্মদিগের সভা ডাকিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।

দলাদলির অঙ্কতা।—এই বিবাদেব বিষয় ভাবিতেও ক্লেশ, লিখিতেও ক্লেশ, কিন্তু বিবাদটা যখন ব্রাহ্মসমাজেব ইতিবৃত্তেব অঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তখন সে বিষয়ে যতটা স্মরণ হয়, লিখিয়া রাখা ভাল বলিয়া লিখিলাম। দলাদলিতে মানুষকে কিরূপ অন্ধ কবে তাহা দেখাইবাব জন্ত একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি।

এই গোলমালের মধ্যে আমাদের দলে যিনি যিনি লেখনী ধারণ করিতে জানিতেন, তাহাবা সকলেই কেশব বাবুর বিকক্ষে লেখনী ধারণ করিতে লাগিলেন। আমি “এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?” নাম দিয়া এক পুস্তিকা লিখিলাম। পুরোহিত ঘননিবিষ্ট মণ্ডলীর সভ্য বজ্রবোগিনী নিবাসী আনন্দচন্দ্র মিত্র স্বকাব বলিয়া সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি এই সময়ে বুঢ়াচংগার বিতাব বিবাহেব প্রতিবাদ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিলেন। এ সংবাদ আমরা জানিতাম না, তাহা যে আমাব বন্ধু কেদারনাথ বায়েব প্রেসে ছাপা হইতেছে তাহাও জানিতাম না। যখন বাহির হইল, তখন একখানা আমার হাতে পড়িল। আমি দেখিলাম, তাহাতে অতি লঘুভাবে কেশব বাবুকে ও তাঁহাব দলকে আক্রমণ কব’ হইয়াছে। বিশেষ অপরাধের কথা এই, আচার্য্যপত্নীকে তাহার মধ্যে অনিয়া তাঁহার প্রতিও লঘুভাবে গ্লেশ-বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমি আচার্য্যপত্নীকে মনে মনে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। আমি দেখিয়া জলিয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ আনন্দ মিত্রকে ডাকাইয়া, কেদারকে অভ্যর্থনা করিয়া, ঐ পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করিয়া দিলাম। দিয়া মিত্রার আক্ষিমে গিয়া কেশব বাবুর দলই প্রচারক বন্ধুদিগকে বলিয়া আসিলাম, “যদি ঐ পুস্তিকা তাঁহাদের হাতে

পড়ে, কিছু যেন মনে না করেন। আমরা অগ্রে জানিতাম না, পরে জানিয়া উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছি।”

হায়, হায়, দলাদলিতে মানুষকে কি অন্ধ করে! ইহার পরও তাঁতাবা বিরোধী দলের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিলেন যে, তাহার নাটক লিখিয়া আচার্য্যাপন্থীর প্রতি লঘুভাষা প্রয়োগ করিয়াছে। আবার এষ্ট কথা একরূপ ভাবে লিখিলেন, যেন আমিই ঐ নাটক লিখিয়াছি। তখন আমি লজ্জাতে মরিয়া গেলাম। একরূপ দলাদলির মাথায় ধর্ম টেকে না। আমরা সেই যে ধর্ম হারাইয়াছি, তাহার সাজা এতদিন ভোগ করিতেছি; আর কতদিন ভোগ করিব, ভগবান জানেন। ব্রাহ্মসমাজ এতৎভাবে লোক-সমাজে যে হীন হইয়াছে, তাহা আজিও সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতন আমাদের পাপের শাস্তি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামকরণ, সংগঠন ও নিয়মাবলী প্রণয়ন ।

শ্রুতর শ্রম । তত্ত্বকৌমুদী ও “ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়ন”

সম্পাদন । নিয়মাবলী প্রণয়ন কার্যে আনন্দমোহন

বসুর সাহায্য । প্রচারকপদে বৃত্ত হওয়া ।

বেহারে প্রচার । কলিকাতায় ফিরিয়া

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের জন্ম

অর্থ সংগ্রহ ; মহষির দান ।

(১৮৭৮, মে হইতে ডিসেম্বর)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যে দেহ মন নিয়োগ ।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে যাহা কিছু করিয়াছি তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ । এখন ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে কিরূপে ঈশ্বর এই ঘুলীপাকের মধ্যে আমাকে আনিয়া ফেলিলেন, তাঁহার বাণী আমাকে কিরূপে অধিকার করিল । আমার প্রকৃতিনিহিত দুর্বলতা কতবার আমাকে তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে ও তাঁহার নির্দিষ্ট কাজ হইতে দূরে লইতে চাহিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে দূরে যাইতে দিলেন না । যেন আমার চুলের টিকি ধরিয়া আমাকে বাধিয়া রাখিলেন ।

এরূপ মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াও আমার সুখাসক্ত চিত্ত বহুদিন সুখের প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে নাই ; বারবার আত্মবিস্মৃতির ও ঈশ্বর-বিস্মৃতির মধ্যে পড়িয়া সুখের পশ্চাতে ছুটিয়াছে । বলিতে কি, এই আন্তরিক সংগ্রামের জন্মই আমার দ্বারা যতটা কাজ হইতে পারিত তাহা হইতে পারে নাই । আমি বহুবৎসর যেন ছই হাত দিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে পারি নাই ; এক হস্ত প্রবল প্রবৃত্তিকুলের সহিত

সংগ্রামে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে এবং অপর হাত দিয়া ঈশ্বরের পোষা করিয়াছি। সময় সময় মনে হইয়াছে, আমার মত দুর্বল ব্যক্তির প্রতি প্রধান কার্যের ভার না থাকিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ভাল হইত ; ইহার প্রতি লোকের আরও শ্রদ্ধা জন্মিত।

বাস্তবিক, এতদিন পরে বতই চিন্তা করিতেছি ততই মনে হইতেছে যে, যেকপ গুরুতর কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহার গুরুত্ব যেন বহুদিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই ; সমুচিত দায়িত্বজ্ঞান যেন জাগে নাই। বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে উৎসাহের সহিত নানা কাজে ছুটিয়াছি, ধীর চিন্তে নিজের প্রকৃতির দুর্বলতা লক্ষ্য করিবার ও তদুপরি উঠিবার আয়োজন করিবার সময় পাই নাই ; কাজক্মে অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে নিবিষ্ট চিন্তে ধন্যজীবনের গাঢ়তা ও গভীরতা সাধন করিবার সময় পাই নাই। কতবার মনে করিয়াছি, দূর হোক সরিয়া পড়ি, সকলের পশ্চাতে থাকিয়া উৎসাহ দান দ্বারা কার্য করি ; কিন্তু ঘটনার পর ঘটনার স্রোতে আমাকে টানিয়া সম্মুখে লইয়াছে। ঈশ্বর আমাকে দূরে বা পশ্চাতে যাইতে দেন নাই। সে-সকল কথা আর ভাঙ্গিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। এখন সে-সব সংগ্রাম চলিয়া গিয়াছে। যে প্রবৃত্তিসূর্য মধ্যে মধ্যে আমাকে বেঁটন করিয়া শক্তিশূন্য করিত, ঈশ্বর তাহাকে হত করিয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি বাহ্য করেন তাহাই ভাল ; আমাকে যে এতদিন কঠিন সংগ্রামে রাখিয়াছিলেন, তাহাও মঙ্গলের জন্ত। যে-সকল বলদ পথে চলিতে উভয় পার্শ্বের তৃণ শুষ্ক খাইতে চায়, তাহাদের মুখে চামড়ার ঠুলি দিয়া, চাবুকের উপর চাবুক লাগাইয়া, তাহাদিগকে সোজা পথে চালাইতে হয় ; বিধাতা তেমনি করিয়া আমাকে তাঁহার সেবার পথে আনিয়াছেন ! ধন্য তাঁর মহিমা ! দর্পহারী ভগবান্ আমার দর্প চূর্ণ করিবার জন্তই সময়ে সময়ে আমার হৃৎকল্পিত অভিমানে-মন্দির ভাঙ্গিয়া

ধূলিসাৎ করিয়াছেন, নতুবা আমার দম্ভ-প্রবণ প্রকৃতি অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া থাকিত। তিনি আমাকে কি শিক্ষাই দিয়াছেন! আর একটা কথা। আমি যদি নিজে প্রলুব্ধ না হইতাম, যদি নিজে সংগ্রামের মধ্যে না পড়িতাম, কোন্ পথ দিয়া মানুষ অধঃপাতে যায় তাহার আভাস যদি না পাইতাম, গাল হইলে কি প্রলুব্ধ ও অধঃপতিত নরনারীকে সমবেদনা দিতে পারিতাম? বুদ্ধিমান গৃহস্থ যেমন যে-ছেলেকে কোনও বিষয়ে তদারকাস করিতে চান, তাহাকে সেই বিষয়ের নিয়ম ধাপ হইতে পা পা কবিয়া তুলিয়া থাকেন, তাহার ভ্রম দুঃখ প্রলোভন সমগ্র সমুদয় তাহাকে দেখাইয়া থাকেন, তেমনি মুক্তিদাতা বিধাতা তাঁহাব যে দাসকে অপবেব সাহায্যের জন্ত নিযুক্ত করেন, তাহাকেও ভাল মন্দ দুই দেখাইয়া থাকেন। বিচিত্র তাঁহার বিধাতৃত্ব, ধন্ত তাঁহার করুণা।

সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজেব নামকরণ ও তাহার ফল।—এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেব কথা বলি। প্রথম বক্তব্য, সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ নাম কিরূপে হইল? আমরা যখন স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করি, তখন আমাদের মনে দুইটা ভাব প্রবল ছিল। প্রথম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একনায়কত্ব দেখিয়াছি, কেশব বাবু সর্বোৎকর্ষ, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে কার্য্য হইবে। দ্বিতীয়, কেশব বাবু ব্রাহ্মগণেব ও ব্রাহ্মসমাজ-সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সভ্যগণেব ও সমাজ-সকলের মত গ্রহণ কবিয়া কার্য্য হইবে। আমাদের মনে এই দুইটা প্রধান ভাব ছিল, সুতরাং আমরা সমাজেব নিয়মাবলী প্রণয়নের সময় এই দুইটা বিষয়ই সমাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধানরূপে লিখিয়া দিয়াছিলাম। ধর্ম্মবিষয়ে কোনও নূতন মত, বা ধর্ম্মজীবনের কোনও নূতন আদর্শ যে স্থাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের শক্ত্যহলে ছিল না।

বরং আমাদের ভাব এই ছিল যে, আমবাই ভাববর্মীর ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কার্য্য করিতেছি।

সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজের নামটা যে কেমন কবিয়া উঠিল ঠিক মনে নাই। যতদূর স্মরণ হয়, আমাদের প্রধান ভাবের দ্বোতক বলিয়া, আমাদের উৎসাহী বন্ধু পবলোকগত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই নামটাব উল্লেখ কবিয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবু ভাবতবর্মীর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনকর্ত্তাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। এক্ষণে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন বিষয়ে ও তাঁহার প্রথম নিয়মাবলী নির্ণয় বিষয়ে অনেক সহায়তা কবিয়াছিলেন। এমন কি, এই সময়ে তাঁহার এক পুত্রের নামকরণ হইল, তাহার নাম ‘সাধারণচন্দ্র’ রাখিলেন। নাম শুনিয়া আমবাই হাসিলাম, অপরে হাসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? নামকরণ অনুষ্ঠান হইতে ফিরিবার সময় আমি আনন্দমোহন বাবুর গাডিতে আসিতেছিলাম। ‘সাধাবণচন্দ্র’ নাম লইয়া গাডিতে খুব হাসাহাসি হইতে লাগিল। আনন্দমোহন বাবু বলিলেন, “আমাব ছেলেব নাম দিবার সময়! তাব নাম ‘অনুষ্ঠানপদ্ধতিচন্দ্র’ রাখিব।”

নূতন সমাজের নামটা কি হয়, নামটা কি হয়, আপনাদের মধ্যে কিছুদিন এই আলোচনা করিয়া অবশেষে একদিন কতিপয় বন্ধু মিলিয়া আমরা মহাবির চরণ দর্শন করিতে গেলাম। তিনি তখন চুঁচুড়া সহবে গঙ্গাতীরস্থ এক ভবনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তিনি ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ নামটা শুনিয়া বলিলেন, “বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম ‘আদি’ সমাজ, আমরা কালে আছি। কেশব বাবুর সমাজের নাম ‘ভাবতবর্মীর’ সমাজ, তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশ-কালের অতীত হইয়া যাও।” সেখান হইতে আমরা নূতন সমাজের নাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রাখা স্থির করিয়া আসিলাম। সেই নামই রাখা হইল।

কিন্তু এই নাম রাখিয়া তিন দিকে তিন প্রকার ফল ফলিল। প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের অনেকে এ নাম পছন্দ করিলেন না, তাঁহাদের চক্ষে যেন কেমন হাক্কা হাক্কা বোধ হইতে লাগিল ; ছেলে-ছোকরার ব্যাপার, হট্টগোল, এই ভাব তাঁহাদের মনে আসিতে লাগিল। এই কারণেই বোধ হয়, প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাহারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন আশা করা গিয়াছিল, তাঁহাদের অনেকে তেমন করিয়া যোগ দিলেন না, দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এই নাম লওয়াতে বাহিবেব লোকে মনে করিল, এ সমাজ কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নয়, সাধারণের সম্পত্তি ; এখানে যথেষ্ট ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। এই কারণে বাহিরের লোকেব মধ্যে কেহ মন্দিরের দ্বারে গোলযোগ করিলে বড় তাহাতে বাধা দেওয়া যাইত, তবে তাহারা বলিয়া উঠিত, “এটা যে সাধারণ সমাজ, এখানে আবার বাধা দেও কেন ?” আমরা শুনিয়া হাসিতাম। তৃতীয় ফলটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর। এই নামের প্রভাবে, যাহারা ইহার সভা হইলেন, তাঁহাদের মনে নিবস্তুর এই কথা জাগিতে লাগিল যে, ব্যক্তিগত প্রাধান্তে বাধা দেওয়াই এ সমাজের প্রধান কাজ। কর্মচারীদিগের কাজের সহায়তা করা অপেক্ষা তাঁহাদের কাজের দোষ প্রদর্শন করা ও তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে সংঘত করাই যেন সভ্যদিগের প্রধান কর্তব্য। এই ভাব লইয়া কার্য্যারম্ভ করাতে প্রথম প্রথম কিছু দিন আমাদের পক্ষে কর্মচারী পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বার্ষিক সভাতে কার্য্যাববরণ উপস্থিত হইলে সভাগণ এ ভাবে বসিতেন না যে, অবৈতনিক কর্মচারীগণ যিনি বতটা কাজ করিয়াছেন, সে জন্য ধন্যবাদ করিয়া ভবিষ্যতে আরও ভাল কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; কিন্তু সভাগণ এই ভাবে উৎকর্ষ ও উৎশৃঙ্খল হইয়া বসিতেন যে, কার্য্যবিবরণে কোথায়, কি ভ্রটি আছে তাহা বাহির করিতে হইবে, এবং কোথায় কি ভ্রম প্রমাদ আছে তাহা লইয়া ফাড়াছেঁড়া করিতে হইবে। বহু বৎসরে এই ভাব

অনেক পরিমাণে গিয়াছে। কিন্তু সেই উৎকর্ণ ও উৎশৃঙ্গ ভাব, সেই ব্যক্তিগত শক্তির নামে দ্রাস, সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক, সেই কার্যে একতা অপেক্ষা প্রতিবাদ-পরায়ণতার ভাব এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাব বলিলে সভ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ দোষ-প্রদর্শনেচ্ছা প্রভৃতি বুঝায়। ইহা অনেক পরিমাণে ঐ নাম গ্রহণের ফল বলিয়া বোধ হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যে গুরুতর শ্রম।—অগ্রেই বলিয়াছি*

আমি যখন কৰ্ম্ম ছাড়ি, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হয় নাই; সবে আন্দোলন উঠিতেছে। আন্দোলনটা একটা উপলক্ষ্য হইল বটে, কিন্তু আন্দোলন না উঠিলেও আমি কৰ্ম্ম ছাড়িতাম; সেজন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা এই দুই কৰ্ম্মে আপনাকে দিব এই উদ্দেশ্যেই কৰ্ম্ম ছাড়িয়াছিলাম। কিন্তু কৰ্ম্ম ছাড়িয়াও যদি কাহারও উপরে ভারস্বরূপ না হওয়া যায় তাহাই ভাল,—এটাও মনের ভাব ছিল। এই জন্ত স্থির করিয়াছিলাম যে কলিকাতার “ছাত্রদিগের” জন্ত সংস্কৃত পাঠনার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুলিব। মাসে দুই টাকা করিয়া বেতন লইব। ৩০।৪০ জন ছাত্র জুটিলেই আমার আবশ্যিক মত ব্যয় চলিয়া যাইবে। আমি অবশিষ্ট সময় ব্রাহ্মসমাজের কাজে দিব। অপরাপর কাজের মধ্যে ছাত্রদের জন্ত একটা সমাজ স্থাপন করিব। এইরূপ কল্পনা করিয়াই কৰ্ম্ম ছাড়িয়াছিলাম। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার পর এত কাজ বাড়িয়া গেল যে, ছাত্রদের জন্ত রাড্রে সংস্কৃত পড়িবার বন্দোবস্ত করা আর সম্ভব হইল না; তাহাদের জন্ত একটা সমাজ স্থাপন অবশিষ্ট রহিল; তাহা ১৮৭৯ সালে করা হইয়াছিল।†

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলেই নানা কারণে আমার শ্রম অতিশয় বাড়িয়া গেল। প্রথমতঃ, ইহার অগ্রণী ব্যক্তিগণ ইহার নিয়মাবলী প্রণয়নে ও মফঃসল সমাজসকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যস্ত হইলেন। এ কাজে তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ণমানায় থাকিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, ইংবাজী সাপ্তাহিক পত্র “বান্ধ পব্লিক ওপিনিয়নেব” বান্ধধন্য ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিবার ও সহকাৰী সম্পাদকতা কবিবাব এবং “তত্ত্বকৌমুদী” পত্রিকার সমগ্র সম্পাদকতা কবিবাব ভাব লইতে হইত।

“তত্ত্বকৌমুদী” প্রকাশ ও পবিচালন।—এই “তত্ত্বকৌমুদীর” প্রকাশ ও পরিচালনের ভাব আমাব উপবেই পড়িয়াছিল। আমরা কয়েকমাস পূর্বে “সমালোচক” নামে যে কাগজ বাহির করিয়াছিলাম, এবং বাহা বন্ধুগণ আমার হাত হইত কাড়িয়া লইয়া বন্ধুবব দ্বারকা-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছিলেন, * তাহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ হইল না। সে নামটা ভাল লাগিল না, এবং যে ভাবে তাহা চলিতেছে তাহাবও পরিবর্তন আবশ্যক বোধ হইল। তাই তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন বান্ধবকে দিয়া, আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নূতন কাগজ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নূতন কাগজের নাম কি হয়, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, মহাত্মা বাজা রামমোহন রায় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল “কৌমুদী”, আদিসমাজেব কাগজের নাম “তত্ত্ববোধিনী”, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেব কাগজেব নাম “ধর্মতত্ত্ব”। শেষোক্ত দুই কাগজ হইতে “তত্ত্ব” এবং বাজা রামমোহন রায়ের “কৌমুদী” লইয়া আমাদের কাগজেব নাম হউক “তত্ত্বকৌমুদী”। আমার মনের ভাব ছিল যে রাজা রামমোহন রায়ের সমগ্র হইতে যে

আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহাধর্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে তত্ত্বকৌমুদী তাহাই প্রচার করিবে। ১৮৭৮ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে) তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

অনেক দিন এরূপ হইত, তত্ত্বকৌমুদীর প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহায্য করিবার কাহাকেও পাইতাম না। এক এক দিন এমন হইয়াছে, দুই পত্রিকা একদিনে বাহির হইবাব কথা। প্রত্যুষে স্নান ও উপাসনান্তে প্রেসে বসিয়াছি। ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়নের কাজ সারিয়া তত্ত্বকৌমুদীর কাজ, তত্ত্বকৌমুদীর সে কাজ সারিয়া ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়নের কাজ, এইরূপ সমস্ত দিন চলিয়াছে। মধ্যে এক ঘণ্টা আহার করিয়া লইয়াছি। কাজ সারিয়া রাত্রি দশটাতে শয্যাতে ঘাইবার কথা, কিন্তু তখনই হয় ত নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটিতে গিয়া বসিতে হইল। এক দিনের কথা স্বরণ আছে, যে-দিন প্রাতে ৬টার সময় বসিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত একদিনে এক পুস্তিকা রচনা করিলাম, তাহার নাম “এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ?”

নিয়মাবলী প্রণয়ন। আনন্দমোহন বসু।—ওদিকে প্রথম নিয়মাবলী প্রণয়নের ব্যাপার এক মহা শ্রমসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিল। এক আনন্দমোহন বসু ব্যতীত আমরা আর সকলেই নিয়মতন্ত্রপ্রণালী বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলাম। তিনিই এ বিষয়ে আমাদের সারথি হইলেন; তাঁহার ভবনে নিয়মাবলী-প্রণয়ন কমিটির অধিকাংশ অধিবেশন হইত। সে-সকল অধিবেশনে চিন্তারও শেষ ছিল না, তর্কেরও শেষ ছিল না। কিরূপে নিয়মপ্রণালী সর্বোৎকৃষ্ট হইবে, কিরূপে অতীত কালের ভ্রম প্রমাদ আর না ঘটে, কিরূপে ব্রাহ্মগণের মধ্যে একতা স্থাপিত হয়, কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্যে আবার শক্তি সঞ্চার হয়, এই-সকল চিন্তা সকলেরই মনে প্রবল থাকিত। তৎপরে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি বঙ্গসংসদ সমাজসকলে প্রেরিত হইয়া চারিদিক হইতে প্রস্তাবসকল

আসিতে লাগিল। সেই সকলের বিচারের জন্য দিনের পর দিন কমিটির অধিবেশন হইতে লাগিল। আমি হাসিয়া আনন্দ মোহন বাবুকে বলিতাম,—“এ কমিটি তো ‘কমিটি’ রৈল না, এ যে ‘বেশী’টি হয়ে গেল।”

একদিনের কথা মনে আছে। সে দিন প্রাতে ৬টা হইতে অপরাহ্ন ৬টা পর্য্যন্ত আমি ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়ন ও তত্ত্বকৌমুদীর কাজে মগ্ন আছি, সন্ধ্যার সময় আনন্দমোহন বাবুর পত্র আসিল যে সেইদিন নিয়ম-প্রণয়ন কমিটিতে আমার থাকা চাই। তদুত্তরে আমি লিখিতাম যে “আমাকে বাদ দিয়া কাজ করুন; আমি প্রাতঃকাল ৬টা হইতে এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজে মগ্ন আছি।” তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, আমাকে যাইতেই হইবে, রাত্রিকালের আহার ও শয়ন তাঁহার গৃহেই হইবে। সেখানে গিয়া আহার করিয়া আমরা ৯টাের সময় নিয়ম-প্রণয়ন কার্যে নিযুক্ত হইলাম। নিয়মাবলীর বিচার করিতে করিতে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। আমি আর বসিতে পারি না, নিদ্রাতে চক্ষুর্দ্বয় অভিভূত হইয়া আসিতেছে। অবশেষে বন্ধুদিগকে প্রত্ন-বিশেষের বিচারে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া আমি অজ্ঞাতসারে আনন্দমোহন বাবুর ডিনার টেবিলের নীচে নামিয়া পড়িলাম, ও ম্যাটিঙের উপর শুইয়া শুইয়া নিদ্রিত হইলাম। প্রায় ৩টা রাত্রির সময় আমার অনুপস্থিতি তাঁহাদের লক্ষ্যস্থলে পড়িল। তখন আমার অবেষণ আরম্ভ হইল। আমি কিছুই জানি না, অধোরে ঘুমাইতেছি। অবশেষে আনন্দমোহন বাবু টেবিলের নীচে উকি মারিয়া দেখেন, আমি ঘুমাতেছি। তখন মহা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তখন তিনি আমার দুই ঠ্যাং ধরিয়া টানি/ আমাকে বাহির করলেন, এবং উঠিয়া চলিয়া চক্ষে জল দিয়া।

সূতর প্রস্তাব শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

এখানে আনন্দমোহন বহু মহাশয়ের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।



স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন ও ইহাব কার্যপ্রণালী নির্দেশ বিষয়ে
 •নি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
 সভাগণ যে তাঁহাকে প্রথম সভাপতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা
 স্মরণীয় হইয়াছিল। তিনি এ সময়ে সারাণা না হইলে আমরা
 •কি কবিতা তুলিয়াছি, তাহা কবিতা হইতে পারিতাম না। তিনি
 •সময় কি পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা আমরা দোষিয়াছিলেন,
 •তাহা কখনও ভুলিবেন না। বলিতে কি, তিনি এই সময় ছিলেন
 •সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মস্তিষ্ক, আর আমি ছিলাম দক্ষিণ হস্ত।
 •এমন পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করিতাম, তাহাই আমি কার্যে
 •পরিণত। তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, ১৮৭৪ সালে তাঁহাব
 •১০ হইতে প্রত্যগমনের দিন অবধি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমি
 •এমন কিছু করি নাই, যাহা তাঁহাব সহিত পবামশ কবিতা করি নাই,
 •অথবা তিনি এমন কিছু কবেন নাহ, যাহা আমার সহিত পরামর্শ
 •কবিতা করেন নাই। এই অবিচ্ছিন্ন যোগ, এই অকৃত্রিম মিত্রতা
 •চবাবন বিজ্ঞমান ছিল। আমি কত রাত্রি তাঁহার ভবনে যাপন
 •কিয়াছি, শেষ রাত্রি পর্যন্ত কেবল ব্রাহ্মসমাজের কাজের কথা। অবশেষে
 •১০ দুইটা বা তিনটার সময় তাঁহার গৃহিণী তাড়া খাইয়া দুইজনে
 •২৫৩ গিয়াছি। আনন্দমোহন বাবু মীটিংএ আসিতেছেন শুনিলেই
 •আমাদের ভয় হইত, আজ আর রাত্রি দুইটার পূর্বে মীটিং ভাঙ্গিবে
 •না, কাজেবও অন্ত থাকিবে না, কথারও অন্ত থাকিবে না, নিজেও
 •উঠিবেন না, আমাদেরকেও উঠিতে দিবেন না। বাস্তবিক তাঁহার
 •হাত ছাড়াইয়া কেহ উঠিতে পারিতেন না, কেহ উঠিতে চাহিলেই
 •তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া দুই হাত দিয়া ধরিয়া তাঁহাকে জোরে
 •বসাইয়া দিতেন, বলিতেন,—“আব একটু বসুন, এইবার সকলে
 •উঠবে।” সেই যে বসি, আবার দুই তিন ঘণ্টার ব্যাপার। তাঁহার

গৃহিণীৰ মুখে শুনিতাম, এই সময় তিনি মাম্বা মোকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখিলেই বলিতেন, “এগুলো যেন কাগসাপ, দেখলেই ভয় হয়। পেটের দায়ে ব্যারিষ্টারি কবা।” হাইকোর্টেব এটর্নির। আমাকে বলিতেন, “ভায়রে। এমন শক্তি থেবে ও কাজে তেমন হলো না। বোস্ একবাব বলুন যে, তিনি স্মি হয় সহবে থাকবেন, আমবা তাঁর ফাষ্ট্ প্রাক্টিস্ কবে দিচ্ছি।” স্মজ মহাশয় সে দিকে মন দাতেন না। তিনি মফঃসলে গিয়া কিছু অধিক উপার্জন কবিয়া আনিয়া বসিতেন, যেন ব্রাহ্মসমাজেব কাজ কবিবাব সময় পান। এই তাঁর কার্যেব বীতি ছিল। কতবাব ইচ্ছা কবিয়াছেন যে, অনন্যকম্মা হইয়া দেশেব হিত সাধনে লাগেন, কেবল রহৎ পবিবাবেব পালন চিন্তাতে পাবিয়া উঠিতেন না। এমন অকৃদিম বিনয়, এমন বিনয় ঈশ্ববপ্রীতি, এমন অকপট স্বদেশানুরাগ, এমন স্বজনপ্রেম, এমন কর্তবানিষ্ঠা আমি মানুষে অল্পই দেখিয়াছি। বড় সৌভাগ্য, ভগবানের বড় রূপা, যে, এমন মানুষকে বন্ধু রূপে পাইয়াছিলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার পব কয়েক মাস ইহার কার্যের ব্যবস্থা কবিতে গেল। প্রথম নিয়মাবলী প্রণয়ন, সকল সমাজে তাহার পাণ্ডুলিপি প্রেরণ, সকলেব মতসংগ্রহ ও তাহার বিচার, একটী মুদ্রায়ন্ত্র স্থাপন, সমাজেব পত্রিকা-পুস্তকাদির মুদ্রণ ও প্রচার, ইত্যাদি কার্যে আমাকে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতে হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রচারক দল।—এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইলে অবশেষে সমাজের কমিটি ব্রাহ্মদ্বয় প্রচার কার্যে মন দিবার সময় পাইলেন। চারি ব্যক্তিকে আপনাদের প্রধান প্রচারকরূপে মনোনীত কবিলেন। সে চারি ব্যক্তি এই—(১ম) পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, (২য়) পণ্ডিত রামকুমার বিহারদ্ব, (৩য়) বাবু গণেশচন্দ্র বোষ, (৪র্থ) আমি।

ইহার মধ্যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সর্বসাধারণের নিকট



স্বর্গীয় বিজয়রক্ষ গোস্বামী

সুপরিচিত। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি সংস্কৃত-কলেজে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, এবং আমাকে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে তিনি এক প্রধান কাৰণ ছিলেন। নরপূজার প্রতিবাদের পর কেশব বাবুর সহিত পুনর্মিলিত হইয়া তিনি আবার প্রচারকার্যে রত হইয়াছিলেন। ১৮৭১।৭২ সালে ভারত-সংস্কার সভা ও তদধীনে দাতব্য বিভাগ ও বয়স্থা মহিলা বিদ্যালয় ও ভারতশ্রম স্থাপিত হইলে, তিনি স্বাস্থ্যকে বাধ্য জ্ঞান না করিয়া বয়স্থা-বিদ্যালয়ের পাঠনা কার্যে ও বেহালা নামক গামেন ম্যালেরিয়া-প্রসীড়িত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে দাতব্য ঔষধ বিতরণ কর্ত্তা প্রধানরূপে আপনাকে নিযুক্ত করেন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গান ও উপাসনান্তে ঔষধাদি লইয়া ছয় সাত মাইল উত্তীর্ণ হইয়া বেহালা-গামে ঔষধাদি বিতরণ করিতে যাইতেন। সেখান হইতে দ্বিপ্রহর .২টা কি ১টার সময় আসিয়া আগার করিতেন; আহারাভ্যন্তে ২টার পর বয়স্থা-বিদ্যালয়ে পাঠনা কার্যে রত হইতেন। তৎপরে অনেক দিন দেখিতাম, রাত্রে মেয়েদের জন্ত পুস্তক রচনাতে প্রবৃত্ত হইতেন। আমি বার বার সতর্ক করিতাম, তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। একরূপ শ্রম আর কতদিন নয়? একদিন বুকে একপ্রকার বেদনা হইয়া গৌসাইজী অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই বৃকের ব্যথা থাকিয়া গেল। তাহা নিবারণের জন্ত বহুমাত্রাতে মর্ফিন্স সেবন ভিন্ন উপায় রহিল না। এ জন্য, অতিরিক্ত মাত্রাতে মর্ফিন্স সেবন করা গৌসাইজীর অভ্যস্ত হইয়া গেল। সেই মর্ফিন্সের মাত্রা ক্রমে অসম্ভব রূপে বাড়িয়াছিল। ইহার পরে গৌসাইজী বাঘআঁচড়া গ্রামকে তাঁহার প্রধান কার্যক্ষেত্র করিয়া সেখানে অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। বাঘআঁচড়া হইতেই তিনি কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তদনন্তর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনকর্ত্তাদিগের সহিত তাঁহার যোগ হয়। তিনি আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইলেন।

বিভারত্ব ভায়া পূর্ব হইতেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে আসিলেন না। তাঁহার-স্বপ্তর একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, এবং বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন। তিনি বোধ হয় বালিকা কন্তাকে ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গে আসিতে দিলেন না। যে কারণেই হউক, তাঁহার পত্নী জ্ঞানদা অনেক বৎসর আমাদের কাছে আসেন নাই। সুতরাং বিভারত্ব ভায়া নিজ স্বপ্তরের গ্রাম স্বাধীনভাবে নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সমদর্শীদের সহিত কেশব বাবুর দলের মিশ খাইতেছে না দেখিয়া তিনি আর সে দিকে ঘেঁসিলেন না, স্বাধীন ভাবেই কার্য্য করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন ও তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে, তিনি ইহার উৎসাহী প্রচারকদিগের মধ্যে একজন হইলেন, সুতরাং তাঁহাকেও মনোনীত করা হইল।

বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ ইতিপূর্বে আসামে বিষয়কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। এই সময় বিষয়কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে মুন্সের সহরে আমার পরিবারগণের সহিত বাস করিতেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে, তাঁহারও প্রচারকদলে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনিও মনোনীত হইলেন।

বেহার প্রদেশে প্রচার যাত্রা।—প্রচারকপদে মনোনীত হইয়াই আমরা নানাদিকে প্রচার-কার্য্যার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম। ২৪শে মে ১৮৭৯ তারিখে আমি বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে যাত্রা করি। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী তখন সন্তানদিগকে লইয়া মুন্সেরে বাস করিতেছিলেন, আমি প্রথমে সেখানে গেলাম। সেখানে দ্বারকানাথ বাগচী নামে একজন স্থায়ক ব্রাহ্মবক্তা ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তিনি আমার অনুমোদনে বিষয়কর্ম্ম হইতে ছুটি লইয়া আমার

সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। আমরা সে বারে কোন্ কোন্ স্থানে কি কি বিশেষ কাজ করি, তাহার সকল স্মরণ নাই। বোধ হয়, অন্যান্য স্থানের মধ্যে উত্তর বেহারের নেপাল-প্রান্তবর্তী মতিহারী সহরে গিয়াছিলাম। তখন মতিহারী যাইবার রেল ছিল না। মজঃফরপুর হইতে ৫০ মাইল একা চড়িয়া যাইতে হইত। এই আমার পথম একা গাড়িতে চড়া। দেখিলাম, এই একা গাড়ি এক অদ্ভুত ধান। একটা ঘোড়াতে টানে, চালকের পশ্চাতে আরোহীর বসিবার আসন, সে একজন যোগ্য আসন, দুইজনের ভাল স্থান-সমাবেশ হয় না; আসনের উপরে ঠাকুর-চৌকিব চূড়াব ত্রায় একটু আচ্ছাদন, তাহাতে ৬ল বৃষ্টি বোদ্ধ ভালরূপ বাধণ হয় না। চাকাতে স্প্রিং নাই, খটাখট ৭৪ ও পড়ে; অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে কোমরে ব্যথা হয়, ছুটিলে চাকার শব্দে ৯৭ বধিরপ্রায় হয়। তাহার উপরে আবার অনেক গাড়িতে দুই চাকাতেই করতাল বাধা থাকে, চাকার খড়খড়ানি ও করতালের ধমধমানিতে আব কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না। গাড়িতে চড়িয়া মনে হইল, কবতাল বাধিয়া ভালই করিয়াছে, আরোহী যে বাপু-রে মা-রে করিবে, তাহা চালক শুনিতে পাইবে না, তার গাড়ি চালানর ব্যাপাত হইবে না।

এই একা গাড়িতে প্রথম দিন কিয়দূর গিয়া অচেতনপ্রায় এক দোকানে পড়িলাম। মনে করিলাম, আর প্রাতে উঠিতে পারিব না। কিন্তু প্রাতে দেখি, কোমরের ব্যথা অনেক কমিয়াছে; আবার যাত্রা করিলাম। দুইদিনে মতিহারী পৌছিলাম। মতিহারীতে কয়েক দিন থাকি। পরে সেখানে আরও দুইবার গিয়াছি।

মতিহারী হইতে ফিরিয়া আমরা বাঁকিপুর আরা এলাহাবাদ হইয়া লঙ্কো যাই। লঙ্কো দ্বিরা টেলিগ্রাম পাইলাম যে, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা কলিকাতাতে অত্যন্ত পীড়িত। মুক্কেই পরিবারদিগকে প্রেরণ

করিবার সময় শিক্ষার জন্ত একটি বন্ধুর তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে কলিকাতায় রাখিয়া গিয়াছিলাম। ঐ সংবাদ পাইয়া লক্ষ্মীএসর কাজ বন্ধ করিতে হইল, ও কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। আসিবার সময় মুন্সের হইতে প্রসন্নময়ীকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম, বিরাজমোহিনী অত্র সন্তানগণের ভার লইয়া মুন্সেরেই থাকিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্মাণের চেষ্টা।—আমি কলিকাতাতে ফিরিয়া তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকতা, উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য, এই সকল লইয়া ব্যস্ত রহিলাম। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ত্যাগ করার পর তৎপার্শ্ববর্তী ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর ভবনে কিছুদিন আমাদের উপাসনা চলে। উপেন্দ্র বাবু এই সঙ্কটকালে আমাদের সহায় হইয়া তাঁহার ঠাকুর-দালানটি আমাদের ব্যবহারের জন্ত দিয়া মহোপকার করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনে একটি সুপ্রশস্ত ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে আমাদের সাপ্তাহিক উপাসনা তুলিয়া আনা হয়। এই সময়ে সেইখানেই উপাসনার কার্য্য চলিতেছিল।

আমি আসিয়া দেখিলাম, বঙ্গুগণ ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একখণ্ড ভূমি নির্দ্ধারণ করিয়া সেখানে উপাসনা-মন্দির নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিতেছেন, এবং সেজন্ত প্রত্যেকে নিজের এক মাসের আয় দিবেন বলিতেছেন। আমি সে কার্য্যে মহা উৎসাহী হইলাম। শুনিলাম, অর্থ সাহায্যের জন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটেও এক দরখাস্ত গিয়াছে, তাহাতে আনন্দমোহন বাবুর, আমার, দুর্গামোহন বাবুর, গুরুচরণ মহালানবিশ মহাশয়ের, ও অপর কাহারও কাহারও নাম আছে; মহর্ষি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে খবর লইতে বলিয়াছেন, জমির দাম কত, মন্দির নির্মাণের ব্যয় কত হইবে, ট্রস্টী কারা নিযুক্ত হইয়াছেন, ইত্যাদি।' বোধ হইল যেন, তিনি ট্রস্টী



মহানি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিয়োগের পূর্বে টাকা দিবেন কি না, কাহার হাতে দিবেন, কত দিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না ।

মহর্ষি সহিত সাক্ষাৎ । মহর্ষি দান ।—একদিন আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম । তিনি তখন তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ ভবনেই আছেন । গিয়া দেখি, ভক্তিজাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন । তিনজনে অনেক কথা আশু হইল । মহর্ষি রাজনারায়ণ বসুকে ও আমাকে বড় ভাল বাসিতেন । রাজনারায়ণ বাবুতে ও আমাতে মিলন, মহর্ষির নিকট যেন মাণ কাঞ্চনের যোগ বোধ হইল, তাঁহার স্বয়ংদ্বারা খুলিয়া প্রেমের উৎস, আনন্দের উৎস, উৎসারিত হইতে লাগিল ; তিনজনের অট্টহাস্তে অত বড় বাড়া কাপিয়া যাইতে লাগিল । ক্রমে নিঃশব্দে সুস্বপ্নে বাবির গ্রাম মহর্ষির বাক্যশ্রোতে হাফেজ আসিলেন ; নানক আসিলেন, শ্বশিবা আসিলেন, উপনিষদ্ আসিলেন, আমরা সকলে সেই বসে মগ্ন হইয়া গেলান । দেখিতেছি, মহর্ষির কান ছটা লাল হইয়া যাইতেছে, মহর্ষির মস্তকেব কেশ মাঝে মাঝে খাড়া হইয়া উঠিতেছে । এমন সময় কথার একটু বিচ্ছেদ হইবামাত্র আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমাদের অর্থ সাহায্যের দাব্যান্তের হলো কি ?” মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন, “তোমাদের দরখাস্ত নথির সামিল আছে ।” আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “বায় বাহিব হবে কবে ?”

মহর্ষি—কিছুদিন পরে হবে ।

ইহার পরে আবাব সদালাপের তরঙ্গ, হাসির গব্বা ও ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল । অবশেষে আমি উঠিতে চাহিলে মহর্ষি উঠিয়া আমার হাত ধরিলেন ; বলিলেন, “চল, কিছু না খেয়ে যেতে পারে না ।” এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া দক্ষিণের বারান্দার কোণের এক ঘরে লইয়া গেলেন । গিয়া দেখি, টেবলের উপরে নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ পাত্র আমার দৃষ্টিতে উপস্থিত । মহর্ষি আমাকে এক চেয়ারে বসাইয়া,

পার্শ্বের এক চেয়ারে নিজে বসিলেন, এবং নিজের হাতে তুলিয়া এক একটি খাদ্যদ্রব্য আমাকে দিতে লাগিলেন। মহর্ষির এই নিয়ম ছিল, বাহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, তাহাদিগকে নিজের হাতে তুলিয়া দিয়া। খাওয়াইয়া সুখী হইতেন; সেইরূপ আমাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে আমি বলিলাম, “ডেব হয়েছে, পেট ভরেছে।” তিনি আর একটা সুখাচ্ছ লইয়া হাসিয়া বলিলেন, “তা বললে চলবে না, বাপু! এ সব জিনিষ বাড়ীর মেয়েরা নিজের হাতে করেছেন, না খেলে নারীর সম্মান করা হবে না, তোমরা ত স্ত্রী স্বাধীনতার দল!” এই বলিয়া অটুহাস্ত করিয়া উঠিলেন। এমন সুন্দর, এমন পবিত্র, এমন অকপট হাস্য মানুষে কম দেখিয়াছি। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও মহর্ষি জ্যোতিপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মধ্যে অকপট অটুহাস্যেব জন্ম প্রসিদ্ধ ছিলেন; কিন্তু মহর্ষি হাস্য বড় কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। তবে ঈর্ষা সকলের কাছে হাসিতেন না, নিতান্ত অন্তরঙ্গ লোকেব ভাগেই তাহা ঘটিত।

আহারান্তে আমরা আবার মহর্ষির বৈঠক গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, রাজনারায়ণ বাবু তখনও বসিয়া আছেন। চুপে চুপে তাঁহার কানে আহারের ব্যাপারটা বর্ণন করিলাম, তিনি হাসিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দেখি, মহর্ষি তাঁহার ক্যাশ-বাক্স তলব করিয়াছেন, ও চেকবুক বাহির করিয়া লিখিতে আবশ্য করিয়াছেন। আমি সেদিকে মনোযোগ দিবামাত্র, হাসিয়া আমাকে বলিলেন, “তোমাদের দ্ব্যখাস্তের রায় লিখি।

আমি (রাজনারায়ণ বাবুর প্রতি)—কেবল ব্রাহ্মণ-ভোজন নয়, হাতে হাতে বিদায়টা হয়ে যায় দেখি।

রাজনারায়ণ বাবু—তাইত, সেইরূপ গতক দেখি।

মহর্ষি চেক স্বাক্ষর করিয়া আমাদের হাতে দিয়া, ইংরাজীতে বলিলেন,

“This is my unconditional gift.” আমি মনে ভাবিলাম, টুঙ্গী নিয়োগ প্রভৃতি যে-সকল বাঁধাবানি অগ্রে ছিল, তাহা রাখিলেন না।

চেকখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, সাত হাজার টাকার চেক ! অগ্রে বন্ধুদের মধ্যে শুনিয়াছিলাম, তিনি দুই হাজারের অধিক দিবেন না, একগুণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমবা দুই হাজার টাকারই প্রত্যাশা করিতেছিলাম। সাত হাজার টাকা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম।

মহর্ষি (আমার মুখের দিকে চাহিয়া)—কেমন, সন্তুষ্ট ত ?

আমি—একটা বড় খাবাপ হলো। আর একটু বসব মনে কবছিলাম, কিন্তু ওটা পেয়ে আব বসতে ইচ্ছা করছে না। দৌড়ে গিয়ে দলে খবর দিতে ইচ্ছা কবছে।

মহর্ষি (হাসিয়া)—তবে যাও।

আমি চলিয়া গেলাম। কিন্তু এমনি আনন্দের আবেগে যে, চেকখানি পকেটে না পুরিয়া মহর্ষির ঘরেই ফেলিয়া গেলাম ! পথ হইতে আবার ফিরিয়া আসিলাম। ইহা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইল।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। আমি ছুটিয়া একেবারে আনন্দমোহন বাবুর মটস্ লেনস্থ ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, তাঁহার কয়েক জনে বসিয়া সমাজের নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছেন। আমি চেকখানি মিষ্টার বোসের সমক্ষে রাখিবামাত্র তিনি দেখিয়া কয়তালি দিয়া উঠিলেন, এবং চেয়ার হইতে উঠিয়া সজোরে আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তৎপরে বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে মহা আনন্দধ্বনি উঠিল। মিষ্টার বোস তখনই প্রচুর মিষ্টান্ন আনাইলেন। সকলে মনের আনন্দে মিঠাই খাইলাম।

ইহার পরে গুরুচরণ মহানবিশ ও আমার উপরে মন্দির নির্মাণের ও অর্থসংগ্রহের ভার প্রধানতঃ পড়িয়াছিল। আমি বেহার, উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব, মধ্য ভারতবর্ষ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আরও অনেক হাজার টাকা তুলিয়াছিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন । সিটি স্কুল । ছাত্রসমাজ । গৃহে নিরাশ্রয় বালিকার
সংখ্যাবৃদ্ধি । প্রচারযাত্রা । পাথের অভাব । ঝাঁকিপুর । “মেজ বউ”
রচনা । আগ্রা, টুণ্ডলা । লাহোর । শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, সর্দার
দয়াল সিং । মুলতান । হায়দরাবাদ ; নবলরায় আদবানি ।
বোম্বাই, আহমদাবাদ । রাণাডে । ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কী,
কর্ণেল অলকট । ট্রেনে শিশু কেশবচন্দ্রের সহিত
সাক্ষাৎ, ও সঙ্গে মিরবের গালাগালির প্রতিবাদ ।

(১৮৭২)

মন্দিরের ভূমিক্রয় ও ভিত্তিস্থাপন ।—১৮৭২ সালের মাঘোৎসবের
সময় ভূমি ক্রয় করিয়া নূতন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করা হইল । আমরা
প্রাচীন ও প্রবীণ শিবচন্দ্র দেব মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া এই মহা কার্য
সমাপ্ত করিলাম । যখন সমাজের অগ্রণী সভাগণ ও তাঁহাদের পত্নীগণ
এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা ভিত্তিগহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,
তখন আমি চন্দ্রের জল রাখিতে পারিলাম না ; একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম ।

সিটি স্কুল ।—এই সময়েই আমি ও আনন্দমোহন বাবু আর-একটি
কার্যে ব্যস্ত হইয়াছি । আমরা দুজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে
একটা উচ্চশ্রেণীর স্কুল স্থাপন করিতে হইবে । তদ্বারা দুই উৎসকার
হইবে ; প্রথম, অনেক উৎসাহী ও অল্পবয়সী ব্রাহ্ম যুবককে শিক্ষকতা
কার্য দিয়া নিকটে রাখা যাইবে, তদ্বারা সমাজের কার্যের অনেক
সাহায্য হইবে ; দ্বিতীয়, বহুসংখ্যক বালকের মনে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের
ভাব দেওয়া যাইবে । তখন আনন্দমোহন বাবু, সুরেন্দ্র বাবু ও আমি

বঙ্গীয় যুবকদের প্রধান নেতা। আমরা সুরেন বাবুকে অমুরোধ করাতে তিনিও আমাদের সঙ্গে নাম দিতে স্বীকৃত হইলেন। আমাদের তিন জনের নামে স্কুলের প্রস্তাবনা-পত্র প্রকাশ হইল। স্কুলের নাম হইল সিটি স্কুল। আনন্দমোহন বাবু স্কুলের সরঞ্জামের টাকা দিলেন; সুরেন বাবু পড়াইতে লাগিলেন, এবং আমি সেক্রেটারির কাজ করিতে লাগিলাম। প্রথম দিনেই স্কুল বসিয়া গেল বলিলে অত্যাক্তি হয় না। প্রথম মাসেই ব্যয় বাদে টাকা উদ্ধৃত হইল। কয়েক মাসের মধ্যে আনন্দমোহন বাবুর প্রদত্ত টাকা শোধ হইল।

এই সিটি স্কুল স্থাপনের কথা ভুলিবার নহে। সে যেন রোম রাজ্যের পত্তন! অপরাপর স্কুলের তাড়ান ছেলে, বদ ছেলে, দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার স্থাপনকর্তাদিগের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস থাকাতঃ অনেক ভাল ছেলেও আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ছেলে বাছাই করা এক মহা সঙ্কটের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কি হুশিঙ্গা, কি পরিশ্রম, কি সতর্কতার যে প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা এখন বর্ণনা করা হঃসাধ্য। দুই একটি ঘটনামাত্র উল্লেখ করিতে পারি।

ছেলে বাছাই করিবার জন্ত আমি এক নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলাম। প্রত্যেক শিক্ষকের হাতে এক-একখানি খাতা দিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার দিনের পর দিন ক্লাসের ছুঁছুঁ ছেলেদের, অর্থাৎ বাছার কামাই করে, বা পড়া না করে, বা ছুঁছুঁ করে, তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিতেন। সপ্তাহান্তে বাছাই হইয়া বড় ছুঁছুঁ ছেলেদের নাম আর-এক খাতায় উঠিত। ঐ খাতার নাম ছিল “ব্ল্যাক বুক।” ঐ খাতা ছেলেদের অগোচরে লাইব্রেরীতে ডেকের মধ্যে থাকিত। আমি তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিতাম, তদ্বারা সকল শ্রেণীর ছুঁছুঁ ছেলেদের নাম আমার নখের আগায় থাকিত। আমি ক্লাস দেখিতে গেলেই ক্লাসের ছুঁছুঁ ছেলেদের বিষয়ে সন্দেহে অস্থসন্ধান করিতাম।

একবার দেখিলাম, তৃতীয় শ্রেণীর একটি বালকের নাম বার বার
ক্ল্যাকবুকে উঠিতেছে। দেখিয়া সেই ক্লাসে গেলাম। গিয়া তাহার
বিষয় অনুসন্ধান করিলাম। তৎপরে যে ব্যাপার ঘটিল তাহা এই,—

ক্লাসের ছেলেরা—সার, সে আজ আসে নি।

আমি—কেন ?

আর কেউ কোনও উত্তর করে না।

আমি—তার পাড়ার কি কোনও ছেলে আছে ? বলতে কি পার সে
কেন আসে নি ? তার কি ব্যায়রাম হয়েছে ?

একটি ছেলে—না সার, তার ব্যায়রাম হয় নি।

আমি—তবে কেন আসে নি ?

আর একটি ছেলে—সার, সে গুণ্ডা ভাড়া করতে গিয়েছে, আজ
ছুটির পর দাঙ্গা হবে।

আমি—কার সঙ্গে ?

সে বালক—হিন্দুস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে।

আমি—কেন ?

সে বালক—আজ্ঞে, আজ দশটার সময় হিন্দুস্কুলের একটি ছেলে এসে
শাসিয়ে গিয়েছে যে, ছুটির পর তাকে উবিয়ে নে-ধাবে, নরলোকে খবর
পাবে না।

আমি—বটে ! আর কোন্ কোন্ স্কুলের ছেলে এই দাঙ্গাতে আছে ?

সে বালক—আজ্ঞে, এলবার্ট স্কুলের আর ট্রেনিং ইন্সটিটিউশনের।

আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া হিন্দুস্কুলে ভোলানাথ পাল মহাশয়কে, এলবার্ট
স্কুলে কৃষ্ণবিহারী সেনকে ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউশনে কানাই বাবুকে পত্র
লিখিলাম, “এ দাঙ্গা বন্ধ করিতে হইতেছে।” তাহারা স্বীয় স্বীয় স্কুলে
ক্লাসে সতর্ক করিয়া দিলেন ; দাঙ্গা বীজেই বিনষ্ট হইল, অঙ্কুর হইতে
পারিল না।

ভোলানাথ বাবু এক দ্বারবান দিয়া তাঁর স্কুলের সেই ছেলেকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সে দশটার সময় সিটি স্কুলে গিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতেছে না। আমি সে ছোকরাকে সত্য কথা বলাইবার জন্য অনেক বুঝাইলাম, কিছুতেই স্বীকার করিল না। তৎপরে তৃতীয় শ্রেণী হইতে চারিপাঁচটি বালক ডাকাইয়া তাহাকে দেখাইলাম। তাহারা তার মুখের উপর বলিয়া গেল যে সে দশটার সময় আমাদের স্কুলে আসিয়াছিল। আমি তখন তাহার কান ধরিয়া ঘরের কোণে দাঁড় করাইয়া দিলাম, এবং তাহাকে এক ক্লাস নামাইয়া দিবার জন্য ভোলানাথ বাবুকে এবং তাহার পিতার নাম জানিয়া লইয়া তার পিতাকে চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সে ভয় করিয়া কাদিয়া ফেলিল, এবং আমার পায়ে ধরিয়া সমুদয় কথা স্বীকার করিল। হহার পর সে সহজেই নিষ্কৃতি পাইল।

ইহার পর চতুঃপার্শ্বেব স্কুলমহলে আমার প্রতি ছেলের একটা ত্রাস জন্মিয়া গেল। এই ত্রাস হইতে একদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটিল। একদিন আমি বাড়ী বাইবার জন্য সিটি স্কুল হইতে বাহির হইয়াছি, দেখিলাম কয়েকজন বালক আমাকে দেখিয়াই গোলদীঘির ভিতরকার গাছের খোপের আড়ালে গিয়া লুকাইল। তাহারা ওঙ্কপ না লুকাইলে বোধ হয় আমি লক্ষ্যই করিতাম না। কিন্তু লুকাইবার চেষ্টা করাতেই আমার চক্ষে পড়িয়া গেল। আমি দীঘির ধারে গিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে ডাকিলাম। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া আমার নিকট আসিল।

আমি—তোমরা কোন্ স্কুলের ছেলে ?

তাহারা—আজ্ঞে, এলবার্ট স্কুলের, হিন্দু স্কুলের, হেয়ার স্কুলের।

আমি—তোমরা এমন সময় স্কুলে না থেকে এখানে আছ কেন ?

তাহারা—আজ্ঞে, পরের ঘণ্টাতে ক্লাসে যাব।

আমি—তোমাদের মধ্যে আমাদের সিটিকুলের ছেলে কেউ আছে ?

তাহারা—আজ্ঞে, আছে ।

আমি—কে ? ডাক দেখি ।

তাহারা—তারা ঐ বাজারে গাঁজা খেতে গেছে ; ধরে দেব, মশাই ?

আমি—কৈ চল দেখি ।

তখন তাহারা যেন বাঁচিল । আমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় পাইল । আমাকে সঙ্গে করিয়া মাধব দত্তের বাজারে গেল । আমি এক গেটে রহিলাম, দুই দুই ভেলে অল্প গেটে দাঁড়াইল । আর দুই জন বাজারের মধ্যে প্রবেশ কবিল । কিয়ৎক্ষণ পরেই সিটি স্কুলের একজন ছেলেকে পাক্‌ড়িয়া আনিল ।

গ্রেপ্তারকারিগণ—দেখুন সার, পকেটে গাঁজা ছিল, ফেলে দিয়েছে ।

আমি সত্য সত্যই দেখিলাম, পকেটের কাপড়টা উল্টাইয়া রজিয়াছে ।

আমি—সত্যি করে বল, গাঁজা ছিল কি না, এবং গাঁজা খেয়েছ কি না ?

বালক—না সাব, আমি গাঁজা খাই না ।

আমি (অপর বালকগণের প্রতি)—চল ত গাঁজার দোকানে যাই, দেখি গাঁজা কিনেছে কি না ।

তৎপরে দলে বলে সেই বালককে বন্দী করিয়া গাঁজার দোকানের দিকে চলিলাম । আমাদিগকে এই ভাবে চলিতে দেখিয়া পাহারাওয়ালারাও আমাদের সঙ্গে চলিল । ভালই হইল, গাঁজার দোকানদারকে তন্ন দেখাইবার একটা উপায় হইল ।

আমরা গিয়া গাঁজার দোকানের সমক্ষে দাঁড়াইলাম । রাস্তা হইতে আরও লোক জুটিয়া গেল ।

আমি (দোকানদারের প্রতি)—এই ছোকরাকে গাঁজা বেচেছ কি না ?

দোকানদার (খতমত থাইয়া)—না মশাই, গাঁজা বেচি নাই ।

আমি তার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম যে সে মিথ্যাকথা বলিতেছে।
একটু উগ্রভাবে—

ঠিক বল, সঙ্গে পাহারাওয়াল সাঙ্গী আছে, স্কুলের ছেলেদের গাঁজা
বেচ, আমি পুলিশ সাহেবকে লিখে তোমার লাইসেন্স কেড়ে নেব।

তখন সে ভয়ে সত্য কথা বলিল, তাহাকে গাঁজা বেচিয়াছে। আমি
সেই বালককে ধরিয়া সিটি স্কুলে ফিরিয়া আসিলাম। আমি তার নাম
কাটিয়া দিয়া কারণ প্রদর্শন পূর্বক তাহার পিতাকে এক পত্র লিখিলাম।

তৎপর দিন তার পিতা আসিয়া উপস্থিত। আমার হাতে পায়ে
ধরাধরি,—“যদি ছেলে ভাল হয়, আপনাদের কাছেই হবে। আমার প্রতি
দয়া করে একে রাখতেই হবে।” মীমাংসাটা কি হইয়াছিল, তাহা এখন
স্মরণ নাই। তবে সে সময়ে আমি ছুটি ছেলে তাড়ান বিষয়ে কিপ্রহস্ত
ছিলাম।

যদি কোনও শিক্ষকের চক্ষে পূর্বোক্ত বিবরণগুলি পড়ে তবে তাঁহাকে
বলি যে, এক সহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়-সকলের শিক্ষকদের মধ্যে
আত্মীয়তা ও ষোগ না থাকিলে, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের
অভিভাবক এই উভয়ের মধ্যে সাহচর্য না থাকিলে, বিদ্যালয়ে সুশাসন
রক্ষিত হইতে পারে না। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই
দুইটাই অভাব।

সিটি স্কুলটি সমাজের সর্ববিধ কার্যের কেন্দ্র।—সিটি স্কুল
স্থাপিত হইলে ইহার বাড়ীটি আমাদের সর্ববিধ কার্যের কেন্দ্রস্থল
হইয়া দাঁড়াইল। ইহারই একটি ঘরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আপিস
উঠিয়া আসিল। এতদ্ব্যতীত এই ভবনে আমরা কয়েকজন প্রতিদিন
সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরোপাসনার জন্ত মিলিত হইতে লাগিলাম। কতক
এই ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইতে লাগিল।
সমাজের কাজ দিন দিন জমিয়া বাইতে লাগিল।

ছাত্র সমাজ '—সিটি স্কুলটি জমিয়া বসিলে কয়েকমাস পরেই (১৮৭৯ সালের ২৭শে এপ্রিল) আনন্দমোহন বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমার বহুদিনের সংকল্পিত * একটি কাজের সূত্রপাত করা গেল; তাহা ছাত্রসমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপন করা। প্রথম এক সপ্তাহ অন্তর বিবাহের প্রাতে সংক্ষিপ্ত উপাসনা পূর্বক নানা বিষয়ে উপদেশ দিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। স্কুলকলেজে ধর্মবিহীন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। স্ততরাং আমরা সেইভাবে বক্তৃতা-সকল করিতাম। ঐ-সকল বক্তৃতার অধিকাংশ আনন্দমোহন বাবু ও আমি দিতাম। প্রথমে সিটি স্কুল গৃহে ছাত্রসমাজের অধিবেশন হইত। তৎপরে উপাসনা-মন্দির নির্মিত হইলে সেখানে উঠিয়া যায়।

পাঁচপ্রকারে ছাত্রসমাজের কাযা চলিল। (১ম) প্রথমে পার্থক্য, তৎপরে সাপ্তাহিক, উপাসনা ও বক্তৃতা। (২য়) ছাত্রাবাস পরিদর্শন। (৩য়) মধ্যে মধ্যে সদলে সহবের সন্নিহিতস্থ উদ্যানাদিতে গমন। (৪র্থ) মধ্যে মধ্যে সাক্ষাসমিতিব ব্যবস্থা। (৫ম) পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কণ ও প্রচার।

এই পাঁচ প্রকার কার্য দ্বারা প্রভূত ফল লাভ করা গেল। ছাত্র-সমাজের সভ্যসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এক-একবার দুই শত, আড়াই শত যুবক লইয়া আমরা কোম্পানির বাগানে গিয়াছি। সেখানে উপাসনা ও প্রীতিভোজন প্রভৃতি হইয়াছে। তখন ছাত্রসমাজ ভিন্ন যুবকদিগের ধর্ম ও নীতি শিক্ষার উপযোগী অন্য সভা সমিতি ছিল না; সভ্যসংখ্যা অধিক হইবার সেও একটা কারণ।

যাহা হউক, এই ছাত্রসমাজ দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহোপকার সাধিত হইয়াছে। ইহা অনেক উৎসাহী যুবককে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে, ইহাব সভাগণের মনে নীতি ও ধর্মের ভাব স্ফূর্তিতে মুদ্রিত কাব্য আছে, এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের তরঙ্গ উঠিলে তাহাকে বাধ দিবাব পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এখানে “ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ”, “প্রার্থনার আবশ্যিকতা ও গুণবিশিষ্টতা,” “জাতিলেদ,” “পরকাল,” প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা হয়, তাহাতে ১২ তং কালে বিশেষ সুফল বলিয়াছিল, এবং তাহার অনেকগুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

পরে একবার ইহাব উৎসাহী সভাগণের মধ্য হইতে কতকগুলিকে লইয়া একটি ঘননিখিষ্ট মণ্ডলা (Inner circle) কবিরার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে সপ্তাহে একবার বসিতাম এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করিতাম, ওদ্বারা অনেক কাজও হইত, নিজেও বিশেষ উপকৃত মনে করিতাম। ছাত্রসমাজ এখনও আছে, কিন্তু আমি পূর্বের ছাত্র ইহার কার্যের প্রধান ভার আর আমার উপর রাখিতে পারি না।

গৃহে নিবাস্ত্রা বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি।—এই সময় প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী পুত্রকন্ডা সহ মুন্সের হইতে কলিকাতাতে থাকিবাব জন্ত আসিলেন। ইহারা আসিবাব পর হইতে ক্রমেই আমাদের গৃহে নিবাস্ত্রা বালিকাব সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন বালিকাদের জন্ত বোর্ডিং ছিল না। আমাব বন্ধুদের কাহারও কাহারও কন্ডাকে গৃহে স্থান দিতে হইয়াছিল। তন্নিমিত্তে-সকল বালিকার কোনও আশ্রয় ছিল না, একপাশ বালিকাও অনেকগুলি আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রসন্নময়ীর সন্তানের কুখ্য বেন মিটিত না। তাহার নিজের পুত্র কন্ডা ছিল, তথাপি কোনও বালিকাকে নিবাস্ত্রা দেখিলে, তাহাকে নিজ কোড়ে না লইয়া বেন দ্বিগুণ থাকিতে

পারিতেন না। এইরূপে অতঃপর আমাদের গৃহে সর্বদাই পাঁচ ছয়টি করিয়া উপরি বালিকা থাকিত। ইহাদিগকে লইয়া আমরা পরম সুখে বাস করিতাম। অনেক সময় আমাদের দুই তিনটির বেশি শয়ন-ঘর থাকিত না। প্রসন্নময়ীর সন্তানদের সঙ্গে দুই একটা, আমার সঙ্গে আমার ঘরে দুই একটা, বিরাজমোহিনীব সঙ্গে তাঁর ঘরে দুই চারিটা বালিকা থাকিত, এইরূপে চলিত। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী এই বৃহৎ পরিবারের জন্ত রন্ধন করিতেন ও ইহাদিগকে পালন করিতেন। এই বালিকাদের অধিকাংশ পরে বিবাহিত হইয়া সুখে ঘবকলা করিতেছেন, কেহ কেহ বা শিক্ষালাভ করিয়া নিজে অর্থোপার্জন করিয়া পরোপকার-ধর্ম পালন করিতেছেন। সেজন্ত জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ।

পশ্চিমে প্রচার যাত্রা।—তৎকালোদ্ভূত ও ছাত্রসমাজের কার্যের ব্যবস্থা করিয়া এবং প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনীকে কলিকাতায় স্থাপন করিয়া আমি ১৮৭৯ সালের মে মাসে আবার প্রচারে বহির্গত হই। এবার কমিটি স্থির করিলেন যে, আমি উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, সিন্ধ, বোম্বাই, গুজরাট ও মালদ্বীপ প্রভৃতি সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিব। আমি তদনুরূপ প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু ভারত প্রদক্ষিণের প্রধান আয়োজন যে অর্থ, সেদিকে আমারও দৃষ্টি নাই, সমাজেব কশ্মচারিগণেরও দৃষ্টি নাই। আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি, সমাজ আপিস হইতে টাকা লইব, লইয়া যাত্রা করিব। মনে মনে স্থির করিয়াছি যে একেবারে আগ্রার ঝাঁইব, ঘাইবার সময় বাঁকিপুর্ বা এলাহাবাদে নামিব না, কারণ পূর্ববঙ্গের ঐসকল স্থানে গিয়াছিলাম। বিশেষতঃ অগ্রেই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, আমার বন্ধুবর আগ্রাপ্রবাসী নবীনচন্দ্র রায় শীঘ্রই কর্ণ হইতে ছুটিয়া লইয়া সপরিবারে তাঁহার জমিদারী ব্রাহ্মগ্রামে গমন করিবেন। তাঁহার সহায় করিবার পূর্বে তাঁহার সহিত দুই দিন বাসন করিবার অর্থ সংগ্ৰহ করিয়াছিলাম।

পাথেয়ের অভাব।—ঈশ্বরের প্রতি আমার কিরূপ নির্ভরের অভাব ছিল, এবং তিনি কিরূপে আমার অভাব পূরণ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য এই প্রচার-যাত্রার বিশেষ বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আগ্রা বাইব মনে করিয়া যাত্রার দিন সমাজ-আপিসে গিয়া টাকা চাহিলাম। আপিসের কর্মচারী একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলেন; আমি যে বাইব, আমার যে টাকার প্রয়োজন, সে চিন্তা কাহারও মনে ছিল না! আমি ধর্ম-প্রচারার্থ সমুদয় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিব বলিয়া নির্দ্বারক করা হইয়াছে, আমি কবে যাত্রা করিব তাহারও সংবাদ অগ্রে দিয়াছি, অথচ আমার গাড়িভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় নাই, দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। সমাজের কর্মচারী ভায়াকে বলিলাম, “বাক্স হাতড়ে দেখ, কিছু টাকা পাও কি না; আমি আজ রাতে যাত্রা কব্ব ব’লে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক বন্ধুকে লিখেছি, আর দেরি কব্বতে পারব না।” তিনি খুঁজিয়া পাতিয়া আট টাকা কয়েক আনা বাতির করিলেন। আমি রেলওয়ে টাইম-টেবিল পরীক্ষা করিয়া দেখি যে তাহাতে ডুমরাওন পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। কর্মচারী বার বার হুইদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন, কিন্তু কি জানি কেন আমার মন সেজন্য প্রস্তুত হইল না। আমি অনেকবার দেখিয়াছি, প্রচার-যাত্রার জন্য একবার প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে দিন স্থির করিলে তাহা ভাঙ্গা আমার পক্ষে সহজ হয় না, মহাবিশ্ব ষটিলেও যাত্রা করিয়া থাকি। এযাত্রাও আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। বন্ধুদের অমুরোধ, পরিবার-পরিজনের অমুরোধ, কিছুতেই আবার ক্রিয়াকর্ম নিবৃত্ত করিতে পারিল না। আমি সেই দিনই রাতে যাত্রা করিলাম। মনে করিলাম, আমার বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায় বাঁকিপুরে আছেন, তাঁহার ভবনে ছুই একদিন যাপন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাথের হিসাবে কিছু ডিকা করিয়া লইব। এই ভাবিয়া বাঁকিপুরের টিকিট লইয়া যাত্রা করিলাম।

বাঁকিপুুর। “মেজ বউ” রচনা।—পরদিন আতে বাঁকিপুুর প্রকাশচন্দ্র

অবতরণ করিয়া দেখি যে প্রকাশচন্দ্র রাজকার্য্যে স্থানান্তবে যাইবার জন্ত ষ্টেশনেই দণ্ডায়মান। তাড়াতাড়ি বেশি কথা হইল না।

প্রকাশ—সে কি ? তুমি যে আসবে, সে সংবাদ তো দেও নাই।

আমি—ভাই, প্রথম আমার এখানে নাম্বার কথা ছিল না। কাল আসবার সময় স্থির হলো, তাই খবর দিতে পারিনি।

প্রকাশ—যাও, আমার বাড়ীতে যাও, সেখানে অঘোরকামিনী আছেন, আতিথোর ভাবনা নাই। চারদিন অপেক্ষা করো, আমি কাজ সেয়ে আসছি।

এই বলিয়া অপর দিকের ট্রেনে উঠিয়া যাত্রা করিলেন।

আমি গিয়া অঘোরকামিনীর গৃহে অবতীর্ণ হইলাম। অঘোরকামিনীর ভালবাসা ও আতিথোর গুণে তাঁর বাড়ী যেন আমার তীর্থস্থানের মত বোধ হইত। আমি পবন স্নুখে তাঁর গৃহে বাস কবিত্তে লাগিলাম। সেখানকার ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ কবিয়া, তাঁহাদের সাহায্যে একটা বক্তৃতা দেওয়া গেল, এবং অপরাপর কাজও কিছু করা গেল।

কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের আর দেখা নাই। আমি এখানে মে মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত সপ্তাহের অধিক কাল যাপন কবিলাম। এই কালের মধ্যে একটা কাজ সারা গেল। গ্রাশনাল্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সভাগণের নিকট একখানি পারিবারিক উপস্থাস লিখিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাটা এখানে পূরণ কবিলাম। এই ৮।১০ দিনের মধ্যে “মেজ বউ” নামক একখানি উপস্থাস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ কবিলাম।

প্রকাশচন্দ্র আর আসিলেন না; আবার বিল্ডাট উপস্থিত, পাথরের টাকা কোথায় পাই ? ভাবিলাম, অঘোরকামিনীর হাতে প্রকাশ সঙ্গার চলিবার মত টাকা দিয়া গিয়াছেন ; আমি চাহিলে তিনি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁর অন্ত্রবিধা-ঘটিতে পারে। স্তব্ধ

লজ্জাবশতঃ তাঁহাকে নিজের অভাবের কথা জানাইতে পারিলাম না।
হাতে যে পরসা আছে, তাহাতে ডুমরাওন পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। ভাবিলাম,
ডুমরাওনে ব্রজেনকুমার বসু নামে একজন ব্রাহ্ম বসু আছেন, তাঁহার
নিকট টাকা ভিক্ষা করিয়া লইব।

এই ভাবিয়া একদিন প্রাতে অধোরকামিনীকে বলিলাম, “আজ
আমাকে সকাল-সকাল খাওয়াইয়া দেও, আমি ডুমরাওন যাইব।” তিনি
রন্ধনে প্রবৃত্ত আছেন, আমি বিছানাপত্র বাঁধিতেছি, এমন সময় একটি
বাক্সালী বাবু আসিলেন। তাঁহার সহিত সেই আমার প্রথম পরিচয়।
তাঁহার নাম তিনকড়ি ঘোষ, তাঁহারই নামে বাঁকিপুৰে T. K. Ghosh's
Academy হইয়াছে। তিনকড়ি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাই
নাকি এমনি বক্তৃতা করিতে করিতে সমুদয় ভারতবর্ষ বেড়াবেন?”

আমি—আজ্ঞে হাঁ, এইরূপ সংকল্প করাই ত বাহির হইয়াছি।

তিনকড়ি বাবু—আমার একটা অনুরোধ আছে, কিন্তু বলতে লজ্জা
কব্ধে।

আমি—বলুন না, তার আর লজ্জা কি?

তিনকড়ি বাবু—আমার ইচ্ছে, আপনার কাজের জন্ত কিছু সাহায্য
করি।

আমি—যা দেবেন মনে করেছেন দিন; ও ত ঈশ্বরের দান। এইরূপ
দানেই ত আমাদের কাজ চলে।

তিনি তিনটা টাকা দিয়া গেলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম,
এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। তখন ডুমরাওন যাওয়ার পরামর্শ রহিত
করিয়া একেবারে এলাহাবাদ যাওয়া স্থির করিলাম। আহা! কল্পিত
গিয়া অধোরকামিনীকে সেই পরামর্শ জানাইলাম।

আহার করিয়া আসিয়া দেখি, আমাকে ঈশ্বরে নাইবার জন্ত এলাহাবাদ
গাড়ি আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে, এবং আর-একটা বাবু আমার সঙ্গে

বসিয়া আছেন। তিনি কলিকাতা সমাজের প্রাপ্য বলিয়া তিনটা টাকা দিয়া গেলেন। আমি কলিকাতার সমাজ আপিসে সংবাদ দিয়া সে টাকা নিজের পাথেয়ের জন্য ব্যয় করা স্থির করিলাম। আমি ষ্টেশনে গিয়া এলাহাবাদে নামিবার পরামর্শ ত্যাগ করিয়া একেবারে আগ্রার টিকেট লইলাম।

আগ্রা।—আগ্রাতে বঙ্গবর নবীনচন্দ্র রায়ের বাটীতে পৌছিয়া আমার পকেটে আট আনা পরস্না মাত্র রহিল। আমি গিয়া দেখি, নবীন বাবু ছুটি লইয়া তাঁহার জিনিসপত্রের অধিকাংশ ব্রাহ্মগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন; এবং তৎপরদিন সঙ্গীক যাত্রা করিবাব জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানকার কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্র-লোকের সহিত আমার আলাপ পবিচয় করাইয়া দিয়া তৎপরদিনই আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন। আমি সেই তাড়াতাড়ির ও ব্যয়বাহুল্যের মধ্যে আর তাঁহাকে আমার পাথেয়ের অভাবেব কথা জানাইতে পারিলাম না।

আগ্রাতেও পাঠ ব্যাখ্যা বক্তৃতা প্রভৃতি কিছু কিছু কাজ হইল। কিন্তু আমার লাহোর বাইবার উপায় কি? যাহাদের ভবনে আছি তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন। যাহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন, নূতন পরিচিত মানুষ, কিরূপে তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করি? ভিক্ষা করিতে পারিলাম না। অবশেষে মনে করিলাম, টুঙলাতে একজন উপবীতত্যাগী আত্মরক্ষানিক ব্রাহ্ম আছেন শুনিয়াছি, তাঁহাকে গিয়া খুঁজিয়া বাহির করিব এবং তাঁহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিব।

টুঙলা।—এই স্থির করিয়া সেই আট আনা পরস্না সঞ্চল করিয়া একদিন বৈকালে টুঙলা ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, দুই দিক্ হইতে দুইখানি ট্রেন আসিয়াছে; লোক উঠা নামা করিতেছে, মহা গোলযোগ। জিনিসপত্র নামাইয়া প্ল্যাটফর্মে পাঠচারণা করিতে লাগিলাম, এবং ভাবিতে লাগিলাম যে, ট্রেন দুখানা চলিয়া গেলে

ট্রেনের বাবুদের নিকট সেই ব্রাহ্মবন্ধুটির ঠিকানা জানিয়া লইব। এখন সময়ে এক কৃষ্ণকায় বুঝা পুরুষ আসিয়া একেবারে আমার পায়ে লুপ্তিত হইয়া পড়িল। “কে মশাই, কে মশাই, উঠুন উঠুন” বলিয়া তুলিয়া দেখি, সে আমাদের সোমপ্রকাশ-আপিসের এক পুরাতন বিল-সরকার; তাহাকে কোনও অপরাধের জন্ত আমি কৰ্ম্মচ্যুত করিয়াছিলাম। জানিতাম না যে সে এখানে রেলওয়ে লোকে (Loco) আপিসে কৰ্ম্ম লইয়া আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে যেরূপ বিস্মিত হইল, আমিও তদ্রূপ তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সে—মশাই এখানে যে ?

আমি—আমি আগ্রা গিয়েছিলাম, অতঃপর লাহোরে বাব। এখানে অমুক বাবু আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা। তাঁর বাড়ী কোথায় বল ?

সে ব্যক্তি (হাসিয়া)—মশাই, তিনি ত আর আপনাদের ব্রাহ্ম নাই; তিনি আর-একরকম হয়ে গেছেন।

আমি—বল কি ? তা ত আমি জান্তাম না !

সে ব্যক্তি—এখন আমার বাসাতে চলুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হয় পরে করবেন। আমি আপনাদের খেয়ে মাথুষ, আমার বাড়ীতে পদার্পণ করতেই হবে। আপনি আমাকে তাড়িয়েছিলেন, সে জন্ত আমার ক্ষোভ নাই; আমি তার উপযুক্ত কাজ করেছিলাম।

আমি তখন একটা আশ্রয় পাইলেই বাঁচি, সুতরাং তাহার আস্থানে তাহার কুটারে গিয়া প্রবেশ করিলাম। তাহার ভবনে আশ্রয় পাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, লাহোর বাইবার ব্যয় কোথা হইতে আসিবে ? আমি কলিকাতা হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, পাণ্ডেরের জন্ত কলিকাতাতে লিখিব না, আপনার ব্যয় আপনি সম্বল করিয়া লইব; এইরূপে প্রচার-কাণ্ড চালাইয়া লইতে হইবে।

প্রতিজ্ঞানুসারে মহা অভাবের মধ্যে পড়িয়াও কলিকাতার বন্ধুদিগকে জানাইতেছি না। এইবার কিন্তু সঙ্কট উপস্থিত। সে-ব্যক্তি একে ব্রাহ্ম নহে, তাহাতে আবার আমাদের চাকর ছিল, এবং আমিই তাহাকে তাড়াইয়াছিলাম। সুতরাং তাহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। অথচ আর কেহ নিকটে নাই যাহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। অবশেষে স্থির করিলাম, লাহোরের রেলভাড়া ঐ ব্যক্তির নিকট ঋণ করিয়া লইব এবং পরে লাহোর হইতে তাহাকে পাঠাইব। ইতস্ততঃ করিতে করিতে দুইদিন কাটিয়া গেল। এই দুই দিন কিন্তু বৃথা যাপন করিলাম না। সে ব্যক্তির দ্বারা সেখানকার স্কুলের হেড-মাস্টারের অমুমতি লইয়া স্কুলভবনের উঠানে এক বক্তৃতা করা গেল। সে বক্তৃতাতে স্থানীয় বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পরদিন লাহোর যাত্রার কথা। সে সংকল্প তাহাকে জানাইয়াছিলাম। সে ব্যক্তির নিকট টাকা কর্জ করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু লজ্জাতে রাত্রে আহারের পূর্বে চাহি চাহি করিয়া মুখ ফুটিয়া চাহিতে পারিলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি, সে আপিসে গিয়াছে, ব্রাধুনীকে আমার জন্ত ব্রাধিতে বলিয়া গিয়াছে। আমি স্নান উপাসনা করিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় সে আসিয়া উপস্থিত। বলিল, “আহার করে নিন, আহার করে নিন, গাড়ির সময় হলো।”

এইবার কর্জের প্রস্তাব আসিতেছে।

আমি—হাঁ হে, লাহোরের ভাড়া কত ?

সে ব্যক্তি—তা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি পাছে আমার সাহায্য না নেন, তাই আমি একখানা টিকেট কিনে ষ্টেশনে রেখে এসেছি।

আমি—সে কি ! তুমি এর মধ্যে টিকেট কিনে রেখে এসেছ !

তৎপরে আমি লাহোর যাত্রা করিলাম। “পথে ভগবানের কৃপাতে বিশ্বাস” ও নির্ভরের অভাবের জন্য আপনাকে শত ধিকার দিতে লাগি-

‘লাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ কি! আমি প্রতি পদে নিজের উপর নির্ভর রাখিয়া ভাবিয়া মরিতেছি, আর প্রতি পদে বিধাতা কোথা হইতে অভাব পূরণ করিতেছেন! তাঁর কাজ করিবার সমরও কি তাঁর উপর নির্ভর রাখিব না? এইরূপে আপনাকে ধিকার দিতে দিতে লাহোরে গিয়া পৌছিলাম।

লাহোর। শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী। সর্দার দয়াল সিং।—

১১ই জুন আমি লাহোরে পৌছিয়া সেখানকার বিরাদন্-ই-হিন্দু নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক, গবর্ণমেন্ট কলেজের সাব্‌ভে টীচার, ব্রাহ্ম বঙ্কু শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলাম। সেখানে তাঁহার পত্নী লালাবতীর বিমল বঙ্কুতাণ্ডে আপনাকে বড়ই উপকৃত বোধ করিতে লাগিলাম। লাহোরে গিয়াই দেখি, কিছুদিন পূর্বে দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় সেখানে আর্থ্যসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তখনও বেদের অশ্রান্ততা লইয়া মহা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। আমি অগ্নিহোত্রীর অনুরোধে এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলাম। তত্ত্বিন্ন অশ্রান্ত শাস্ত্র নানা যায় না কেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া কতকগুলি যুক্তি লিখিয়া দিলাম। অগ্নিহোত্রী ভায়া সেগুলি অনুবাদ করিয়া বিরাদন্-ই-হিন্দু মুদ্রিত করিলেন, এবং হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলকে তাহার উত্তর দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ইহা লইয়া কয়েকমাস ধরিয়া নানা কাগজে নানা তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল।

আমার লাহোর পরিত্যাগের পূর্বে লালসিং নামক একজন শিখ যুবক আমার সেবক ও সহায় হইয়া আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রার্থী হইল। তখন আমি নির্ভর-বলে বলি হইয়াছি। আমি বিশেষ প্রার্থনার পর স্থির করিলাম যে লালসিংকে সঙ্গে লইব। সে আমাকে উর্দু শিখাইতে পারিবে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা দিব। যখন তাহাকে সঙ্গে লইব স্থির করিলাম এবং পরদিন প্রাতে সমুদয় বিষয় ঠিক করিব বলিয়া আশু

দিলাম, তখন তাহার ব্যয় কোথা হইতে চলিবে মনে সেই চিন্তা হইল না। মন বলিল, ঠাকুর তাহা দেখিবেন। কি আশ্চর্য্য, এই সংকল্প জানাইবার রাত্রে সর্দার দয়ালসিংহের এক পত্র পাইলাম। দয়ালসিং সর্দার লেহনা সিংহের পুত্র। লেহনা সিং মহারাজ ব্রজসিং সিংহের অধীনে পার্শ্বত্যা প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন, এবং অমৃতসরে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সর্দার দয়ালসিং তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি পিতার বিভবের অধিকারী হন এবং ঘোবনের প্রারম্ভে ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া উদারভাবাপন্ন হন। দেশে ফিরিয়া তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত যোগ দেন ও সর্ববিধ দেশহিতকর কার্যে উৎসাহী হন। যতদূর স্মরণ হয়, ইহার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, লালসিং আমার সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া তিনি আনন্দিত, এবং তার ব্যয়নির্বাহার্থ তিনি ৫০ টাকা পাঠাইতেছেন। আমি লালসিংকে একটা ঝুলি প্রস্তুত করিয়া ঐ টাকা তাহার মধ্যে রাখিতে বলিলাম। বলিয়া দিলাম, “এ ৫০ হইতে আমার জন্য পাঁচ পয়সাও ব্যয় করিবে না; ঐ সমগ্র টাকা তোমার জন্য ব্যয় করিবে। তোমার খরচের প্রত্যেক পয়সার হিসাব রাখিবে। আমার ব্যয়ের জন্য যিনি যাহা দিবেন, তাহাও ঐ ঝুলিতে রাখিবে। কাহাকেও আমাদের অভাব জানিতে দিবে না; যিনি যাহা স্বতঃপ্রসূত হইয়া দিবেন, ঐ ঝুলিতে দিতে বলিবে।” “Beg not, Borrow not, Refuse not,” (অর্থাৎ ভিক্ষা করিবে না, ঋণ করিবে না, দিলে কিরাইবে না,) এই তিনটি কথা একখান কাগজে লিখিয়া ঐ ঝুলিতে রাখিয়া দিলাম; বলিয়া দিলাম, এই ভাবেই কাজ করিবে।

মূলতান :—এই ভাবেই আমরা মূলতান হইয়া সিদ্ধুদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই মূলতান-বাসকালের একটা স্মরণীয় ঘটনা আছে। আমরা মূলতানে গিয়া দেখিলাম যে কয়েকটা বাদ্যালী পরিবার কঠোরপন্থে

সেখানে বাস করিতেছেন। তন্নিম্ন পাঞ্জাবীদিগের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষিত লোক একটি ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছেন। ঐ সমাজে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের কেহ কেহ যোগ দিয়া থাকেন। আমরা সেখানে পৌঁছিলে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী সকলে মহা উৎসাহে আমাদেরকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। যতদূর স্মরণ হয়, আমি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে রহিলাম; লালসিংও তৎসন্নিকটে এক পাঞ্জাবী বন্ধুর গৃহে রহিলেন। বাঙ্গালী বন্ধুটাব গৃহে আমার আদরের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহার পত্নী যে কেবল ভগিনীর ন্যায় আমার পরিচর্যা রত হইলেন তাহা নহে; আহার করিতে গেলেই দেখিতে পাইতাম, অপরাপর বাঙ্গালী বাড়ী হইতেও নানাপ্রকার তরকারী ও মিষ্টান্ন আসিয়াছে। সকল বাড়ীর মেয়েবা কোমল বাঁধিয়া আমার সেবায় লাগিয়া গেলেন। মহোৎসাহে বক্তৃতা, উপাসনা, আলোচনা প্রভৃতি চলিল।

এদিকে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী বন্ধুরা লালসিংকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “তোমাদের খবচপত্র কিরূপে চলছে? যাবার খরচ আছে ত?” লালসিং আমার আদেশ অনুসারে বলিতে লাগিলেন,—“আমাদের আর্থিক অবস্থা জানাতে নিবেধ। কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন।”

পরে যেদিন যাবার দিন আসিল, আমরা স্টেশন অভিমুখে চলিলাম। বন্ধুরা দল বাঁধিয়া আমাদের সঙ্গে চলিলেন। পথে আরও মানুষ জুটিল। একটা মস্ত দল সহ যাইতেছি, এমন সময় পথে হঠাৎ কে আমার পকেটে হাত দিল। আমার প্রথমে মনে হইল, কে যেন আমার পকেট হইতে কি তুলিয়া লইতেছে। “কে পকেটে হাত দিল?” বলিয়া ফিরিয়া দেখি, তিনি একজন শিক্ষিত পাঞ্জাবী বন্ধু। তিনি হাসিয়া বলিলেন, “It is a riddle. You need not see it here, you may see it in the train.” ট্রেন ছাড়িলে পকেটে হাত দিয়া দেখি, বন্ধুরা কুড়ি টাকার মোট বিক্রাজেন; সে মোট ছখানি মাথার রাখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া লালসিংকে বুলিয়ার

মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। আমাদের পথের খরচ এইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত দানেব দ্বারা চলিল। আমরা এইরূপে মূলতান, সক্রয়, হায়দরাবাদ, করাচি হইয়া দীমার যোগে বোম্বাই গেলাম।

হায়দরাবাদ। নবলরায়।—হায়দরাবাদ-বাসকালের একটা স্মরণীয় বিষয় আছে। সেখানে আমি আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধু নবলরায় শৌকিরাম আদবানি (Navalrai Shaukiram Advani) মহাশয়ের ভবনে অতিথি হইয়াছিলাম। তাঁহার সাধুতা, ধর্মনিষ্ঠা, ও পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখিয়া অতিশয় উপকৃত হইলাম। তিনি তখন গবর্ণমেন্টের অধীনে একটি উচ্চকর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা শৌকিরাম তখনও জীবিত আছেন। তিনি আমাকে পুত্রের ত্রায় সমাদবে গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার ভবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নবলরায় মহাশয়ের কাজ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে একটি সুন্দর বাগানের মধ্যে একটি সমাজ-মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে সপ্তাহে একদিন বিশেষ উপাসনা হয়। তত্ত্বিন্ন সভাগণ প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেখানে উপস্থিত হইয়া ভগবানের নাম করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের সহিত সেই সভাস্থলে গিয়া দেখিতাম, পাঁচটিপিয়া টিপিলা নির্ঝাঁক মৌনীভাবে সভ্যেরা আসিতেছেন; কেহ ঘরের কোণে, কেহ এক পার্শ্বে, কেহ মাটির উপর এক পার্শ্বে বসিতেছেন, একটি সংগীত ও একটি প্রার্থনার পর আবার সকলে নির্ঝাঁক ও মৌনীভাবে ধীরে ধীরে বাহিরে বাইতেছেন; বাগানের মধ্যে গিয়া তবে পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতেছে। নবলরায়ের পরোপকার-প্রবৃত্তির চিত্তবিরূপ দেখিলাম, তিনি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর বালকদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার উৎসাহী ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া সহরের ব্রাহ্মদল বৃদ্ধি করিতেছেন। তত্ত্বিন্ন প্রত্যেক রবিবার স্কুলে সভ্যদের উপাসনার পর স্থানীয় কারাগারে গিয়া কয়েদীদিগকে সমবেত করিয়া ধর্মোপদেশ

‘দিবার নিয়ম করিয়াছেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট’ এই অধিকার চাহিয়া লইয়াছেন। আমি ছই রবিবার তাঁহার সহিত স্কোলের এই মীটিঙে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, কয়েদীগণ দলে দলে আসিয়া মাটিতে বসিল। তিনি দাঁড়াইয়া সিদ্ধী ভাষায় জৈনধর্মকে ধন্যবাদ করিয়া কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন। কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু দেখিলাম যে কয়েদীদের অনেকের চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছে। অনেকে “উঃ আঃ” প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবব্যঞ্জক শব্দ করিতেছে।

পরে শুনিলাম, তাঁহার এই-সকল উপদেশের ফলস্বরূপ অনেক কয়েদীর হৃদয় পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ একদিনের একটা ঘটনার কথা তিনি বলিলেন। একবার তিনি রাজকার্য্যোপলক্ষে মফঃসলে গিয়া একদিন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পথে বনের মধ্যে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কোথায় রাজি যাপন করেন সেই ভাবনায় তিনি অস্থির হইলেন। এমন সময় অদূরে একখানি কুঁড়ে ঘর দেখিতে পাইলেন। তদভিমুখে অগ্রসর হইতে না হইতে একজন মানুষ তাহা হইতে বাহির হইয়া তাঁহার অভিমুখে আসিল এবং বলিল, “আপনার কি স্মরণ হয়, আপনি অমুক মাসে জেলে বক্তৃতা করিতে গিয়া একজন কয়েদীর সঙ্গে অনেককণ কথা কহিয়াছিলেন? আমি সেই মানুষ। আপনার উপদেশ আমাকে পাগলপন্থ হইতে ফিরাইয়াছে। আমি আর কোন খারাপ কাজ করি না। আমার ঘরে আসিয়া দেখুন, আমি জী পুত্র লইয়া বাস করিতেছি। তাহারা সকলেই আপনাকে ধন্যবাদ করে। আজ রাত্রে আপনাকে ঘরে স্থান দিয়া ও আপনার সেবা করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।” নবল-রায় বলিলেন, সে রাজি তিনি বেক্রম জুথে বাস করিয়াছিলেন, জীন্সনে একরূপ অন্ন রাজিই যাপন করিয়াছেন। বলিতে কি, নবলরায়ের জ্ঞানে হায়দরাবাদ আমার নিকট পৃথিবীহামের দূর হইয়া গেল।

বোম্বাই।—২০শে আগষ্ট ১৮৭২ আমরা দীবারে বোম্বাই পহুঁছিলাম।

বোম্বাইয়ে বি এম ওয়াগ্লে, নারায়ণ পরমানন্দ, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, মিষ্টার কুটে, তেলাঙ্গ, প্রভৃতি মহাআগণের সহিত পরিচিত হইয়া আপনাকে বড়ই উপকৃত বোধ করিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ পরমানন্দ মহাশয়ের অকৃত্রিম বিনয় ও বিমল সাধুতা চিরদিন আমার স্মৃতিতে রহিয়াছে। নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকার তখন কলেজের ছাত্র, কিন্তু তখনই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি তখনই “ইন্দুপ্রকাশ”, কাগজের সম্পাদকতা করিতেছেন। তিনি এযাত্রা আমার কার্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আহমদাবাদ।—আমি লালসিংকে বোম্বাই নগরে রাখিয়া গুজরাটে গমন করি। স্ফাট হইয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর আহমদাবাদে যাই। আহমদাবাদে গিয়া আমি সুপ্রসিদ্ধ ভোলানাথ সারাভাই মহাশয়ের ভবনে অতিথি হই। এমন নিম্নল সাধুতা, এরূপ অকপট ঈশ্বরভক্তি, আমি অল্প মাত্রাষেই দেখিয়াছি। তাঁহার সহবাসে কয়েক দিন থাকিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি। ভোলানাথ সারাভাই সুকবি ছিলেন, তিনি ভজন সঙ্গীত রচনা করিয়া গুজরাটী সঙ্গীতে অমৃত ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভজনাবলী এখনও ঘরে ঘরে গীত হইতেছে। আহমদাবাদ হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর বড়োদার গমন করি। সার টি মাধব রাও তখন বড়োদাতে প্রধান নব্বীরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আমাকে রাজ-অতিথিরূপে গ্রহণ করেন, এবং আমাকে বিধিমাতে সম্মানিত করেন।

গুজরাট প্রদেশ হইতে ফিরিয়া বোম্বাই নগরে আসিয়া আমি কলিকাতার বন্ধুদের টেলিগ্রাম পাইলাম যে, অবিলম্বে কলিকাতার ফিরিতে হইবে। আমি ৩ লালসিং জব্বলপুর হইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদ পৌঁছিলে লালসিং টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাঁহার জননী গুরুতর পীড়িত, তাঁহাকে অবিলম্বে অমৃতসরে যাইতে হইবে। আমাদের বিচ্ছেদের দিন আসিল। এতদিনের পর আমাদের সুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি, আমার

কলিকাতা পৌঁছিবার ও লালসিংহের অমৃতসর পৌঁছিবার মত টাকা হইয়া দুই টাকা বেশী আছে। সে দুই টাকা আমার সঙ্গেই রহিল। আশ্চর্যের বিষয় এই, কলিকাতা পৌঁছিতে, কি কি কারণে স্মরণ নাই, সে দুই টাকাও গেল। কি আশ্চর্য্য ভগবানের কৃপা! করুণাময় ঈশ্বর অনেকবার ঐরূপে আমাকে দিয়া প্রচারকার্য্য করাইয়াছেন। ধন্ত তাঁহার করুণা!

বাগাডে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ। বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রীয় পদস্থ লোকের প্রভেদ।—এই প্রচার-যাত্রা-কালের কয়েকটি ঘটনা স্মরণ আছে। প্রথম, যেদিন স্বর্গীয় রাণাডে মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেদিন একটা স্মরণীয় দিন। সেই দিন প্রাতে চন্দাবরকার আসিয়া আমাকে বলিলেন, “আমাদের বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শিক্ষিতদের নেতা মঃ রাণাডে মহাশয় গত রাত্রে তাঁহার কক্ষস্থান হইতে বোম্বাই আসিয়াছেন। অশ্রুক স্থানে আছেন, চলুন তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া দিই।” আমি তৎক্ষণাৎ বাহির হইলাম। পথে ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম যে, বোম্বাইয়ের শিক্ষিত দলের নেতা ও গবর্ণমেন্টের উচ্চ কর্মচারীর সহিত দেখা করিতেছি, না জানি গিয়া কিরূপ মানুষ দেখিব। চন্দাবরকার পক্ষে আমাকে তাঁহার গুণকীর্ত্তি অনেক বলিতে লাগিলেন। আমি সল্পমে পূর্ণ হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। গিয়া দেখি, বাহিরের দরজার মেঝেতে জাজিমের উপর একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহার গায়ে একটা সামান্ত বেনিয়ান, মাথায় একটা নাইট ক্যাপ, বেল্লপ ক্যাপ আমরা কলিকাতার রাজপুত্রের সামান্ত লোককে পরিতে দেখিয়াছি; সম্মুখে একটা তাকিয়ার উপরে একখানি সংবাদপত্র, তাহাই তিনি পড়িতেছেন। চন্দাবরকার আমাকে লইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি আমাকে নমস্কার করিয়া বসিতে বলিলেন। তার পর প্রত্যেক কথার এমন কিছু স্মরণিত লাগিলাম ও লিখিতে লাগিলাম, যাঁহা তৎপূর্বে শিক্ষিত মানুষদের মুখেও শুনি নাই। তাঁহারা আলিয়ার নদীর

তাঁহার সামান্য বেশ ও সবিনয় ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া ভাবিতে আগিলাম, শিক্ষিত বাঙ্গালী পদস্থ লোক ও বোম্বাইয়ের পদস্থ লোকে কত প্রভেদ ! বাঙ্গালী পদস্থ লোকেরা হাব ভাব পোষাক পরিচ্ছদে বড়লোক হইয়া পড়েন এবং অনেক ব্যয় করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভদ্র ও পদস্থ লোকেরা পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। ইহা একটা চিন্তা করিবার মত কথা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ হইতেছে যে, আমি পরে একবার প্রচারে গিয়া (১৮৮৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে কয়েকদিন) পুণা নগরে এই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে মহাশয়ের ভবনে অতিথি হইয়াছিলাম। এখানেই তাঁহার বর্ণনা করিতেছি। সেবারেও রাণাডে মহাশয়ের দৈনিক জীবন দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি বোধ হয় তখন পুণার স্থল কজ কোর্টের জজ। এক্ষণ পদস্থ একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক হইলে তাঁহার ভবনে কি বাহ্য বিলাসের প্রাচুর্য্যাব দেখিতাম ! জুড়ি, গাড়ি, পোষাক, পরিচ্ছদ, দাস দাসীর ধূম দেখিতাম। কিন্তু রাণাডের ভবনে তাহার কিছুই দেখিলাম না। তিনি কোর্ট হইতে আসিয়াই রাজকীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার মারহাট্টা লালপেড়ে ধুতি, বেনিয়ান ও লালপেড়ে চাদর ও চটি পরিয়া আমার সহিত বহির্ভ্রমণে বাহির হইতেন। ফিরিয়া আসিয়া একটা কাঠের দোলার উপরে বসিতেন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি সংবাদপত্র সকল লইয়া মাটিতেই বসিতেন, বসিয়া এক এক খানি কাগজ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন ; এক এক প্যারাগ্রাফের ছই পংক্তি পড়িলেই রাণাডে মহাশয় আর পড়িতে হইবে কি না জানাইতেন ; তৎপরে আবশ্যক হইলে আরও পড়া হইত, নতুবা সে প্যারা ত্যাগ করাই হইত। পড়িতে পড়িতে কোন্ কাগজে কি টেলিগ্রাম করিতে বা পত্র লিখিতে হইবে, তাহা মুখে মুখে লেখাইয়া দেওয়া হইত। এইরূপে ঐক্লম্ব ইচ্ছা আড়াই ঘণ্টা বাইত, তৎপরে আহ্বানার্থ বাওয়া হইত। ঐক্লম্ব

রাণাডে গুরুতর বিষয়-সকল পাঠ করিতেন ও সে বিষয়ে চিন্তা করিতেন। এইরূপে নিঃশব্দে চিন্তা ও কার্যের স্রোত প্রবাহিত থাকিত, দেখিয়া হৃদয়-মনের বিশেষ উপকার হইত।

এইরূপে কয়েকবার আমি রাণাডে মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়া থাকিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ ও আড়ম্বরশূন্য। কেবল তাঁহার নহে, বোম্বাইয়ের অনেক বন্ধুর ইকপ আড়ম্বরশূন্য ব্যবহার দেখিয়াছি। কেবল বোম্বাইয়ের নহে, পাঞ্জাব মাদ্রাজ প্রভৃতি সকল স্থানেই শিক্ষিত ভদ্রলোকদের আচরণ আড়ম্বরহীন দেখা যায়। মাদ্রাজে রেল পৌছিয়া ষ্টেশনে অনেকবার দেখিয়াছি, সহরের পদস্থ হিন্দু ভদ্রলোকেরা একজন বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, পারে জুতা নাই। সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকদিগের পক্ষে চামড়ার জুতা পায়ে দেওয়া তখনকার রীতি ছিল না; এখন কি দাড়াইয়াছে জানি না। ফল কথা এই, বাঙ্গালীরা ইংরেজদের সংস্রবে আসিয়া যেকপ বাবুগিরি শিখিয়াছেন, অপরাপর প্রদেশের ভদ্র লোকেরা তাহা শেখেন নাই।

ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কী ও কর্ণেল অল্‌কট্‌.—বোম্বাই-বাগকালের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কী ও তাঁহার সহকারী বন্ধু কর্ণেল অল্‌কটের সহিত সন্মিলন। ইহার আমার যাইবার কিছুদিন পূর্বে আসিয়া বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মত প্রচারের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন। একজন বন্ধু আমাকে ও লালসিংকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন, এক আমাদিগকে তাঁহাদের দলস্থ করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন তাঁহাদের সহিত মহা তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। আমি তাঁহাদিগকে বলিতাম, আপনাদের অনেক কথার সহিত আমার

মিল আছে, কিন্তু আপনারা ঈশ্বরের যে ভাব ব্যক্ত করেন, তাহার সহিত আমার মিল নাই। আপনাদের ভাব অদ্বৈতবাদের ভাব, আমি ভক্তিবাদী বলবী; আমার ঈশ্বর জীবন্ত শক্তিশালী, জ্ঞানময় ও প্রেমময় পুরুষ; তাঁহার সঙ্গে প্রেমযোগেই মানবের পরিজ্ঞান। ইহা লইয়া ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কী আমাকে অনেক উপহাস বিদ্রূপ করিতেন; আমি তাহার প্রতি কর্ণপাত করিতাম না।

আমি লালসিংকে বোম্বাইয়ে বাধিয়া গুজরাটে গেলে, লালসিং প্রায়ই তাঁহাদের নিকট যাইতেন। আসিয়া শুনিলাম, তাঁহার লালসিংকে পুত্রের ছাত্র বুকে ধরিয়া লইয়াছিলেন। দেখা করিতে গেলে ধরিয়া রাখিতেন; উঠিতে গেলে উঠিতে দিতেন না, এটা ওটা খাইতে দিতেন; সে শিখের ছেলে, তাহার মাথায় লম্বা চুল ছিল,—ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কীর সঙ্গিনী একজন মেম তাহার চুল আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া বাধিয়া দিতেন। আমি গুজরাট হইতে ফিরিয়া যখন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইলাম, এবং লালসিংকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলাম, তখন ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কী হাসিয়া বলিলেন, “তোমাদিগকে এত বোঝান বুঝা হইল।”

“সংশে মিরার” কাগজে ঈশ্বরের উদ্ভূতগে গালাগালি।— বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাসকালের তৃতীয় স্মরণীয় ঘটনা গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ নগরে ঘটে। তাহা এই। এই সময় রবিবাসরীর মিরারের ডিভোশনাল কলামে (“Devotional” column এ) ঈশ্বরের উদ্ভূতরূপে নানা কথা প্রকাশিত হইত। উপাসক-মণ্ডলী ঈশ্বর চরণে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের আচার্য্যকে তাঁহারা কি ভাবে দেখিবেন? ঈশ্বর তত্ত্বত্তরে, আচার্য্যকে কি ভাবে দেখিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন; ইত্যাদি। ডিভোশনাল কলামটি কেশব বাবুর নিজের বিশেষ উক্তি বলিয়া সকলে জানিত, এবং সেই ভাবেই সকলে গ্রহণ করিত।

উক্তিগুলির মধ্যে ভাল বিষয় অনেক থাকিত, বাহা পড়িয়া উপকার বোধ হইত, আবার পড়িয়া হাসি পায়, একরূপ কথাও থাকিত। আমি যখন আহমদাবাদে, তখন ২১শে সেপ্টেম্বরের মিরারে ঈশ্বরের উক্তিগ্ৰণে বিরোধী দলের প্রতি এক অপূৰ্ণ গালাগালি প্রকাশিত হইল। আমার মন্থিতে যতদূর আছে, তাহাব ভাবটা এই প্রকার,—“Then the Lord God rolled down a hill, and saw a number of men secretly working to undermine His kingdom Then the Lord spoke. Ye sceptics, materialists,” ইত্যাদি, ইত্যাদি, অনেক বিদ্বেষশূচক কটুক্তি।

আমি তখন কলিকাতা হইতে দূরে আছি। কলিকাতায় কি ঘটনা ঘটিয়া এই অভিনব তপ্ত আরক-শ্রোত বাহির করিয়াছে, তাহা জানিতাম না, আমি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। সেখানকার একজন বন্ধু এটা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, আমরা দুজনে খুব হাসিলাম। প্রথম প্রথম আমি এটাকে লঘুভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই ভাবে ত্রাঙ্ক পব্লিক ওপিনিয়ন পত্রিকাতে মুদ্রিত করিবার জন্য ইংরাজীতে একটা প্রার্থনা লিখিয়াছিলাম, তাহার কয়েক পংক্তি মনে আছে :—“Our Father which art in the *Sunday Mirror*, mellowed be thy temper. It seems that Thy favourite children have spoiled Thee, and have made Thee say things that are abominable. Indeed, Lord, Thou must be ashamed to have used such expressions,” ইত্যাদি। কিন্তু পরক্ষণেই সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম; লঘুভাবে অন্তর্হিত হইয়া পণ্ডীর দুঃখের সন্ধান হইল। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কি হইয়া দাঁড়াইতেছেন, মনে করিয়া কোড হইতে লাগিল। ঈশ্বরের জবাবিতে একরূপ লেখা অসম্ভবীক অপরাধ বলিয়া ক্রোধ হইতে লাগিল।

ট্রেনে সদলে কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ।—ইহার পর বোম্বাই হইয়া কলিকাতায় যাত্রা করি। এলাহাবাদ হইতে যখন কলিকাতা আসিতেছি, তখন মথুরা এক ষ্টেশনে দেখি, কেশব বাবু সদলে দণ্ডারমান। আমাদের সে ট্রেনে সিমলার কর্ণচারীরা নামিয়া আসিতেছিল। গাড়ীতে বড় ভিড়, ফিরিঙ্গী ছোঁড়াতে ইণ্টারমীডিয়েট গাড়ী পূর্ণ, তাহারা সারা পথ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে আসিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এক কামরাতে তিন চারিজন মাত্র ছিলাম। কেশব বাবুরা গাড়ী না পাইয়া প্লাটফর্মেরে ছুটছুটি করিতেছেন দেখিয়া, আমরা যে কামরাতে ছিলাম তাহাতে উঠিবার জন্ত আমি তাঁহাদিগকে ডাকিলাম। কেশব বাবু, বাবু বলচন্দ্র রায় প্রভৃতি আমাদের কামরাতে উঠিলেন, আর উমানাথ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন পাশের কামরাতে উঠিলেন। উমানাথ বাবুর হাতে খেরো কাপড়ের খোলের মধ্যে কি একটা ছিল। সেই কামরাতে এক ফিরিঙ্গী যুবক শুইয়া ছিল; উইরা প্রবেশ করিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল,—“What’s that?”

উমানাথ বাবু—A bugle.

ফিরিঙ্গী—A bugle ! Coming from the Afghan War ?

উমানাথ বাবু—No, from a Brahmo Samaj expedition.

তখন আমি বুঝিলাম, তাঁহারা গাজিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে Salvation Armyর অনুকরণে যুদ্ধযাত্রা করিয়া আসিতেছেন; কারণ তাহার বিবরণ মিরারে অগ্রেই পড়িয়াছিলাম। আমি সেই ফিরিঙ্গী ছোকরার রসিকতা নিবারণের জন্য একখানা কাগজে লিখিলাম, “Keshub Chunder Sen with his friends.” লিখিয়া তাহাকে দেখাইলাম, তাহাতে সে খামিল।

গাড়ি ছাড়িল, বেশ গরমগাছা হইতে লাগিল, আমরা সুখেই চলিলাম। হঠাৎ বলচন্দ্র রায় কি আর কেহ ঠিক মনে নাই, রবিবারদী

মিরারের সেই গালাগালির উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহা দেখিয়াছি কি না। আর কোথায় যাব! আশ্রয়গিরির অধ্যুৎপাতের জায় আমার পূর্বসন্ধিত ক্রোধ ফাটিয়া বাহির হইল। “কি! আপনারা সে জন্ত লজ্জিত না হয়ে আবার হেসে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আনাদের প্রতি ঐ ক্রোধ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়; এত ফাড়াছেঁড়া করা গেছে, ক্রোধ হওয়াই ত স্বাভাবিক। উনি কেন নিজের নামে আমাদিগকে গাল দিলেন না, ‘তোরা অধার্মিক, তোরা নচ্ছার’? বুঝ্‌তাম, মানুষ মানুষের সঙ্গে কারবার করছে। তা না করে ঈশ্বরকে রক্তভূমিতে অবতীর্ণ করা, ও ঈশ্বরের মুখে যাচ্ছে-তাই অপভাষা দেওয়া,—এ কি-রকম ব্যবহার? ঈশ্বরে প্রীতি থাকলে মানুষ কি এ রকম পারে?” আমি দেখিলাম, কেশব বাবু মুখটা গম্ভীর করিয়া আর-এক দিকে চাহিয়া আছেন; প্রচারক বন্ধুদের চেহারা বাগে রক্তবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

প্রশ্নকর্তা (আমার প্রতি)—ধর্মের চোখ থাকলে ত দেখতে পেতেন, কি মহৎভাবে ওগুলি লেখা হয়েছে।

আমি (হাসিয়া)—এদেশে একটা কথা চলিত আছে, “চিত্রগুপ্ত শালা, যত দোষ লিখে মানুষের বেলা, দেবতার বেলা লীলাখেলা,” এ দেখছি তাই! উনি লিখেছেন কিনা, তাই আপনাদের কাছে ‘মহৎভাব’ হয়েছে; অথ কেউ সেসব কথা লিখলে আপনারা তাকে নরকে ডোবাতেন।

এইরূপ বগড়া হইতে হইতে আমরা ঝাঁকিপুর পৌছিলাম। তাঁহার সদলে সেখানে নামিয়া গেলেন। আমি গয়ে শুনিয়াছি, এখানে নামিয়া গিয়া তাঁহার বন্ধুবর প্রকাশচন্দ্র দ্বারের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহাদের এক কমিটি, বসে; তাহাজে স্থির কর যে ঝিনোদী দলের সহিত তাঁহার বাক্যানুগত বা সাময়িক সংগ্রহ রাখিবেন না।

তঁাহারা নামিয়া গেলে আমার দুঃখ হইল যে, বাগ্‌ড়াবাঁটির এত দিন পরে কেশব বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কেন এত উত্তপ্ত হইয়া কথা কহিলাম! পরে ভাবিলাম, ক্রোধটা যখন মনে ছিল, তখন তঁাহার সমক্ষে প্রকাশ করাই ভাল হইয়াছে। আমার মনে এই একটা সন্তোষ আছে যে তঁাহার বিরুদ্ধে যাহা বলিবার তাহার অধিকাংশ তঁাহার সম্মুখেই বলিয়াছি।

কলিকাতায় ফিরিয়া গালাগালির কারণ অনুসন্ধান।—
অক্টোবরের মধ্যভাগে আমি সহরে পৌঁছিয়া ঐ গালাগালির মূল কারণ অনুনিলাম। সে মূল কারণ এই। ঐ বৎসরের মধ্যভাগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী সভ্যগণের মধ্যে এক ব্যক্তির নামে কেহ তঁাহাদের নিকট অতি জঘন্য দৃশ্যচিত্রতার কুৎসা করে। যেই এই কুৎসা শোনা, অমনি তঁাহারা লম্ফ দিয়া উঠিলেন, এইবার শত্রুকুল বিনাশের অস্ত্র হাতে আসিয়াছে। এই উৎসাহ এত অধিক হইল যে, বলিতে লজ্জা হইতেছে যে, একটা বাজারের জীলোককে বাড়ীতে ডাকাইয়া আনাইয়া নিজেদের সভার মধ্যে তাহাকে বসাইয়া, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করাকেও ছোট কাজ মনে করিলেন না!

ইহার পরে তঁাহারা মহত্মদের অনুকরণে বিরোধীদের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; দরবার হইতে আদেশবিধি প্রচার হইতে লাগিল; কেশব-ধর্মকে ব্রাহ্মধর্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইবার চেষ্টা হইতে লাগিল; রবিবাসরীর মিরারে ঐ ঈশ্বরীয় উক্তি প্রকাশিত হইল; এবং কেশব বাবু expedition বাহির করিলেন। এই ভাব হইতেই পরে নববিধানের অভ্যুদয়। ইহা স্মরণ করিলেও মনে ক্রোধ হয়।

যে কুৎসার্ত্তা ইহঁারা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইবার বক্তব্য সে আমি সহরে ছিলাম না, বিশেষ জানি না। কিন্তু দায়ক

নাথ গাঙ্গুলী আমাদের মধ্যে সত্যাহুতাগী, জ্ঞানপরাশর, ও তেজীমান
 পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন ; তিনি কাহাকেও ছাড়িবার লোক ছিলেন
 না। তিনি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি
 বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঐ কুৎসার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পান নাই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হওয়া ; আর্থিক অবস্থা । দার্জিলিং

মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত গমন ; অস্বাভাবিক । মতিহারীতে

বেদের অভ্যাসতা বিষয়ে বিচার । কলিকাতা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সম্পূর্ণ করা

ও পরবর্তী মাঘোৎসবের সময়

মন্দির প্রবেশ ।

(১৮৮০)

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হওয়া । আর্থিক অবস্থা ।—১৮৮০ সাল
হইতেই বোধ হয় আমি ইউনিভার্সিটির এন্ট্রান্স্ ও এল্ এ পরীক্ষায়
সংস্কৃতের পরীক্ষক হইতে লাগিলাম । তদবধি বহু বৎসর ধরিয়া
পরীক্ষকের কাজ করিয়াছি । প্রথম প্রথম পরীক্ষকের পারিশ্রমিক
স্বরূপ প্রতিবৎসর ৫০০।৬০০ টাকা পাইতাম । ক্রমে কম হইয়া
আসিয়াছে । গড়ে সাড়ে তিন শত টাকা করিয়া ধরিলে আমি
এইরূপে আট দশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছি । তন্নিম্ন আমার
পুস্তকাদির আর দ্বারাও কয়েক হাজার টাকা পাইয়াছি । ইহার
কিছুই সঞ্চিত রাখি নাই ।

অর্থসঞ্চয়ের কথা মনে হইলেই মনে হয় যে, যদি সেই পথেই
যাইব, তবে বিষয়-কর্ম ছাড়িলাম কেন ? নাচিতে উঠিয়া ঘোমটা
দেওয়া ভাল নয় । দুই পথ আছে,—এক বিষয়ীয় পথ, অপর ধর্মপ্রচারের
পথ । বিষয়ীয় পথে যদি যাও, তবে অর্থের উপার্জনের ও সঞ্চয়ের দিকে
দৃষ্টি রাখ ; যদি ধর্মপ্রচারের পথে যাও, তবে অর্থোপার্জন ও সঞ্চয়ের
দিকে প্রধান দৃষ্টি রাখিবে না, ধর্মপ্রচার ও ধর্মসমাজের সেবার
প্রতি প্রধান দৃষ্টি রাখ, ঈশ্বরের কৃপার উপরে নির্ভর কর ।

প্রশ্ন এই, এত হাজার টাকা কোথায় গেল? ভাল কাজেই গিয়াছে। সমাজের বন্ধুগণ আমাকে চিরদিন বাহা দিয়া আসিতেছেন, তাহা কোনও দিন আমার ব্যয়নির্বাহের উপযুক্ত হয় নাই। আমার জননীর পীড়ার জন্ত অনেকবার কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাসা করিয়া তাঁহাকে আনিয়া বাথিতে হইয়াছে। দেশে পর্ণ-কুটীরের পরিবর্তে জনক-জননীর মাথা বাথিবাব জন্ত পাকা ঘব করিয়া দিয়াছি। তত্ত্বিন্ন আমাব পূর্বকার দেনা শোধ করিয়াছি। তত্ত্বিন্ন, ব্রাহ্মসমাজের যে যে কার্যের ভার প্রধানরূপে আমার উপরে পড়িয়াছে, তৎসংক্রান্ত ঋণশোধের জন্তও অনেক টাকা দিতে হইয়াছে, যথা, সাধনাশ্রম, প্রথম ব্রাহ্ম বালক-নিবাস, বাকিপুরের রায়মোহন রায় সেমিনারি, প্রভৃতি। ধন্য মঙ্গল-ময় ঈশ্বরের রূপা। তিনি তাঁহার অনুপযুক্ত ভৃত্যকে চিরদিন পালন করিয়াছেন। আশ্চর্যরূপে আমার আর্থিক অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। আমি যখন ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলাম, তখন আমার কিছু টাকা চুবি যায়, এবং অপরাপর প্রকারে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি। তখন বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস আমাকে ৪০০ চারিশত টাকা কর্জ দেন, এবং বন্ধুবর আনন্দমোহন বসু ২৫০ কি ৩০০ টাকা কর্জ দেন। পরে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া আমি ইহার প্রচারকদলে প্রবেশ করিতে উদ্যুত হই, তখন দুর্গামোহন বাবু ও আনন্দমোহন বাবুর কাছে প্রথমে গিয়া বলি, “দেনার টাকার কি হবে? ঋণ থাকিতে আমি কিরূপে চাকুরী ছাড়িয়া প্রচারকার্যে ব্রতী হইব?” তাঁহার তখন আমার এই চিন্তাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন। বলেন, “সমাজের জন্ত আমাদেরকে কত শত টাকা দিতে হবে, তুমি কি সামান্য ঋণের টাকার কথা বল! ও টাকা আমাদের সমাজে দান।” আমি বলি, “আচ্ছা, আমি যদি কখনও কোন প্রকারে টাকা উপার্জন করি,

এবং আপনাদের ঋণ শোধ করতে পারি, আপনাদের টাকা আপনাদের নিতেই হবে।” তাঁহারা বলেন, “আচ্ছা, তখন দেখা যাবে। এখন ত সমাজের কাজ কর।”

তখন এই কথা থাকে। তদনুসারে এবার পরীক্ষকের বৃত্তি পাইয়াই আমি দুর্গামোহন বাবুকে টাকা লইবার জন্য লোক পাঠাইতে লিখি। তিনি উত্তরে লিখিলেন, “Good boy ! Quite worthy of you ! Make over the four hundred rupees to G. C. Mahalanobish as part of my contribution to the Mandir Building Fund.”

তিনি বন্ধুকে কর্তব্য করিতে দিলেন, অথচ সমাজের সাহায্য করিলেন।

আনন্দমোহন বাবুর দেনা শোধ দিবার অবসর প্রায় বিশ বৎসর পরে উপস্থিত হইয়াছিল। বিশবৎসর পরে আমি যখন টাকা দিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিলাম, তখন তিনি লিখিলেন যে “তাঁহার পুরাতন কাগজপত্র নাই এবং ঐ টাকার কথা তাঁহার স্মৃতিতেও নাই।” পরে যখন দেখিলেন যে ঋণটা শোধ না দিলে আমার মনটা শান্ত হয় না, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও টাকাটা লইলেন। কিন্তু পরে জানিয়াছি যে সে-টাকা স্বতন্ত্র করিয়া বাড়ীর মেয়েদের হাতে দিয়া এই আদেশ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাহা আমার সাহায্যার্থ ব্যয় করিবেন। তাঁহারা এইরূপে শত শত টাকা আমার সাহায্যার্থ দিয়া আসিতেছেন। তাহা আর কি বলিব! তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়। আজিও বহু পরিবারের বন্ধুগণ আমার পশ্চাতে সহায় হইয়া রহিয়াছেন। আমি কোনও অভাবে পড়িয়াছি জানিলেই সাহায্যের জন্য তাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হয়। বলিতে চক্ষু জল আসে, আমাকে কিছু দিন দেখিতে না পাইলেই তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠেন, তবে বৃষ্টি কোনও ক্রেশের মধ্যে বাস করিতেছি! অমনি চিঠির উপর আসে, ঋণ নিজেরা কেহ আসিয়া উপস্থিত হন।

১৮৮০ সালের মাঘোৎসব।— ১৮৮০ সালের মাঘোৎসব অর্ধনিশ্চিত মন্দিরের উপর চাঁদোয়া দিয়া সমাধা করা হইল। এই উপলক্ষে গোসাইজী, বিজ্ঞারত্ন ভায়া, শিবনারায়ণ অয়িহোত্রী * ও আমি, এই চাবিজনকে বিশেষ উপাসনাস্তর প্রচারকরূপে বরণ করা হয়।

দার্জিলিং মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তথায় গমন। অন্বারোহণ।— এই বৎসর ১লা বৈশাখ দিবসে দার্জিলিং পাহাড়ের নব-নিশ্চিত উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে একপ স্থির হয়, ও মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আমি উক্ত স্থলে যাই। তখন উত্তর-বঙ্গে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত রেল ছিল। শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং পর্য্যন্ত রেল পাতা হইয়াছিল, কিন্তু তখনও রেল খোলে নাই। আমি শিলিগুড়িতে গিয়া ডাক্তার আনন্দচন্দ্র রায়ের ভবনে আশ্রয় লইলাম। তখন শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং পর্য্যন্ত টোঙ্গা নামক এক প্রকার গাড়ি চলিত। কিন্তু তাহার ভাড়া এত অধিক ছিল যে আমার দরিদ্র ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগের পক্ষে আমার জন্য তত ব্যয় করা কষ্টকর হইবে বলিয়া অনুভব করিলাম; সে ভার তাঁহাদের উপর দিবার ইচ্ছা হইল না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে পাহাড়ে চড়িবার জন্য ঘোড়া পাওয়া যায়। জীবনে ঘোড়া কখনও চড়ি নাই। বালককালে সমবয়স্ক সঙ্গী বালকদের সঙ্গে জুটিয়া কখন কখনও বাঁড় চড়িতাম বটে, এবং একবার পড়িয়া গিয়া ব্যথা পাইয়াছিলাম, ইহা বোধ হয় অগ্রে বলিয়া থাকিব +; কিন্তু ঘোড়া চড়া কখনও তাপ্যে ঘটে নাই। কিন্তু কি করা যায়? ১লা বৈশাখের পূর্বে দার্জিলিং পহুছিতেই হইবে। দেখিলাম, ইউনিটেরিয়ান মিশনারি ড্যান্স সাহেব টোঙ্গার জন্য ডাকবাং-

* ২৭০ পৃষ্ঠা দেখ। শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র ঘোষ ইহার পূর্বেই অমৃততার জন্য পণ্ডায়াগ করিয়াছিলেন।—(সম্পাদক)।

+ ইহার কোনও উল্লেখ আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপিতে নাই।—(সম্পাদক)।

লাতে অপেক্ষা করিতেছেন, কারণ তখন টোকা আবার রোজ চলিত না আমার পরসাত ছিল না এবং অপেক্ষা করিবার সময়ও ছিল না; সুতরাং ঘোড়াতেই বাইতে প্রস্তুত হইলাম। একদিন প্রাতে আনন্দ বাবু এক পাহাড়ে ঘোড়া আনাইয়া আমাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিলেন। আমি ত হেলিয়া ছলিয়া অগ্রসর হইলাম। “গুকনা” পার হইতে না হইতে পাহাড়ে উঠিবার সময় সহিস আমাকে বলিল, “ঘোড়াটা মাদী ঘোড়া এবং গাভিন। গুনিয়া আমার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল; আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া সহিসের হাতে লাগাম দিয়া পদব্রজেই পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যাঁহাকে পাহাড়ে short cut (সোজা পথ) বলে, সেই সকল সোজা রাস্তা দিয়া উঠিতে লাগিলাম। তাহাতে পথ সোজা হয় বটে, কিন্তু বড় চড়াই উঠিতে হয়, বুকে পিঠে বেদনা লাগে। কি করা যায়, উপায়ান্তর না দেখিয়া মরিয়া কুটিয়া উঠিতে লাগিলাম। এইরূপে, যে খাসিয়াঙ্গে (Kuisong) ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের অপরাহ্ন দুইটা কি তিনটার সময় পৌঁছিবার কথা, সেখানে রাতি ৮টার সময় গিয়া পৌঁছিলাম।

তখন বার্ড কোম্পানী নামে এই পাহাড়ে এক কোম্পানী ছিল। তাঁহার মালপত্র বহিয়া দিতেন। প্রিয়নাথ বসু নামে একটি বাবু খাসিয়াঙ্গে তাঁহাদের কার্য্যকারক ছিলেন। পূর্বকৃত বন্দোবস্ত অনুসারে আমি গিয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইলাম। তৎপরদিন আমার দার্জিলিং পৌঁছিতেই হইবে। নতুবা শরীর বেকরপ ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহাতে দুইদিন বিশ্রাম করিলে ভাল হইত। প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন, তিনি পরদিন প্রাতে অস্বারোহণে দার্জিলিং বাইবেন, আমার জন্তও একটা ঘোড়া আনাইবেন। গুনিয়াই আমার ভয় হইল। তিনি অভয় দিয়া বলিলেন, ভয় নাই, তিনি সঙ্গে থাকিবেন। তৎপরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখি, আমার জন্ত গোলমাল এক পাহাড়ে টাটু আসিয়াছে, এবং তাঁহার জন্ত বার্ড

কোম্পানীর আস্তাবলের এক দীর্ঘকায় সুন্দর খেতবর্ণ ঘোড়া সাজিয়া অপেক্ষা করিতেছে । আমাব ঘোড়া দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, “প্রিয়বাবু, এ কি করেছেন ? এ যে বেশ জোরাল ঘোড়া ! আমার জন্ত একটা এক-পা-খোঁড়া ঘোড়া আনিলে ভাল হইত ।” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “উঠুন, উঠুন, আমি সঙ্গেই আছি ।” আমরা ত বাহির হইলাম । আমি আগে, প্রিয়বাবু পশ্চাতে । ঘোড়াদেব মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তাহা অগ্রে জানিতাম না । যেই প্রিয়বাবুর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা, অমনি আমাব ঘোড়া উদ্ধ্বাসে দৌড়িল । আমি কখনও ঘোড়া চড়ি নাই, সুতরাং এরূপ অবস্থাতে কখনও পড়ি নাই । আমি দুই পা দিয়া ঘোড়ার পেট চাপিয়া ধরিয়া দুই হাত দিয়া তার ঘাড়ের ঝুঁটি ধরিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিয়া বঠিলাম । ঘোড়াও বোধ হয় এরূপ অবস্থাতে কখনও পড়ে নাই । সে বোধ হয় মনে করিল, এ কি জন্ত আমার উপরে উঠিল ! কারণ সে আরও উদ্ধ্বাসে দৌড়িতে লাগিল । প্রিয়নাথ বাবু পশ্চাৎ হইতে চোঁচাইতে শ্যুগিলেন, “মশাই, থামুন, থামুন । গেলেন, গেলেন । এখনি খদের মধ্যে পড়ে শাবেন ।” আমি বলিলাম, “আপনি থামুন, আপনি না থামিলে আমার ঘোড়া থামিবে না ।” তিনি নিজ আখের বেগ সম্বরণ করিলেন, আমি এদিকে প্রাণপণে লাগাম টানিয়া ধরিলাম । ক্রমে আমার ঘোড়ার বেগ মন্দীভূত হইল । এই ভাবে গিয়া দার্জিলিঙ্গে উপস্থিত হইলাম, এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিলাম । আসিবার সময় বোধ হয় টোকাতে নামিয়াছিলাম ।

মতিহারীতে বেদের অভ্রাণ্ডতা বিষয়ে বিচার ।—ইহার কিছুকাল পরে অর্থাৎ ১৮৮০ সালের জুলাই মাসে আমি মতিহারী সমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করি । সেখানে সকল সম্প্রদায়ে মিলিয়া এক মহাবিচার হয়, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি । যতপারখানা এই । আমি গিয়া এক বন্ধুর বাড়ীতে আবস্থিত হইলাম ।— দুইদিন পরে সেখানকার

আর্য্যসমাজের * সম্পাদক আসিয়া আমার সঙ্গে বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিলেন।

আমি—একটা অভ্রান্ত শাস্ত্র এত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন কেন ?

সম্পাদক—মানবের ধর্ম্মজীবনের ভ্রাস্ত্র গুরুতর বিষয়ে কি ভ্রান্তিশীল মানববুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় ?

আমি—বেদের অভ্রান্ততা মানিয়াও ভ্রান্তিশীল মানববুদ্ধির হাত এড়াইতে পারিতেছেন না। বেদের অর্থ সাধারণ এক প্রকার করিয়াছেন, দয়ানন্দ সরস্বতী আর-এক প্রকার করিয়াছেন। কে আমাকে বলিয়া দিবে কোন্ অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রেত অর্থ ? এখানেও ভ্রান্তিশীল মানব-বুদ্ধিকে বিচারকরূপে দুই ব্যাধ্যাকর্তার উপরে বনাইতে হইতেছে। অভ্রান্ত শাস্ত্র দিলে, অভ্রান্ত টীকাকর্তাও দিতে হইবে, নতুবা ভ্রান্তিশীল মানববুদ্ধির হাত এড়ান যাইবে না। তৎপরে দেখিয়াছি, দয়ানন্দ এদেশে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া পূজিত অনেক অংশ বর্জন করিয়াছেন, কতকগুলি শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কতকগুলিকে শাস্ত্র নয় বলিয়া বর্জন করিয়াছেন, ইহা কোন্ প্রমাণে ? তাহাও ত ভ্রান্তিশীল বুদ্ধির বিচারেরই দ্বারা। তবেই, ভ্রান্তিশীল বুদ্ধির হাত হইতে নিস্তার নাই।

বিচারটা এই মূল ভিত্তির উপরেই চলিল। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পরদিন আবার বিচার হইবে এইরূপ কথা রহিল। ইতিমধ্যে সহরে জনবহু প্রচার হইল যে, কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক আসিয়াছে, অভ্রান্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে বিচার চলিতেছে। তৎপর দিন বথাসময়ে পিপীলিকা-শ্রেণীর ভ্রাস্ত্র হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকল শ্রেণীর লোক

* “পাঠকগণ আর্য্যসমাজের নাম শুনিয়া দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের আর্য্যসমাজ জাবিবেন না।”—ভক্তকৌমুদী, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৮০২ শকাব্দ; ৫৯ পৃঃ।—(সম্পাদক)।

আসিয়া উপস্থিত। বিচারস্থলে মানুষ ধরে না। আবার সেই পূর্বদিনের তর্ক উঠিল। আমি ছিনাজোকের মত আমার আসল কথাটা ধরিয়া আছি,

“অভ্রান্ত টীকাকার না দিলে অভ্রান্ত শাস্ত্র দেওয়া বৃথা”; ইহা হইতে আর নড়ি না। তাঁহারাও আর ইহার জবাব দিয়া উঠিতে ‘পারেন’ না; তর্কের ঢালপালা বিস্তার করেন মাত্র। খুব তর্ক বাধিয়াছে, এমন সময় একদল হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা তীর্থদর্শন করিয়া হিমালয় হইতে বাবাণসী অভিমুখে যাইতেছেন। সহরে আসিয়া গুনিয়াছেন, অমুক স্থানে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মহা বিচার উপস্থিত; তাই কৌতুহলবশতঃ আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। এই সন্ন্যাসীদলেব নেতার নাম ফণীন্দ্র যতি। দাখলাম, মানুষটি বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতজ্ঞ। আমি তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তখন তাঁহাতে ও আমাতে বিচার চলিল। এই স্থির হইল যে, আমাদের দলের অপব কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিবেন না; তাঁহাদের দলের অপর কেহ প্রশ্ন করিলে আমি উত্তর দিব না; প্রশ্ন করিতে হইলে অশ্রাব বা তাঁব দ্বারা করিতে হইবে, একজনের বক্তব্য শেষ না হইলে অপবে কথা কহিবেন না। অতঃপর বিচারটা ধীরে ধীরে চলিল। সোদিনও শেষ হইল না। স্থির হইল যে পরদিন স্কুলের মাঠে সন্ধ্যার সময় বিচার হইবে।

তৎপরদিন আবার সকল সন্তোষের লোক স্কুলের মাঠে সমবেত হইল। চন্দ্রালোকে ঘাসের উপর বসিয়া বিচার চলিল। একরূপ বিচারে কি কিছু স্থির হয়? উভয় পক্ষের কেহই ছাড়িবার নহে। অবশেষে রাত্রি ১১টার সময় অভ্রান্ত-শাস্ত্র-পক্ষীয়েরা “স্বামীজীকী জয়, স্বামীজীকী জয়” করিয়া চোঁচাইয়া উঠিল। তাহাতে আমার দলের কে একজন বলিয়া উঠিলেন, “কুন্তোঁকো ভৌক্নে দেও।” এই কথা স্বামীর দলের লোকের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহারা লুটি সোটা লইয়া মারিতে উদ্ভূত। তখন ফণীন্দ্র যতি ও আমি মাঝখানে পড়িয়া থামাইয়া দিলাম। ইহার পর

হুই একদিনে ফণীন্দ্র যতির সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা জন্মিল। আমি কখনও কাশীতে গেলে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেব মন্দির সম্পূর্ণ করা।—মতিহারী হইতে কলিকাতা ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যেই আমার প্রতি এক মহাকাঙ্ক্ষার ভার পড়িয়া গেল। সেটা অর্দ্ধনির্মিত উপাসনা-মন্দিরটাকে সম্পূর্ণ করিবার উপায় বিধান করা। ১৮৭৯ সালের প্রারম্ভে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তখন আনন্দমোহন বসুর স্বপ্নের ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ছুটিতে ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া ঐ মন্দির নির্মাণ কার্যেব ভার লইতে চাহিলেন। রুড়কি হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র বিনা ব্যয়ে প্ল্যান প্রভৃতি করিয়া দিয়া বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। নিয়োগকার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

১৮৮০ সালের মাঘোৎসব অর্দ্ধনির্মিত মন্দিরের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তখন আশা করা গিয়াছিল যে, ১৮৮১ সালের মাঘোৎসব সমাপ্তপ্রাপ্ত মন্দিরের মধ্যেই হইবে। কিন্তু ১৮৮০ সালের আগষ্ট মাসে দেখা গেল যে অবশিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে অবশিষ্ট কার্য্য শেষ হওয়া কঠিন। ভগবান বাবুর উদ্ভাবনী শক্তি বড় প্রবল ছিল। তাঁহার মাথাতে অনেক পরামর্শ আসিত। এজন্ত নানা কাজের সৃষ্টি করিয়া তিনি অনেকবার কতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য হাতে লইয়া তিনি ভাবিলেন যে, নেপাল তরাই হইতে শালকাঠ আনা হইলে সস্তা হইতে পারে। তদনুসারে নেপাল তরাইয়ে শালকাঠের অর্ডার দিয়াছিলেন। সে কাঠ কয়েক মাস ধরিয়া নানা নদ নদী দিয়া ভাসিয়া আসিবে, কাজেই বিলম্ব হইতে লাগিল। অবশেষে কাঠ যখন আসিল, তখন তাহার অনেক কাঠ কম-মজবুত বোধ হইল। কি করা যায়, কি করা যায়, করিতে করিতে দিন বাইতে লাগিল। ওদিকে ভগবান বাবু স্থানান্তরে বাইতে বাধ্য হইলেন।

তখন কমিটি অন্ত্রোপায় হইয়া গুরুচরণ মহলানবিশ ও আমার প্রতি
 দাযোৎসবের পূর্বে মন্দির নির্মাণ কার্য শেষ করিবার ভার দিলেন।
 আমি একপ কার্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কি করিতে হইবে বুদ্ধিতেই আসে
 না, মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। অবশেষে রাত্রে শয়ন করিয়া ভাবিতে
 ভাবিতে এক পবামশ মনে পড়িয়া গেল। আমি যখন ভবানীপুর সাউথ
 সবার্কন স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলাম, তখন চাকিবশ পবগণার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার
 সপ্রসিদ্ধ রাধিকাপ্রসাদ মুখুয্যে মহাশয়ের সহিত আমার বন্ধুতা হয়।
 এই বিপদে তাঁব শরণাপন্ন হইব বলিয়া স্থির করিলাম। পরদিন প্রাতে
 শ্রীমান উপাসনা সমাপন করিয়া বাধিকা বাবুব বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত
 হইলাম। তিনি আমাব মুখে সমুদয় বিবরণ শুনিয়া এ কাজের ভার
 গহিতে স্বীকৃত হইলেন। তৎক্ষণাৎ টমটম্ যোতা হইল, আমরা দুইজনে
 মন্দিবেব অভিযুখে যাত্রা করিলাম। তিনি অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া
 নেপাল সমাগত কাঠ বাছিয়া ষেগুলি বর্জন করিতে হইবে সেগুলিতে
 খড়ি দাগ দিলেন। কি প্রণালীতে মন্দিরের অবশিষ্ট কার্য শেষ করিতে
 হইবে তাহা আমাদিগকে জানাইলেন, লোহার থাম ও কড়ি কোথায়
 পাওয়া যাইবে তাহা লিখিয়া দিলেন, এবং তৎপরে নিজেই কতকগুলি
 থামের মাথায় বসাইবার মত লোহার বাক্সের অর্ডার দিবার জন্ত সেই
 টমটমে চিৎপুবেব লোহার কারখানাতে চলিয়া গেলেন। আমাকে
 ৩২পবদিন প্রাতে তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া গেলেন।
 ৩২পবদিন ভবানীপুরে তাঁহার ভবনে গিয়া দেখি, একজন কন্ট্রাক্টর
 বসিয়া আছেন, তাঁহাকে তিনি ডাকাইয়া আনিরাছেন। সেই
 কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট স্থির হইল। পরদিন লেখাপড়া হইল; অগ্রিম
 টাকা দেওয়া গেল। দুই দিনের মধ্যে মন্দিরের কাজ আরম্ভ হইল। আমার
 মাথার বোঝা যেন নামিয়া গেল। মহলানবিশ মহাশয় প্রতিদিন নির্মাণ
 কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। আমি সে দায় হইতে নিবৃত্ত

হইয়া অত্র কার্যে মনোনিবেশ করিলাম, এবং মন্দিরের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মন্দির প্রতিষ্ঠা।—১৮৮১ সালের ১০ই মাঘ ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন হইতে নগর কৌর্টন করিয়া আসিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করা গেল। সেই এক দিন! আমরা গাইতে গাইতে আসিয়া দেখি, বুদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মন্দিরের চাবি হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি ঈশ্বরের শুভাশীর্বাদ ভিক্ষা পূর্বক মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। মহোৎসাহে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করা গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

মাস্ত্রাজে প্রচার যাত্রা । ব্রাহ্মণের আহার শুদ্ধে দেখিতে পায় না ।

মাস্ত্রাজে বক্তৃতা ও “মাস্ত্রাজ মেইল” পত্রিকা । কোকনদা ।

‘কাম্‌টা’র ছোঁয়া জলে স্নান করার ফল । রাজমহেন্দ্রী ।

কোইম্বাটুর । পঞ্চমার বাড়ীতে দুধ ও আপম্

খাওয়া । বাঙ্গালোর । কমলাস্মা । মাস্ত্রাজে

দ্বিতীয় বার । দুর্ভিক্ষের অনাথ শিশু ।

Dancing girls.—

যত্নশি ঘোষ ।

(১৮৮১)

মাস্ত্রাজে প্রচার যাত্রা ।—১৮৮১ সালের মাঘোৎসব ও মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই (ফ্রেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে) আমি মাস্ত্রাজ বাই । আমি ষ্টীমারযোগে মাস্ত্রাজ যাত্রা করি । তখন মাস্ত্রাজের অবস্থা কি ছিল, তাহা কতকটা লিখিয়া রাখা ভাল বলিয়া এই প্রচার-যাত্রার বিশেষ বিবরণ একটু দিতেছি । জাহাজ মাস্ত্রাজ উপকূলে পৌঁছিল । তখন মাস্ত্রাজের রুদ্রিম বন্দর (artificial harbour) প্রস্তুত হয় নাই । জাহাজ তীর হইতে প্রায় ৩৪ মাইল দূরে দাঁড়াইত । সেখান হইতে বোটেরে করিয়া তীরে উঠিতে হইত । সে বোটেরে যাওয়া নূতন যাত্রীদের পক্ষে বড় জীভিক্সক ব্যাপার ছিল । তরঙ্গের আঘাতে বোটেরে ছাট লাগিয়া কাপড়-চোপড় ভিজিয়া বাইত । একবার বোট তরঙ্গের মাথায় দৃশহাত উপরে উঠিতেছে, আবার তরঙ্গের সঙ্গে দশহাত নিরে নামিয়া জাহাজের লোকেদের চক্ষের অনর্শন হইয়া বাইতেছে । এইরূপ ঝেটযাত্রার পর জাহাজে ফিরিতে করিতে তীরে দিয়া নামিলাম ।

ব্রাহ্মণের আহার শূদ্রে দেখিতে পার না।—মাস্ত্রাজ সমাজের কতিপয় সভ্য আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাকে লইয়া এক বাড়ীতে তুলিলেন। দেখিলাম, তাহার উপরতলা আমার জন্ত ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সমাজের ব্রাহ্মণ সভ্য বুঢ়িয়া পাণ্টুলু মহাশয়ের বাড়ী হইতে আমার ভাত আনিয়া দিবার জন্ত এক ব্রাহ্মণ বালক নিযুক্ত করিয়াছেন। যথাসময়ে স্নান করিয়া বসিয়া আমি সমাগত ব্রাহ্মণগণের সহিত আলাপ করিতেছি, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ বালক আসিয়া ইংরাজীতে আমাকে আহারের জন্ত ডাকিল। আমি আহার করিতে বাইবার সময় সমবেত বন্ধুদিগকে বলিলাম, “চলুন, আমি আহার করিব, আপনারা সেখানে বসিয়া কথা কহিবেন।” তাঁহারা উত্তর করিলেন না, কিন্তু সঙ্গে আসিলেন না। আমি গিয়া আহারে বসিয়া সেই ব্রাহ্মণ বালককে ইংরাজীতে বলিলাম, “উহাদিগকে আসিতে বল, আর বসিবার জন্ত চেয়ার দাও।” সে আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া জিভ কাটিয়া বলিল, “They are Sudras, how can they see you eating?” (ওরা শূদ্র, ওরা কি আপনার খাওয়া দেখিতে পারে?) পরে জানিলাম, এই কারণেই তাঁহারা আমার সঙ্গে আসেন নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, সেদেশে ব্রাহ্মণের আহার শূদ্রের দেখিবার অধিকার নাই। এমন কি “চেষ্টা” প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতার আহার পুত্রে দেখিবার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্র একসঙ্গে পথে পথিক হইলে ব্রাহ্মণকে কাপড়ের কাণ্ডার খাটাইয়া তন্মধ্যে আহার করিতে হয়।

মাস্ত্রাজে বন্ধুতা।—ইহার পর আমি মেম্বারদিগের সহিত জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম, এবং সে বিষয়ে একদিন বন্ধুতাও করিলাম। সহরে হলদুল পড়িয়া গেল। এই সময়ে আমি মাস্ত্রাজ সহরে “পাচিন্নান্না হল্” নামক ভবনে ইংরাজীতে সাধারণ ভাবে একটা বন্ধুতা করি। তাহার মধ্যে প্রসবকালে ভারতীয়

গভর্ণমেন্টের বহুবায়সাধ্যতার উল্লেখ করিতে গিয়া বলি যে, তাহার এক ফল এই দেখে যে, “The poor man’s salt is not free from duty.” তৎপরদিন *Madras Mail* নামক ইংরাজদের কাগজে “The poor man’s salt is not free from duty” এই শিরোনাম দিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হইল। তাহাতে বলা হইল যে বঙ্গদেশ রাজস্বের সমুচিত অংশ দেয় না বলিয়া অপর প্রদেশের দরিদ্র প্রজাদিগকে করভারে ক্লিষ্ট হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহাতে বাঙ্গালীদিগকে নিন্দা করা হয়। আমি সেই নিন্দাগুলির উত্তর দিয়া এক পত্র লিখি, এবং হিন্দু পোট্রিটের সম্পাদক কৃষ্ণদাস গাল মহাশয়কে অপর কথাগুলির উত্তর দিবার জন্য গোপনে পত্র লিখি। তিনি “Bengal, the Milch Cow of the British Government of India” বলিয়া এক নজির-পরিপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল কারণে স্থানকার শিক্ষিত ও ইংরাজ দলে আমার নাম বাহির হইয়া যায়। তৎপরে পবণবাকম্, মাইলাপুর, প্রভৃতি মাস্ত্রাজের অনেক উপনগরে আমাকে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে থাকে, এবং অনেক স্থলে প্রকাশ সভাতে পুষ্পমালার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করে। এই বাত্ৰাতেই দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও প্রভৃতি বড়লোকদিগের সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা হয়।

আমি যখন মাস্ত্রাজে কাজ করিতেছি, তখন উত্তর বিভাগে রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থানে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। রাজমহেন্দ্রীতে বীরেশ্বরিদাস পাণ্টলু নামক একজন প্রেতিভাশালী লেখক ও সমাজসংস্কারক দেখা দিয়াছেন, তিনি তেলুগু সাহিত্যের অদ্ভুত পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, এবং স্বদেশ মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার উপদেশে অনেকে বিধবাবিবাহ করিয়া বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন চলিয়াছে। সে সময় রাজমহেন্দ্রীর অপরবর্তী কোকনদা নামক সমুদ্রকূলবর্তী নগরে রাজমহেন্দ্রীর ন্যায় এক

ধনী বাস করিতেন। তিনি জাতিতে ‘কাম্‌টা’ অর্থাৎ আমাদের দেশীয় বৈষ্ণবের ছাত্র ছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কারক দলের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত ও শাস্ত্রীদিগকে সমবেত করিয়া তর্ক উপস্থিত করিতেন। এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, এমন সময় রামকৃষ্ণিয়া মাদ্রাজের সংবাদপত্রে আমার সংবাদ পাইলেন। তৎপরে কোকনদাতে আমাকে লইয়া যাইবার জন্ত টেলিগ্রামের পত্র টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল।

কোকনদা।—অবশেষে আমি কোকনদা যাত্রা করিলাম। বন্দরে পৌঁছিয়া দেখি, আমাকে লইবার জন্ত রামকৃষ্ণিয়ার গাড়ি আসিয়াছে। আমি গিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপনীত হইলাম। আমার সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ নাই দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আমি বলিলাম, “আমি গরীব প্রচারক, আমি কি সঙ্গে রান্নানী লইয়া বেড়াইতে পারি? আমি যেখানেই যাই, তাঁদের সঙ্গে থাই। আমি জাতি মানি না।” শুনিয়া রামকৃষ্ণিয়ার মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি বোধ হয় মনে মনে ভাবিলেন, কি সর্ব্বশেষে লোক এনে ফেললাম! যাহা হউক, তাঁহার সৌজন্ত ও আতিথ্যের কিছুই ক্রটি হইল না। তিনি আমার থাকিবার জন্ত তাঁহার বাসভবনের অদূরে একটি বাড়ী দিলেন, এবং আমার পরিচর্যা ও অন্যান্য বহনের জন্ত একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দুই দিন যাইতে না যাইতে সেই ক্ষুদ্র সহরে জনরব উঠিল যে রামকৃষ্ণিয়া বঙ্গদেশ হইতে এক নাস্তিক পণ্ডিত আনিয়াছে, সে দেশের সমুদয় বিবাহোপযুক্ত বিধবার বিবাহ দিয়া যাইবে। এই জনরব উঠাতে আমার মুন্সিল বোধ হইতে লাগিল; পক্ষে ঘাটে বাহির হইবার বো নাই, বাহির হইলেই দলে দলে লোক পক্ষাৎ পক্ষাৎ যায়; রাত্তার রাত্তার জনতা হইয়া লোকে আমার প্রতিবিধি লক্ষ্য করে; আমার দক্ষিণে খাট চুল দেখিয়া আমাকে ক্রীড়ান

বলিয়া নির্দ্বারণ করে, এবং তাহা লইয়া মহা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়।

‘কাম্‌টী’ব ছোঁয়া জলে স্নান করার ফল।—একদিন প্রাতঃকালে আমাব সঙ্গে বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার করিবার জন্য একমল পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সংস্কৃতে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃতেব উচ্চারণ শুনিয়া আমাদের বঙ্গদেশীয় উচ্চারণ-প্রণালীর প্রতি ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। তৎপূর্বে আমার সংস্কৃতে কথা কহা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং সংস্কৃতে কথা কহিতে আমাব একটু বাধ বাধ করিতে লাগিল। যাহা হউক, একপ্রকার বিচার চলিল। ইতিমধ্যে এক ঘটনা উপস্থিত। বামকৃষ্ণিয়ার চাকর আমার স্নানের জল আনিতেছে। আমি দেখিলাম, তাহাকে দেখিয়াই সমাগত ব্রাহ্মণেরা পরস্পর ইসারা, গা-টেপাটেপি, কানে কানে ফুস্ ফুস্ কবিতে লাগিলেন। তাহাব অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিরংকণ পরেই তাঁহারা বিচাণ বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমি উঠিয়া বারান্দার দাঁড়াইয়া দেখি, তাঁহারা বাজপথে স্থানে স্থানে জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ কাবতেছেন। ভীমরাও নামক একটা ইংরাজীভাবাভিজ্ঞ ও আমার প্রতি অমুরক্ত ব্রাহ্মণ যুবক তাহাব ভিতব হইতে দৌড়িয়া উপরে আসিয়া আমাকে বলিল যে, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া ‘কাম্‌টী’ চাকরের আনীত জলে স্নান কবিতেছি দেখিয়া সমবেত ব্রাহ্মণেরা বিরক্ত হইয়াছেন, এবং আমাকে সহব হইতে তাড়াইবার জন্য সদলে বামকৃষ্ণিয়ার নিকট বাইতেছেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, ‘কাম্‌টী’র আনীত জলে স্নান করি বলে এত আন্দোলন, আমি তাঁহাদের অন্ন খাই তা বুঝি তাঁহারা জামেন না।”

ইহার পরে ব্রাহ্মণগণ সদলে বামকৃষ্ণিয়া বেচারার ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন; বামকৃষ্ণিয়া আপনাকে বিপন্ন ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ভীমি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মাস্তোজ হইতে আনাইয়াছিলেন, সুতরাং আমাকে

প্রকাশ্যভাবে কোকনদা পরিত্যাগ করিতে বলিতে পারেন না, অথচ ব্রাহ্মণদিগের কোপশাস্তির জ্ঞাও ব্যগ্র হইলেন। তিনি আমার নিকট দেখা করিতে আসা ত্যাগ করিলেন।

আমি মহা মুন্সিলে পড়িলাম। তাঁহাকে বিপন্ন করিবার ভয়ে সেখানে আর থাকা উচিত বোধ হইল না। আমি নিরামিষাশী, ফিরিকীদিগের হোটেলেও যাইতে পারি না; আবার, খাট চুল ও দাড়ির জন্ত দেশী হোটেলের লোকেও খ্রীষ্টিয়ান মনে করিয়া তাদের হোটেলে থাইতে দেয় না। কি করা যায়? অবশেষে স্থির করিলাম, রাজমহেন্দ্রীতে বিধবাবিবাহের দল কাজ করিতেছেন, তাঁহারাও আমাকে ডাকিয়াছেন, সেখানে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সেখানে বোটে করিয়া কাটা খাল দিয়া যাইতে হয়; বোট সপ্তাহে দুই একদিন আসে; কবে আসে তার স্থিৰতা নাই; উগ্ৰুখ হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সেরূপেই বা কতদিন বসিয়া থাকি? অবশেষে রামকৃষ্ণায়ার নিকট লোক পাঠাইলাম, আমাকে পাল্কী ও বেহারা দাও, আমি রাজমহেন্দ্রী যাই। ত্রিশ মাইল পথ পাল্কীতে যাওয়া বড় কম ব্যয়সাধ্য নয়; সেই জন্তই বোধ হয় রামকৃষ্ণা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে ব্রাহ্মণতনয় ভীমরাওকে বলিলাম, “ওহে, তুমি আমার মালপত্রগুলো লইয়া যাইবার জন্ত দুইজন কুলী ঠিক কর, আমি হাঁটিয়া রাজমহেন্দ্রী যাই। বোটের জন্ত তিন চারিদিন বসিয়া থাকা ভাল লাগিতেছে না।”

এই প্রস্তাব শুনিয়া ভীমরাও বলিলেন, “কি! আপনি হাঁটিয়া রাজমহেন্দ্রী যাইবেন! তা হইতেই পারে না; আশ্বিন, আমার বাড়ীতে আশ্বিন, এ কয়দিন আমার বাড়ীতে থাকুন।” আমি বলিলাম, “না, ভীমরাও, তা হবে না; তুমি ব্রাহ্মণ, দেখলে ত, কাম্‌টীয় জলে দান করাতে কি আন্দোলন উপস্থিত! তোমাকে বিপদে পড়তে হবে। বিশেষতঃ তুমি গরীব, সামান্য কেরাণীপিরি কর, কোনওরূপে একটা ছোট বাড়ী জাড়া

কবে আছে, তার ভিতর আমাকে কোথায় নে-যাবে?" ভীমরাও কোন কপেই শুনিলেন না। বলিলেন, "আমুন না, সেই ঘরেই সকলে থাকবে। আমাকে বা সাজা দিতে চায় দেবে, আমি তা গ্রাহ্য করি না।" এই বলিয়া আমাব আপত্তির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া মাল বহিবার জন্ত কুলী ডাকিয়া আনিলেন; আমাকে লইয়া তাঁহার ভবনে উপস্থিত করিলেন, এবং তথায় লইয়া তাঁহার মাতা ভগিনী ও স্ত্রীব সহিত এক ঘরে স্থাপন করিলেন। আমি বারংবার দাবাতে মাদুর পাতিয়া বৈঠক করিলাম।

তৎপর দিন প্রাতে ভীমরাও বলিলেন যে, সম্মুখের রাস্তার অপর পার্শ্বে একটা ছাপাখানা আছে, সন্ধ্যার পর তাহার আপিসে কেউ থাকে না, তাহাদিগকে বলিয়া সায়ংকালের জন্ত আপিসটা চাহিয়া লইবেন, সেখানে লোকে আসিয়া আমাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে; কারণ অনেকে দেখা করিবার জন্ত বাঞ্ছা। আমি বলিলাম, "আচ্ছা বেশ, ঠিক কর।" তদনুসারে ভীমরাও ছাপাখানার কর্তাদের নিকট গিয়া দুই তিন দিন সন্ধ্যাকালের জন্ত তাঁহাদের আপিস-ঘরটা চাহিলেন। তাঁহারা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তদনুসারে সহরের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সম্বাদ দেওয়া হইল। কিন্তু আমরা সন্ধ্যার সময় বসিতে গিয়া দেখি, প্রেসওয়ালারা প্রেসবাড়ীতে তালা দিয়া উঠাও হইয়াছে। পরে শুনিলাম, তাহারা প্রাতে স্বীকৃত হইবার পর সহরের ব্রাহ্মণেরা সদলে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। শুনিয়া অনেক হাসিলাম, "বাপরে বাপ! বেতের জলে স্নান করার এত সাজা!"

কোকনদা স্কুল গৃহে বক্তৃতা।—পরদিন প্রাতে ভীমরাওকে হানীর ইংরাজী স্কুল কমিটির সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম। বলিলাম, "জেনে এস, তিনি স্কুলগৃহে আমাকে বক্তৃতা করিতে দিবেন কি না, এবং তিনি নিজে সভাপতি হবেন কি না।" বক্তৃতার বিষয়-হিস্ট্রী "The Brahmo Samaj, its history and its principles"।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অগ্রেই *Madras Mail* এ আমার নাম শুনিয়াছিলেন এবং আমার চিঠি পড়িয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিষয় শুনিতে ব্যগ্র ছিলেন, সুতরাং অনুরোধ করিলাম যে তিনি স্কুলগৃহ দিতে এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। বক্তৃতার পরে ইংরাজেরা আমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে চা খাইতে প্রস্তুত কি না? আমি বলিলাম, “প্রস্তুত।” তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি পরদিন বোটে রাজমহেন্দ্রী যাইব বলিয়া নিমন্ত্রণ লইতে পারিলাম না। রামকৃষ্ণিয়া বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, সহরের বড় বড় ইংরাজেরা আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছেন ও নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তখন ভিড় একটু কমিলে আমার কাছে আসিয়া কানে কানে বলিলেন, “আমার একটা বাগানবাড়ী দিতেছি, সেখানে থাকিবেন চলুন। এরা ত দেখা করিতে আসিবে, ভীমরাওর বাড়ীতে কি দেখা হতে পারে?” আমি হাসিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলাম, “আগামী কলা বোটে রাজমহেন্দ্রী যাইতেছি।”

রাজমহেন্দ্রী।—তৎপর দিন আমি বোট-যোগে রাজমহেন্দ্রীতে গেলাম, এবং সেখানে গিয়া বীরেশলিঙ্গমের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ও তাঁহার পত্নীর আতিথ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বীরেশলিঙ্গমের পত্নী একজন স্নরগীয় ব্যক্তি। একদিকে দৃঢ়চেতা, তেজস্বিনী ও কর্তব্যপরায়াণা, অপর দিকে সদয়-হৃদয়া ও পরোপকারিনী। তাঁহার মত স্ত্রী পাইয়াছিলেন বলিয়াই বন্ধুবর বীরেশলিঙ্গম্ নানা সামাজিক নির্ঘাতনের মধ্যে কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। সেখানে খুব উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ হইল।

রাজমহেন্দ্রী হইতে আমি পুনরায় মাদ্রাজে যাই। সেখানকার অল্পলোকেরা এক প্রকাণ্ড সভাতে সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রীতির চিহ্নস্বরূপ আমাকে একটা বড় উপহার দিলেন।

কোইম্বাটুর। * পঞ্চমার বাড়ীতে দুধ ও আপম্ খাওয়া।—

এই বারেই * আমি কোইম্বাটুর নগরে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে যাই। সে সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনা স্মরণ আছে। মাস্ত্রাজ সমাজের সম্পাদক রজনাত্ম মুদালিয়ার মহাশয় ও আমি একত্রে গমন করি। কোইম্বাটুর সমাজের সভাগণ পদমূর স্টেশন পর্যন্ত আগ বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রেলগাড়ীতে আমাকে বুকাইতে লাগিলেন, কোইম্বাটুরে অবস্থিতিকালে আমাকে জাতি মানিয়া চলিতে হইবে।

আমি—সে কি রকম হবে? আমি ত বহুকাল জাতি মেনে চলি নাই।

তাঁহারা—তা বল্লে কি হবে? তা না হলে এখানকার সব কাজ মাটি হবে।

আমি—আমরা বস্তুতঃ যা করি ও যা মানি তা মানুষের জানাই ভাল। আমরা জ্ঞেতের প্রশ্ন দিতে পাব্বে না।

তাঁহারা—এ বাঙ্গলা দেশ নয়। এখানে জাত বে না মানে সে খ্রীষ্টান বলে পরিত্যক্ত হয়। এখানে অনেক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও জাত রেখে চলতে বাধ্য হইয়েছেন।

(বাস্তবিক তাই। পরে আমি পৈতাধারী খ্রীষ্টান দেখিয়াছি, এবং অনেক জাতমানা খ্রীষ্টানের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে।)

এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে আমরা কোইম্বাটুরে সিরা

* এই বারের প্রচারবাচ্যায় ঐহিকার মাস্ত্রাজ সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথা হইতে একমার কোকনদা ও রাজমহেন্দ্রীর দিকে, এবং একমার কোইম্বাটুর ও খাদোলদেবের দিকে গমন করিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রমণের মধ্যে কোন্টি পুণ্য ও কোন্টি পঙ্গ হয়, তাহা স্থির করিতে পারা গেল না। ১৮৫৩ শকের বৈশাখ ও চৈত্র-মাসের তদ্বাকৌমুদীতে যে বিবরণ আছে, তাহা যথেষ্ট স্পষ্ট-সহজ।—(সম্পাদক)।

উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, তাঁহারা আমাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র বাড়ী রাখিয়াছেন। আহারের সময় এক ব্রাহ্মণ পাচক আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল। খাইতে গিয়া দেখি, কেবল আমার আসন, আমার বন্ধু রজনীনাথের আসন নাই। জিজ্ঞাসা করাতে পাচক বলিল, “তিনি অগত্যা খাইতেছেন।” কি করি, একাই খাইলাম। আহারের পর তিনি আসিলে শুনিলাম, তাঁহাকে কোথায় একটা অন্ধকার গোয়ালঘরে লইয়া খাওয়াইয়াছে; তিনি শূদ্র, তাই তাঁর এই শাস্তি। শুনিয়া আমাব বড় দুঃখ হইল। সমাজের সভ্যেরা বৈকালে আসিলে তাঁহাদিগকে বলিলাম।

আমি—তোমরা কর কি? মাস্তাজে আমি গুব বাড়ীতে আহার করি, গুব জী আমাকে রাখিয়া খাওয়ান, উনি সমাজের সেক্রেটারী, আমার বন্ধু; এখানে গুঁকে খাবার সময় অগত্যা নিয়ে যাও কেন?

তাঁহারা (হাসিয়া)—এখানে আমরা কর্তা, আমাদের বন্দোবস্ত; আপনি কিছু বলবেন না।

বন্ধু রজনীনাথও বলিলেন, “যেমন চলছে চলতে দিন, গোল করবেন না।”

কাজেই আমি মৌনাবলম্বন করিলাম, কিন্তু মনটা বড় প্রসন্ন রহিল না।

ইহার পর প্রাতে ও সন্ধ্যাতে আমাদের ভবনে সমাজের লোকের ও স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের জনতা হইতে লাগিল। প্রত্যেক সময়েই দেখি, একটা লোক উপস্থিত থাকে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে বিছানাতে বসে না, বাড়িতে বসিয়া থাকে। অহুস্কানে জানিলাম, সে একজন সমাজের সভ্য। এরূপে বসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে ব্যক্তি একজন ‘পঞ্চমা’, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ চারিবর্ণের বহির্ভূত অস্পৃশ্য লোক। সে সমাজের অস্বাভাবিক সভ্য বটে, কিন্তু অপর সভ্যগণের সহিত একাসনে বসিতে সাহস পায় না। ক্রমে তাহার ইতিবৃত্তাদি তাহার মুখে শুনিলাম।

সে পুলিশে কাজ করে, সামান্য বেতন পায়, কোইম্বাটুর সহরের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র কুটারে সপরিবারে বাস করে।

একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, “তোমার বাড়ী কতদূর? আমি তোমাব ঘর ও স্ত্রীপুত্র দেখতে চাই।”

সে—আপনি রোজ প্রাতে আমার বাড়ীর নিকট রাস্তা দিয়া বেড়াইয়া থাকেন।

আমি—বটে? তবে কাল পথে দাঁড়িয়ে থেক, আমি আসবার সময় ডেকে নিয়ো।

সে—আপনি সকালে বোড়য়ে এসে দুধ খান, আমার বাড়ী গেলে আপনার খাবার বিলম্ব হবে।

আমি—তুমি আমার জন্ত একটু দুধ রেখ, আমি খেয়ে আসব, তাহলেই ত হবে।

এ প্রস্তাবে সে আশ্চর্যান্বিত হইল। আমি তখন তাহার কারণ তত অনুভব করিতে পারিলাম না।

পৰ্বদিন প্রাতে আমি বেড়াইয়া আসিবার সময় তার বাড়ীতে গেলাম। তারা উঠানে একটা মোড়া দিল, তাহাতে বসিলাম। তার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিলাম, অনেক প্রশ্ন করিলাম, বাঙ্গলা দেশের ও ব্রাহ্মসমাজের কথা অনেক বলিলাম। তারা দুধ ও ‘আপম্’ দিল, আমি খাইলাম।

কিরিয়া আসিয়া ঘরে বসিতে না বসিতে এই কথা সহরে ছড়াইয়া পড়িল যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একজন পঞ্চমার ঘরে গিয়া দুধ ও ‘আপম্’ খাইয়াছেন। সমাজের সভ্যগণ পিল পিল করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, “হায় হায়! কি হলো, কি হলো!” আমি বলিলাম, “খাবার সময় এত কথা মনে হয় নি। আর, সে অনুবোধ করলেই বা কিরূপে অগ্রাহ কর্তাম?”

ইহার পর লোকে জানিল, আমি অর্দ্ধ লোকের অন্ন খাই। তারপর

সহরের শূদ্র ভদ্রলোকেদের বাড়ীতে সদলে আমাদের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। কয়েকদিন মহাভোজ চলিল। লোকে জানিয়া লইল যে আমি জাতি মানি না; ইহা জানিয়াও দলে দলে আমার বক্তৃতা দিতে আসিতে লাগিল। সভ্যগণের ভয় ভাবনা দূর হইয়া গেল।

বাঙ্গালোব।—এই যাত্রাতে আমি মহীশূর রাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালোর সহরেও যাই। সেখানে সেনাদলের মধ্যে এক “রেজিমেন্টাল ব্রান্সসমাজ” ছিল। এক সুবাদার সেই সমাজের প্রধান উৎসাহী সভা ছিলেন, এবং গোপালস্বামী আয়ার নামে এক ব্রান্সগন যুবক ঐ সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। সমাজের কার্য্যের জন্য উক্ত সুবাদার একটা বাড়ী দিয়াছিলেন; তাহাতে একটা বালিকা-বিদ্যালয় হইত, এবং সমাজের কাজও হইত। আমি গিয়া সেই বাড়ীতে থাকিতাম, এবং গোপালস্বামী আয়ারের বাড়ীতে আহাৰ করিতাম।

আমার যাওয়াতে বাঙ্গালোরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার বক্তৃতা শুনিতে লোকারণ্য হইতে লাগিল। একটা বক্তৃতাতে মহীশূরের সুপ্রসিদ্ধ বেণ্ডব্যান রঙ্গাচাৰু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

কমলাস্বা।—বাঙ্গালোর অবস্থিতিকালে এক ঘটনা ঘটিল, যাহা চিরদিন স্মৃতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে। একদিন এক স্থানীয় পরিবার তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া জৈশ্বরের নাম করিতে অমরোধ করিলেন। গিয়া শুনি, গৃহস্থামিনী এক ব্রান্সগন-কন্যা; তিনি বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে থাকিবার সময় এক শূদ্রের সহিত প্রণয়পাশে বদ্ধ হন, এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তার অমরুগামিনী হন। সেই অবস্থাতে একটা কন্যা জন্মিয়াছে। আমি যখন দেখিলাম, তখন কন্যাটির বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইবে। পিতার “মৃত্যু” হইলে কন্যাটি স্বীয় মাতার সহিত ব্রান্সসমাজের একজন প্রাচীন সভ্যের তত্ত্বাবধানে থাকে। সেই অবস্থাতে আশ্রয়দাতারা মেয়েটিকে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিখাইয়াছেন। আমি মেয়েটিকে উক্ত ভাষাতে

পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম । তাহার জননী তাহাকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় আনিয়া তাহার বিবাহ দিব্যর জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তখনও আমাকে অনেক স্থানে বাইতে হইবে বলিয়া আমি তাহা করিতে পারিলাম না ।

কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গালোরে আবার গিয়া মেয়েটির বিষয়ে অনু-সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে লোকে বলিল যে তাহার মায় মৃত্যু হইয়াছে, এবং মেয়েটি খারাপ হইয়া গিয়াছে । শুনিয়া বড় হুঃখ হইল । মনে করিলাম, কেন মেয়েটাকে সঙ্গে করিয়া আনি নাই, তাহা হইলে ত তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত রাখিতে পারিতাম ।

এই সংবাদে তাহার অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে একদিন সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছি, তখন হৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে “একটা ভদ্রলোকের মেয়ে আপনার সহিত দেখা করিতে চাহিতেছে ।” পার্শ্বের ঘরে গিয়া দেখি কমলান্না অর্থাৎ কমলিনী উপস্থিত । তখন ২২।২৩ বছরের মেয়ে । আমাকে দেখিবামাত্র সে আমার পায়ে কতকগুলি ফুল রাখিয়া আমার পায়ে পড়িয়া প্রণিপাত করিল, এবং আপনার পতি বলিয়া একজন শূদ্রজাতীয় ভদ্রলোককে আমার সহিত পরিচিত করিয়া দিল । ক্রমে শুনিলাম, তাহার জননীর শেষাবস্থাতে ঐ শূদ্রজাতীয় ভদ্রলোকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে । তাহার মাতার অভিভাবক সেই প্রাচীন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটী সে বিবাহ দিয়াছিলেন । ঐ বিবাহ অতি গোপনে হইয়াছিল বলিয়া লোকে জানে না । এই বিবাহের জন্য তাহার পতিকে স্বীয় সমাজে জাজিচ্যুত হইতে হইয়াছে, ইত্যাদি । শুনিয়া আনন্দিত হইলাম । এই বিবরণটা নূতন ধরণের বলিয়া স্মরণ আছে । ইহার পরে আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই ।

মাস্ত্রাজে দ্বিতীয় বার ।—আমি সে মাসে মাস্ত্রাজে গমন করিয়া

কলিকাতায় কিরিয়া আসি। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় মাস্ত্রাজ হইতে ঘন ঘন টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল,—আসুন, আসুন, আসিতেই হইবে। ব্যাপারখানা এই। নববিধানের প্রচারক অমৃতলাল বসু মহাশয় তখন মাস্ত্রাজ প্রদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া মাস্ত্রাজে আসিয়াছিলেন। অমনি আমাদের বুচিয়া পাণ্টুলু ভায়া ভয় পাইয়া ঘন ঘন পত্র লিখিতে ও টেলিগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি যে কাজ গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহা বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়। এরূপ স্থলে যাওয়া উচিত ছিল কি না সন্দেহ। বাহা হউক কমিটি আমাকে পাঠাইলেন। গিয়া কার্য আরম্ভ করিলাম। অমৃত বাবুর সঙ্গে আমার বহুদিনের আত্মীয়তা, স্মৃতরাং বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিতাম; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ চলিল। এই সময়ে আমি “The New Dispensation and the Sadharan Brahmo Samaj” নামে ইংরাজী পুস্তক রচনা করি। তাহা মাস্ত্রাজ হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

দ্বিতীয়বার মাস্ত্রাজে গেলে মাস্ত্রাজবাসী ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদের সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীর সন্নিকটে একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে আমাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ভবনে দুই বেলা আহার করিতাম, তাঁহার পত্নী ভগিনীর ন্যায় রন্ধন করিয়া আমার নিকট বসিয়া খাওয়াইতেন। আমি সমস্ত দিন পাঠ চিন্তা ও গ্রন্থরচনাদিতে যাপন করিতাম, বৈকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইতাম।

দুর্ভিক্ষের অনাথ শিশু।—একদিন আমি একজন ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি; পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক একটি অল্পবয়স্ক শিশুকে ভয়ানক প্রহার করিতেছে। শিশুটি অসহায় হইয়া চীৎকার করিয়া কাদিতেছে। তাহার চীৎকার শুনিয়া আমি দাঁড়াইয়া গেলাম। মনে করিলাম সে ব্যক্তি শিশুটির পিতা, কোন অপরাধের জন্য বৃষ্টি শাসন করিতেছে।

টাডাইয়া সঙ্গেব একজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ও কি ওর পিতা? এত মারিতেছে কেন?” তিনি বলিলেন, “ও ব্যক্তি ওর পিতা নয়, ওর কেহই নয়, ওই ছেলেটা পিতৃমাতৃহীন। ওর মাথা বাখিবার স্থান নাই, রাত্রে ভদ্রলোকেব বাড়ীৰ দরজায় বারান্দায় পড়িয়া ঘুমায়। পেটেব ভাত জোটে না, লোকেব বাড়ী ভিক্ষা কবিয়া খায়। ওই মানুষটা ওই ছেলেটাব সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে, ছেলেটা নহবেব গৃহস্থদেব দবজা হইতে কয়লা কুড়াইয়া আনিয়া দিবে। মানুষটা ৫ চাব দশ দিন অন্তব হয়ত একটা পয়সা দিবে। মাব খাবার ভয়ে ছে’টা কয়লা আনে। আজ কয়লা আনে নাই বলিয়া মার খাইতেছে।” অল্পসন্ধানে জানিলাম, কয়েক বৎসব পূর্বে মাদ্রাজ প্রদেশে বে হুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তখন বহুসংখ্যক শিশু পিতৃমাতৃহীন হয়। ইহাদের অনেক-গুলিকে খৃষ্টীয়ান মিশনবিগণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদের অনাথালয়ে আশ্রয় দিয়াছেন, কিন্তু বহুসংখ্যক শিশু নিরাশ্রয় অবস্থাতে বাস করিতেছে। আমি অনেক দিন প্রাতে এইকপ বালক-বালিকাদিগকে ভদ্রলোকেব ঘাবেব সম্মুখস্থ বারান্দাতে পড়িয়া ঘুমাইতে দেখিয়াছি। এই দৃশ্য দেখিয়া ও এই বিবরণ শুনিয়া আমার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। সেই খাবাপ মন লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ দেখা করিতে আসিলে তাঁহাদিগকে বলিলাম, “হয় এইকপ পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকার রক্ষা ও শিক্ষার জন্ত কিছু করুন, নতুবা সমাজ মন্দিরে বড় বড় কথা বলবার ফল কি?” আমার হৃৎক দেখিয়া একজন ব্রাহ্মবন্ধু সেই প্রাতেই রাত্তা হইতে এইকপ একটা বালক ডাকিয়া আমার নিকট আনিিলেন। সে প্রথমে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চায় না। ওরূপ জাতিব্রহ্ম বালকদের ভদ্র-লোকদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, এই সংস্কার থাকাত্তে সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনেক বলাতে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া

উঠানে আসিল। আমি উপরে আসিবার জন্য কত ডাকিলাম, কোন মতেই আসিল না। অবশেষে খাইতে দিবার জন্য একখানি “আপম্” লইয়া নীচে গেলাম। আমি বলিলাম, “হাত পাত।” হাত পাতিল, কিন্তু আমি যখন “আপম্” দিতে গেলাম, তখন পাছে হাতে হাতে ঠেকাঠেকি হয় এই ভয়ে হাত সবাইয়া হইল। তখন আমি তাহার হাত ধরিয়া হাতে আপম্‌খানা দিলাম, এবং তাহাকে টানিয়া উপরে লইয়া গেলাম। একটা ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, সে ঘরে সে ব্রাত্রে থাকিবে; এবং যে বাড়ীতে আমি খাই সে বাড়ীতে খাইতে পাইবে। এই বলিয়া চাকরের হাতে তাহাকে দেখিবার ভার দিয়া বন্ধুর বাড়ীতে আহ্বার করিতে গিয়া তাঁহার পত্নীকে সমুদয় বিবরণ বলিয়া তাহাকে খাইতে দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি স্বীকৃত হইলেন। ছেলেটী কিছুদিনের মত আমার কাছে থাকিয়া গেল।

আমি নিশ্চিন্ত আছি যে সে যথা সময়ে আহ্বার পাইতেছে। কিন্তু একদিন প্রাতে কোন কাজে বাহির হইয়া বাড়ীতে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল। আমার আহ্বারের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আমি আহ্বার করিতে গিয়া দেখি, বাহিরের দরজার সম্মুখে রাস্তার উপরে একখানা পাতে কুকুরের মত ছেলেটাকে ভাত দেওয়া হইয়াছে; সে বসিয়া আহ্বার করিতেছে। দেখিয়া ভিতরে গেলাম। আহ্বারে বসিয়া বন্ধুর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার ছেলেটাকে কুকুরের মত রাস্তার ভাত দেওয়া হয় কেন?” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “ওর যে জাত গেছে। ওশ্রেণীর লোক ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবেশ করতে পার না। ওরা সকলেই ত রাস্তায় খায়।”

তার পর তাঁহার সঙ্গে যে কথোপকথন হইল তাহা এই।—

আমি—তুমি কি মনে কর, আমার জাত গেছে কি আছে? তুমি
ত জান, আমি সকল জাতির বাড়ীতে খাই। কতদিন তোমাকে বলে

গিয়েছি, অমুক কিরিস্টীয় বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ আছে, আমার ভাত্ত করে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয়ে পৈতা ত্যাগ করে, এবং বান-তার বাড়ী খায়, তাব কি জাত থাকে? তবে আমাকে তোমার নিজের ঘরব ভিতর থেতে দাও কেন?

বন্ধুপত্নী (হাসিয়া)—আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি বা করেন তাই শোভা পায়। আপনি ব্রাহ্মণই আছেন।

আমি—ওটা তোমার ভালবাসার কথা।

আমাব বন্ধুপত্নীর আমার প্রতি এই অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় অল্পদিনেব মধ্যেই পাইলাম। কয়েকদিন পরে তিনি তাঁহার জোড়া কতাকে আমার নিকট আনিয়া বলিলেন, তাহার গর্ভে সন্তান বক্ষা হয় না, হইবাব নষ্ট হইয়াছে, তাহাকে এমন কিছু ঔষধ দিতে হইবে, যাহাতে সন্তান রক্ষা পায়। আমি হাসিয়া বলিলাম, “আমি ত চিকিৎসক নই! ঔষধ আবার কি দিব?” তিনি বলিলেন, “আপনি ওর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করুন, এবং পদধূলি দিন, তাহলেই ওর সন্তান বক্ষা হবে।” যিনি জাতিভ্রষ্ট ছেলেকে রাস্তায় কুকুরের মত ভাত দিতেছিলেন, অপর দিকে তাঁহার এই নিষ্ঠা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

এইস্থানে ইহা বক্তব্য যে সেই ছেলেটা আমাদের এত বড় সঙ্কেত এক সামাজিক উৎসবদিনে আমাদের বাড়ী হইতে পলাইয়া গেল। অনেক খুঁজিয়াও আর পাওয়া গেল না। পরে শুনিলাম, আবার রাস্তায় ঘুরিতেছে। শুনিয়া ভাবিলাম, এই শ্রেণীর বালকবালিকাদের সর্বপ্রধান বিপদ এই যে, নিরাপদে বাস করা ও নিরাময়ীণ থাকার তাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া যায়। যাহা হউক, এই অনাথ বালকবালিকার জন্য উৎকর্ষী বৃথা-গেল না। মাস্ত্রাজে, অক্ষবন্ধুপত্নী ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের মন্দিরসংলগ্ন গৃহে “শ্রীমতী, মন্দির

Rammohun Roy Rigged School” নামে অনাথ শিশুদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহা ক্রমে একটি Middle English School হইয়া দাঁড়াইল।

Dancing Girls.—আমি একটি ঘটনাও বোধ হয় সেইবারে কি ৩৭শব্দবারে ঘটয়াছিল, সেটাই এই সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। আমি মাস্তাজ বাসকালে অনেক ভদ্রলোকের মুখে তাঞ্জোর হইতে সমাগত গায়কদিগের গানবাণের বড় প্রশংসা শুনিতে পাইতাম। ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে বলিয়াছিলাম, তাঞ্জোরের গায়কগণ কোথাও গাহিতে আসিয়াছে শুনিলে আগায় বলিবেন, আমি গিয়া গান শুনিব। তাঁহারা এই কথা লইয়া নিশ্চয় লোকের সঙ্গে বলাবলি করিয়া থাকিবেন; কারণ, একদিন একজন মাস্তাজী ভদ্রলোক (যিনি সমাজের সভ্য নহেন) আসিয়া আমাকে তাঁহার ভবনে তাঞ্জোরের গায়কদিগের গান শুনিতে বাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

আমি তৎপূর্বে অনেক স্থলে দেখিয়াছিলাম যে Dancing Girls নামে এক শ্রেণীর কুলটা স্ত্রীলোক আছে, দেবমন্দিরে পরিচর্যা করা তাহাদের প্রধান কার্য, এবং অনেক স্থলে দেবদাসী বলিয়া তাহারা পরিচিত। তাহাদের অবস্থা সাধারণ বৈশ্যদিগের অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত। তাহারা অবাধে ভদ্রলোকদের বাড়িতে যাতায়াত করে, বিবাহাদি উৎসবে নৃত্যপীত করে, ভদ্রলোকেরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লজ্জা বোধ করেন না। এমন পারিবারিক উৎসব হয়ই না, যেখানে এই স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকে না। আমি মাস্তাজ প্রদেশে তাহাদের সর্বত্র গতি ও বেশামেশি দেখিয়া লজ্জিত ও চূর্ণিত ছিলাম। সুতরাং ভদ্রলোকটী যখন আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন মনে ভয় হইল পাছে এইরূপ স্ত্রীলোকের ডিঙরে গিয়া পড়ি। তাই উপস্থিত একটি ব্রাহ্মবন্ধুকে পোপনে ডাকিয়া কানে কানে সেই আশঙ্কা জানাইলাম। তিনি গিয়া

ভদ্রলোকটির সহিত কি কথা कहিলেন জানি না, আমাকে আসিয়া বলিলেন যে ভদ্রলোকটি বলিয়াছেন, আমাকে Dancing Girlদের মধ্যে ফেলা হইবে না। তখন আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, ও সেইদিন অপরাহ্নে গান শুনিতে গেলাম।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখি, একটা পাশের ঘরে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থান। সেখানে অনেক ভদ্র স্ত্রীলোক বসিয়া গান শুনিতেছেন। আমি নির্ভয়ে গিয়া আসরের মধ্যে বসিলাম, এবং গীতবাদ্য শুনিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিন চারিটা সুসজ্জিত নানা অলঙ্কারে ভূষিত যুবতী মেয়ে সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। গৃহস্থারী উঠিয়া সমাদর পূর্বক তাহাদিগকে সেই আসরে আমার পার্শ্বে বসাইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, তারা বুঝি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হবে, তাই তাহাদিগকে মেয়েদের সাধারণ ঘরে না বসাইয়া আসরের মধ্যে বসাইল। ভদ্রলোকটি আমাকে কথা দিয়াছিলেন যে Dancing Girlদের মাঝে আমার ফেলিবেন না, সুতরাং আমার মনে সে চিন্তাও আসিল না। কিন্তু আমি চাহিয়া দেখি যে যে-হই ব্রাহ্মবধূ আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পর চোখোচোখী করিয়া হাসিতেছেন। তখন আমি তাঁহাদিগকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম, “Who are they?” তাঁহারা উত্তর করিলেন “They are Dancing Girls.” আমি তখনি সে আসর হইতে উঠিয়া দাড়াইলাম, এবং সে স্থান ত্যাগ করিবার জ্ঞাত প্রস্তুত হইলাম। তখন গৃহস্থারী আমার সম্মুখে মাটিতে মাথা দিয়া পড়িয়া গেলেন এবং আমাকে আসর ত্যাগ করিতে নিবেদন করিতে লাগিলেন। এই বিবরণ লইয়া আসরের মধ্যে একটা আন্দোলন ও কানাকানি হইতে লাগিল। Dancing Girls আসিয়াছে বলিয়া চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া সমাগত ব্যক্তিগণ হাঁ করিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাওনি করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকগুলির ত কথাই নাই। ‘তাহারা’ ‘একল’ ব্যবহার, কখনও কোথাও গায়

মাই, স্মরণে রাখি করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। আমি অল্পনূন বিনয় করিয়া গৃহস্বামীর হাত ছাড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

সেইরাত্রই সেই কথা স্মরণে ছড়াইয়া পড়িল। “ওরে ভাই, শুনেছিস, Dancing Girls এসেছিল বলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেস্থান পরিত্যাগ করে গিয়েছেন!” তৎপরদিন আমি বেড়াইতে বাহির হইলেই লোকে গা-টেপাটেপি করে, ও আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। কোন কোন ভদ্রলোক সাক্ষাতে আমার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন, “আপনি একটা সামাজিক ব্যাধির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। ভদ্রলোকেরা দেখুক, সমাজের অবস্থা কি!”

মাস্ত্রাজ হইতে আমি বোম্বাই গমন করিলাম, এবং কিছুদিন পরে কলিকাতায় ফিরিলাম।

যতুমণি ঘোষ।—মাস্ত্রাজ হইতে কলিকাতা ফিরবার পর, বোধ হয় ইহার কিছু পরে, একটা ঘটনা ঘটে যাঁহা উল্লেখযোগ্য। একদিন প্রাতে ৯৩ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীটে বাসিয়া ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের বা তত্ত্বকৌমুদীর কাপি লিখিতেছি, এমন সময় যতুমণি ঘোষ নামে একজন ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া উপস্থিত। ইনি উড়িষ্যাজাত বাঙ্গালী ছিলেন, এবং ইঁহাকে আমরা কেশববাবুর বিশেষ অঙ্গুগত প্রচারকদলে-প্রবেশার্থী শিষ্য বলিয়া জানিতাম। আমি উঠিয়া অভ্যর্থনা করিতে না করিতে যতুমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাই, বিনা টাম্পে হ্যাণ্ডনোটে নাগিশ চলে কি না?”

আমি—বহুদূর বহুদূর, সে কথা পরে হবে।

যতুমণি—পরে বসছি, বলুন না, নাগিশ চলে কি না?

আমি—বহুদূর আনি, চলে না।

যতুমণি—হ্যাঁ, তবে ত কামান্ন অনেক হাজার টাকা গেল।

আমি—সে কি ? কার নামে নালিশ করবেন ?

যতুমণি—কেশবচন্দ্র সেনের নামে ।

আমি—সে কি ! কেশব বাবুর নামে নালিশ !

তৎপরে যত্ন বাবু বলিলেন যে, কেশববাবু কমলকুটির কিনিবার সময় তাঁর নিকট কয়েক সহস্র টাকা কর্জ লইয়া একখানি হাওনোট লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ষ্ট্যাম্প দেন নাই । পরে কথা হইয়াছে যে, কমলকুটিরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ী-পাড়ায় যতুমণির জন্ত একটি বাড়ী নির্মিত হইবে । সেই জমির দাম ও গৃহনির্মাণের ব্যয় বাদে যে টাকা প্রাপ্য থাকিবে তাহা যতুমণিকে প্রদত্ত হইবে । এই প্রস্তাবে যতুমণি স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহার চিত্ত বিচলিত হইয়াছে ।

আমি বলিলাম, “বিনাষ্ট্যাম্পে হাওনোটখানা দেওয়া ভাল হয় নাই । যদি হাওনোট দিলেন, তবে ষ্ট্যাম্প দিয়ে দেওয়াই ভাল ছিল । কিন্তু আপনি এজন্ত কেশববাবুর প্রতি সন্দেহ করলেন কেন ? হাওনোটেরই বা কি প্রয়োজন ? তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির অংশ কি নাই ? তিনি কি মনে করলে আপনার টাকা দিতে পারেন না ? আর আপনি তাঁকে না বলেই বা ছুটে বাহির হলেন কেন ?”

দেখিলাম, তাঁহাকে বুঝাইয়া শাস্ত করাই দায় । তাঁহার চক্ষুচটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই মনে হইল, উন্মাদের লক্ষণ । তৎপরে যে ভয়ানক কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আর আমার সন্দেহ রহিল না । তিনি বলিলেন, “গত কল্যা বৈকালে ঐ আমার দুধ জাল দিতেছিল, কেশব বাবুর গৃহিণী ঝিকে বলিলেন, ‘ঝি, তুই কাজে যা, আমি দুধ জাল দিচ্ছি ।’ বলিয়া দুধ জাল দিতে বসিলেন । বলুন, আমার দুধ জাল দিবার জন্ত কেশব বাবুর জীর এত গরজ কেন ?”

আমি—এ ত খুব ভাল কথা ; এজন্ত শু তাঁর প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত । আপনি তাঁদের বাড়ীতে থাকেন, তাঁরা রান্নাবান্ন করে

দেখেন ; বিন্ন অল্প কাজ আছে, তাকে সরিয়ে ঠাকরণ আপনার দুধ জাল দিতে বসলেন, এ ত মায়ের কাজ করলেন। এর ভিতরে আবার কি আছে ? তাঁর ভালবাসার জন্ত তাঁকে ধন্যবাদ করা উচিত।

যদুমণি—না, আপনি বুঝলেন না ! আমাকে বিব খাওয়াবার চেষ্টা, তা হলে আর টাকাগুলো দিতে হবে না।

আমি—(ছুই কানে হাত দিয়া) ছি, ছি, এমন কথা শুনলেও পাপ হয়। আপনি ঐ সাধবীসতী সরলহৃদয়া নারীকে আজও চেনেন নাই।

যদুমণি—আচ্ছা, আমি ভুবনমোহন দাস এটর্নির নিকট চললাম। আইনানুসারে কি করা যায় আমাকে দেখতে হবে।

আমি উঠিয়া হাতে ধরিলাম, “বসুন বসুন, যা করবার আমরা করে দেব, ব্যস্ত হবেন না। স্নান করুন, আহাৰ করুন, শান্ত হোন।”

তিনি আমার অমুরোধ উপরোধের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া ভবানীপুর যাত্রা করিলেন।

আমার লেখা পড়িয়া রহিল, আমি তখনি ভুবনমোহন দাসকে লোকের হস্তে এক পত্র পাঠাইলাম, যেন এই উদ্ভাদগ্রস্ত ব্যক্তির কথায় তিনি কর্ণপাত না করেন। ভুবন বাবুকে পত্র লিখিয়াই কমলকুটীরে কেশব বাবুর নিকট ছুটিলাম। তাঁহাকে গিয়া সমুদয় বিবরণ বলিলাম।

কেশব বাবু—কি আশ্চর্য্য ! ওর মনে মনে এত সন্দেহ হচ্ছে, তার কিছুই ত আমাকে জানতে দেয় নি।

আমি—এই ত আমারই আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। আপনি হাণ্ডনোট যদি দিলেন, তাতে ষ্ট্যাম্প দেওয়া উচিত ছিল। ঐটে তার সন্দেহের কারণ হয়েছে।

কেশব বাবু—আরে, ঐ হাণ্ডনোট কি সে নেয় ? কোনও মতে নিতে চায় না ; অবশেষে কতটা টাকা নেওয়া গেল তার একটা লিখিত নিদর্শন তার কাছে রাখবার জন্ত আমি জোর করে এটা লিখে দিলাম।

তিনি বলিলেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে তার টাকা ফেলিয়া দিবেন, এবং পরে তাহাই দিয়াছিলেন। যতুমণির জন্ত যে বাড়ী নির্মিত হইয়াছিল, তাহা অপরকে দেওয়া হইল।

যতুমণি টাকা লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। পরিশেষে ইউরোপে গিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ভুবনমোহন দাস মহাশয়ও এটর্নিব পত্র না দিয়া টাকাটা ফেলিয়া দিবার জন্ত অন্তর্বোধ করিয়া কেশব বাবুকে বন্ধুভাবে গোপনে পত্র লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু হায়, বলিতে লজ্জা হইতেছে! দলাদলিকে শত ধিকার দিতে হচ্ছা করিতেছে! ইহা মানব-প্রকৃতিকে কিরূপ বিকৃত করে ভাবিয়া শঙ্ক হইতেছে! ইহার পরেও কেশব বাবুর অমুগত প্রচারকগণ তাঁহাদের সংবাদপত্রাদিতে শ্লেষ করিয়া লিখিলেন যে, বিরোধীদল কি কম করিয়াছেন, আচার্য্যের নামে নালিশ পর্য্যন্ত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং ঐ শ্লেষের ভঙ্গীতে বৃষ্টিতে পারা গেল যে, তাঁহাদের অভিপ্রায় যে আমি প্রধানতঃ ঐ কার্য্যে উদ্যোগী ছিলাম। ঐ শ্লেষোক্তি পাঠ করিয়া আমার চক্ষে জলধারা বহিল, এবং দলাদলির অনিষ্ট ফল মনে বড়ই আগিয়া উঠিল।

বোড়শ পরিচ্ছেদ ।

প্রমদাচরণ সেন । নীতি বিদ্যালয় । “মুকুল” । “ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার” ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস । বড়বেলুন-গ্রামে প্রচার যাত্রা । কেশব-

চন্দ্রের স্বর্গারোহণ । খাসিয়াঙ্গে নির্জনবাস । “হিমাদ্রি-

কুম্ভম” । আসামে প্রচার যাত্রা । কাশীতে

পিতাঠাকুর মহাশয়ের গুরুতর

পীড়া । দ্বিতীয় কন্যা

তরঙ্গিনীর বিবাহ ।

১৮৮২-১৮৮৮

ইহার পরে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে যে যে বিশেষ কাজ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিতেছি ।

প্রমদাচরণ সেন ।—প্রথম, এই সময়ের মধ্যে বালক-বালিকাদিগের জন্য দুইটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় স্থাপিত হয় । প্রথমটির প্রধান উদ্যোগकर्তা ছিলেন, “সধা”-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন । প্রমদা হেয়ারস্কুলে আমার নিকট পড়িত, এবং সে সময় আমি ছাত্রদিগকে লইয়া যে-সকল সভা সমিতি করিতাম তাহাতে উপস্থিত থাকিত । সেই সময় হইতে সে আমাকে পিতার স্থান ভাল-বাসিত এবং সর্ববিষয়ে আমার অনুসরণ করিত । ধর্মপুত্র কথাটি যদি কাহারও প্রতি খাটা উচিত হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে প্রমদা আমার ধর্মপুত্র ছিল । ইহার পরে সে ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হয় এবং আমার বাড়ীর ছেলের মত হয় । সিটিস্কুল স্থাপিত হইলে সে তাহার একজন শিক্ষক হইয়াছিল । সে উদ্যোগী হইয়া অপর কয়েক জন যুবক বন্ধুকে লইয়া সিটিস্কুল ভবনে বালকদিগের জন্য একটা নীতিবিদ্যালয় স্থাপন করে । সাক্ষাৎ

ভাবে আমার সহিত ঐ নীতিবিদ্যালয়ের যোগ ছিল না, কিন্তু আমি তাস্তর উৎসাহদাতা ও পরামর্শদাতা ছিলাম। মধ্যে মধ্যে তাহাতে উপস্থিত থাকিতাম ও উপদেশ দিতাম।

নীতিবিদ্যালয়।—যে নীতিবিদ্যালয়টাব সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিল, তাহা ১৮৮৪ সাল হইতে আমাদের উপাসনা-মন্দিরে বসিল। হহাব প্রধান উত্তোগকাবিণী ও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, আমাদের কয়েকটি কন্যা। গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা লাণ্যপ্রভা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী, এবং আমাব কন্যা হেমলতা। হেম ইহাদের মধ্যে বয়সে সবকনিষ্ঠা ছিল। আমি এই নীতিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকর্তা ও উৎসাহদাতা ছিলাম। এই কন্যাদেব সঙ্গে বসিয়া ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ কবিতাম, নীতিবিদ্যালয়ের কার্যাদি বিষয় পরামর্শ কবিতাম, ইহাদের সকল কাজে সঙ্গে থাকিতাম।

“মুকুল”—কয়েক বৎসব পবে (১৮৯৫ সালে) ইহার বালকবালিকা-দিগের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহিব করিবার সংকল্প করিলেন। তখন আমি তাহার সম্পাদক হইয়া “মুকুল” নাম দিয়া এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম এবং কিছু দিন তাহার সম্পাদকতা করিলাম। ঈশ্বর-রূপায় ঐ নীতিবিদ্যালয় এখনও আছে, এবং প্রতি বিবিবার প্রাতে ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে তাহার অধিবেশন হইয়া থাকে।

“ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার”—১৮৮৩ সালে আমাকে আর একটা কাজে হস্তার্পণ করিতে হয়। আমাদের সমাজের ইংরাজী সংবাদপত্র “ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন”র (Brahmo Public Opinion) যে তাবে ভ্রম হইয়াছিল, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই কালের মধ্যে তাহাতে দুইটা পরিবর্তন ঘটে। প্রথম, ভুবনমোহন দাস মহাশয় ইহার রাষ্ট্রনীতিক ভাগের সম্পাদকতা ত্যাগ করেন; দ্বিতীয়ত, যে দুই বন্ধু ইহার সম্পাদক হইয়া ইহার পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহারা সে ভার

ত্যাগ করেন। তখন সমাজের উহার স্বত্বাধিকারী হওয়া আবশ্যক হয়, এবং আমি প্রস্তাব করি যে কাগজের নাম পরিবর্তন করিয়া, তাহাকে ধর্মভাবপ্রধান করিয়া রাজনীতিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া একখানি কাগজ বাহির করা হউক। তদনুসারে “ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার” (Indian Messenger) নামে কাগজ বাহির করা হয়, এবং আমি তাহার সম্পাদক হই।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস।—“ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার” প্রথমে অন্যের ছাপাখানাতে ছাপা হইত, তাহাতে অধিক ব্যয় লাগিত এবং প্রেসের সহিত আমার সর্বদা ঝগড়াঝাটি হইত। সেজন্য সমাজের স্বতন্ত্র প্রেস করা আবশ্যক বোধ হইল। কিন্তু সমাজের সভাগণ অগ্রে একটী প্রেস করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আর প্রেস স্থাপন করিতে নারাজ হইলেন। স্বর্গীয় বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয় কমিটিতে বার বার আমার প্রস্তাবে বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই কয় বৎসরে আমার মনের ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, যেটী আমি সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করিতাম সেটী আমাকে করিতেই হইত। বন্ধুরা যদি বাধা দিতেন তাহা হইলে নিজের শক্তিতে কুলাইলে নিজেই সে কাজ করিতাম, পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া সে কাজে লইবার চেষ্টা করিতাম। তদনুসারে নিজে টাকা কর্জ করিয়া “ব্রাহ্মমিশন প্রেস” (Brahmo Mission Press) নামে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলাম। ঐ ঋণ গয়ে প্রেসের টাকা হইতে শোধ করা হইয়াছে।

এই প্রেস স্থাপন বিষয়ে আমাকে অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অক্ষরওয়ালার সহিত অক্ষরের বন্দোবস্ত করা, বাজারে গিয়া প্রেস প্রভৃতি ক্রয় করা, প্রিন্টার প্রভৃতি নিযুক্ত করা, কাজ চালাইবার উপযুক্ত লোক প্রভৃতি স্থির করা, প্রতিদিন তাহাদের কার্য পরিদর্শন করা, প্রভৃতি সমুদয় কাজ করিতে হইত। ওদিকে এই

মুদ্রায়ন্ত্র সমাজের সম্পত্তি করাইবার জন্য সমাজের কমিটিতে গান্ধীপ্রমুখ বঙ্গগণের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে হইত।

বঙ্গুরা কেহ কেহ বলিতেন, “নিজে টাকা ধার করিয়া প্রেস করিয়াছেন, নিজের সম্পত্তি করিয়া রাখুন না? এত ঝগড়া কেন?” আমার মনের ভাব সন্দেহ ছিল না। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সমাজের নিজের একটি মদ্রায়ন্ত্র চাই, যাহা হইতে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারোপযোগী পুস্তক পুস্তিকাদি প্রকাশিত হইবে। এই জন্যই ইহার নাম ‘ব্রাহ্মমিশন প্রেস’ রাখিয়াছিলাম, এবং সমাজের হস্তে ইহাকে অর্পণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। কমিটির সভ্যগণকে আমার ভাবপত্র করিতে না পারিয়া কয়েক বৎসর প্রেসটি নিজের হাতে রাখিতে হয়, এবং চিন্তার ভার গ্রহণ করিতে হয়। অবশেষে ১৮৮৭ সালে সমাজ ইহা গ্রহণ করেন।

বড়বেলুন গ্রামে প্রচার বাজা—১৮৮৩ সালের একটি শ্রমণীক বিবয়, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বড়বেলুন নামক গ্রামে প্রচারবাজা। এই গ্রামে গুণ্যদাপ্রসাদ সরকার নামে একজন অমুরাগী ব্রাহ্ম বাস করিতেন। তিনি কয়েকজন বন্ধুকে তাঁহার গ্রামে গিয়া ২৪শে মে তারিখে ব্রহ্মোৎসব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া ষথাসময়ে বড়বেলুনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমরা গিয়া গুণ্যদাপ্রসাদের নির্মিত একটি খড়ের ঘরে আশ্রয় লইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি একটা যুবককে কি জিনিস ক্রয় করিবার জন্য বাজারে পাঠাইলাম। সে আসিয়া সংবাদ দিল যে দোকানে আমাদেরকে জিনিসপত্র বিক্রয় করিবে না। আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইল। কারণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য অনেকবার অনেক নগরে ও গ্রামে গিয়াছি, কিন্তু মানুষের একপ্রকার ভাব কোথাও দেখি নাই। গুণ্যদাপ্রসাদ আসিয়া বলিলেন, গ্রামের জমিদারবাবু দোকানদারদিগকে

কলিকাতা হইতে সমাগত বাবুদের জিনিসপত্র যোগাইতে ব্যয় করিয়াছেন। পুণ্যদাগ্রসাদ নিজে দরিদ্র, তথাপি তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় যাহা কিছু যোগাইতেন ; কিন্তু তাঁহার বাড়ীর লোক বিরূপ, এবং দোকানীরা তাঁহাকেও কিছু দিবে না।

শুনিয়া আমার বড় হাসি পাইল। বলিলাম,—“এস, উপাসনা ত করি, তার পর দেখা যাক কি দাঁড়ায়।” এই বলিয়া স্নানান্তে আমরা উপাসনাতে বসিলাম। উপাসনান্তে উঠিয়া দেখি যে, পাশের ঘরেতে কে আমাদের জন্য জলখাবাব ও বাঁধিবাব জন্য চাউল, ডাল, তবকারি প্রভৃতি ও ভোজনপাত্রের জন্য বড় বড় পদ্মপাত রাখিয়া গিয়াছে। দেখিয়া ত আমাদের বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। উত্তমরূপে জলযোগ করিলাম। আমাদের একজন সেই পাশেব ঘবেই উছন কাটিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে উত্তম আহার কবা গেল।

বৈকালে আমরা ধর্ম্মালোচনাতে নিযুক্ত আছি, এমন সময় কে আসিয়া সেই পাশের ঘরে আমাদের বৈকালে খাইবার সমুদয় আয়োজন রাখিয়া গিয়াছে। পুণ্যদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে এইরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতেছে। তিনি কিছু সন্ধান বলিতে পারিলেন না।

পরদিনও এইরূপ চলিল। আমরা ব্রহ্মোৎসব করিলাম ; উপাসনা, পাঠ, ধর্ম্মালোচনাদি সকলি চলিল ; কিন্তু গ্রামের এক প্রাণী একবার উকি মারিল না। তৃতীয় দিবস প্রাতে আমি বলিলাম, “গ্রামের এক প্রাণী ত এল না, চল আজ নগবকীর্তনে বাহির হই।” আমরা ৭টার সময় নগবকীর্তনে বাহির হইলাম ; দেখি, মধ্যরাত্রে গ্রাম যেমন নিস্তরু থাকে, তেমন নিস্তরু। যে পথ দিয়া যাই, সে পথের সকল বাড়ীর দ্বার বন্ধ, জনমানবের দেখা নাই। আমি বলিলাম, “আজ্ঞা করিয়া কীর্তন কর ত, লোকে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া আছে তাই থাক, জন্মের দয়ার কথা কানে ঢালিয়া দাও।” খুব উৎসাহে কীর্তন চলিল।

পৰ্থমধ্যে এক বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত। দেখি, একজন লোক নগ্নদেহে হহুয়া তাহার পরিধানের ধুতিখানি মাথায় বাঁধিয়াছে, এবং তাহার হুকাটি বাণীব মত করিয়া নাচিতে নাচিতে আমাদের দিকে আসিতেছে। আমি বন্ধুদিগকে বলিলাম, “ওদিকে চাহিও না, গেয়ে চলে যাও।” কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, সে লোকটি লজ্জা পাইয়া কাপড় পরিয়াছে এবং অধোবদনে একদিকে চলিয়া বাইতেছে। তাবপব কিয়দূর অগ্রসর হইলে আর এক বিয় উপস্থিত হইল। দেখি, একদল নিয়শ্ৰেণীর লোক মদ খাইয়া, ঢোল প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে ও চীৎকার করিতে করিতে হুডমুড কবিয়া আমাদের উপবে আসিয়া পড়িল। আমি সঙ্গীদিগকে বলিলাম, “ওদের যাবার পথ ছেড়ে দাও, তোমাদের গান চলুক, ওদিকে চেয়ে দেখো না।” তাহাবা পথ পাইয়া চলিয়া গেল। আমরা আবার অগেসব হইলাম। শেষে আমবা একটা চৌবাস্তায় গিয়া উপস্থিত। আমি বলিলাম, “দাঁড়িয়ে খুব কীর্তন কব, দেখি ওরা কতক্ষণ দ্বার বন্ধ কবে থাকে।” কীর্তন খুব জমিয়া গেল। অন্তে না শুদ্ধক, আমাদের কঠিন হৃদয় আৰ্জ হইতে লাগিল। শেষে দেখি, খট করিয়া একটা বাড়ীর দরজা খুলিল ও কয়েকজন লোক আসিয়া আমাদের নিকট দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি আর-একটা বাড়ীর দরজা খুলিল, আবার কয়েকজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্যক লোক আমাদের দিকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন আমি বলিলাম, “আমাকে একটা উচু কিছু এনে দেও ত, আমি কিছু বলব।” পুণ্যদা ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ কোনও এক বাড়ী হইতে একটা খালি কোয়েসিনের বাস্ক আনিয়া দিলেন; আমি তাহার উপরে উঠিয়া বক্তৃতা আবস্ত কবিলাম। “তোমরা দ্বার দিলে ছিলে কেন? ভগবানের নাম শুনবে না? ভগবানকে সঙ্গে কি তোমাদের বিবাদ আছে? তিনি ত সকলের প্রভু, সকলের পরিত্রাতা, ইত্যাদি ইত্যাদি।” এমন জোরে ও হৃবুক্তিপূর্ণ ভাবান্তে বক্তৃতা

অন্নই করিয়াছি। দেখিলাম, তাহাদের অনেকের চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। আমরা মহোৎসাহে কীর্তন করিতে করিতে সমাজঘরে আসিলাম। গ্রামবাসীদের অনেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজমন্দিরে আসিল। তৎপরে জমিদার-বাবুদের ভাব বদলাইয়া গেল। তাঁহারা আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়াইলেন। আমরা ঈশ্বরের করুণার জয় গান করিতে করিতে কলিকাতায় ফিরিলাম। পরে শুনিয়াছি যে জমিদারগণ আমাদের থাওয়া বন্ধ করিতেছেন শুনিয়া গ্রামের নারীগণ দয়া করিয়া গোপনে গোপনে আমাদের খাবার পাঠাইতেছিলেন। সাধে আমি নারীকুলের এত গোড়া!

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।—১৮৮৪ সালের প্রথমভাগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে তাঁহার বহুমূত্র রোগ ধরা পড়ে। আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হওয়ার পর তাঁহার কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। তদুপায় সমাজকে দণ্ডায়মান করিবার জন্য তাঁহাকে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়। তৎপরে আমাদের প্লেব, কটুত্ব প্রভৃতিতে তাঁহার মানসিক দুঃখ অতিমাত্রায় বদ্ধিত করে। আমরা চলিয়া আসিবার অল্পদিন পরেই তাঁহার brain fever হইয়া তিনি বহুদিন শয্যাস্থ থাকেন। তৎপরে যদিও অসাধারণ মানসিক বল ও উৎসাহের প্রভাবে উঠিয়া কার্য্যারম্ভ করেন, তথাপি বার বার পীড়িত হইতে থাকেন। এই-সকল শারীরিক ও মানসিক পীড়ার মধ্যে আবার নববিধানের অভ্যাস করিয়া তাহার প্রচার ও পুষ্টি সাধনে দেহ-মনের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করেন। অসম্ভব করি, এই-সকল কারণে তাঁহার বহুমূত্র রোগের সঞ্চয় হয়।

প্রথমে তাঁহার নিকটস্থ বন্ধুগণ ঐ রোগের সঞ্চয় অসম্ভব করিতে পারেন নাই। অবশেষে রোগ যখন ধরা পড়িল, তখন সকল সম্প্রদায়ের

বাকগণ সম্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। নববিধানী বন্ধুগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমরাও তাঁহার রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ১৮৮৩ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্য সিমলা শৈলে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের স্থায়ী উপকার হইল না। ঐ সালের অক্টোবর মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আমরা সংবাদ পাইলাম, তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্র আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। তাঁর রোগের বিবরণ সব বলিলেন। পায়ের কাপড় সরাইয়া পা দেখাইয়া বলিলেন, “দেখ আমার পায়ের গুলি কখনও এত সরু হয় নাই; এইটাই কলঙ্ক।” আমি বলিলাম, “ঈশ্বর করুন, এযাত্রা আপনি সারিয়া উঠুন।” তারপর তিনি বতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, আমি মধ্যে মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিতাম। তাঁহার পত্নীর মুখ বখন দেখিতাম, তখন চক্ষের জল বাধিতে পারিতাম না। কি সুখেই ভারতাপ্রসন্ন ছিলাম, আর কি দুঃখেই পরে ঘটিল, তাই মনে হইত। আমরা পরোক্ষভাবে তাঁহার মৃত্যুর অন্ততম কারণ, এই মনে হইয়া সেই দুঃখ ঘনীভূত হইত।

পরে শুনিলাম যে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে মাংসের ঘৃষ খাওয়াইতে ছেন, তাহাতে তাঁহার মূত্রে আলবুমেন (albumen) হইয়া, বহুতে গ্রাভেল (gravel) দেখা দিয়াছে। শুনিয়া ছুটিয়া দেখিতে গেলাম। গিয়া কমলকুটারে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার আর্ন্তনাদ শুনিলাম। রোগীর একরূপ আর্ন্তনাদ অন্নই শুনিয়াছি। নিকটে গিয়া দেখি, তিনি যন্ত্রণাতে ছটফট করিতেছেন। শয্যাতে একপার্শ্বে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। সে যন্ত্রণা, সে আর্ন্তনাদ, সে কাতরানি দেখিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না।

৮ই জানুয়ারি প্রাতে তাঁহার আত্মা নশ্বরখান ত্যাগ করিয়া

স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। সে প্রাতে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। বৈকালে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া পাটুকাইীন পদে সকলের সঙ্গে আমরা অনেকে শ্মশানবাটে গেলাম, এবং অশ্রুজলে ভাসিয়া এ জীবনের অন্ততম গুরুকে চিতানলে অর্পণ করি আসিলাম।

এতদিন ঝগড়া করিতেছিলাম, কিন্তু বন্ধানন্দ যখন চলিয়া গেলেন, তখন মনটা কিছুদিন নিস্তরূ গম্ভীর ভাবে কি গেন ভাবিতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মসমাজ লোকচক্ষে উঠিয়াছিল, তাঁহাতে নিবাস হইয়া তাঁহার অন্তর্দ্বানৈব সঙ্গে সঙ্গে সেই যে পশ্চাতে পড়িল, আব সম্মুখে আসিতেছে না। কোথায় তাঁব জীবনের মহাশক্তি, আব কোথায় আমাদের মত দুর্বল অশর মানুষের চেষ্টা !

১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্রের স্বর্গাবোহণ হইল। ১৮৮৮ সালে আমরা বিলাত গমন পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে যে যে ঘটনাস্থলি ঘটয়াছিল, তাহার সকলগুলি স্মরণ নাই। তাই একটি যাহা স্মরণ হইতেছে তাহা লিখিয়া রাখিতেছি।

খার্সিয়াঙ্গে নিজ্জনবাস।—১৮৮৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমরা সমাজের চারিজন প্রচারক, অর্থাৎ নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রামকুমার বিশ্বাস, শশিভূষণ বসু, ও আমি, এই সংকল্প করিলাম যে আমবা হিমালয় পাছাড়ে কিছুদিন নির্জনে বাস করিব। তৎসঙ্গে এই সংকল্পও করা হইল যে কাহারও নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করা হইবে না। আলোচনার পর স্থির হইল যে আমরা খার্সিয়াঙ্গে গিয়া থাকিব। দার্জিলিং বহু কোলাহলময়, ততদূর বাওয়া হইবে না। তদনুসারে আমরা খার্সিয়াঙ্গে যাইবার স্ত্রু প্রস্তুত হইলাম। একটা ঝুলি করিয়া তাহাতে বাহার ঝাড়া দিবার মত ছিল, ফেলিয়া দিলাম। সেই ঝুলিটা বস্ত্র-বর নবদ্বীপচন্দ্র দাসের হস্তে রহিল। তিনি আমাদের কোবাক্ষক হইলেন। আমরা পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ য়েলওয়ার নিকট স্ত্রী পাশ

পাইয়া খাসিয়াঙ্গে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া সাধন ভজনে বসিলাম। একটা চাকর রাখিলাম, সে বাসন মাজিত, ঘব ঝাঁট দিত, ও অপবাপব কাজ করিত। নব্বীপ বাবু বাজার করিবাব ভার লইলেন; শশী বিছানা তোলা ও ডাক-ঘবে যাওয়ার ভার লইলেন; বিত্তাবত্ত ভায়া খাওয়া ও লোকের সঙ্গে দেখা করার ভার লইলেন, আমি বন্ধনেব ভার লইলাম। আমরা প্রত্যুষে উঠিয়া সমবেত উপাসনা করিতাম, তৎপরে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ ও উপাসনা করিয়া যে যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতাম; এইরূপে দুই ঘণ্টা কাল প্রত্যেকে একান্তে যাপন করিতাম। সেই সময়টা প্রত্যেকে নিজ নিজ অতীষ্ট প্রণালীতে চিন্তা, ধ্যান, উপাসনাদি করিতাম। আমাকে বন্ধনেব জন্ত সকলেব অগ্রে ফিবিতে হইত।

আমি বাড়ীর অনতিদূরে পাগড়ের উপরে নির্ঝরের পার্শ্বে একখানি প্রস্তরের উপরে আসন নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে প্রতিদিন বসিয়া চিন্তা ধ্যান ও উপাসনা করিতাম। একমাস এইরূপ সাধন করিয়া প্রভূত উপকার লাভ কবিয়াছিলাম। এমন কি, এখনও দার্জিলিং যাইবাব সময় সেই পাথর খানির উপর যখন দৃষ্টি পড়ে, তখন মনে উপাসনার ভাব উপস্থিত হয়। সেই সাধনের ফল চিরদিন রহিয়াছে। এখানে বাসকালে ব্রাহ্মবন্ধুগণ অনেকে দার্জিলিং যাইতে আসিতে আমাদের জন্ত খাণ্ডদ্রব্য অর্থাদি দিয়া যাইতেন।

এইরূপে প্রায় একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা একদিন উপাসনান্তে স্থির করিলাম যে নামিয়া যাইব। তখন কোবাধ্যক্ষ মহাশয়ের অর্থের বুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে কিরিতে যে ব্যয় হইবে তাহার এগারটা টাকার অগ্রদুল; ভৃত্যকে বেতন দিতে হইবে, এবং বাড়ী ভাড়া দিতে হইবে, ইত্যাদি। আমি প্রস্তাব করিলাম, ভিক্ষা করা হইবে না; ভৃত্যকে আমার

গায়ের মোটা কঞ্চল দেওয়া হইবে, ল্যাম্পটী বিক্রয় করা যাইবে, ইত্যাদি। তদনুসারে ল্যাম্পটী বিক্রয় করা গেল। আমি ভৃত্যের নিকট বেতনের প্রাপ্য অংশ স্বরূপ কঞ্চল দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম; সে শুনিয়া হাসিতে লাগিল। আমরা যে এত দরিদ্র যে গাত্রের কঞ্চল দিয়া ভৃত্যের বেতন দিতে হয়, এ কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

অবশেষে কি করা যায়? আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভিক্ষা করাই স্থির হইল। আমি একজন ব্রাহ্মবন্ধুর নিকট ভিক্ষা করিবার জন্য চিঠি লিখিতে বসিলাম, এবং আমার দেখাদেখি বিত্তারত্ন ভায়া দার্জিলিংয়ের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাবু পার্শ্বতীচরণ রায়কে পত্র লিখিতে বসিলেন। ছই চারি পংক্তি লিখিয়াই আমার মনটা কেমন করিতে লাগিল; নিয়মটা ভাঙিতে ইচ্ছা হইল না। সুতরাং যে কয় পংক্তি লিখিয়াছিলাম, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমি পত্র-খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম দেখিয়া বিত্তারত্ন ভায়াও অর্দ্ধলিখিত পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

সেই দিনেই দার্জিলিং হইতে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনারি সি এইচ এ ড্যাল সাহেবের এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, “আমি পরশু নামিয়া যাইতেছি, তুমি কবে নামিবে? তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে, যদি সেই দিন যাও, এক সঙ্গে যাইতে পারি এবং সে কথাটা বলি।” আমি উত্তরে লিখিলাম, “আমাদের হাতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত গাড়ী ভাড়া দিবার পয়সা নাই, আমরা বোধ হয় হাঁটিয়া শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত যাইব।”

তৎপরদিন এক আশ্চর্য ঘটনা! ডাকঘোণে কলিকাতা হইতে এক পত্র আসিল। খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে দশ টাকার ক্রেসি নোট, প্রেরকের নাম নাই; কেবল এইমাত্র লেখা—“আপনাদের খরচের জন্য”।

কি আশ্চর্য্য। তখন আমরা দশ টাকার জন্ত ভাবিয়া আকুল হইতেছিলাম, ঠিক সেই দশটা টাকাই আসিয়া উপস্থিত! আমরা তখনই দেনাপত্র শোধ করিয়া দার্জিলিং মেইলে শিলিগুড়ি নামা স্থিব করিলাম।

তদনুসাবে পবদিন থার্ড ক্লাসেব টিকিট লইয়া ট্রেনে দাঁড়াইয়া আছি, দেখি ড্যাল সাহেব আসিয়া উপস্থিত। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, “বাং, এই তুমি লিখিলে, পরস্য নাই, হাঁটিয়া শিলিগুড়ি নামবে, আবাব এ কি?” আমি হাসিয়া বলিলাম, “একটা অদৌকিক ঘটনা ঘটেছে”। তিনি আমাকে টানিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে তুলিয়া লইলেন, আমার সেকেণ্ড ক্লাসেব অতিরিক্ত ভাড়া দিলেন, এবং শিলিগুড়ি পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা তাঁব মনে উদ্ভাবিত একটা গুণেব কাজেব পবানর্শ বিবৃত কবিতে করিতে আসিলেন। প্রস্তাবিত কাজটার বিষয়ে যতদূর স্ববর্ণ আছে তাহা এই। তিনি প্রস্তাব করিলেন, এস আমবা একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্ববে বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটা সভা গঠন করি। তাহাবা খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম হউক আর না হউক, কেবল নাস্তিক না হইলেই হইল। এই দলকে লইয়া এক সাংস্কৃতিক ধর্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করি, ইত্যাদি। এই মূলভাবের অনেক শাখা প্রশাখা ছিল, সকল মনে নাই। কলিকাতায় যিবিয়াই এই কার্যের সূচনার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু হায়, ড্যাল সাহেব কলিকাতায় পৌঁছিবাব অল্পদিন পরেই গুরুতর কুক্ষিরোগে আক্রান্ত হইয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিলেন।

“হিমাদ্রি কুসুম।”—এই হিমালয়-বাসকালে আমি “হিমাদ্রি-কুসুম” নামক এক পঞ্চগ্রন্থের কিয়দংশ লিখি, তাহা পরে বর্দ্ধিত আকারে মুদ্রিত হয়।

আসামে প্রচার যাত্রা।—খার্মিয়াং হইতে ফিরিবাব কয়েকদিন পরে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে আমি ধর্মপ্রচারার্থ আসাম প্রদেশে

গিয়া খুবড়ী, গোয়ালপাড়া, গোঁহাটী, তেজপুর, নওগাঁ, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, ও শিলং, এই সমুদয় স্থানে গমন করি। যে কারণে এই প্রচারযাত্রার বিবরণ মনে আছে তাহা এই। আমি খুবড়ী হইতে ডিব্রুগড় অভিমুখে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে একস্থানে আমার স্বর্গীয় বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসিয়া আমার সঙ্গে জুটিলেন। তিনি সঞ্জীবনীর এজেন্টরূপে আসিয়াছিলেন, এবং ভারতসভার সহকারী সম্পাদকরূপে আসামের কুলি আইনের কার্য্য বিষয়ে ও অপরাপর কোনও কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে জোটাতে এক নূতন ব্যাপার ঘটিল। যেখানে যাই এবং বক্তৃতার নোটস বাত্মি করি, সেইখানেই ইংরাজ কর্মচারিগণ সেখানকার উকীল ও অপরাপর ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, “এ শিবনাথ শাস্ত্রী কে? এ কি কুলিআইন প্রভৃতি রাজনীতিমূলক বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ আসিয়াছে?” তাঁহারা বলেন “না, ইনি বান্ধবশ্রম প্রচারক।” প্রশ্ন, “তবে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি সঙ্গে কেন?” উত্তর, “হুজুরে বক্তৃতা আছে, সেজ্ঞা এক সঙ্গে বেড়াইতেছেন, এই মাত্র।” কর্মচারিগণের সতর্কতার প্রমাণ কোনওকোনও নগরে পাইলাম। সেই সেই স্থানের ডেপুটী কমিশনার প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারীরা কেহ কেহ আমার বক্তৃতাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এমন কি, ডিব্রুগড়ে যে দিন আমার বক্তৃতা হয় সোদিন ভয়ানক হুর্ঘ্যোগ, বক্তৃতাস্থলে গিয়া দেখি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অনেকে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু ডেপুটী কমিশনার উপস্থিত।

আমরা ডিব্রুগড় হইতে ফিরিবার পথে শিবসাগর যাই। এখানে যাত্রাবিঘ্নে দুই বিভিন্ন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইল। যাইবার সময় ঈমার-খাটে দেখিলাম, শিবসাগরের বন্ধুগণ আমার জন্ত হাতী প্রেরণ করিয়াছেন। দুই বীরপুরুষ হাতীতে আরোহণ করিলাম। হাতীর বেঁ মেজাজ আছে, তাহা ইতিপূর্বে দেখিবার ভাল সুযোগ হয় নাই। এবারে তাহা দেখিলাম। মাছের দুর্ব্যবহারেই হউক, আর অল্প কোন কারণেই

হটুক. হাতী পথের মধ্যে বড় রাগ করিল ; এবং আমাদিগকে লইয়া পথ ছাড়িয়া এক পুষ্করিণীর মধ্যে নামিল। আমাদের পা জলে ডোবে আর কি ! হাসিব, কি ত্রস্ত হইব ও লাফাইয়া পড়িব, স্থির করিতে পারি না। শেষে মাহুত অনেক সাধা সাধনা করিয়া মিষ্টকথা বলিয়া হাতীকে বাস্তাতে তুলিয়া আনিল। আমরা যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিবার সময় আর-এক বিপদ উপস্থিত। মধ্যে কয়েকদিন প্রবল বষ্টি হইয়া চারিদিক ভাসিয়া গেল। সংবাদ পাওয়া গেল যে ব্রহ্মপুত্র ভাসিয়া লিয়াছে। কিন্তু কি করা যায়. আমাদের শীঘ্র আসা আবশ্যক। আমরা আমাদের যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্ত সেখানকার বন্ধুদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলাম। তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। যাত্রার দিন প্রাতে দেখিলাম, একটা হাতী আসিল। মনে মনে ভাবিলাম এটা বোধ হয় শাস্ত শিষ্ট, পুষ্করিণীতে নামিবে না। কিন্তু আমরা আহাঙ্গাদি করিয়া যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলে দেখা গেল যে, হাতী সেখানে নাই, বনের ভিতর কোথায় প্রবেশ করিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অবশেষে সেখানকার উকাল বন্ধুদিগের মধ্যে একজন আমাদিগকে তাঁহার গাড়িখানা দিলেন। যথাসময়ে গাড়িতে উঠিয়া কিয়দ্দূর গিয়া দেখি যে কাদা ঠেলিয়া যাওয়া ভার। কাদাতে গাড়ির চাকা বসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে দ্বারিবাবু নামিয়া গাড়ি ঠেলিতে ও টানিতে লাগিলেন। ক্রমে গাড়িও ছাড়িয়া দিতে হইল। তখন আমরা মুটের মাথায় জিনিসপত্র দিয়া ৮ মাইল হাঁটিয়া ষ্টীমারঘাট পর্য্যন্ত যাওয়া স্থির করিলাম। কিন্তু নগরের ব্যহিরে মাঠের ধারে গিয়া দেখিলাম, একখানা শালুতি অর্থাৎ শাল কাঠের ডোঙ্গা আছে। চারিদিক জলপ্লাবিত হওয়াতে সেখানা নগরের পার্শ্বে আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে ভাঙা স্থির করিয়া দুই তিন জনে তাহাতে উঠিলাম। দুই দশ হাত যাইতে না যাইতে দেখা গেল যে শালুতিখানার

স্থানে স্থানে গৰ্ভ আছে, কাদা দিয়া তাহা বুজাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের ভাৱে কাদাগুলি ঠেলিয়া শাল্‌তির মধ্যে জল উঠিতে লাগিল। তখন আমরা নামিয়া পড়িলাম ; এবং একঠাটু জল ঠেলিয়া পদব্রজেই শীমার-বাটের অভিমুখে চলিলাম।

সে এক কোতুকেব ব্যাপাব। গাঙ্গুলি ভাৱা আমার আগে আগে বিশ পঁচিশ হাত দূৰে চলিয়াছেন। তাঁহাব উৎসাহ দেখে কে ! আমি অত চলিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কাজেই একটু পিছাইয়া পড়িয়াছি। এইকপে দুইজনে চলিয়াছি, হঠাৎ দ্বারি বাবু ডুবিয়া গেলেন ! তখন ভাববাহক মূৰ্চের মুখে শুনিলাম, সেখানে একটা খাল ও ততপরি এক পুল ছিল, ব্রহ্মপুত্ৰের জলবৃদ্ধি হইয়া খাল ভাসিয়া পুল বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি ব্যস্তমস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া দেখি, দ্বারি বাবু কিছু দূৰে মাথা জাগাইয়া একবার উঠিয়া আবার “আমি গেলাম” বলিয়া ডুবিলেন। সে বার আমি নিবাস হইলাম, তাবিলাম খালের স্রোতে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে দেখি কিয়দূৰে তিনি আবার মাথা জাগাইয়া হাত দিয়া যেন কি একটা ধরিলেন। পরে জানিলাম, খালের পার্শ্বস্থ কোনও গুল্লের শাখা ধরিয়ান্নে। খালের অপর পার্শ্বে কিয়দূৰে একখানা শাল্‌তি দাঁড়াইয়া ছিল, আমি তখন উচ্চস্বরে তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম, “বাবুকে বাঁচা, বাবুকে বাঁচা, বক্‌সিস কব্ব।” আমার চোঁচাচোঁচিতে তারা শাল্‌তিখানা লইয়া দ্বারি বাবুকে গিয়া তুলিল। তাঁহার সামলাইতে অনেককণ গেল। তৎপরে আমরা দুইজনে চলিতে লাগিলাম।

বেলা অবসান হইয়া আসিতে লাগিল ; তৃষ্ণায় দুই জনের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে ; কাদা-জল পান করিতে পারি না। কি করি, কি করি, জাবিতে জাবিতে দেখিতে পাইলাম, কিয়দূৰে একটা উচ্চ ভূমির উপরে একটা বাঙ্গলা ঘর দাঁড়াইয়া আছে। মনে তাবিলাম, সেখানে নিশ্চয়ই মাহুয আছে, তারা জল দিতে পারিবে। উঠিয়া দেখি, সেটা গবৰ্ণমেণ্টের

ইন্স্পেকশন বাঙ্গলা, সেখানে একজন আসামী চাকর আছে। তার একটি পানীয় জলের কলস দেখিলাম। তার মুখে একটা বাটি চাপা। তার নিকট জল চাহিলাম। তারপর যে কথাবার্তা হইল তাহা এই।—

ভৃত্য—কিসে করে খাবে ?

উত্তর—কেন ? তোমাব ঐ বাটিতে করে দাও।

ভৃত্য—তা হবে না, তোমাদিগকে বাটি ছুঁতে দেব না। তোমরা “কলা বঙ্গাল”, আমাদের জলপাত্র তোমাদের ছুঁতে দি না।

উত্তর—আচ্ছা, আমরা হাতে অঞ্জলি কবে হাত পাতছি, তাতে জল লেদে দাও।

ভৃত্য—তাতে ও বাটিতে যদি ঠেকাঠেকি হয়ে যায় ?

ইতিমধ্যে দ্বারি বাবু গাছেব পাতা ছিঁড়িয়া আনিতে গেলেন। বলিয়া গেলেন, “আচ্ছা, আমি গাছেব পাতা আনছি, তার বাটি করে তাতে জল দিবে।”

তাহার ফিবিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমি সেই বাক্তিব কাছে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলিলাম, “তোমার কি লজ্জা হচ্ছে না ? যে ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। বলতে গেলে তুমি আমাদের ভাই। আজ এই বিপদের দিন, জলাভাবে প্রাণ যায়, তোমার জল আছে অথচ তুমি দিতে পারছ না। ভগবান যে জল সকলের জন্য দিয়েছেন, তাই একটু তুমি আমাদের জল দিতে পারলে না, কি লজ্জার কথা !”

কেন জানি না, আমার কথা শেষ হইলে সে ব্যক্তি ধীরভাবে বলিল, “আচ্ছা, আমার বাটিতে জল খাও।” তখন আমি দ্বারি বাবুকে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, “আমুন, আমুন ! আমি একে ব্রাহ্ম করেছি, বাটিতে জল দিতে রাজি হয়েছে।” দুজনে কত হাসিলাম, তার বাটিতে পেট ভরিয়া জল পান করিলাম।

আবার পদব্রজে জল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইলাম। সন্ধ্যাকালে ঈমারঘাটের ষ্টেশনে উপস্থিত। সেখানকার বাবুয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি আশ্চর্য্য! এই জলপ্লাবনে আপনারা এলেন কিরূপে?” আমি হাসিয়া বলিলাম, “হস্তী দর্শন, গাড়ি কর্ষণ, নৌকা স্পর্শন, ও শেষে সস্তরণ।” ইহার অর্থ যখন ব্যাখ্যা করিলাম, তখন একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তৎপর দিন আমরা উভয়ে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

কাশীতে পিতাঠাকুর মহাশয়ের গুরুতর পীড়া।—১৮৮৮ সালের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা, কাশীতে আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের গুরুতর পীড়া। আমি উপবীত পরিত্যাগ করার দিন হইতে পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি এই দীর্ঘকাল আমার মুখ দেখেন নাই; আমার জীবন সংশয় কালেও দেখেন নাই। * প্রথম প্রথম আমার উপার্জিত সিকিপয়সা লইতে চাহিতেন না। আমি আমার পিস্তুতো বড়ভাইয়ের হাত দিয়া শীতকালে কম্বল প্রভৃতি দিতাম। তিনি কৌশলে তাহা বাবার হাতে দিয়া দাম লইতেন, এবং সেই মূল্য গোপনে আমার মায়ের হাতে দিতেন। আমি যখন ভবানীপুরে সাউথ স্কবার্কেন স্কুলে কর্ম করি, তখন আমার মধ্যম ভগিনীর বিবাহ হয়। সে সময়ে আমি বিবাহ-ব্যয়ের সাহায্যার্থ গোপনে মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়াছিলাম। পরে শুনিলাম যে বাবা তাহা জানিতে পারিয়া এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে ঘরের চালে আগুন দিয়াছিলেন, পাড়ার লোকে আসিয়া নিবাইয়াছিল। তৎপর এই ক্রুদ্ধভাব ক্রমে চলিয়া গিয়াছিল। তখন আমি মায়ের হাতে প্রত্যেক মাসে দশ টাকা করিয়া দিতেছি জানিরা।

বুদ্ধ হইতেন না ; কিন্তু সে অর্থ তিনি স্পর্শ করিতেন না, তাহা মায়েরি থাকিত।

এইরূপ চলিতেছিল, মধ্যে বাবা কন্ঠ হইতে অবসৃত হইয়া সংকল্প করিলেন, দেশভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইবেন, যেন আর অধম পুত্রের মুখ দর্শন করিতে না হয়। বাবা মা কাশীতে বসিবার পূর্বে গয়া বন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হইলেন। তখন আমি তাঁহাদের তীর্থভ্রমণের ব্যয়ের জন্য অর্থসাহায্য করিলাম, বাবা দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। ক্রমে তাঁহার কাশীধামে আসিয়া বাস করিলেন। সেখানে বাবার মান সন্ত্রম হইল। তাঁহাব পেন্সনের টাকাতে ও আমার সামান্য সাহায্যে তাঁহার মূখে বাস করিতে লাগিলেন। আমি আমার ভগিনী ঠাকুরদাসীকে পৈতৃক ভিটাতে স্থাপন করিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলাম।

দিন এই প্রকার চলিতেছে, এমন সময় ১৮৮৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রে আমি ঐক্সমাজের বেদী হইতে নাগিয়াছি, এমন সময় কাশী হইতে আমার একজন ডাক্তার বন্ধুর নিকট হইতে তারে সম্বাদ পাইলাম যে পিতাঠাকুর মহাশয় গুরুতর পীড়িত, আমাকে অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া আমার দ্বিতীয় পত্নী বিরাজমোহিনীকে সঙ্গে লইয়া তৎপরবর্তী ট্রেনে কাশী যাত্রা করিলাম। পরদিন দুপুর বেলা কাশীতে পৌঁছিয়া পথে সেই ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া শুনি, বাবা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত, নাড়ী নাই। আমি ডাক্তার সঙ্গে করিয়া বাবার বাসাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নাড়ী নাই, তাহার উপর হিকা হইয়াছে, সকলে মহা উদ্বিগ্ন। এই অবস্থাতে আমি গিয়া যখন নিকটে দাঁড়াইলাম, তখন বাবা আঠার বৎসরের পর প্রথম আমার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু আমাকে দেখিয়া মুখ

ফিরাইলেন। বিরাজমোহিনীকে তিনি বড় ভালবাসিতেন; বিরাজমোহিনী যখন তাঁহার পদধূলি লইয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, তখন বাবা তাঁহার মুখেব দিকে চাহিয়া কঁাদিতে লাগিলেন। আমি ডাক্তার বন্ধুকে বাবাকে দেখিয়া পার্শ্বের ঘরে আসিবার জগ্ৰু অন্ুরোধ করিয়া সেই ঘরে গেলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন যে নাড়ী আবার পাওয়া যাইতেছে। আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিলাম। ইহার পরে আমি আমার জননীর দ্বারা বাবাকে আমার সঙ্গে কথা কহিবার জগ্ৰু অন্ুরোধ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, “আমাকে রোগের বিষয়ে বিশেষ বিবরণ না বলিলে আমি কিরূপে ডাক্তারকে বুঝাইয়া দিব?” তাই বলিলেন বলিয়াই হউক, বা তাঁহার যে-দিন পীড়া হইয়াছে তৎপরদিনেই কিরূপে আসিলাম, এই ভাবিয়াই হউক, আমার উপবীত পরিত্যাগের আঠার উনিশ বছরের পরে বাবা আমার মুখ দেখিলেন ও আমার সঙ্গে কথা কহিলেন।

এত যে গুরুতর পীড়া, তাহাতে বাবাকে কিছুমাত্র স্নান বা বিষণ্ণ ননে হইত না। ডাক্তার গাত দেখিয়া বলিতেছেন, “নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে”; বাবা হাসিয়া বলিতেছেন, “আনাড়ীর আবার নাড়ী!” মা কঁাদিতেছেন, বাবা তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাকে বলিতেছেন, “কেমন অজ্ঞ, দেখেছ? যাব জগ্ৰু কাশীতে আসা, তাই ঘটবার উপক্রম; কোথায় আমোদ করবে, না, কারা! কাশীতে কিছু বিষয়-বাণিজ্য করতে আসি নি; মরতে এসেছি, সেই মরণ এসে উপস্থিত, তাতে আবার শোক কেন?” আমি বলিলাম, “বাবা! আপনি ত সহজ কথাগুলো বললেন, মার প্রাণ তা শুনবে কেন?” বাবা বলিলেন, “তবে শূঁর এখানে আসা উচিত হয় নি।” তার পর শোনা গেল যে কচি তালের জল দিলে হিকা থামিতে পারে। কচি তাল কোথায় পাওয়া যায় আমি সেই চেষ্টায় বড় ব্যস্ত হইলাম। পরদিন প্রাতে আমার একজন বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। বাবা হাসিয়া

তাহাকে বলিলেন, “দেখ হে, তাল না পেলে এ তাল সামলাচ্ছে না।”
 তিন যাইবার সময় হাসিয়া বলিয়া গেলেন, “এঁকে মারে কে? এমন
 মানসিক বল ত সচরাচর দেখা যায় না।”

যাহা হউক, বাবা কয়েক দিনের মধ্যে সারিয়া উঠিলেন। তিনি
 মর পথ্য করিলে, আমরা তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া কলিকাতা যাত্রা
 করলাম। আমাদের যাত্রা করিবার সময় তিনি বলিলেন, “আমি
 বৌমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।” আমি বললাম, “না বাবা,
 এ হবে না। আপনার বৌমাকে ত আমি এনেছি, আমিই নিয়ে যাব,
 আপনার যাওয়া হবে না।” তিনি কোন মতেই সে কথা গুলিলেন
 না; মহা চেষ্টাতে উঠিতে চাহিলেন। কি করা যায়, ছই জন লোক
 তাঁর কাছে হাত দিয়া তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিলেন, এবং ধরিয়া
 খাস্তে আস্তে সিঁড়ী দিয়া নীচে নামাইলেন, তারপরে বাবা কোনও
 মতে লাঠিতে ভর দিয়া ও মানুষের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গলির
 মোড়ে বড় রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ির নিকট পর্য্যন্ত আসিলেন।
 যেই আমি ও বিরাজমোহিনী তাঁর পদধূলি লইয়া গাড়িতে উঠিলাম,
 অমনি বাবা কাঁদিয়া মাথা ঘুরিয়া রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন। সেখান
 হতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া যাওয়া হইল।

দ্বিতীয়া কন্যা তবজ্জিনীর বিবাহ।—ইহার কিছুকাল পরে (১৮৮৮
 সালের ১৩ই এপ্রিল) বাঘ-আঁচড়া নিবাসী শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ
 বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি বুবার সহিত আমার দ্বিতীয়া কন্যা তবজ্জিনীর
 বিবাহ হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ইংলণ্ড ভ্রমণ। সমুদ্রযাত্রা। লণ্ডনের বাসা। ইংলণ্ডে সাধারণ প্রজাবর্গের
দোষগুণ :—পানাসক্তি ; নারীর সম্মান ; সত্যে প্রীতি ও প্রবঞ্চনায়
দ্রুণা ; কণ্ডব্যাজ্ঞান ; সত্যতা। সাকুলেটিং লাইব্রেরী। উন্মুক্ত
স্থানে নানাবিধ বস্তুতা। নরহিতৈষণা :—শিশুরক্ষণী সভা ;
সন্ধ্যাকালে রাজপথস্থ বালিকাগণের চিত্তবিনোদন ;
কাবামুক্তের সাহায্য সভা ; Toynbee Hall ;
People's Palace ; Working
Men's Institute. ইংরাজ-
জাতির সংকার্যো দান।

১৮৮৮

ইংলণ্ড ভ্রমণের প্রস্তাব ও সংকল্প।—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে
বঙ্কুর হুর্গামোহন দাস ও তৎসঙ্গে ডেপুটি কলেজের বাবু পার্কর্তী-
চরণ রায় ইংলণ্ড গমনের জন্ত কৃতসংকল্প হইলেন। হুর্গামোহন বাবু
তঁাহাদের সঙ্গে আমাকে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া আমার জাহাজ
ভাড়া দিবার ইচ্ছা জানাইলেন। আমি আসিয়া বঙ্কুগণের মধ্যে সেই
প্রস্তাব উপস্থিত করিতেই অপর কেহ কেহ অর্থসাহায্য করিতে
চাহিলেন। তঁাহাদের সকলের প্ররোচনাতে আমি হুর্গামোহন বাবু ও
পার্কর্তী বাবুর সহিত ১৮৮৮ সালের ১৫ই এপ্রিল রবিবার ইংলণ্ড যাত্রা
করিলাম।

জাহাজে একমাস।—আমি সেকেন্ড ক্লাসের টিকেট লইয়াছিলাম।
হুর্গামোহন বাবু ও পার্কর্তী বাবু ফার্স্ট ক্লাসে থাকিতেন। বঙ্গোপসাগরে



গ্রন্থকার (১৮৮৮ সালে বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে)

পড়িয়াই পার্কসীবাৰুব সামুদ্রিক বমন (sea-sickness) আরম্ভ হইল, তিনি নিজ ক্যাবিনে পড়িয়া রহিলেন। জুর্গামোহন বাবু একটু ভাল ছিলেন, কিন্তু দেশ হইতেই তিনি কাহিল হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। আমি এক প্রকার পালাজব লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পূর্ণিমা ৭ অমাবস্যাতে আমাব জব হইত, আমি জবে ক্যাবিনে একা পড়িয়া থাকিতাম। পড়িয়া পড়িয়া সে সময়কার ভাবে এই গানটা গাধিয়াছিলাম, তাহা পরে কলিকাতায় প্রেরণ করি, এবং তাহা বোধ হয় ওরকোমুদীতে প্রকাশিত হয়, পাবে ব্রহ্মস গীত গণ্ডে উঠিয়াছে।

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে ?

আব কোন্ মা আছে এমন ক'বে পালিতে জানে ?

কি স্বদেশে কি বিদেশে, মা আমার সৰ্বদা পাশে,

প্রাণে ব'সে কহেন কথা মধুব বচনে।

আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী, (মাকে) ভুলে থাকি দিবানিশি,

মা আমাব সকল বোঝা এতেন যতনে।

এ অনন্ত সিদ্ধুজলে, মা আমায় রেখেছেন কোলে,

কত শান্তি কত আশা দিতেছেন প্রাণে।

হায় আমি কি করিলাম, এমন মায়ে না চিনিলাম,

না সঁপিলাম প্রাণ মন এমন চরণে।

জাহাজে থাকিতে থাকিতে দুইটা ঘটনা দ্বারা আমি ইংরেজ-চরিত্র ও ব্রাহ্মী চরিত্র উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারিলাম। প্রথম ঘটনাটি এই।—আমাদের সঙ্গে একজন ইংরেজ যাইতেছিলেন। তিনি ছয়মাস পূর্বে এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, বেড়াইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি একদিন আহায়ে বসিয়া অপরাপর ইংরেজের নিকট এদেশীয়দিগকে খুব গালাগালি দিতে লাগিলেন। ভারতবাসী ইংরেজদের মুখে বাহা শুনিয়াছিলেন ও নিজে বাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া

এদেশীয়দিগের প্রতি ঘণাবর্ষণ কবিতে লাগিলেন। আমি তখন কিছু বলিলাম না। পরে আহাৰাস্তে উপরকার ডেকে তিনি যখন বেড়াইতেছেন আমিও বেড়াইতেছি, তখন আমি তাঁহার নিকট গিয়া ভদ্রভাবে বলিলাম, “আপনি টেবলে যে-সকল কথা বলিতেছিলেন, সে বিষয়ে আমি আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি। আপনি ছয়মাস বৈ এদেশে আসেন নাই, বেশী দেখেন নাই ; যা শুনেছেন তার অনেক ঠিক নয়।” এই কথা শুনিয়াই মানুষটা মুখ কিবাইয়া লইল, বলিল, “দব্কার নেই, আমি কিছু শুনতে চাই না।” সেইদিন অবধি আমি তাহাকে ত্যাগ করিলাম, সে আমাকে ত্যাগ করিল। এক স্ত্রীমারে এক ক্রাসে আছি, এক সঙ্গে খাই, তবু যেন কত দবে আছি ; আলাপ পরিচয় সম্ভাষণ নাই।

দ্বিতীয় ঘটনাটা এই। জাহাজ যখন গিয়া ফ্রান্সের মার্সেলিস বন্দরে দাঁড়াইল, তখন আমরা স্থির করিলাম যে একবার সহরটা দেখিতে যাইব। বড় বড় নৌকা আসিয়া জাহাজের মাল তুলিতেছে, আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া আছি ; অপেক্ষা করিতেছি, একটু ভিড় কমিলে নামিব। দেখিলাম, ফরাসি ভদ্রলোক দুই-একজন আসিতেছেন, তাঁহারা সেখান হইতে আরোহী হইবেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের বন্ধুরা তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক বন্ধুকে তুলিয়া দিয়া বাইবার সময় দেখিলেন আমি একপাশে দাঁড়াইয়া আছি। নিকটে আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আপনি বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন?”

আমি—হাঁ।

প্রশ্ন—আপনাদের পথে ক্লেশ হয় নাই ত ?

আমি—না, আমরা বেশ আসিয়াছি।

তিনি আমাকে চুরুট দিতে চাহিলেন, আমি তামাক খাই না শুনিয়া



মিস মো - যা ব্রসন ব্লেট

সেটা নুকাইলেন। শেষে বলিলেন, “আপনি কি তীরে যাইবেন? সাবধান, ভাল ইন্টারপ্রেটার লইবেন, নতুবা লোকে ঠকাইবে।” এই বলিয়া ঘাইবার সময় একজন চেনা ইন্টারপ্রেটারকে ডাকিয়া আমার কাছে দিয়া গেলেন। ইংরাজদের ব্যবহারের সহিত কি প্রভেদ!

সেই সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে আর-একটা স্মরণীয় ঘটনা আছে। জাহাজে আরোহিণী আপনাদের বিনোদনের জন্ত নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে; সাহেব ও মেমদিগের নাচ গান ও খেলা, সকলি চলিতে থাকে। আমরা “মিজাপুর” নামক জাহাজে যাইতেছিলাম। তাহার ফার্স্ট ক্লাসের আরোহিণী এইরূপ নাচ গান খেলা আরম্ভ করিলেন। সেকেণ্ড ক্লাসে তিন দেশ হইতে কতকগুলি ইংরাজ মিশনারি কলম্বো বন্দরে আসিয়া আমাদের সঙ্গে জুটিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি বলিলাম, “আমুন, আমরা সপ্তাহে একদিন করিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করি ও প্রথম শ্রেণীর আরোহীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শুনাই।” ক্রমে আমাদের সাপ্তাহিক বক্তৃতা আরম্ভ হইল। তাহার এক বক্তৃতা আমাকে দিতে হইল। যদিও অনেকে আসিলেন না, তাহারা আসিলেন তাঁহারা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এই উপলক্ষে পরগণায় দেশের একজন ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় ও বক্তৃতা হইয়া গেল। তিনি ফার্স্ট ক্লাস ত্যাগ করিয়া অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্তা করিতেন।

লগুনের বাসা।—১৯শে মে শনিবার আমরা লগুনে উপস্থিত হইলাম। দুই দিনের মধ্যেই আমি ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষিণী মিস্ কলেটের সান্নিধ্য করিলাম। তিনি তখন উত্তর লগুনে হাইবরির সন্নিকটে এক বাড়ীতে একলা থাকিতেন। একটা চাকরানী তাঁহার পরিচর্যা করিত। তন্নিম্ন বোধ হয় একটা ব্রাহ্মপুত্রীও তাঁহার সঙ্গে থাকিত। মিস কলেট বলিলেন, “ভূমি এই উত্তর লগুনে একটা থাকবার জায়গা

দেখে লও, দুজনে সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ হবে।” আমি তাঁহার কথা .
অনুসারে উত্তর লঙনে ক্যাম্‌ডেন ষ্ট্রীটের পাশে, হিল-ড্রপ রোড নামক
গলিতে এক পরিবারে থাকিবার স্থান করিয়া লইলাম।

বাড়ী দেখিয়া বসিলাম বটে, কিন্তু বহুদিন মনটা দেশের দিকে পড়িয়া
রহিল। পথে ঘাটে কেবল সাদা মানুষ; বাহিব হইলেই সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া
তাকায়; আমার ভাষা কেহ বোঝে না; আমি থাকি কি মরি কেহ দেখে
না; এসব যেন আমার কেমন কেমন লাগিতে লাগিল। তাহার উপরে
দেশ হইতে যে অন্ন লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া কয়েকমাস
ছিল। অরে আক্রান্ত হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিতাম, একবার উকি
মারিবার একজন লোক ছিল না। বাড়ীব মেয়েরা কেহ পুরুষের ঘরে
প্রবেশ করিতেন না; চাকর একবার চা দিয়া যাইত, এই মাত্র।

ইহার উপরে আবার প্রাণে শুষ্কতা অনুভব কবিতে লাগিলাম।
কোলাহলপূর্ণ রাজনগরে ঈশ্বর যেন আমাকে পবিত্যাগ করিলেন। এই
অবস্থাতে কয়েকদিন বড় কষ্টে কাটাইলাম। এই সময়ে বা কিছুদিন পরে
বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া একটা সংগীত বাধি, তাহা এই :—

জান্‌লাম না মা, বুঝ্‌লাম না মা, এ তোর রীতি কেমনধারা,

থাক থাক লুকাও বোথায়, করে আমায় দিশেহারা ?

আমি আঁচল-ধরা ছেলে, যেতে হয় কি একলা ফেলে ?

মায়ের মুখ না দেখতে পেলে, ভয়ে ছাওয়াল হয় যে সারা।

যদি বল কি গুণ আছে, বাঁধা রবে আমার কাছে,

(ভূমি) আপনার গুণে আপনি বাঁধা, ও আমার মা চমৎকার।

যে পরিবারে আমি থাকিবার স্থান পাইলাম, তাঁহারা ইংলণ্ডের মধ্য-
শ্রেণীর নিম্নস্তরের লোক। তাঁহাদের মেয়েরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া
দরজা, জানালা প্রভৃতির পরদা প্রস্তুত করিতেন, আর ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ গৃহ-
স্বামী পিতা সেগুলি ভূত্যের মস্তকে দিয়া ভদ্রলোকের বাড়ীতে ও দোকানে

বিক্রয় করিয়া আসিতেন। সে পরিবারে বৃদ্ধ পিতা মাতা ও তিন কন্তা মাত্র ছিলেন। এতদ্বিন্ন তাঁহারা আপনাদের বাড়ীতে আমার ছাত্র আগন্তুক লোকও রাখিতেন। আমি যে সময়ে ছিলাম, সে সময়ে সে ভবনে আমি ছাড়া একজন জাপানী, (তৎপরে তৎস্থানে একজন রশীয়ান), একজন আইবিশমান, ও দুজন ইংরেজ যুবক থাকিতেন।

বাড়ীওয়ালী দুই দিনেই আমাকে চিনিয়া লইয়াছিলেন, এবং আমার কাপড় চোপড়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, এবং সর্বদা লণ্ডন পরিদর্শন বিষয়ে জ্ঞাতব্য অত্যাৱশ্যক সংবাদ সকল আমাকে দিতেন। তিনি আমাকে এমন চিনিয়াছিলেন যে, আমি চা খাইতে গেলেই হাসিয়া লিতেন, “মিষ্টার শাস্ত্রী! রসো, বসো, তোমার গলার আগে বিব্ (bib) বেধে দিই।” আমি তাঁহাদের ভবনে নিকপদ্রবে ও স্থখে বাস করিতে লাগিলাম, এবং ক্রমে ইংরেজ সমাজের ভাল মন্দ দেখিতে লাগিলাম।

ইংলণ্ডের সাধারণ প্রজাবর্গের দোষগুণ। পানাসক্তি।— মন্দটাই আগে বলিয়া ফেলি। পৌছবার পরদিনই বাড়ী দেখিতে বাহির হইয়াছি। একজন বাঙ্গালী যুবক (কে, তাহা ভাল মনে নাই,) আমার সঙ্গে আছে। আমি আগে আগে যাইতেছি, সে ব্যক্তি পশ্চাতে আছে। সে পশ্চাৎ হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, “মশাই, মশাই, স’রে দাড়া, আপনাকে বল!” আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি যে একটা মাতাল জীলোক আমার গলার কাপড় ধরিতে আসিতেছে; বলিতেছে, “Here is my man.” অপর একটি জীলোক তাহাকে টানিয়া অপর দিকে লইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা সরিয়া গেলেই আমি বাঙ্গালী যুবকটিকে বলিলাম, “এ কোথায় এলামু রে? এ কি দৃশ্য!” সে বলিল, “কিছুদিন থাকুন, আরও অনেক দৃশ্য দেখিবেন।” বাস্তবিক তাহাই হইল। পানাসক্তির আবণ্ড অনেক দৃশ্য চক্ষে পড়িতে লাগিল। জীলোক মাতাল হইয়া অসামান্য হইয়াছে, মুগিধ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, একপ দৃশ্যও দেখিলাম।

দেখিতাম, সেখানকার খাবাপ মেয়েরা বড় সাহসী ; রাস্তা হইতে পুরুষদিগকে ধাবিয়া পাকড়িয়া লইয়া যায়। আমরা ইংলণ্ডে পৌঁছিবার কিছুদিন পূর্বে নাকি এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে, যে-মেয়ে রাস্তাঘাটে অপরিচিত পুরুষকে বিবস্ত্র করিবে, সে-পুরুষ সে কথা পুলিশের গোচর করিলেই সে-মেয়েকে গ্রেপ্তার কারবে ও আইনানুসারে তাহাব দণ্ড হইবে। কিন্তু বিদেশেব কালা মানুষ দেখিলে বোধ হয় তাহাবা মনে করিত যে ইহারা আমাদের এ আইন জানে না, কাবণ, দেখিতাম, কালা মানুষকে বিবস্ত্র করিতে ভয় পাইত না। একদিন আমি একটু অধিক রাত্রিতে বাড়ীতে আসিতেছি। পাডাব নিকটে গলিব মোড়ে একটি মেয়ে আমাকে Good evening, করিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, কেমন আছি। আমি যথাবীতি বলিলাম, “O ite well, thank you”, মনে কবিলাম, দোকানে পোষ্ট-আপিসে কত মেয়েব সঙ্গে কথা হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ হইবে। তার পব দেখি তাহা নহে। মেয়েটা বলিল, “Do you want a sweetheart ?” বলিয়াই একেবাবে আমার বাস্ত তাহাব কৃষ্ণিতলে পুরিয়া লইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। আমি স্বর্ণায় হাত বাহিব করিয়া লইয়া বলিলাম, “তুমি থাক কোথায় ? বাত্রে এখানে বেড়াইতেছ কেন ?” তাহাব উত্তবে সে যাহা বলিল ও কবিল, তাহা শ্রবণ করিতে লজ্জা হয়। আমি স্বর্ণায় তাহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া আসিলাম, কিন্তু তথাপি সে ক্ষণকাল সঙ্গে সঙ্গে আসিল। অপরিচিত পুরুষেব প্রতি স্ত্রীলোকেব এতদূর সাহস কখনও দেখি নাই। ভাবিতে লাগিলাম, আমাদের দেশের যুবকেরা এখানে আসিয়া কি বিপদেব মধ্যেই বাস করে !

অধিক রাত্রে লণ্ডনের রাস্তা যে কি এক মুর্ত্তি ধরে ! যাকে দেখি সেই নেশাতে টং। রাত্রি ১১টার পব যদি কোনও দূর স্থান হইতে রেলগাড়ীতে বাড়ীতে আসিতে হইত, দেখিতে পাইতাম, ষ্টেশনে যে টিকেট বিক্রয় করিতেছে সে নেশাতে চুর ; ষ্টেশনের যে লোক (porter) গাড়ীর দরজা খুলিতে

আসিল সে মাতাল, ভাল করিয়া যেন দাঁড়াইতে পারিতেছে না। যাত্রা এক সঙ্গে এক কামরাতে আসিয়া বসিল, তারা পুরুষ মেয়ে নেশাতে চুর। নামিয়া টামে বসিলাম, আরোহীদের মধ্যে কে কার গান্ধে ঢলিয়া পড়ে। যার সঙ্গে কথা কহি, তার মুখেই মদের গন্ধ। দেখিতাম, আর মনে ভাবিতাম, এত বড় জাতিটার যদি এই পানদোষটা না থাকিত, তাহা হইলে আরও কত কাজ করিতে পারিত!

চারিদিকেই ইংরাজ জাতির পানাসক্তিব নিদর্শন প্রাপ্ত হইতাম। কোথাও পথের পাশে দেখি, পর্বতাকার আমাদের দেশের ধাত্তের স্তূপ বাহিয়াছে। দাঁড়াইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ ধাত্ত রাশি হইতে মদ প্রস্তুত হইয়া পচা ধাত্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। দেখিয়া মনে ভাবিলাম, “ওমা! অশ্রাব্যে আমাদের দেশের শত সহস্র দরিদ্র লোক মরিতেছে, আর তাদের মুখের অন্ন আনিয়া এই ব্যবহারে লাগাইতেছে!”

যে বাড়ীতে আমি থাকিতাম, সে বাড়ীর বাড়ীওয়ালা একজন বৃদ্ধ। তিন তাঁর পত্নী ও তিনটি অবিবাহিতা মেয়ে, এই তাঁহাদের পরিবার। আহারের সময় মেরেদিগকে সুরাপান করিতে দেখি নাই। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা প্রতিদিন বৈকালে আহারান্তে ঐ ভোজনস্থানেই বসিয়া প্রায় ত্রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত পড়িতেন। পড়া চলিয়াছে এবং ঘন ঘন সুরাপান চলিয়াছে। এই জন্ত তাঁর হাতের নিকট এক জগ্ (ক্ষুদ্র কলস) ধেনো মদ (ale) রাখা হইত। পড়া শেষ হইতে হইতে প্রায় কলসটি খালি হইত। শুইতে বাহবার সময় যদি কোনও দিন তাঁর সঙ্গে কথা কহিতাম, দেখিতাম নেপথ্যে বৃদ্ধের গলার স্বর বদলিয়া গিয়াছে।

অথচ এই পরিবারের মধ্যে ধর্ম্মভাব বিলক্ষণ ছিল। প্রতিদিন প্রাতে তাঁহারা সপরিবারে উপাসনা করিতেন এবং রবিবারে নিয়মিতরূপে উপাসনামন্দিরে যাইতেন। বিশেষভাবে বৃদ্ধ কণ্ঠার ধর্ম্মভাব দেখিতাম। তিনি

আমাকে রবিবারে ধর্মোপদেশ শুনিবার জন্ত ভাল ভাল উপাসনানন্দিত্রে লইয়া যাইতেন। আমি দেশে ফিরিবাব সময় তিনি আমাকে একখানি পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। ঈশ্বারে আসিয়া দেখি, সেখানি একখানি দৈনিক উপাসনা পুস্তক। এতাত অনেক সার্বজন্যের উক্তি উদ্ধৃত আছে। গ্রন্থখানির প্রথম পৃষ্ঠায় বুদ্ধ নাজ একটি প্রার্থনা লিখিয়া দিয়াছেন, এহার মন্ত এই, “হে প্রভো। যেমন একবার ভ্রমসঙ্গামা পালব কাছে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল, সেমনি স্বদেশে না পৌছিও পোছিতে এই ধর্মাস্থবাগী ব্যক্তিব কাছে আপনাকে প্রকাশ করিও।” এই সাধু সঙ্গায় মানুষের যে সুবাপান।

একদিন আহাণে বাসিয়া বুদ্ধ গৃহস্থটাকে বলিলাম, “আচ্ছা, আপনারা তো বাতবেলের পত্ন্যক কথা অনাস্ত বাগিয়া বিশ্বাস করেন?” উত্তর,—
“তাই কাব বই কি?”

আমি—আচ্ছা, আদম বলিয়া একজন মানবের আদি পিতামহ ছিলেন, এবং তাহাব অবস্থা নিষ্পাপ, পূর্ণাবস্থা ছিল, তাহা কি বিশ্বাস করেন?
উত্তর—হা, তা কাব বই কি?

আমি—আচ্ছা, সেহ নিষ্পাপ পূর্ণাবস্থাও আদম স্ববাপান করিতেন কি না?

উত্তর—না, তখন ত সুবা আবিধাব হয় নাই।

আমি—তবে ও দেখিতেছেন, সুবাটা মানুষের পতিত অবস্থাব পানীয়।

এই কথা বলিতেই বুদ্ধ আমার উপর বাগিয়া উঠিলেন, কত কি বলিতে লাগিলেন। আমি ও তাঁহার পত্নী ও কন্তাগণ, ক্ষণিতে লাগিলাম।

ফল কথা এই, কোনও ইংরাজের সঙ্গিত আলাপ হইলেই আমি স্ববাপানের বিরুদ্ধে ভজাইবার চেষ্টা করিতাম। একবার কতিপয় জ্ঞ

পুরুষ ও মহিলার প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রমজীবীদের সভাতে গেলাম। সেদিন আলোচ্য বিষয় ছিল, “পানাসক্তির অবৈধতা।” আমি সুরাপানবিরোধী বলিয়া আমাকে তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। জাতীয় পানাসক্তির অনিষ্টফলেব বিষয় বক্তাগণ যখন বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন আমার মন বিস্ময় ও ঘৃণাতে অভিভূত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা আমাকে কিছু বলিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, “তোমরা মখে ‘সুরাপান-নিবারণ’ ‘সুরাপান-নিবারণ’ বলিতেছ; আমি ত দেখি, তোমরা সুরা-সাগরে নিমগ্ন আছ। তোমাদের বাস্তব মধ্যে গুঁড়ীর বাড়ী সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়ী। সেটা যেন সাধারণ মানুষের বেঠকখানা; ভদ্রলোক সেখানে প্রবেশ কবিতে লজ্জা পায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ভদ্রলোক কখনও গুঁড়ীব দোকানে প্রবেশ করে না; ছোট লোকেরাই প্রবেশ করে। আমি সেই দেশ হইতে আসিয়াছি, যে দেশের পূর্বপুরুষগণ সুরাপানকে মহাপাতকের মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন।” এই বলিয়া মনুর “ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ত্রেয়ং” প্রভৃতি বচন উদ্ধৃত করিলাম। আর-একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম যে, সেই পূর্বপুরুষগণ আদেশ করিয়াছেন যে, “মত্তহস্তীতে তাড়া করিলে বরং হস্তীর পদতলে পড়িয়া মরিবে, তথাপি গুণ্ডিকালয়ে আশ্রয় লইবে না।” এই-সমস্ত বচন শুনিয়া উপস্থিত পুরুষ ও মহিলাগণ হা করিয়া রাইলেন, ও পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিতে লাগিলেন। যখন আমি বলিলাম যে, “আমাদের দেশে এক্রপ লক্ষ লক্ষ পরিবার আছে, যথা আমার নিজের পরিবার, বাহারা চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কোন প্রকার মত্ত দেখে নাই; এক্রপ দেশে তোমাদের গবর্ণমেন্টের অধীনে প্রকারান্তরে সুরাপানের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, এবং হাজার হাজার সুরার দোকান স্থাপিত হইতেছে,” তখন চারিদিকে “shame, shame,” (কি লজ্জা! কি লজ্জা!) শব্দ উদ্ভিষ্ট লাগিল।

একদিন উত্তর লণ্ডনে আমার বাসা হইতে কুমারী কলেটের বাড়ী-
 বাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি, পথে একটা লোক একখানা মুদ্রিত কাগজ
 লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল, “অমুক জাহাজ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে,
 ইহাতে তাহার বিবরণ আছে, আপনি নেবেন?” আমি বলিলাম,
 “আমি সংবাদপত্রে ঐ জাহাজ ডোবাব বিবরণ পড়েছি।” তখন
 সে আপনার দারিদ্র্যের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইল। বলিল, “আমরা
 জীপুরুষে বড় কষ্টে আছি, আমাদের দিন চলে না। অনেক দিন অনাহারে
 যান্ন, আপনি যদি কিছু সাহায্য করেন, বড় ভাল হয়।” তাহার কথা
 শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল, কিছু দান কবিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাব
 মুখে মদেব গন্ধ পাইলাম। তখন তাহাকে বলিলাম, “তোমাকে
 কিছু সাহায্য কবিতে ইচ্ছা হইতেছে, করিতেও পারি; কিন্তু
 তোমাদের জাত বড় মাতাল, তোমাকে যে পরমা দিব, তাহা
 হয়তো তোমরা জীৱ হাতে না গিয়া শুঁড়ির হাতে যাবে। এই জ্ঞান দিতে
 ইচ্ছা করে না।” সে ব্যক্তি বলিল, “এই রাস্তার অদূৰে এক গলিতে আমি
 থাকি, আপনি আমার বাড়ীতে আমার জীৱ কাছে চলুন, তাকে জিজ্ঞাসা
 করিলে সব কথা জানিতে পারিবেন।” আমি পূৰ্বেই সংবাদপত্রে পড়িয়া-
 ছিলাম যে লণ্ডনের ঐ উত্তর-পূৰ্ব্ণ ভাগে অনেক দুঃখলোকের বাস; সৰ্ব্বদাই
 চুরি, ডাকাতি, হত্যা, মারামারি প্রভৃতি হইয়া থাকে; সময় সময় পথিক-
 দিগকে ভুলাইয়া গলির ভিতর লইয়া সৰ্ব্বস্ব কাড়িয়া লয় এবং চোখে কাপড়
 বাঁধিয়া নানা গলি ঘুরাইয়া আর-এক পথে ছাড়িয়া দেয়। তখন দয়ার
 আবির্ভাবে সে কথা আমার স্মরণ হইল না। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 চলিলাম। সে আমাকে গলি হইতে গলির ভিতর লইয়া চলিল। অবশেষে
 আমাকে একটা বাড়ীতে এক ঘরের ভিতর পুরিয়া বলিল, “আমার জীৱ
 ঘরে নাই, এখানে বসুন, আমি তাকে ডেকে আনিছি।” এই বলিয়া
 বাহির হইয়া গেল। আমার তখনও খেয়াল নাই যে বিপৎসমুদ্র স্থানে

‘আসিয়াছি। তখনও তার স্ত্রীর সহিত কথা কহিব ও কিছু দান করিব, এই ভাবটা প্রবল আছে। আমি বসিয়া আছি, কিম্বৎক্ষণ পরে দেখি, তিন চারি জন সবলকায় পুরুষ আসিয়া দ্বারে উকি মারিতেছে ও পরস্পর কি পরামর্শ করিতেছে। তখন আমার সেই সংবাদপত্রের কথাটা স্মরণ হইল। আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলাম ও দ্রুতগতিতে বাহিরের বাস্তায় যাইবার জন্ত অগ্রসর হইলাম। তাহারা দ্বারে আমার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। তাহারা আমার হাত ধরিতে না ধরিতে আমি দৌড়িয়া বাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন দেখি সেই লোকটা বাস্তার অপর পার্শ্ব হইতে আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আমার দিকে আসিতেছে। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার স্ত্রী আসছে।” আমি বলিলাম, “না, তোমার স্ত্রীর জন্ত আর দাঁড়াইব না, আমি চলিলাম।” সে আমার সঙ্গ লইল। আমি বলিলাম, “তোমাকে যখন কিছু দিব বলেছি, তখন দিচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গ ছেড়ে যাও।” এই বলিয়া তাকে কিছু পয়সা দিয়া কুমারী কলেটের বাড়ী গেলাম। গিয়া তাঁর বকুনি খাইয়া মরি। তিনি বলিলেন, “তুমি কাগজে পড়েছ, লোকমুখে শুনেছ, এই দিকে খারাপ লোকের বাস ; তবু তোমার চেতনা হয় নাই, এ বড় আশ্চর্য্য কথা ! আর যদি প্রাণভয়ে পাগিয়ে এলে, তবে পরশা দিলে কেন ? দয়ার কি স্থান অস্থান নাই ?” আমি আর কি বলিব ! মাথা পাতিয়া তাঁর বকুনি খাইলাম।

নারীর সম্মান।—বাহা ইউক, ভাল বিষয়ও অনেক দেখিতে লাগিলাম। তাহার কতকগুলি মনে আছে এবং উল্লেখ করিতেছি। একদিন কোথায় যাইব বলিয়া ট্রামে বসিয়াছি। গাড়ীটা প্রায় যাত্রীতে পরিপূর্ণ। আরোহীদিগের মধ্যে একজন এমনই মাতাল যে ঠিক হইয়া বসিতে পারিতেছে না। এমন সময় দেখা গেল, দুইজন ভদ্র স্ত্রীলোক গাড়ীতে উঠিতে আসিতেছেন। সে দেখেই নিম্ন এই বে গাড়ীতে আরোহণ

না থাকিলে পুরুষেরা দাঁড়াইয়া জীলোকদিগকে বসিবার স্থান করিয়া দিবে। তদনুসারে আমি ও আর একটি পুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছি, কিন্তু আমরা উঠিতে না উঠিতে সেই মাতাল পুরুষটি হেলিয়া ছলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গাড়ী-লোকেরা বলিল, “তুমি বসিয়া থাক, এঁরা উঠিতেছেন।” কিন্তু সে তাহা শুনিল না; তার মাতালে’ সুরে বলিল, “No! Ladies!” অর্থাৎ “তা হবে না; ভদ্রমহিলা যে!” আমি দেখিলাম, বে বেতস তারও এতটুকু হুঁস আছে যে নিজে উঠিয়া ভদ্রমহিলা-র স্থান করিয়া দিতে হইবে।

নারীজাতির প্রতি এই সম্মম ইংরাজ জাতির চরিত্রের এক প্রধান লক্ষণ। সেখানে থাকিতে থাকিতে একদিন শুনিলাম যে এক ছুটার দিন Crystal Palace এ শতাব্দিক শ্রমজীবী পুরুষ কি বিবাদ বাধাইয়া মহা দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইল। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে একটি রোগা ডিঙ্কিও মেয়ে আসিয়া তাহাদের মধ্যে পড়িয়া সেই দাঙ্গা থামাইয়া দিলেন। তিনি নাকি ঐ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঘূষিয়া ঘুরিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সন্তো প্রীতি ও প্রবঞ্চনায় ঘৃণা,—অণ্ডে সাধারণ প্রজাদের চরিত্রের কথাই বলি। তাহাদের মধ্যে এক প্রকার মোটামুট সত্যপরায়ণতা আছে। তাহারা অসত্যকে ঘৃণা করে, প্রবঞ্চনাতে প্রবৃত্ত হয় না। যে কাজটা করিবে বলিয়া তার লয়, তাহা সূচারু রূপেই করিবার চেষ্টা করে। অপরের কথা সোজাছজি বিশ্বাস করে; সে প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে বলিলেও তাহা বুঝিতে পারে না; পরে প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইলে ভয়ানক রাগে, এবং উত্তমরূপে প্রহার কবে।

আমি সেনাপতি গর্ডনের জীবনচরিত পড়িবার সময় একটি ঘটনার কথা পড়িয়াছিলাম। সেটি এই। গর্ডন বড় দয়ালু মানুষ ছিলেন। একবার একজন প্রবঞ্চক লোক দরিদ্র সাজিয়া এক গল্প সাজাইয়া আসিয়া

‘তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। তাহাকে দেখিয়া ও তাহার দুঃখের বিবরণ শুনিয়া গর্ডনের দয়া হইল। তিনি তাহাকে প্রচুররূপে দান করিলেন, যেন সে স্বীয় তাহার বর্ণিত কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। দুইদিন পরে গর্ডন শুনিলেন যে সেই ব্যক্তি পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্তী অপর কোনও স্থানে আর এক গল্প বলিয়া ভিক্ষা করিতেছে। ইহাতে তাঁহার এত ক্রোধ হইল যে তিনি চাবুক হাতে পাঁচ ছয় মাইল হাটিয়া তাহাকে মারিতে গেলেন। সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রহার করিলেন, অথচ নিজে যে টাকাগুলি দিয়াছিলেন, তাহা ফেরত লইতে মনে থাকিল না। এই ব্যাপাবে গর্ডন ব্রিটিশ জাতীয় চরিত্রে লক্ষণই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কর্তব্যজ্ঞান ।—সাধাবণ প্রজাদের মোটামুটি সত্যপ্রিয়তার ও কর্তব্যপরায়ণতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্বরণ আছে। একবার মিস্ ম্যানিং আমাকে ক্লাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি যাইব বলিয়া প্রস্তুত হইতেছি, আমার বাড়ীওয়ালী বলিলেন, তোমার প্যান্টালুন পার্টিতে যাইবার উপযুক্ত নয়, তুমি একটা নতুন কোট ও নূতন প্যান্টালুন কবাইয়া লও।

আমি—আর সাত দিন পরে পার্টি, এর মধ্যে কি প্যান্টালুন ও কোট কবা যাইবে ?

বাড়ীওয়ালী—রসো, আমি একটা দরজীকে ডাকছি, সে বোধ হয় করে দিতে পারবে।

যথাসময়ে একজন দরজী আসিল, সে আমার মাগ লইয়া গেল, এবং যথাসময়ে জিনিষ ছুটা দিবে বলিয়া গেল। দুদিন পরে তার জী কাটা কাপড়গুলি লইয়া উপস্থিত। বলিল, “আপনার কাজের ভার লওয়ায় পর, আমার স্বামীর স্কটল্যান্ড হতে একটা বড় কাজের ডাক এসেছে। অনেক দিন হতে এই ডাকের কথা বলছিল, এখন তাকে যেতেই হবে।

আমরা কাপড় কেটেছি, কিছু সেলাই করেছি; আপনি আর কোনও দরজীকে ডাকিয়ে অবশিষ্ট করে নিন।” তাহারা যে কাপড় কাটিয়াছিল ও কিছু সেলাই করিয়াছিল, তাহার দাম লইতে চাহিল না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, পাছে আমার অসুবিধা হয়, সেদিকে এদের এত দৃষ্টি! আমাদের দেশে শ্রমজীবীদের মধ্যে এটা দেখা যায় না।

আর একটি ঘটনা এই। আমি দেশে ফিরিবার সময় বাড়ীওয়ালী একদিন একজন লোককে ডাকিলেন, সে আমার পুস্তক প্রভৃতি আনিবার জন্ত একটি প্যাকিং কেস করিয়া দিবে। প্যাকিং বাক্সটি টিন দিয়া এমন করিয়া মুড়িতে হইবে যেন জাহাজে তাহাতে জল প্রবিষ্ট হইতে না পারে। মাল্‌বটাকে ঠিক আমার মনের কথাগুলো বুঝাইতে দেরি হইতে লাগিল। হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না। আমি তার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, ঠিক আমার মনের ভাবটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। যখন বুঝিল, তখন ঠিক সেইরূপ করিয়া দিবে বলিয়া ভার লইয়া গেল। কথা রহিল যে তৎপরদিন ১২ টার মধ্যে বাক্সটি আনিবে, আমরা আহ্বারান্তে প্যাকিং আরম্ভ করিব। তৎপর দিন প্রাতে আহ্বার করিতেছি, ঘড়িতে ১১টা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে, এমন সময়ে প্যাকিং বাক্সের শব্দ শোনা গেল। আমরা উঠিয়া গিয়া দেখি, সুন্দর বাক্সটি করিয়াছে, দোষ দেখাইবার কিছু নাই। বস্তুতঃ ইংরেজ কারিকরগণ যে কার্যটির ভার লয়, সেটা ভাল করিয়া করিবার চেষ্টা করে; সেটা লইয়া বসিয়া যায়, তাহার মধ্যে যত ভাল হইতে পারে তাহা করিয়া তোলে।

সত্যতা।—সেখানকার প্রজাসাধারণের এই সত্যপরায়ণতার ও সত্যতার, জন্ত দেশে এমন সকল কাজ চলিতেছে, বাহা এ দেশ হইলে ছদ্ম চলিত না। তাহার একটির উল্লেখ করিতেছি।

নিম্নশ্রেণীর লোকের মাকুলেটিং লাইব্রেরী।—আমি পিতা

দেখিলাম, শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে, এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্ত চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুই-দশখানি বাড়ীর পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা জমা দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া সে পুস্তক আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকান ঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবস্থা করিতেছে, সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়াও কিছু উপার্জন করিতেছে। ইহা ভিন্ন স্বল্পমূল্যে বিক্রয় ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য।

এইরূপ একটি পুস্তকালয়-বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অল্প কাজে গিয়া দেখি, এক পাশ্বে দুইটি আলুমারিতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম, পুস্তকগুলি স্বল্পমূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক। জিজ্ঞাসা করিলাম এ-সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্ত ?

উত্তর—না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী।

আমি—এসব পুস্তক কারা লয় ?

উত্তর—এই পাড়ার নিম্নশ্রেণী লোকেরা।

আমি—আমি কি বই লইতে পারি ?

উত্তর—হ্যাঁ পারেন, এ ত সাধারণের জন্ত।

তারপর আমি একখানি ৬৭ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে বইখানি ফেরৎ দিয়া আবার দুই আনা দিয়া আবার একখানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিন চারি সপ্তাহের পর

একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ ব্যবসা তোমরা কতদিন চালাইতেছ ?”

উত্তর—গত ৮৯ বৎসর।

আমি—মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না ?

উত্তর—কিরাপে ?

আমি—লগনের মত প্রকাণ্ড সহবে মানুষ এক পাড়া হতে আর এক পাড়ায় উঠে গেলে খুঁজে পাওয়া ভার। মনে কর, যদি বই ফিরিয়ে না দিয়ে এ পাড়া হতে উঠে যায়, তা হলে বই কি করে পাবে ?

এই প্রশ্নে আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল, “তা কি করে হতে পারে ? এ যে আমাদের বই। তাকে উঠে যাবার সময় ফিরে দিতেই হবে।”

আমি—মনে কর যদি না দেয় !

তাহারা হাসিয়া কহিল, “সে ভতেই পারে না।” বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে, হঁহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না।

উন্মুক্ত স্থানে নানাপ্রকার লোকের বক্তৃতা ও অন্যান্যের প্রকাশ্য প্রতিবাদ।—অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক কোনও উপাসনাস্থানে যায় না, এই অভাব দূর করিবাব জন্ত আমি যাইবার কিছুদিন পূর্ব হইতে সেখানে একটা কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। কোন কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রচারক ও উপদেষ্টাগণ, রবিবার প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ও উদ্ভান প্রভৃতির বৃক্ষতলে, উপাসনা ও উপদেশ আরম্ভ করিয়া ছিলেন। আমি অনেক সময় এই-সকল উপাসনা ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতাম। দেখিতাম, নিম্নশ্রেণীর নরনারী অনেকে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে। কোনও কোনও স্থলে দেখিতাম যে ধর্মপ্রচারকদের দেখাদেখি রাজনীতির পক্ষীয়গণ এবং ব্রাড্‌লার দলের নাস্তিকগণও তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে আসিতেন। সে বড় কৌতূহলের ব্যাপার। এক বৃক্ষতলে এক-

জন খ্রীষ্টীয় উপদেষ্টা বাইবেল গ্রন্থখানা উদ্ভে ধরিয়া বলিতেছেন, “দেখ, এই গ্রন্থ ঈশ্বরদত্ত। ইহাতে তোমরা দুর্বলতার অবস্থাতে বল, নিরাশায় আশা, শোকে সাহসনা ও বিপদে আশ্রয় লাভ করবে।” অপরদিকে কিয়দূরে ব্রাড্‌লা’র একজন শিষ্য হয় ত চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, “বাইবেল মানুষের গ্রন্থ, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ; ঈশ্বর বলিয়া যে কেহ কোথাও আছেন, তার প্রমাণ কি? তোমরা বুদ্ধিজীবী জীব, তাহারা চিন্তিয়া দেখিয়া শুনিয়া কাজ কর।” আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন রাজ-কার্যের ভার ‘টোরী’দিগের হস্তে ছিল। একজন বক্তা সেই ‘টোরী’ গবর্ণমেন্টের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিতেছেন; তাঁহারা যে অত্যাচার কবিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছেন। এদিকে দেখি, একজন সামান্য ছুতার বা কামার, যাহার পরিধানে মালিন ছিল বস্ত্র, পদদ্বয় পাছকাহীন, অঙ্গুলিগুলি বড় বড় চাটম কলার ছায়া, মুখনগল লোহিতবর্ণ, বামহস্তের উপর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির আঘাত করিয়া, ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া বলিতেছেন, “The Tories are rascals,” অর্থাৎ ‘টোরী’রা বদম্যের। যাহাকে তাহারা অত্যাচার বা অসত্য বা অধম্য মনে করে তাহার প্রতি তাহাদের এতই ক্রোধ! নিম্নশ্রেণীর লোকের অনেক সভাতে উপস্থিত থাকিয়া দোষিতাম, তাহারা যাহাকে অত্যাচার মনে করে, হৃদয়-মনের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছে, এবং যাহাকে সৎ মনে করে তাহাতে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেছে। গড়ের উপরে এই কথা বলি যে, এই হীনশ্রেণীর লোকদের কথা শুনিয়া অমুভব করিতাম, ধর্মবিশ্বাস ইহাদের মনে স্বাভাবিক।

কোনও দরজীর দোকানে গিয়া যদি কোনও কাপড়-চোপড়ের কর্ম্মাল দিয়া আসিতাম, একপ্রকার নিশ্চয় জানিতাম যে তাহা সময়ে পাইবই পাইব। কথা ভাঙ্গা, কাজ করিতে বসিয়া কাজ না করা, সামান্য প্রবঞ্চনা করা, এ সকল কাজকে সে দেশের সাধারণ লোক বড় ঘৃণার চক্ষে দেখে।

নরহিতৈষণা।—তৎপরে দেখিতাম, যেমন একদিকে দারিদ্র্য আছে, দুর্নীতি আছে,বিবিধ সামাজিক পাপ আছে, তেমনি আর একদিকে সে-সকল দূর করিবার জন্ত শত শত ব্যক্তির হস্ত প্রসারিত আছে। পাশ্চাত্য জগতের অল্প খ্রীষ্টীয় দেশে যাই নাই, স্তত্রাং সে-সকল দেশের নরহিতৈষী পুরুষ ও মহিলাগণের কার্যের কথা জানি না; কিন্তু ইংলণ্ডে নরহিতৈষণার যে ব্যাপার দেখিলাম,তাহা অতীব বিস্ময়জনক। মানব-বুদ্ধিতে যে জনহিতকর এত প্রকার কার্য উদ্ভাবিত হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য! তাহার কতগুলির উল্লেখ করিব? অসংখ্য বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। লণ্ডনে ডাক্তার বার্ণার্ডের অনাথাশ্রমবাটিকা ও ত্রিষ্টলে সাধু ভক্ত জর্জ মুলার মহাশয়ের অনাথাশ্রমবাটিকা যখন দেখিলাম, তখন বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ঈশ্বর-ভক্তি, নরহিতৈষণা, বা কার্যদক্ষতা, কোন্ গুণের অধিক প্রশংসা করিব! তৎপরে শ্রমজীবীদিগের ইনষ্টিটিউট, পীপ্ল্‌স্‌ প্যালেস্‌, শ্রমজীবীদিগের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়, পুওর হাউস বা দরিদ্রদিগের আশ্রম-বাটিকা, প্রভৃতি যাহা দেখিতে লাগিলাম, তাহাতেই বিস্ময় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলিতে কি, ইংলণ্ডবাসকালে আমি ঐ-সকল দেখাকেই আমার একটি প্রধান কার্য্য মনে করিয়াছিলাম।

শিশুরক্ষণী সভা।—ইংরাজ জাতির কিরূপ নরহিতৈষণা তাহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। আমি যখন সেখানে, তখন তিন প্রকার কাজের বিষয় আমার প্রতিগোচর হইল। প্রথম মিষ্টার বেন্‌জামিন ওয়া (Benjamin Waugh) নামে একজন পাদরী একদিন কোনও নগরের রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন যে একটা শিশু পথে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাব মুখে নানা আঘাতের দাগ, মুখ ফুলিয়া রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, তাহার পিতা বা মাতা মাতাল হইয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছে। তখন মিষ্টার ওয়ার মনে মনে প্রব্র উঠিল, তবে ত পিতামাতার হস্ত হইতেও ক্লসহার বাগল-বাধিকাকে রক্ষা করা চাই।

এই চিন্তা লইয়া তিনি ঘরে গেলেন, এই চিন্তা তাঁহার মনকে বিরিয়া লইতে লাগিল, এবং তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত ঐ বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার ফলস্বরূপ শিশুরক্ষিনী-সভা নামে একটা সভা স্থাপিত হইল; শত শত ব্যক্তি তাহার সভ্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তৎপরে এই কয়েক বৎসবে সেই সভার সভাগণ মহাকাৰ্য্য সমাধা করিয়াছেন, শিশুরক্ষার জন্ত পাল্‌মেণ্টের দ্বারা নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। সে আইন অনুসারে শিশুদের প্রতি নির্দয়তার জন্ত পিতামাতাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। ইংলণ্ডের ছায় মাতাল দেশে এইরূপ আইন নিত্য প্রয়োজনীয়।

সন্ধ্যাকালে রাজপথে ভ্রমণকারিণী বালিকাদিগের চিন্তাবিনোদন।—আর একটা কার্যের সূচনাও এইরূপ কাবণে হইয়াছিল। একদিন এক ভদ্রমহিলা লণ্ডনের রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, বৈকাল বেলা সন্ধ্যার পূর্বে রাজপথে হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা, অর্থাৎ ১৬ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক যুবতী স্ত্রীলোক বেড়াইতেছে। এরূপ দৃশ্য সেখানে নূতন দৃশ্য নহে, কিন্তু সেদিন ঐ দৃশ্য উক্ত মহিলার অন্তরে এক নূতন ভাবের উদয় করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই-সকল মেয়ে মফঃসল হইতে আসিয়াছে, কাজকর্ম লইয়া এখানে বাস করে। কেহ দোকানে কাজ করে, কেহ পোষ্ট অফিসে কাজ করে, কেহ হোটেলে কাজ করে। সন্ধ্যা হইলে ছুটি পায়, রাস্তাতে বেড়ায়; দশজনে ‘মেস্’ করিয়া থাকে, পিতামাতা নিকটে থাকে না। ইহাদিগকে দেখে কে? এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি বাড়ীতে আসিলেন। স্বীয় পতির সহিত এই কথাতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই চিন্তা তাঁহাকে বিরিয়া লইল। অবশেষে তাঁহার কতিপয় মহিলা একত্র হইয়া একটি ছোট সভা করিলেন। প্রথমে লণ্ডনের

যে বিভাগে এই শ্রেণীর বালিকা অধিক পরিমাণে বাস করে ও বেড়ায়, সেই বিভাগে একটা বড় ঘর ভাড়া করিলেন। ঘরটা উত্তমরূপে সাজাইলেন, বসিবার উত্তম আসনের ব্যবস্থা করিলেন, একটা পিয়ানো লইয়া গেলেন, গানবাঞ্ছের সমুচিত ব্যবস্থা করিলেন, এবং কতিপয় মহিলা বন্ধুতে মিলিয়া কে কে সপ্তাহের কোন্ কোন্ দিন সন্ধ্যার সময় এই গৃহে গিয়া মেয়েদিগকে গান বাজ শুনাইবেন ও মেয়েদেব সঙ্গে কথাবার্তা কহিবেন তাহা স্থির করিলেন। তৎপরে একদিন ছোট ছোট কাগজে একটা ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া রাজপথে-দয়ণকারিণী বালিকাদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইল। “তোমরা যদি অমক নম্বর বাড়ীতে নিম্ন তলের ঘরে এস, তবে তোমাদিগকে গানবাজনা শুনান হইবে,” ইত্যাদি। প্রথম দিনে দুই একটা বালিকা আসিল। মহিলারা গান বাজনা শুনাইলেন, তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় কবিলেন, এবং তাহারা কোথায় থাকে, কিরূপ সঙ্গে বেড়ায়, কিরূপে দিন কাটায়, এই-সকল সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। তাহারা সেদিন অপায়িত হইয়া ফিরিয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময় বহুসংখ্যক বালিকা উপস্থিত হইল। ক্রমে আর সে ঘরে লোক ধরে না। একটীর পর আর একটা এইরূপ করিয়া লগুনের সেই বিভাগে ক্রমে ক্রমে সাত আটটা ঘর লইতে হইল। শত শত যুবতী স্ত্রীলোক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঐ-সকল গৃহে আসিয়া গান বাজনা উপদেশাদি শুনিতে লাগিল। এদিকে উদ্যোগ-কারিণী মহিলাদের সভা বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য পরোপকার প্রবৃত্তি !

কারামুক্তের সাহায্যসভা।—আর একটা কার্য্যের কথা তখন শুনিলাম ; ইহার আয়োজন বোধ হয় পূৰ্ণ হইতেই হইয়া থাকিবে। সে কাজটা এই। একবার কয়েকজন ভদ্রলোক এই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, “বাহারা একবার কোনও অপরাধে লিপ্ত হইয়া কান্দাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহারা যখন কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, তখন বাহিরে

আসিলে ত আর পূর্বের ছাত্র সমাজে মিশিতে পার না, লোকে তাহাদিগকে কাজ দিতে ভয় পায়, ঘরে বাধিতে ভয় পায়, সমাজে তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লজ্জা বোধ করে। তখন তাহাদের কি অবস্থা দাডায়। এই কাবণেই বোধ হয় অনেক কাবামুক্ত লোক আবার অপরাধে লিপ্ত হইয়া কারাগারে ফিরিয়া যায়। কাবামুক্ত মানুষদিগকে সুপথে রাখিবাব জন্ত ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত কবিবাব জন্ত কিছু করা যায় কি না ?” এই চিন্তা করিতে কবিতো পত্র ভদ্রলোক “কাবামুক্তের সাহায্য সভা” নাম এক সভা স্থাপন করিলেন। তাহাব ফল এই হইয়াছে যে ইংলণ্ডের অনেকগুলি কারাগার কয়েদীহীন হইয়াছে।

বিবিধ সদনুষ্ঠান।—সেখানকাব সহদয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর পুরুষ ও নারীগণের পারোপকারস্পৃহাব কথা অধিক ক বলব। সেখানে অনেক ৩৬ মহিলা হাসপাতালে বোগাগণের নিকট ফুলের তোড়া পাঠাইবার জন্ত স্থানে স্থানে সভা কবিয়াছেন, নিম্নশ্রেণীব দরিদ্র শিশুদিগকে বড়দিনের সময় পুতুল উপহার দিবাব জন্ত বড় বড় সভা কবিয়াছেন, বড় বড় সহরে নিম্নশ্রেণার বালক বালিকাদিগকে মধ্যে মধ্যে সহরের বাহিরে লইয়া গিয়া বসুন্ধ বাসেবন কবাইবাব ও প্রকৃতির শোভা দেখাইবার জন্ত সভা কবিয়াছেন। বস্তুতঃ মানবেব পরহিতৈষণা প্রবৃত্তি হইতে কতপ্রকার সদনুষ্ঠান উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়।

প্রজাসাধারণেব মধ্যে জ্ঞানবিস্তাবেব চেষ্টা।—আমি সেদেশে পৌছিবার কিছুদিন পূর্ব হইতে সে দেশের প্রজাসাধারণেব মধ্যে জ্ঞানবিস্তাবেব চেষ্টা চলিতেছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আশঙ্কিত শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারেব প্রয়াস পাইতেছিলেন।

“টয়নবাহল” ও “পীপল্‌স্‌ প্যালেস্‌”।—ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। মিষ্টার টয়নবী (Arnold Toynbee) নামে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা যুগ্মকের মনে হইল যে, তাহার যখন অবস্থা ভাল,

উদরারের জন্ত চিন্তা নাই, তখন তিনি তাঁহার জীবন কোনও ভাল কার্যে দিবেন ; তিনি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার প্রয়াসে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি লণ্ডন সহরের পূর্বভাগে আসিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; কারণ ঐ বিভাগেই অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী লোকের বাস। টয়ন্বী প্রথম প্রথম ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে নিজ ভবনে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সঙ্গে পাঠ ও মৌখিক উপাসনাদি দ্বারা কার্য্যারম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার কার্য্যের আশ্চর্য্য ফল দেখা গেল, এবং অপর কয়েকজন শিক্ষিত যুবক আসিয়া তাঁহার সহিত বোগ দিলেন। তাঁহার নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শ্রমজীবীদিগকে রীতিমত শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের ফল স্বরায় ফলিল। নৈশ-বিদ্যালয় করিয়া শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষাদান করিবার জন্ত চারিদিকে আয়োজন হইতে লাগিল। নানা স্থানে “ওয়ার্কিং মেন্‌স্ ইনষ্টিটিউট” (Working Men’s Institute) নামে পাঠাগার-সকল নিৰ্ম্মিত হইতে লাগিল। ক্রমে টয়ন্বীর মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার স্বদেশবাসীগণ তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থ লণ্ডনের ঐ পূর্ব বিভাগে তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্রের সম্মুখানে “টয়ন্বী হল” (Toynbee Hall) নামে শিক্ষামন্দির নিৰ্ম্মাণ করিলেন। তাহা অত্থাপিও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্ত ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্বিল লণ্ডনের ঐ পূর্বভাগেই “দি পৌপ্‌ল্‌স্ প্যালেস্” (The People’s Palace) অর্থাৎ “প্রজাকুলের প্রাসাদ” নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নিৰ্ম্মিত হইল, তাহা এক্ষণে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। আমি সে প্রাসাদ দেখিয়াছি। তাহাতে নিম্নশ্রেণীর জন্ত পাঠাগার, পুস্তকালয়, রঙ্গালয়, ভোজনাগার প্রভৃতি সকলই আছে। ঐ প্রাসাদের মধ্যে বসায়মান হইলে ইংরেজদের পরহিতৈষণার নিদর্শন দেখিয়া শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে।

শ্রমজীবীদিগের শিক্ষালয়।—আমি একদিন ওয়ার্কিং মেন্‌স্‌ ইনষ্টিটিউটের (Working Men's Institute) একটা পাঠাগার দেখিতে গেলাম। একটা ১৭১৮ বৎসর বয়স্ক শ্রমজীবী যুবক আমাকে লইতে আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি তখন একজন সেক্রার সহকারীর কাজ করিত। সে আমাকে সঙ্গে করিয়া উত্তর লওনে এক ইনষ্টিটিউটে লইয়া গেল। সে এক প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রবেশ করিয়া দেখি, তাহাতে নানাপ্রকার আলোচনা ও উপদেশাদির জন্ত নানা ঘর। কোন ঘরের দ্বারে লেখা রহিয়াছে “কেমিস্ট্রি” (Chemistry); শুনিলাম, সে ঘরে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন সন্ধ্যার সময় কিমার্তিবত্তা বিষয়ে উপদেশ হয়; ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি একটা ছোটখাট ল্যাবরেটোরী প্রস্তুত। কোন ঘরের দ্বারে লেখা “ফিজিক্‌স্‌” (Physics) অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞান; ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে উপদেশের আয়োজন। এইরূপ নানা ঘরে নানা আয়োজন দেখিলাম। সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তিনি তৎপূর্বে চৌদ্দ বৎসর কাল ঐ কাজ করিতেছেন; বেতন লন না। প্রতিদিন বৈকালে নিজের অফিস হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার সময় ইনষ্টিটিউটে আসেন, এবং রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত কাজ করেন। এই পরিশ্রম চৌদ্দ বৎসর চলিয়াছে! ভাবিলাম, কি স্বদেশহিতৈষিতা ও পরহিতৈষণা!

ইনষ্টিটিউটের মধ্যে দুইটা বড় ঘরে এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী দেখিলাম। শুনিলাম, শ্রমজীবীগণ সেই লাইব্রেরী হইতে বই লইয়া পাঠ করে। তৎপরে বাহির হইয়া উঠানে গিয়া দেখি, ছাত্র ও ছাত্রীগণের শারীরিক ব্যায়াম ও খেলার জন্ত সমুদয় বন্দোবস্ত আছে। ছাত্র ও ছাত্রীগণের জন্ত দুইটা স্বতন্ত্র প্রাঙ্গন। বক্তৃতাদি শোনার পর সেই-সকল প্রাঙ্গনে একটু খেলাও হইয়া থাকে।

শুনিলাম, এই প্রকাণ্ড ভবন দেশহিতৈষীগণের স্বতঃপ্রস্তুত দানের দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, এবং এখানে যে-সকল বক্তৃতাদি দেওয়া হয়,

তাহা লণ্ডন ইউনিভার্সিটির প্রফেসরগণের ও অপরাপর বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-দিগের মধ্যে অনেকে বিনা বৃত্তিতে দিয়া থাকেন।

ইংরাজজাতির সৎকার্য্যে দান।—ইংরাজদিগের এইরূপ সদহুষ্ঠানে দানপ্রবৃত্তি যে কিরূপ, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যাব্বিত হইতে লাগিলাম। একবার শুনিলাম, ঐরূপ একটা ইনস্টিটিউটের জন্ত একজন ভদ্রলোক ১০।১২ লক্ষ টাকা দান করিলেন, কিন্তু কে দিলেন জানিতে পারা গেল না। ধনী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র, সকলেরই মধ্যে আশ্চর্য্য দানপ্রবৃত্তির নিদর্শন দেখিতাম। যে বাড়ীতে আমি থাকিতাম সে বাড়ীতে অনেকবার এইরূপ ঘটনা হইয়াছে যে, মেয়েরা সাঙ্গকালীন আহারের পর বৈঠকঘরে বসিয়া পড়িতেছেন ও কাজ করিতেছেন, এমন সময়ে একটা মেয়ে খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিয়া উঠিলেন, “মা, দেখ! দেখ! একটা নূতন কাজের আয়োজন হছে। আমরা কি কিছু সাহায্য করতে পারি না?” এই বলিয়া কাগজ হইতে কাজটার বিবরণ পড়িয়া শুনাইলেন। মা বলিলেন, “রোস, দেখি, দিবার মত কি আছে।” এই বলিয়া তাঁহার হিসাবের খাতা আনিয়া হিসাব দেখিতে বসিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “আমরা পাঁচ শিলিং দিতে পারি।” তখন মনি-অর্ডার যোগে: পাঁচ শিলিং ঐ কাজের সেক্রেটারির নামে পাঠান হইল। দেখিয়া আমি ভাবিলাম, অপরাপর অভ্যাসের জ্ঞান habit of public charityও (অর্থাৎ জনহিতকর কার্য্যে অর্থদান-প্রবৃত্তিও) সঙ্গ ও অবস্থাগুণে ফুটিয়া থাকে। যে দেশের লোকের মনে এই অভ্যাস (habit of public charity) ফোটে নাই, সে দেশের মানুষকে ভাল কাজের জন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়। লোকে মুঠা করিয়া পরসা ধরিয়া বসিয়া থাকে; যে জোরে মুঠা খুলিয়া লইতে পারে সেই পায়; অস্ত্রে পায় না। আমাদের দেশের যেন এই অবস্থা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

ইংলণ্ডের ধর্ম্মমূলক সদনুষ্ঠান :—বার্নার্ডোর অনাথাশ্রম ; জর্জ মূল্যের অনাথাশ্রম ; কয়েকজন কোয়েকারের শ্রমজীবীসেবা ; মুক্তিফৌজ ।

ইংলণ্ডে শিক্ষার ব্যবস্থা :—কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ; বোর্ড স্কুল ;

“আপার মিড্‌ল্‌ ক্লাস্‌” স্কুল ; বালিকাদের বোর্ডিং স্কুল ;

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী ; অক্সফোর্ড ; কেম্ব্রিজ ।

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার :—ই

বি কাউয়েল ; জেম্‌স্‌ মার্টিনো ; মিস্‌ কব্‌ ;

ফ্রান্সিস্‌ নিউম্যান্‌ ; চার্ল্‌স্‌ ভয়সী ;

উইলিয়ম্‌ ষ্টেড্‌ ; মিসেস্‌ বাটলার ।

(১৮৮৮)

ইংলণ্ডের ধর্ম্মমূলক সদনুষ্ঠান । বার্নার্ডোর অনাথাশ্রম ।—
সে দেশের ধার্মিক ব্যক্তিগণ পরোপকারের জন্ত যে সকল কার্যের
আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহারও অনেকগুলি দেখিয়াছিলাম । তাহার
মধ্যে ডাক্তার বার্নার্ডোর প্রতিষ্ঠিত পিতৃমাতৃহীন বালকদিগের আশ্রম-
বাটিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ডাক্তার বার্নার্ডো একজন চিকিৎসা-ব্যবসারী
লোক ছিলেন ; চিকিৎসা-কার্যে বসিয়া এই প্রেণীর বালকদের প্রতি
তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল । তিনি ইহাদের জন্ত কিছু করা আবশ্যক
বোধ করিলেন । কতকগুলি পিতৃমাতৃহীন বালক সংগ্রহ করিয়া লণ্ডন
সহরে এক আশ্রম-বাটিকা স্থাপন করিলেন । আমার বাইবার পূর্বে
কয়েক বৎসর হইতে এই কাজ চলিতেছিল । তৎপূর্বে তাঁহার আশ্রম-
বাটিকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অনেকগুলি যুবক ক্যানেনডা দেশে কর্ম
কাজ করিবায় জন্ত প্রেরিত হইয়াছিল । আমরা যখন তাঁহার আশ্রম-

বাটিকা দেখিবার জন্ত গেলাম, তখন গিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিসের অধিক প্রশংসা করিব, ইংরাজের কার্যের ব্যবস্থা করিবার অদ্ভুত শক্তির, অথবা পরহিতৈষণার। কাজের একপ স্রব্যবস্থা জীবনে কখনও দেখি নাই, একপ পবোপকার-প্রবৃত্তিও দেখি নাই।

জর্জ মূল্যবের অনাথাশ্রম :—এইরূপ আর-একটি আশ্রম-বাটিকা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। সেটি ব্রিষ্টল নগরের সুপ্রসিদ্ধ জর্জ মূল্যের প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রম-বাটিকা। ইহার ইতিবৃত্ত অতি অদ্ভুত। কিরূপে জর্জ মূল্য এক পয়সা ভিক্ষা না করিয়া, চাঁদা না তুলিয়া, কেবলমাত্র ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা ৬৩ বৎসর এই-সকল আশ্রম-বাটিকাতে এককালে সহস্রাধিক পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাকে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ইতিহাস অতীব বিস্ময়কর, ও ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই পাঠেব যোগ্য। আমি গিয়া দেখিলাম, পাঁচটি আশ্রম-বাটিকাতে প্রায় দুই সহস্র বালক-বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। তাহাদের জন্ত পাঁচটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁড়ী নির্মিত হইয়াছে, যাহার জানালার সংখ্যাই এগার শত। ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা ও মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা এই-সকল ভবন নির্মিত হইয়াছে। ভবনে প্রবেশ করিয়া প্রথমে শিশুদের ঘরে গেলাম। গিয়া দেখি, দুইজন স্ত্রীলোক ২০।২৫টি শিশুকে লইয়া খেলা দিতেছেন ও রক্ষা করিতেছেন। তৎপরে অপরাপর গৃহও দেখিলাম। কি স্রব্যবস্থা, কি রক্ষা ও শিক্ষার রীতি, দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

কয়েকজন কোয়েকারের শ্রমজীবী-সেবা :—কোয়েকার-সম্প্রদায়-ভুক্ত কয়েক ব্যক্তি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রতি রবিবার প্রাতে একটা ভবনে তাঁহারা শ্রমজীবীদিগকে একত্র করিয়া ধর্মোপদেশ দিবেন। আমাকে একদিন দেখিবার জন্ত ডাকিয়াছিলেন। আমি গিয়া তাঁহাদের

যে কার্যপ্রণালী দেখিলাম, তাহা এই। প্রায় ষত্বেশক শ্রমজীবী একত্র হইয়াছে। প্রথম একটা বড় ঘরে তাহাদিগকে লইয়া আধঘণ্টা কাল উপাসনা করা হইল। তাহার পর তাহাদিগকে আর-একটা ঘরে আনিয়া আধঘণ্টা কাল দুইপ্রকার কাজ চলিল। প্রথম, ব্যাকের কাজ আরম্ভ হইল। শ্রমজীবীগণ সপ্তাহের মধ্যে যে যাহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহা জমা দিতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ, অপব দিকে অনেকে লিখিবাব খাতা খুলিয়া A B C D লিখিতে বসিয়া গেল, এবং যাহা লিখিয়া আনিয়াছে, তাহা শিক্ষকদিগকে দেখাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম, ৩০।৩৫ বৎসব বয়সের বুড়া মদ্রেরাও A B C D লিখিয়া দেখাইতেছে। তৎপবে ধর্মোপদেশের জন্ত চারি পাঁচ ঘণ্টে ক্লাস বসিল। এক এক ক্লাসে এক-একজন ভদ্রলোক শিক্ষকের আসন অধিকার করিয়া উচ্চ আসনে বসিলেন। আমাকে তাহার এক ঘরে উচ্চ আসনে শিক্ষকের পাশে বসাইয়া দিলেন। তৎপরে যে ভাবে কার্য্য আবস্ত হইল, তাহা এই। শিক্ষক বলিলেন, “গত রবিবার অমুক ব্যক্তিকে বাইবেলের অমুক অমুক স্থান পড়িয়া আসিবার জন্ত অমুরোধ করা হইয়াছিল। তিনি যদি উপস্থিত থাকেন, উঠে দাঁড়ান, এবং সেই স্থান পড়ে কি উপদেশ পেয়েছেন বলুন।” অতঃপর সমবেত শ্রমজীবীদের মধ্যে একজন উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বাইবেলের কোন্ কোন্ স্থান পড়িয়া কি উপদেশ পাইয়াছে বলিতে প্রবৃত্ত হইল। বক্তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও ভাবগ্ৰাহিতা দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। শিক্ষক আমাকে কিছু বলিতে অমুরোধ করিলেন, আমি কিছু বলিলাম না, কিন্তু অপর কয়েকজনে কিছু কিছু বলিলেন। অবশেষে শিক্ষক তাঁহার উপদেশ দিয়া উপসংহার করিলেন। এইরূপে একঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল।

‘যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে আপনাকে উপকৃত বোধ করিলাম।

“মুক্তি ফৌজ।”—আমি ইংলণ্ড বাসকালে মুক্তিফৌজের (Salvation Army) কাজ কর্তব্য বিশেষভাবে দেখিতাম; তাহাদের

সভা-সমিতির সংবাদ পাইলেই উপস্থিত থাকিবার চেষ্টা করিতাম। একবার “আলেগ্‌জান্ড্রা প্যালেস্” (Alexandra Palace) নামক কাচমন্দিরে তাঁহার এক বিয়াট সভা করিলেন। তখন সভ্যগণের, বিশেষতঃ জেনারেল বুথের পুত্রকন্যাগণের যে উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা হয় না। আমি উক্ত প্রাসাদে পদার্পণ করিবামাত্র মেয়ের পর মেয়ে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। “আপনি কি স্মার্ত্তশৈলি? আপনি কি খ্রীষ্টান?” যেই বলি “না,” আর কোথায় যায়! অমনি চীৎকার, তর্ক বিতর্ক, উপস্থিত হয়। একটা মেয়ের হাত ছাড়াইলে আর একটার হাতে পড়ি। মুক্তি-ফৌজের কার্যে স্ত্রীলোকদিগেরই বিশেষ উৎসাহ দেখিলাম। গুলিলাম, জেনারেল বুথের পুত্রবধূ, ব্রামওয়েল বুথের পত্নী, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘোড়েন, এবং বারাক্সাদিগের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া তাহাদিগকে বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন।

একদিন আমি ইহাদের প্রধান কর্মস্থান দেখিবার জন্ত ইচ্ছুক হইয়া জেনারেল বুথের বাসভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন মিসেস বুথ বোধ হয় অসুস্থ ছিলেন। জেনারেল বুথ আসিতে পারিলেন না। তাঁহার পুত্র ব্রামওয়েল বুথ আমাকে লইয়া তাঁহাদের সাধন-গৃহ দেখাইতে লাগিলেন। আমি যেদিকে চাই, সেইদিকেই দেখি, প্রাচীরের গায়ে লেখা আছে, “যীশু তোমাদিগকে ডাকিতেছেন,” “যীশুর চরণে মতি রাখ,” “যীশুর চরণে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদিগকে বল দিবেন”, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সমুদয় প্রাচীর যীশুর গুণগানে পরিপূর্ণ; ঈশ্বরের নাম কোথাও নাই। দেখিয়া আমি কিছু বিষম হইয়া গেলাম। আমার বিষম মুখ দেখিয়া ব্রামওয়েল বুথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাকে বিষম দেখিতেছি কেন?” আমি বলিলাম, “কেবল যীশু যীশু দেখিতেছি, ঈশ্বরের নাম কোথাও নাই, সেই জন্ত আমার দুঃখ হইতেছে; আপনারা যীশুর পক্ষ দিয়া একেবারে ঈশ্বরকে ঢাকিয়া কৈলিয়াছেন।” ব্রামওয়েল

বুথ হাসিয়া বলিলেন, “আপনি কি জানেন না, যীশুই আমাদের ঈশ্বর? যীশু ঈশ্বরের অপর নাম মাত্র।” আমি ভাবিতে লাগিলাম, অবতারবাদে ভক্তবৎসল ভগবানের স্বরূপকে কি চাপা দিয়াই ফেলিয়াছে! এই ভাবিতে ভাবিতে ঘরে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

শিক্ষার ব্যবস্থা। কিণ্ডারগার্টেন স্কুল।—ইংলণ্ডের শিক্ষা-প্রণালী দেখিবার জন্ত কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, বোর্ড স্কুল, “আপার মিড্‌ল ক্লাস্” স্কুল, প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছিলাম। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলাম। শিশুদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার যে এত প্রকার উপায় উদ্ভাবন হইতে পারে, তাহা অগ্রে জানিতাম না। তাহাদিগকে খেলার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাহার মাটি দিয়া ছোটখাট বাড়ী গড়িতেছে; নানারঙের কাগজ দিয়া অত্রপ্রকার পদার্থ নিৰ্ম্মাণ করিতেছে। শিক্ষয়িত্রীরা আমাকে লইয়া সকল বিভাগ দেখাইলেন। অবশেষে একজন শিক্ষয়িত্রী যখন শিশুদিগের সহিত করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে ঘরে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। শিশুদের এই শিক্ষাপ্রণালী আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমি আসিবার সময়ে কিণ্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রোবেলের জীবনচরিত ও উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর কয়েকখানি গ্রন্থ কিনিয়া আনিলাম। তাহা আমি পরে ব্রাহ্ম বালিকা-শিক্ষালয়ের পুস্তকালয়ে উপহার দিয়াছি।

বোর্ড স্কুল।—বোর্ডস্কুলের শিক্ষাপ্রণালীও বড় চমৎকার বোধ হইল। বিশেষতঃ বালকগণ মানসাকে যেরূপ অঙ্কুরিত পারদর্শিতা দেখাইল, তাহা কখনও ভুলিবার নয়। শিক্ষক দাঁড়াইয়া বলিলেন, “এততে এত যোগ কর, তাহা হইতে এত বিয়োগ কর, তাহার ফলকে এত দিয়া গুণ কর, তাহার ফলকে এত দিয়া ভাগ কর, ইত্যাদি, ইত্যাদি।—কি কল দাঁড়াইল,

বল। বে ছেলে ঠিক করেছে সে হাত তুলুক।” যেই বলা, অমনি একটা ছেলে হাত তুলিল, এবং ফলটা বলিয়া দিল।

“আপার মিড্‌ল ক্লাস” স্কুল !—“আপার মিড্‌ল ক্লাস” স্কুলে গিয়া দেখি, ভূগোল ও ভূতত্ত্ববিজ্ঞানে বালকদেব অদ্ভুত পারদর্শিতা। সমগ্র পৃথিবীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যেন তাহাদের নখের আগায় রহিয়াছে। তারপর সেখানে আব এক ব্যাপার দেখিলাম। এক এক শ্রেণীতে ২৫।৩০ জন ছাত্রের বেশী হ'বে না, কিন্তু একই সময়ে দুইজন শিক্ষক কার্য্য করিতেছেন।

বালিকাদিগের বোর্ডিং স্কুল।—কেবলমাত্র বালকদিগের স্কুল দেখিয়া ক্ষান্ত হই নাই। একটা বালিকাদিগের বোর্ডিংস্কুলও দেখিতে গিয়াছিলাম। কি শৃঙ্খলা, কি পরীক্ষার-পরিচ্ছন্নতা! কি পাঠ ত্রীড়া প্রভৃতির সুনিয়ম! যাহা দেখি, তাহাতেই চমৎকৃত হইতে হয়! অবশেষে তত্ত্বাবধায়িকা, যে গৃহে বালিকাবা শয়ন কবে তাহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, সেটা একটা হাঁসপাতাল ঘরের ভায় বড় হল (hall); তাহাতে অনেকগুলি বালিকাব শয়নের শয্যা আছে। হলের এক পার্শ্বে একটা উচ্চ কাঠের মঞ্চ (platform)। একজন শিক্ষয়িত্রী বালিকাদের সঙ্গে একত্রে শয়ন করেন, তাহাব শয্যাটা ঐ মঞ্চের উপর রহিয়াছে। আমি তত্ত্বাবধায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “শিক্ষয়িত্রী কাঠের মঞ্চের উপর শয়ন করেন কেন?” তিনি বলিলেন, “ওখানে শুইয়া শুইয়া বালিকাদের গতিবিধি দেখা যায়।”

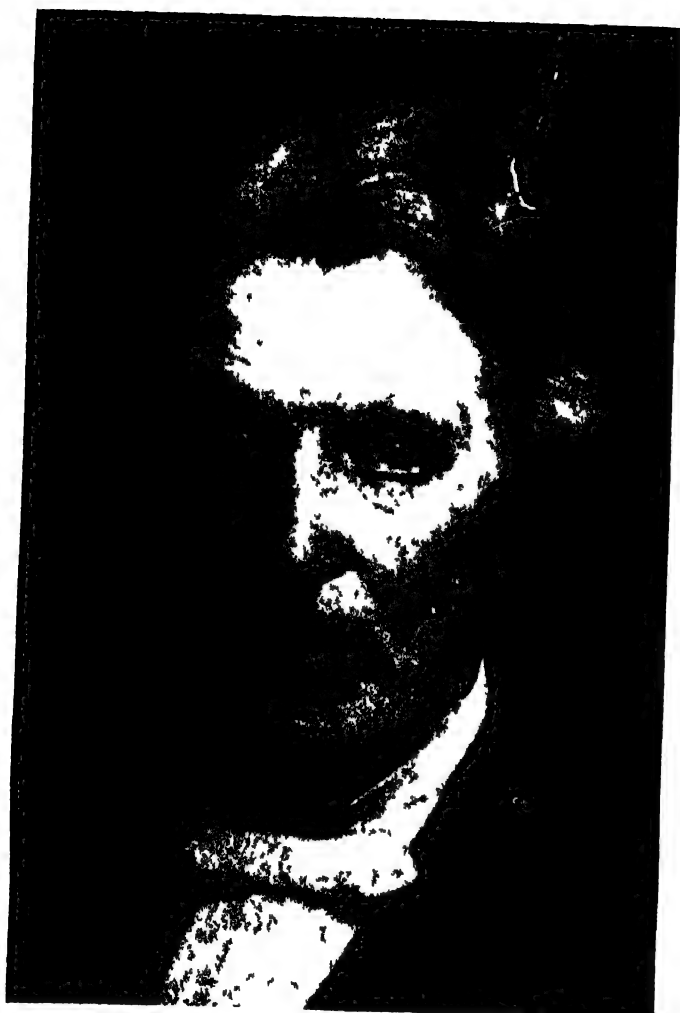
লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী।—লণ্ডনবাসকালে আমি অনেক দিন ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে গিয়া পড়িয়াছি। শুনিয়াছি, সেখানে এত বইয়েব আলমাবি আছে যে, একটার পাশে আর একটা দাঁড় করাইলে ছয় মাইল পূর্ণ হইতে পারে; অথচ কাজের কি সুব্যবস্থা! পাঠক একখানি নূতন বই চাহিবামাত্র ৫ মিনিটের

মধ্যে বইখানি আসিয়া উপস্থিত। এই লাইব্রেরীর বাতীক ইংরাজ-গণের এক প্রধান বাতীক। ভদ্রলোকদের বাড়ীতে গিয়া দেখিতাম যে তাঁহাদের পাঠাগারে মেজে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত পুস্তকের আলমারিতে পরিপূর্ণ। পথ ঘাট গলি ঘুচি, সবত্রই পুস্তকালয়। সামান্য ব্যয়ে সকল শ্রেণীর মানুষ পড়িবার সুবিধা পায়। ইহাতেই প্রমাণ ইংরাজদের জ্ঞানস্পর্শ কত প্রবল।

অক্সফোর্ড। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষালয়ের মধ্যে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-সকল দেখিতে গিয়াছিলাম। অক্সফোর্ডে গিয়া মনে হইল, হায়! একদিনের জন্ত এই-সকল বিদ্যামন্দির দেখিতে না আসিয়া যদি ছয়মাস কাণ বা এক বৎসরকাল এখানে থাকিতে পারিতাম, নিশ্চয় বিশেষ উপকৃত হইতাম! কলেজগুলি দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন হিন্দু-শিক্ষাপ্রণালীর কথা মনে হইতে লাগিল। আমাদের পাঠান নিয়ম এই ছিল যে, ছাত্রগণ পঠদশায় ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিবে এবং গুরুকূলে বাস করিবে। সেখানে দেখিলাম, ছাত্রগণ সকলেই অবিবাহিত ও ব্রহ্মচর্য্য আছে, এবং কলেজ-ভবনগুলিতে গুরুগণের সহিত একত্রে বাস করিতেছে। সেই-সকল ভবনের হাওয়াতেও যেন জ্ঞান ও সদাশোচনা রহিয়াছে। অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরী যখন দেখিতে গেলাম, তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলাম। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরী দেখিয়া ঘেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলাম, ইহাও তদ্রূপ।

কেম্ব্রিজ।—অক্সফোর্ড হইতে আসিয়া কেম্ব্রিজে গমন করি। ঘটনাক্রমে সেদিন বড় দুর্ঘ্যোগ হইল। খুরিয়া সকল কলেজ দেখিতে পাইলাম না। কেবল মিল্টন ও ডার্বইনের কলেজ দেখিয়া আসিলাম। তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া হৃদয়ে অপূর্ব ভাবের উদয় হইল।

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার। ই বি কাউন্সেল।—
 এই কেশ্বিজ পরিদর্শনকালের আর-একটা ঘটনা স্মরণ আছে। ঋষি-
 প্রতিম ই বি কাউন্সেল, যিনি এক সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের
 প্রফেসর ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, যাহার সাধু চরিত্রের
 সংশ্রবে আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের কতিপয় ছাত্র ত্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত
 হয়, তিনি তখন সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে কেশ্বিজে বাস করিতেছিলেন।
 অধ্যাপকতা করিবার জন্ত তাঁহাকে কলেজে যাইতে হইত না, কিন্তু
 সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রগণ তাঁহার ভবনে আসিয়া পড়িয়া যাইত। সেই
 প্রবীণ মানুষ যখন শুনিলেন যে ভারতবর্ষের একজন নেতৃস্থানীয় লোক
 কেশ্বিজের কলেজ সকল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন, তখন সেই
 হৃষ্যোগের ভিতরেও, আমি যে বন্ধুর বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তাঁহার
 ভবনে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি বাল্যকালে
 সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় তাঁহাকে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ
 রূপে দেখিয়াছিলাম, এবং কিরূপে তাঁহার সাধুতার দ্বারা মুগ্ধ
 হইয়াছিলাম, তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। এখন দেখিলাম সেই সাধু
 পুরুষ পলিতকেশ, স্থবির; তাঁহার শুভ গুণজাল নাভিকে অতিক্রম
 করিয়া নামিয়াছে; চক্ষুদ্বয়ে ও মুখের আকৃতিতে গভীর জ্ঞানানুরাগ
 ও সাধুতার দেদীপমান প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আমি
 আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। তাঁহাকে বালককালে কি দেখিয়াছিলাম,
 এবং তিনি আমার জীবনে সত্যানুরাগ কিরূপে উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন
 তাহা যখন বলিলাম, এবং মিউটিনের হাঙ্গামা থামিলে নববর্ষে পারিতোষিক
 বিতরণের সময় তিনি যে সংস্কৃত কবিতাটি রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন,
 তাহা যখন আবৃত্তি করিলাম, তখন তিনি বিশ্বস্ত ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া
 উঠিলেন, এবং কেবলমাত্র আমাকে বুকে জড়াইয়া কোলে লইতে
 বাকি রাখিলেন। তাঁহার রচিত সেই কবিতাটি এই—



স্বর্গীয় জেমস্‌ ম্যাটিনো

বিদ্যালয়ঃ স্বালয়মেতা সাম্প্রতম্

সমৃদ্ধ-কীর্তি ভূবনে ভবিষ্যতি ।

তথাহি সানৌ মলয়ন্ত নাভ্যতঃ

ঐবং সমারোহতি চন্দনক্রমঃ ॥

অর্থাৎ কলেজ আপনার বাড়ীতে আসিয়া উন্নতি লাভ করিয়া জগতে বিখ্যাত হইবে। তাহা ত হইবেই, কারণ মলয় পর্বতের সাহুদেশেই চন্দনবৃক্ষ বাড়িয়া থাকে।

এই কবিতাটি আবৃত্তির পর আমাদের পুরাতন সঙ্কলন বেন আবার জাগিয়া উঠিল। তিনি আমার কাছে বসিয়া সংস্কৃত কলেজ, দয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতির কথা বলিতে লাগিলেন, এবং কেশ্বজ্ঞে দেখিবার উপসংস্কৃত কি আছে তাহাও জানাইলেন। দুঃখের বিষয় এই দুর্ঘোষের জন্ত সমুদয় দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু বহুদিন পরে সাধু কাউয়েলের সহিত সন্মিলনে বেন সকল খবাব পূর্ণ করিল। সেই সন্মিলন আমার নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

জেম্‌স্‌ মার্টিনো।—অপর যে যে স্মরণীয় মাহুয সেখানে দেখিয়া-ছিলাম, এবং যঁহাদিগের সহিত পরিচিত হইয়া আপনাকে উপকৃত বোধ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ইউনিটেরিয়ানদিগের নেতা ও গুরু আচার্য্য জেম্‌স্‌ মার্টিনো। তিনি নিজের ধর্মজ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও সাধুতার দ্বারা জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব? তাঁহার সঙ্গে একদিন মাত্র দেখা হইয়াছিল, কিন্তু সেই একদিন এ জীবনে চিরস্মরণীয় দিন হইয়া রহিয়াছে! আমি যখন লণ্ডনে, তখন ডাক্তার মার্টিনো সকল কার্য্য-হইতে অবসৃত হইয়া স্কটল্যান্ড কোন নিভৃত প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে অক্সফোর্ড

হইতে ডিগ্রী দিবার জন্য তাঁহার প্রতি এক নিমন্ত্রণ গেল। তিনি ডিগ্রী লইয়া স্কটলণ্ডে ফিরিবার সময় দুইদিন লণ্ডনে বাস করিয়া গেলেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম কি না সন্দেহ। সেই অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই ধর্মজীবনের অনেক গুরুতর তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন। তন্মধ্যে একটি এই :—“কেবলমাত্র ভ্রম ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার উপরে ধর্মসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে এই এক বিপদ আছে যে, ধর্মভাবসম্পন্ন ভক্তিপ্রধান ব্যক্তিদিগকে সেইরূপ সমাজে তৃপ্ত করিয়া রাখা যায় না। দেখ, আমারই স্বসম্পর্কীয় কতকগুলি লোক আমাদের অবলম্বিত ইউনিটেরিয়ান ধর্মে অতৃপ্ত হইয়া ত্রিভ্রবাদী খ্রীষ্টীয় দলে প্রবেশ করিয়াছে, এবং এরূপ লোকও দেখা গিয়াছে, যাহাবা একেবাবে নিরীশ্বরবাদে উপনীত হইয়াছে।” তাঁহার প্রধান কথাগুলি যেন আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, “somehow men do not stay with us,” অর্থাৎ যে কারণেই হউক, আমাদের সম্প্রদায়ে মানুষ আসিয়া অধিক দিন থাকে না। তৎপরে ইউনিটেরিয়ান পরিবারে সন্তানদিগের ধর্মশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না বলিয়া দুঃখ করিলেন। ভারতবর্ষীয় হিন্দু-গণের ধর্মভাব ও ভক্তিপ্রবণতার বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। আমি যখন উঠিয়া আসিতেছি, তখন সিঁড়ী পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসিয়া আমি যখন নামিতেছি তখন সিঁড়ীর উপর হইতে আমাকে বলিলেন, “give us a little of your mysticism, and take from us a little of our practical genius” আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম, দুই কথায় দুই জাতির বিশেষ ভাবটী কি সুন্দর রূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন! প্রাচ্য ভক্তিপ্রবণতা ও প্রাচ্য কর্মশীলতা মিলিত হইলে যে আদর্শ ধর্মজীবন গঠিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মিস্ কব্ ।—দ্বিতীয় স্মরণীয় ব্যক্তি কুমারী কব্ (Miss Cobbe) । ইংলণ্ড যাত্রার পূর্ব হইতেই আমি তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া ছিলাম, এবং তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম । তাঁহার বিমল ভক্তি ও প্রগাঢ় ধর্মভাব আমার মনকে প্রাবিত করিয়াছিল । আমি যখন লন্ডনে, তখন তিনি ওয়েল্‌স্ প্রদেশে এক নিভৃত স্থানে বাস করিতেছিলেন । কিকপে তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, এই চিন্তাতে যখন মগ্ন আছি তখন একাদিন শুনিলাম, তিনি লন্ডনে আসিয়াছেন, আসিয়া এক বন্ধুর ভবনে স্থিতি করিতেছেন । আমি ৩২ক্ষণাৎ তাঁহাকে দেখিবার জন্ত ধাবিত হইলাম । গিয়া বাহা দোখ-লাম ও শুনিলাম তাহা কখনও ভুলিবার নয় । মানুষের মুখ যে এত প্রসন্ন প্রফুল্ল ও পবিত্র হইতে পারে, এই আশ্চর্য্য ! কুমারী কবের মুখ যেন প্রেমে ও আনন্দে মাথা ! তিনি হাসিয়া প্রাণ খুলিয়া আমার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, এবং প্রেমে যেন আমার মনকে মাথাইয়া ফেলিলেন । ব্রাহ্মসমাজ এদেশে কি কাজ করিতেছেন, সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, এবং তিনি ঐক ভাবে ওয়েল্‌সে বাস করিতেছেন, ও নিরীহ পশুদিগের রক্ষার জন্ত কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলিলেন । অবশেষে তাঁহাদিগের এক সভাতে আমাকে কিছু বলিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন । তাঁহার অনুরোধক্রমে আমি একদিন কিছু বলিয়াছিলাম ।

ফ্রান্সিস্ নিউম্যান ।—তৃতীয় স্মরণীয় ব্যক্তি ফ্রান্সিস্ নিউম্যান । ইনি তখন সকল কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া সমুদ্রকূলবর্তী ওয়েস্টন-সুপার-মেয়ার্ (Weston-Super-Mare) নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন । আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্ত সেখানে গমন করি, এবং দুইদিন তাঁহার ভবনে থাকি । তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষাশীতি বৎসরের অধিক হইবে । সেই শীতপ্রধান দেশে হাত

পাঠিক রাখিতে পারেন না, তাঁহার স্ত্রী কাপড় পরাইয়া দেন, হাত ধরিয়া আনেন, তবে নীচে আসেন। যে দুই দিন সে ভবনে ছিলাম, সে দুইদিন দেখিলাম যে প্রাতে নীচে আসিয়া তাঁহার প্রথম কন্ম ভগবানের নাম করা। সে উপাসনাতে তাঁহার পত্নী, বাড়ীর রাঁধুনী চাকরানী প্রভৃতি সকলে উপস্থিত থাকিত। তিনি প্রথমে কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেন; তৎপরে তাঁহার নিজের প্রণীত প্রার্থনা-পুস্তক হইতে একটা প্রার্থনা পড়িতেন। আহার করিতে গিয়া দেখি, তিনি ভোজনের টেবিলের নিকট আসিলেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বুদ্ধ সাধু অগ্রে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া তবে আহার করিতে বসিলেন। দ্বিতীয় দিনে আহার করিতে বসিয়া আমাকে বলিলেন, “তুমি যেখানে যেখানে যাইবে, একেশ্বরবাদীদিগকে বলিও, তাহারা যেন নাস্তিকের মত পৃথিবীতে বাস না করে। স্বীয় স্বীয় গৃহ ও পরিবারে ঈশ্বরের নাম ও উপাসনাকে যেন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে।” আমি তাঁহার পাঠাগারে গিয়া দেখি, তাঁহার প্রণীত যে-সকল গ্রন্থের কথা জানিতাম না সেই-সকল গ্রন্থে পাঠাগার পূর্ণ। তিনি যে এত ভাষা জানিতেন ও এত বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা আমার ন্যায় তাঁহার অনুগত ভক্তদিগেরও অবিদিত ছিল। দুই দিন তিনি আমাকে সমুদ্রতীরে লইয়া গিয়া অনেক উপদেশ দিলেন।

রেভারেণ্ড চার্লস্ ভয়সী।—চতুর্থ শ্রবণীয় ব্যক্তি খ্রীষ্টিক চার্চের (Theistic Churchএর) আচার্য্য রেভারেণ্ড চার্লস্ ভয়সী (Rev. Charles Voysey)। আমি লণ্ডনে থাকিবার সময় মধ্যে মধ্যে ইহার উপাসনা-মন্দিরে যাইতাম। তিনি যেমন সময়ে অসময়ে খ্রীষ্টীয় ধর্মের ও বীণ্ডর দোষকীর্তন করিতেন, তাহা আমার ভাল লাগিত না; কিন্তু যে ভাবে উদার, আধ্যাত্মিক সার্বভৌমিক ধর্মের সত্য-সকল ব্যক্ত করিতেন, তাহাতে আমার মন মুগ্ধ হইত। তাঁহার সঙ্গে পরিচয়

হইলে তিনি তাঁহার বাড়ীতে আহােরের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন ভয়সী-গৃহিণী (Mrs. Voysey) ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তাঁহারা একেবারে আমাকে নিজের লোকের মত করিয়া লইলেন। তারপর একদিন ভয়সী সাহেবের অফিসে, তাঁহার উপাসনা-মন্দিরে উপদেশ দিলাম। সেই উপদেশে ব্রাহ্মসমাজ কি কি কাজে হাতে দিয়াছে ও কি করিতেছে, তাহার বর্ণনা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মগণ এদেশে কিরূপ সামাজিক নিগ্রহ সহ করিতেছেন, তাহারও কিঞ্চৎ বিবরণ দিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, সেই বিবরণ উপস্থিত ব্যক্তিদিগের অনেকের ভাল লাগিয়াছিল। একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে। উপাসনামণ্ডপ হইতে নামিয়া পার্শ্বের ঘরে আসিয়া ভয়সী সাহেব ও ভয়সী-গৃহিণীর সহিত কথা কহিতেছি, তখন মিষ্টার ভয়সীর কনিষ্ঠা কন্যা, বাহার বয়স তখন ২৭।২৮ বৎসর হইবে, আমাকে আর কথা কহিতে দেখ না ; আমাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া বারবার বলিতে লাগিল, “মিষ্টার শাস্ত্রী, ব্রাহ্মসমাজ আমার সমাজ, ভারতবর্ষ আমার দেশ, আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমাকে নেবে কি না বল না ?” আমি ২।১ বার বলিলাম, “রোস, কথা কহিতে দাও।” সে দেরি তার নয় না, আবার ঠেলিয়া বলে, “আমাকে সঙ্গে নেবে কি না বল না ?” তখন আমি ভয়সী-গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম, “আপনার মেয়ে ত আমার সঙ্গে চলিল।” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “যাওয়ার অর্থ কি, তা ও এখনও বোঝে না। তা মন্দ কি ! ওকে নিয়ে যাও।” ভয়সী সাহেবের একটা মেয়ে সিঙ্গুরদেশের একটা ব্রাহ্ম-যুবককে বিবাহ করিয়া এ দেশে আসিয়াছে, সে সেই মেয়েটা কি না জানি না।

ইহার পরে আমি দেশে ফিরিলে, ভয়সী সাহেব তাঁহার মুদ্রিত উপদেশ সপ্তাহে সপ্তাহে আমার নিকট পাঠাইতেন, সর্বদা চিঠি পত্র লিখিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে আমার কাজের জন্ত অর্থসাহায্য করিতেন। মৃত্যুর নিজ পর্য্যন্ত এই আত্মীয়তা রক্ষা করিয়াছিলেন।

উইলিয়ম ষ্টেড্।—পঞ্চম স্মরণীয় ব্যক্তি উইলিয়ম ষ্টেড্ সাহেব (William Stead)। ইনি তখন পেল-মেল গেজেটের সম্পাদকতা করিতেন। কুমারী কলেট পত্রের দ্বারা তাঁহার সহিত আগার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রথমে পেল-মেল গেজেটের আফিসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, এবং আসামের কুলীদের অবস্থা ও কুলী আইনের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া সে বিষয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত অনুরোধ করি। তিনি বিশেষ ভাবে আরো কিছু স্তম্ভিবার জন্ত একদিন আমাকে তাঁহার বাড়ীতে আহ্বান করিতে নিমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি আহ্বানের পূর্বে আপনার শিশু-সন্তানদিগকে লঙ্ঘা পাশের এক ঘরে একান্তে বসিয়াছেন এবং নানারূপ গল্পগাছা করিয়া উপদেশ দিতেছেন। আমি আসিয়াছি জানিবামাত্র আমাকে সেই ঘরে ডাকিয়া লইলেন। আমি গিয়া বসিলে বলিলেন, “আমি বড় কাজে ব্যস্ত মানুষ, দিনের অধিকাংশ সময় কাজে ব্যস্ত থাকি; দৃঢ়তার সঙ্গে সন্তানদের সঙ্গে কিছু সময় যাপন করবার নিয়ম না রাখলে, উহাদের শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি দৃষ্টি থাকবে না। এইজন্ত নিয়ম করেছি যে সাত্বৎসরীয় আহ্বানের পূর্বে এক ঘণ্টাকাল উহাদের সঙ্গে বসবোই বসবো”। আমি বলিলাম, “এটা বড় ভাল।” তারপর তিনি আমার সমক্ষেই তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, অতি সহজ ভাষায় এমন সকল জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের গোচর করিতেছেন, যদ্বারা তাহাদের বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভাবনা।

তার পর, আহ্বানের পর আমি আসামের কুলীদের অবস্থা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি চেয়ারে বসিয়া বলিতেছি, ষ্টেড্ ঘরের অধার হইতে ওধারে বেড়াইতেছেন, এবং “তার পর” “তার পর,” করিতেছেন। ইহা লইয়া একটা হাসাহাসি উপস্থিত হইল। আমি হাসিয়া বলিলাম, “তুমি যে আমাকে জুঅলজিক্যাল গার্ডেনের বাগের কথা স্মরণ করাইতেছ,



স্বর্গীয় উইলিয়াম টমাস হেড্

একটু বসো না।” ট্রেড বলিলেন, “I cannot make my mind sit down” (আমি আমার মনকে বসাইতে পারি না)। আমি হাসিয়া বলিলাম, “আধ ঘণ্টা বসিবে, তাও পার না? আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে ১৭, আমি দেখাইয়া দিব, আমাদের দেশের সাধুরা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ধ্যানে বসিয়া আছেন।” ট্রেড্‌ করতালি দিয়া হাসিয়া বলিলেন, “ওঃ, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। আমি ভাবিতাম, এত কোটি মানুষকে আমরা কি করিয়া জিনিয়া লইলাম? এতদিনের পর বুঝিলাম। তোমরা চোখ মুদিয়া থাকিয়াছ, আমরা পশ্চাৎ হইতে মারিয়া সহিয়াছি!” ইহা লইয়া খুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল।

আব একদিনের কথা মনে আছে; সেদিনও আমাকে আহ্বার করিতে সম্মত করিয়াছিলেন। সেদিন আহ্বারের পর আমি তাঁহাকে ও তাঁহার শ্রদ্ধাকে প্রেততত্ত্ব ও মানসিক প্রেরণার (telepathy) বিষয়ে কিছু বলিলাম। তৎপূর্বে লণ্ডনের কোনও পরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া ঘাঘা দেখিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিলাম। সে বিষয়টী এই। এক দিন আহ্বারের পর সে বাড়ীর মেয়েরা আমাকে এক খেলা দেখাইলেন। একটা মেয়ে আমাকে পাশের এক ঘরে লইয়া গিয়া ক্রমাল দিয়া আমার দুই চক্ষু বন্ধিলেন। বাঁধিয়া বলিলেন, “তোমাকে বৈঠকঘরে নিয়ে যাই, সেখানে দাঁড় করিয়ে দেবো। নিজে একটা কিছু ইচ্ছা রাখবে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, তারপর চলতে ইচ্ছা হলে চলবে, কিছু করতে ইচ্ছা হলে করবে, তাতে বাধা দিবে না। আমি তোমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত দিয়ে থাকব মাত্র।” এই বলিয়া মেয়েটী আমার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া আমাকে বৈঠকঘরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, এবং নিজে আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কাঁধে হাত দিয়া রহিল। আমি বখাসাখ্য মনটা নিজের করিয়া রাখিলাম। ক্রমে চলিতে ইচ্ছা হইল, সেই চোখ-বাঁধা অবস্থাতেই অগ্রসর হইলাম; হাত বাঁড়াইতে ইচ্ছা

হইল, হাত বাড়াইলাম; একটা চেয়ারের উপর হইতে একখানা কাপড় তুলিতে ইচ্ছা হইল, তুলিলাম; অমনি চারিদিকে কক্কতালি শ্রবণি উঠিল। তাড়াতাড়ি চক্ষের ঝঞ্জন খুলিয়া শুনি, সেই গহস্থিত পুরুষ ও নারীগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে চোখ-বাঁধা মানুষটা আসিলে তাহা দ্বারা ঐ কাপড়টা তুলাইতে হইবে; এবং আমি ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলে সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিলেন। অবশ্য, যে মেয়েটা আমার পশ্চাতে ছিল, সেও ঐ বিষয় জানিত এবং সেও সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিল। আমি যে-বিষয়ে কিছুই জানিতাম না সেরূপ কাজ আমা দ্বারা হইল, ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম।

ষ্ট্রেড ও তাঁহার পত্নীর নিকট যখন এই কথা ব্যক্ত করিলাম, তখন ষ্ট্রেড সাহেব হাসিয়া বলিলেন, “তাও নাকি হয়! আমাকে কিছু জানতে দেবে না, আর আমা দ্বারা কাজ করিয়ে নেবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।” আমি বলিলাম, “এসো, আমি ক’রে দেখাই।” তৎপরে পাশের ঘর হইতে, ষ্ট্রেড সাহেবের চোখ বাঁধিয়া আনা হইল। আমি কাঁধে হাত দিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলাম, কিন্তু তাঁহা দ্বারা যে কাজ করাইব স্থির ছিল, তাহাতে কৃতকার্য হওয়া গেল না। আমি বলিলাম, “তুমি মনটা নিগেটিভ্ (negative) করিয়া রাখিতে পার নাই; আমার ইচ্ছাকে বাধা দিয়াছ।” তার পর তাঁর ঘরের এক কোণে একটা টুপিতে একটা পরসা রাখিয়া, মিসেস্ ষ্ট্রেডের চোখ বাঁধিয়া আনিলাম। আমি তাঁহার পিঠে হাত দিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। তিনি বরাবর ঘরের কোণে গেলেন, অবনত হইয়া টুপির মধ্যে হাত দিলেন, কিন্তু পরসটি তুলিলেন না। এতটা দেখিয়া ষ্ট্রেড কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তাহার পর তাঁহার এক কন্ডার চোখ বাঁধিয়া আনা হইল। এবার স্থির হইল, সে নির্দিষ্ট একটা মিনিস লইয়া তাহার সর্বকর্মিত

অত্যন্ত হস্তে অর্পণ করিবে। সে আসিয়া দাঁড়াইলে আমি তাহার কাঁধে হাত দিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই সে চলিত আরম্ভ করিল এবং সেই জিনিসটি তুলিয়া লইয়া চোখ-বাঁধা অবস্থাতেই নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাব দিকে চলিল। তখন পিতা, মাতা, ভাই, বোন, সকলে মিলিয়া ছোট ছেলেটির হাতের পাশে হাত পাতিলেন। চোখ-বাঁধা মেয়েটি একে একে সকলের হাত ছুইয়া পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ছোট ভাইটির হাতেই জিনিসটি দিল। তখন ষ্টেড আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “তবে ত ইহার ভিতর কিছু আছে। এক মনের শক্তি দ্বারা যদি আর এক মনের ও শরীরের উপরে এরূপ কাজ করা যায়, তবে কেন পর-লোকগত আত্মারা এ জগতের মানুষের উপর কাজ কব্বে না?” আমি বলিলাম, “তাই ত বটে, আমিও ত তাই বলি।” ইহার পর আমি এদেশে চলিয়া আসিলাম। কিছুদিন পরে শুনি, ষ্টেড প্রেভ-তব সম্বন্ধে অনেক কথা ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশিত পত্রিকা ও পুস্তকে তাহার অনেক প্রমাণ পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাঁহার সে প্রকার জ্ঞান কিছুই দেখি নাই। তাহাতে অনুমান করি, অপরাপর ঘটনার মধ্যে এটিও তাঁহার চিত্তকে ওই দিকে প্রেরণ করিয়া থাকিবে।

অস্বাভাব্য স্মরণীয় পুরুষ ও নারী।—যে যে ব্যক্তির নাম বিশেষ-রূপে উল্লেখ করিলাম, তদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন অগ্রগণ্য পুরুষ ও নারীর সহিত সাক্ষাৎ হইরাছিল। বধা, অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামস্, অধ্যাপক জন্ এল্‌গিন্ কার্পেন্টার, রেভারেন্ড ঈগ্‌কোর্ড্ ব্রুক, মিসেস্ কসেট্, মিসেস্ জোসেফাইন্ বাউলার।

মিসেস্ বাউলার ও নারীশক্তি।—ইহার পর মধ্যঃ মিসেস্ বাউলারকে দেখিয়া মনে বেন নব শক্তি পাইয়াছিল। তিনি তখন যে

ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাতে নারীকুলের মধ্যে এক আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চার হইতেছিল। যে সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তখন তিনি আইরিশ নেতা পার্ণেলের পক্ষে ছিলেন; কিন্তু অচিরকালের মধ্যে পার্ণেলের চুচ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে মিসেস্ বাট্‌লারের দল তাঁহার বিকল্পে খজা ধারণ করিলেন, এবং নারীগণের খজাঘাতে পার্ণেল দাঁড়াইতে না পারিয়া অকালে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ইংলণ্ডের নারী-শক্তি কিরূপে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে তাহা এদেশের লোক জানে না। এদেশের প্রাচীনভাবাপন্ন অনেক মানুষের মত এই যে নারীগণকে সামাজিক স্বাধীনতা দিলে সামাজিক পবিত্রতা থাকিবে না। ঠিক ইহাব বিপরীত কথা সত্য; নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার উপরেই সামাজিক শক্তি ও পবিত্রতা নির্ভর করে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ইংলণ্ডে নারীজাতির উন্নত অবস্থা । নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত
পরিবারে নারীদিগের পড়ার অভ্যাস । মধ্যবিত্ত
শ্রেণীর নারীগণের উন্নত চরিত্র ।
সামাজিক স্তরীতির শাসন ।
ইঙ্গী পরিবার ।

১৮৮৮

ইংলণ্ডে নারীজাতির উন্নত অবস্থা ।—ইংলণ্ডে গিয়া বাহা প্রধান-
রূপে আমার চক্ষে পড়িল এবং বাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া
গেলাম, তাহা নারীজাতির উন্নত অবস্থা । আমি প্রায় প্রতিদিন দেখা
হইলেই হুর্গামোহন বাবুকে বলিতাম, “হুর্গামোহন বাবু, এ ত মেরে-
রাজ্যের দেশ ; মেরেদের গুণেই এ দেশ এত বড় ।” তিনি বলিতেন,
“তাই ত ! এখন বুঝিতেছি, কেন নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের
মেরেদের মতন মেরে দেও, আমি ফ্রান্সকে সামাজিক ভাবে বড়
করিয়া তুলিতেছি ।” বস্তুতঃ, ইংলণ্ডে গিয়া আমার এই দৃঢ় প্রতীতি
জন্মিয়াছে যে ইংলণ্ডের মহাশয়ের পশ্চাতে ইংলণ্ডের নারীগণ ।

আমি ধনী রমণীগণের সহিত মিশিবার অবসর পাইতাম না,
সুতরাং তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্রের কথা কিছু বলিতে পারি না ; মধ্যবিত্ত
শ্রেণীর মেরেদের সঙ্গে মিশিতাম, সুতরাং তাঁহাদের বিষয়ই জানি ।
এ দেশের লোক অবরোধপ্রথার মধ্যেই বর্জিত, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা
এই সংস্কার বদ্ধমূল যে নারীগণ স্বাধীনভাবে সর্বত্র পতায়াত করিলে
তাহারা আপনাদের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে না । এ

কি ভ্রান্ত ধারণা, তাহা একবার ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের সহিত মিশিলেই বুঝিতে পারা যায়।

আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন নারীকূলের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করিবার জন্ত, নারীকূলের রাজনৈতিক অধিকার স্বাধিকারের জন্ত, নারীকূলের সর্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্ত, নানা চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার ফলস্বরূপ নারীগণের মধ্যে এক নূতন ভাব ও উন্নতি-স্পৃহা দেখা দিয়াছিল। সকল ভাল কাজে, সকল উন্নতির চর্চাতে, সকল আলোচনাতে, সকল সদুপস্থানে নারীদিগকে দেখিতাম। কোনও সদুপস্থানের সভাতে গিয়া দেখি, অর্ধেকের অধিক নারী; কোনও প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যের উপদেশ শুনিতে গিয়া দেখি, নারী ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে হয়; কোনও বন্ধুর ভবনে কোনও সদালোচনার জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়া দেখি, অর্ধেকের অধিক নারী।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীদিগের পড়ার অভ্যাস।—
 ছুই একটা বিষয় উল্লেখ করিলেই সেখানে নারীগণের কি অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমি বাঁহাদের ভবনে থাকিতাম তাঁহাদের বর্ণনা অগ্রেই করিয়াছি। তাঁহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত পরিবার বলিলেও হয়। তাঁহারী দ্বার-জানালার পয়সা সেলাই করিয়া বিক্রয় করিয়া খাইতেন। অথচ বৃদ্ধ পিতাকে প্রতি সোমবার গৃহের নারীগণের পাঠের জন্ত মুড়ীর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয় হইতে একতাড়া বই আনিতে হইত। সপ্তাহকাল গৃহের তিন কন্যা ও তাহাদের মাতা ঐ-সকল পুস্তক পাঠ করিতেন। সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া আবার সোমবার নূতন পুস্তক আসিত। কোনও দিন সারাকালীন আহারের পর মহিলাদের বসিবার ঘরে বসি উকি দাড়াইতাম, দেখিতাম যে তাঁহারী সকলেই পাঠে গভীর নিমগ্ন আছেন। এই পাঠ দ্বারা ১১টা-১২টা পর্য্যন্ত চলিত। গৃহস্থানীর বড় মেয়েটি

ভোজনের সময় আমার পার্শ্বে ভোজনে বসিতেন। আমি ইংরাজ কবি শেলি ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভক্ত, ইহা দেখিয়া তিনি আমাকে শেলির অনেক কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন; এক শেলির প্রতিভার প্রশংসা করিতেন। আমি একদিন এডুইন্‌স্‌ আর্পারের লিখিত Indian Idylls (ইণ্ডিয়ান আইডিল্‌স্‌) নামক কবিতা-পুস্তক কিনিয়া আনিয়া মেয়েটাকে উপহার দিলাম। বলিলাম, “এই কবিতাগুলি তুমি পড়; পরে তোমার মুখে শুনিব, আমাদের দেশের প্রাচীন কবিতা তোমার কেমন লাগিল।” ঐ গ্রন্থে রামায়ণ মহাভারত হইতে সাবিত্রীচরিত প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। মেয়েটা পুস্তকখানি পাইয়াই সেই রাত্রে প্রায় ১টা ২টা পর্যন্ত পড়িল। তৎপরদিন প্রাতে আহারে বসিয়া আমাকে বলিল, “ও মিষ্টার শাক্সট্রী, তোমাদের সাবিত্রীর ছবি কি সুন্দর! কি সুন্দর! কতদিন পূর্বে এ ছবি আঁকা হয়েছে?” আমি হাসিয়া বলিলাম, “বীণা জন্মাবার দুই চারিশত বৎসর পূর্বে কি পরে, ঠিক বলিতে পারি না।” তখন মেয়েটা বলিল, “যে জাতি এতদিন পূর্বে এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছে, সে জাতি ত সামান্য জাতি নয়!”

ইংলণ্ডে বাসুকালে আমি ব্রাহ্মসমাজের একখানি ইতিবৃত্ত লিখিত প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যাহা লিখিতাম, তাহা কুমারী কলেটকে পড়িয়া শুনাইতাম। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে তাঁহার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি অল্পই ছিল। তিনি যাহা সংশোধন করিবার উপযুক্ত মনে করিতেন, তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া হইত। তৎপরে আমার পুস্তক কাপি করে কে, এই প্রশ্ন উঠিলে, কুমারী কলেট বলিতেন, “আমি তোমাকে একটা মেয়ে দিছি, সে তোমার লেখা কাপি করবে, তাকে এতোক একশত শব্দের জন্ত এক পেনি কল্পে দিও।” এই বলিয়া সেই মেয়েটার ইতিবৃত্ত আমাকে কিছু বলিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর তাহার পিতার মতিগতি বদলাইয়া গিয়াছে পানাসক্তি ও অপরাপর চরিত্রদোষ দেখা দিয়াছে। সে বেচারী বাধ্য হইয়া পিতার ভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র বাসা লইয়াছে। নিজে উপার্জন করিয়া খায়, এবং প্রতিদিন ছপুর বেলায় কয়েক ঘণ্টা গিয়া পিতার সঙ্গে বাস করে, ঘর পরিষ্কার করে, জিনিষপত্র গুছায়, পিতার সেবা করে এবং তাঁহাকে ভাল পথে আনিবার চেষ্টা করে। রাত্রে সে-বাড়ীতে থাকিতে পারে না।

এই যুবতীর বিষয়ে একটা ঘটনা স্মরণ আছে, তাহা এই। একদিন সন্ধ্যার সময় মেয়েটা কাপি লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। তখন আমি বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য উদ্ভোগ করিতেছি। কাপিগুলি লইয়া মেয়েটাকে পরসা দিয়া বলিলাম, “দাঁড়াও, আমি বাহিরে যাইতেছি, দুজনে একসঙ্গে বাহির হইব।” দুইজনে বাহির হইলাম। রাস্তাতে আসিয়া বলিলাম, “চল, তোমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত বেড়াইতে বেড়াইতে যাই।” এই বলিয়া তাহার বাড়ীর দিকে চলিলাম। সে প্রায় দেড় মাইল পথ। কিন্তু আমরা পথের কথা ভুলিয়া গেলাম। কথাপ্রসঙ্গে প্রাচীন যিহুদী জাতির ইতিবৃত্তের বিষয়ে কথা পড়িল। আমি Old Testament ও কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত একখানি প্রাচীন যিহুদী ইতিবৃত্ত পড়িয়া যাহা জানিয়াছিলাম, তাহা বলিতে লাগিলাম। কথায় কথায় দেখিলাম, মেয়েটা সে বিষয়ে এতদূর অভিজ্ঞ এবং এত কথা বলিতে লাগিল, যাহা আমি অগ্রে স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই আলাপে দম্ব হইয়া আমরা তাহার বাড়ীর দ্বারে গিয়া পৌঁছিলাম। কোথা দিয়া সম্মুখ যাইতেছে, তাহা মনে নাই। তাহার বাড়ীর দ্বার হইতে দুই-জনে ফিরিয়া আবার আমার বাসার অভিমুখে চলিলাম। অবশেষে আমাদের বাসার সন্নিকটে আসিয়া বড়ি খুলিয়া দেখি, আহারের সময় সন্ধ্যাকট, তাহারও কার্যান্তরে বাঙালী প্রয়োজন। তখন সে আমাকে

পরিচ্যাগ করিয়া গেল। মেয়েটী চলিয়া গেলে ভাবিতে লাগিলাম, যে-
 মেয়ে একশ'টা শব্দ লিখিয়া এক পেনি করিয়া পায়, সে মেয়ে আমা
 অপেক্ষা জানে এত অগ্রসর যে, তাহার সহিত কথা কহিয়া আমি
 আপনাকে উপকৃত বোধ করিতেছি; এ দেশে জ্ঞানচর্চা কি প্রবল!
 ইহাও মনে হইল, প্রজাসাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানস্পৃহা
 প্রবল থাকা নরনারীর সম্মিলনের মধ্যে পবিত্রতা রক্ষা হওয়ার একটী
 প্রধান উপায়। এই যে দুই ঘণ্টাকাল দুইজনে কথাবার্ত্তাতে মগ্ন
 ছিলাম,—আমি যে পুরুষ এবং ও যে মেয়ে, তাহা মনেই ছিল না। কোথা
 দিয়া সময় গেল তাহা জানিতেই পারিলাম না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের উন্নত চরিত্র।—ইংরাজ সমাজের
 মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার
 প্রয়োজন নাই; একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস
 পাওয়া যাইবে। আমার সেখানে অবস্থান কালে একটী বাঙ্গালী
 যুবকের মুখে যে ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিতেছি।
 ঐ যুবকটী মফঃসলে কোনও স্থানে বাস করিতেন। সেখানে
 নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক যুবকদম্পতীর গৃহে বাসা লইয়াছিলেন।
 তাহাদের বাড়ীর বাহির দিকে একটী দোকান ছিল, তাহাতে কিছু
 আন্ন হইত; এবং তন্নিম্ন তাহারা বাড়ীর মধ্যে একটী ঘরে একটী
 ভাড়াটিয়া লইত, তাহার ঘরভাড়া ৩ পাই-খরচ হিসাবে কিছু পাইত।
 বাড়ীতে চাকর-বাকর ছিল না, মেয়েটীই সব কাজ করিত। মেয়েটীর
 বয়স তখন ২২।২৩ এর অধিক হইবে না। আমাদের বাঙ্গালী যুবক-
 টীর বয়স বোধ হয় ২৬।২৭ হইবে। মেয়েটীর পতিরও ঐ ~~বয়স~~।
 আমাদের বাঙ্গালী যুবক বড় সংলোক; তাঁহাকে পাইয়া যুবকদম্পতী
 আনন্দিত ছিল। কিন্তু এমিকে এক বিপদ উপস্থিত। মেয়েটী সরল-
 ভাবে যখন যুবকটীর কাছে আসে, তা আমিয়া দেখে, হেঁয়ালি

সেলাই করিয়া আনে, এটা ওটা করিতে বলে, নির্জন গৃহে কাছে আসিয়া “কেমন আছ, তোমার মুখ কেন শুকনো” প্রভৃতি প্রশ্ন বন্ধন জিজ্ঞাসা করে, তখন আমাদের বাঙ্গালী যুবকটার চিত্ত বড় বিচলিত হয়। কিন্তু ছেলেটা ভাল বলিয়া সে মনে মনে এই সংগ্রাম নিবারণ করে, মেয়েটাকে কিছুই জানিতে দেয় না। এই অবস্থাতে সে অবশেষে স্থির করিল যে সে-বাড়ীতে আর তার থাকা উচিত নয়; কখন কি বলিয়া কেলিবে, কখন কি করিয়া বসিবে, তার ঠিক কি! একটা মহা ক্লেশকর ব্যাপার ঘটবে। সে অগ্রজ বাসা গাইবে, এইরূপ স্থির করিয়া একদিন সায়ংকালীন আহারের সময় কারণ নির্দেশ না করিয়া যুবকদম্পতীকে ঐ সংকল্প জানাইল। তাহার উত্তরেই মহা হুঃখিত হইয়া তাহাকে থাকিবার জন্ত ব্যগ্রতা সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন আর সে অধিক কিছু বলিতে পারিল না; সে যে ঘোর প্রলোভন ও সংগ্রামের মধ্যে বাস করিতেছে, তাহা জানিতে দিল না। হুঃশিক্ষাতে রাতে তাহার ভাল নিদ্রা হইল না। পরদিন ছপূর বেলা মাথা ধরিয়া সে অসময়ে কলেজ হইতে বাড়ীতে আসিল। তখন একাকিনী সেই মেয়ে ঘরে আছে; পতি দোকানে। সে আসিয়া মেয়েটাকে বলিল, “দেখ, আজ মাথাটা বড় ধরেছে, আমাকে এক পেয়ালা জল ক’রে দিতে পার?” মেয়েটা বলিল, “পারি বৈ কি?” এই বলিয়া জল প্রস্তুত করিতে গেল। চা খাইয়া আমাদের যুবকের নির্জন বৈঠক-গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কি হয়েছে? কেন মাথা ধরেছে? তোমার মুখ বড় খারাপ দেখাচ্ছে, বুঝে কি ঘুমাও নাই? তোমার মনে কোনও অসুখ নিশ্চয় আছে; কি, তা বল না! আমাদের দ্বারা যদি দূর হয়, আমরা তা করতে রাজি আছি।” ইত্যাদি।

এই সন্ধিক্ষণে আমাদের যুবকটা মেয়েটার মুখের দিকে চাহিয়া আরও আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। মনের আবেগে তাহার হাতখানি

ঘরের টেবিলে রাখিতে বলিবে, আমি বেড়াইয়া আসিয়া রাত্রে আহার করিব।’

“সন্ধ্যার সময় এই পত্র তাহার পত্নীর হাতে দিয়া আমি বেড়াইতে গেলাম। তারপর রাত্রে আসিয়া দেখি, আমার টেবিলের উপর আমার খানা রহিয়াছে। আহার করিয়া শয়ন করিলাম। প্রাতে উঠিয়া আমার জিনিসপত্র বাধিতেছি, এমন সময়ে দেখি মেয়েটি চা লইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। তাকে দেখিয়াই আমি লজ্জাতে মুখ অবনত করিলাম। মেয়েটি বলিল, ‘তুমি আমার স্বামীকে যে পত্র লিখেছ, তা আমি পড়েছি। তুমি বড় ভাল লোক। দেখ, একরূপ প্রলোভন আমাদের অনেকের পথে আসতে পারে; ঈশ্বরের নাম ক’রে তাকে দূরে ফেলে দিলেই হলো। তোমার ও-প্রলোভন থাকবে না। তুমি আমাকে বোনের মত দেখ না? আমাকে বোন ভেবে আমার মুখের দিকে চাও না? আমিই তোমাকে বল দেব! আমি ও আমার স্বামী দুজনেই পরামর্শ করেছি, তোমাকে কখনই যেতে দেওয়া হবে না। তুমি আমাদের বন্ধু; এমন বন্ধু সহজে পাওয়া যায় না।’ তার পর আমি সেই গৃহেই রহিলাম। তদবধি আমি তাদের বন্ধুই আছি।”

নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত মেয়েদের স্বভাব চরিত্র যখন এই, তখন সহজেই অজ্ঞান করা যাইতে পারে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্ত নারীদের স্বভাব চরিত্র কিরূপ।

সামাজিক স্ফূর্তির শাসন।—পূর্বে যে বলিয়াছি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণ স্বাধীন ভাবে সকল স্থানে, সকল আলোচনাতে, সকল কাজে যোগ দেন, তাহাতে যেন কাহারও মনে না হয় যে তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক শাসন নাই। এমন কঠিন সামাজিক শাসন অল্পই দেখা যায়। অর্ধমি খাঁদের বাড়ীতে থাকিতাম, সে বাড়ীতে যদি কোনও দিন ~~সন্ধ্যার~~ দরজার চাবি সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিতাম, এবং ফিরিতে

অনেক রাত্রি হইত, তাহা হইলে দেখিতাম, দ্বারে আসিয়া আঘাত করিলেই সিঁড়িতে উপর হইতে নামিবাব থট্‌থট্‌ শব্দ শোনা গেল। একটা মেয়ে আসিয়া দ্বারের চাবি খুলিয়া দিলেন; কিং আমি থট্‌ করিয়া দ্বার খুলিতে না খুলিতেই তিনি অন্তর্দ্বার। আমি উপরের দিকে চাহিয়া সিঁড়ি উপরে নাইট-গাউন-পরা নারীমূর্তির পৃষ্ঠদেশ মাত্র দেখিতে পাইলাম। ছয় সাত মাস তাঁহাদের বাড়ীতে ছিলাম, মেয়েরা যে কোন্‌ ঘরে দুমাইত তাহা জানিতাম না। সে দেশে মেয়েদের গয়ন-বসে পুরুষের প্রবেশের ছায়া নিন্দনীয় কাজ আব কিছুই নাই। মেয়ে পুরুষে বৈঠকঘরে বসি মেশা, রাস্তা-ঘাটে একত্রে বেড়ান নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু আদব-কায়দার এত বাঁধাবাধি যে, তার একটু লঙ্ঘন কবিলে বন্ধুতার বিচ্ছেদ ঘটে। মনে কর, একটা মেয়ের সঙ্গে দুইদিন হইল আলাপ পবিচর হইয়াছে; এরূপ অবস্থাতে হঠাৎ যদি পত্রে একটু ভালবাসার ভাষা ব্যবহার করিলাম, অমনি তাদেব বাড়ীতে কথা উঠিল, “এত লঙ্ঘন ভাল নয়! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!” অমনি আর তাহার নিকট হইতে উত্তর আসিল না, হয় ত তাব জ্যেষ্ঠা ভগিনী গম্ভীরভাবে জ্ঞাতব্য কথাটা জানাইল। আমি বুঝিলাম, আমাকে দশ হাত দূরে ফেলাই উদ্দেশ্য; আর বন্ধুভাবে লইবে না। এইরূপ আদব-কায়দার অনেক বাঁধন আছে; স্বাধীনতার সঙ্গে শাসনও আছে।

ইম্পী পরিবারের মাতা ও দুই কন্যা।—ইংলণ্ডের নারীগণের উন্নত অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ আর-একটি বিবরণ স্বরণ আছে। সমার্সেট-শিয়ারে “স্ট্রীট” (Street) নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে ইম্পী (Impey) নামক কোয়েকার-সম্প্রদায়-ভুক্ত একটা পরিবার বাস করেন। সে পরিবারে পুরুষ কেহ নাই, বিধবা মাতা ও দুইটা স্মৃতিবাহিতা কন্যা। তাঁহাদের পিতা কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত বীজ বিক্রেতার কাজ করিতেন। সেই কাজে তিনি বেশ উপার্জন করিতেন, এবং মৃত্যুদ্বারা

কথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে বড় কত্যাটি পিতার কাজে গিয়া বসিলেন, এবং পূর্বোক্ত ব্যবসায় আরও কোন কোন ব্যবসায় যোগ করিয়া কারবার ফাঁপাইয়া তুলিলেন। অপরাপর ব্যবসায়ের মধ্যে তাঁহার ষে-একটা মহা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, তাহার কথা বলি। সে জেলাতে অনেক আপেল ফল উৎপন্ন হয়। সে দেশে লোকে আপেল ফলে মদ প্রস্তুত করে, সুতরাং আপেলের ব্যবসা খুব চলে। আমি যে পরিবারটির কথা বলিতেছি, তাঁহার সকলেই সুরাপান-বিদ্রোহী, সুতরাং তাঁহার মানে-বিয়ে এই পরামর্শ করিলেন যে, আপেল হইতে যদি জেল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যায়, তবে হাজার হাজার আপেল সুরার ব্যবসায় হইতে তুলিয়া লইয়া আহাদের কাজে লাগান যাইতে পারে। এই পরিবারের জননী তাঁহার ভ্রাতার সহিত এই পরামর্শ করিয়া উভয়ের অর্থসাহায্যে একটি জেল প্রস্তুত করিবার কল খাড়া করিলেন। ভাই হইলেন sleeping partner, অর্থাৎ অর্থ দিলেন মাত্র, কাজে বসিলেন না; ভাগিনী হইলেন ম্যানেজিং পার্টনার আর্থিং কার্যাব্যাক্ষ।

এই পরিবারের ছোট কত্যা পূর্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজের অমুরাগিণী ছিলেন, এবং আমাদের অনেকের নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি আমাকে লগুনে বার বার পত্র লিখিতে লাগিলেন যে আমাকে একবার তাঁহাদের গ্রামে ও তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতেই হইবে। তাঁহার পত্রে বার বার দেখিতে লাগিলাম, “একবার আসিয়া দেখ, তিনজন মেয়ে জীবনকে কিরূপে চালাইতেছে।” একবার সেই ছোট কত্যা ক্যাথারিন লগুনে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং আমাকে ঝাঁটে লইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি, ইহাদের ডবনে কিছুদিন বাসন করিবার পরে প্রোকেন্সর এক্ ডব্লিউ নিউম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে এই নামে লগুন হইতে বাত্মা করিলাম।

ইহাদের ভবন হইতে ফিরিবার সময়ে প্রোফেসর নিউম্যানের ভবনে ছইদিন অতিথিরূপে ছিলাম, তাহার বর্ণনা পূর্বেই করিয়াছি।

ষ্ট্রীটের রেলওয়ে স্টেশনে গিয়া দেখি, ক্যাথারিন গাড়ি লইয়া উপস্থিত। অন্ধদণ্ডের মধ্যে আমাব জিনিসপত্র গাড়িতে উঠিল, ক্যাথারিন আমাকে পাশে বসাইয়া গাড়ি হাঁকাইয়া চলিলেন। দুপুরবেলা বাড়ীতে পৌছিয়া তাঁহার মাতাকে দেখিলাম; তাঁহার দিক্‌দিকে দেখিলাম না, তিনি তখন তাঁহার আপিসে আছেন। আমাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়াই ক্যাথারিন বলিলেন, “চল, বেড়াইয়া আসি।” এই বলিয়া আমাকে এক নির্জন গাছাড়ের উপর বনের ভিতর লইয়া গেলেন। গিয়া বলিলেন, “আমার ধর্মজীবনের অবস্থার বিষয় তোমাকে বলিবার জন্য এই নির্জনে আনিয়াছি। আমি প্রাতঃকাল হইতে হাঁটিয়া বড় ক্লান্ত আছি, আমি এই গাছের উপর শুইয়া কথা কহিব, তুমি কিছু মনে করিও না।” এই বলিয়া আমাব সম্মুখে ঘাসের উপরে শুইয়া পড়িলেন; এবং নিজের ধর্মজীবনে কিরূপে কি কি পরিবর্তন ঘটয়াছে বলিতে লাগিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। তিনি পঠদশাতে একজন সহাধ্যায়িনী বালিকার জ্ঞাতার সংগ্রহে আসিয়া ‘ব্রাডল’র দলের নাস্তিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্যাথারিনের মাতা ও ভগিনী কিন্তু গোড়া খ্রীষ্টান। তাঁহার তাব পবিত্রত্বের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া জননী ও ভগিনী বড়ই হুংখিত হন। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহাকে দ্বারা এই নাস্তিকতা হইতে উদ্ধার করেন। তখন তাঁহার মত সার্বভৌমিক একেশ্বরবাদে দাঁড়ায়। এই সময়ে ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মসমাজের কথা জানিতে পারিয়া তিনি এ বিষয়ে অল্পসন্ধান আরম্ভ করেন। শেষে মনে মনে সংকল্প করেন যে, অবিবাহিতা থাকিয়া ঈশ্বর ও মানবের সেবাতে আপনার দেহমনের সমুদয় শক্তি অর্পণ করিবেন। তাহাই এখন করিতেছেন।

আমি দুই দিন ইহাদের ভবনে থাকিয়া অপূৰ্ব ব্যাপার দেখিলাম। অগ্রেহ বলিয়াছি, তাহা স্বালোকের বাড়ী, পুরুষের নাম গন্ধ নাটী; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটি পুরুষের মূখ দেখা যায় না। যেকপে তাঁহাদের দিন যাইত তাহা এই। বড় কত্ৰাটীর ধর্মভাব বড় প্রবল। তিনি ভোরে উঠিয়া নানাপ্রকার ধর্মগ্রন্থ বা ভাল ভাল উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিতে থাকেন, এবং নিজে উপাসনা করেন। প্রাতঃকাল হইবামাত্র, যে যে অংশ বড় ভাল লাগিয়াছে তাহা দাগ দিয়া, ছোট ভাগনো কাগজারিনের মাথার বাগিশের নীচে রাখিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আপিসের জুতা প্রস্থত হন। ৭টার সময় প্রাতঃরাশের ঘণ্টা পড়ে। তখন গিয়া দেখি, মা, জ্যেষ্ঠা কত্ৰা, কনিষ্ঠা কত্ৰা, অপব দুই চারিটা ভক্তমহিলা, ও চাকরাণীরা উপাসনাস্থলে উপস্থিত। সে উপাসনা নূতন ধরণের। গান হইল না, কেহ মুখে প্রার্থনা করিলেন না, জ্যেষ্ঠা কত্ৰা কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পড়িয়া শুনাইলেন, তৎপরে সকলে মুদ্রিত নেত্রে দশ পনের মিনিট ঈশ্বর-ধ্যানে নিযুক্ত থাকিলেন। তৎপরে প্রাতঃরাশ সমাপন হইল। দেখিলাম, ইহারা নিরামিষাশী পরিবার, টেবিলে মাছ-মাংসের গন্ধও নাই।

এই যে দুই একটি অপর জ্বীলোক দেখিলাম, তাঁহাদের বিবরণ এই। মা ও জ্যেষ্ঠা কত্ৰা নিজ নিজ পরিশ্রমের জুগে যখন বিষয়ের উন্নতি করিতে লাগিলেন, তখন তিন মারে-ঝিয়ে বসিয়া এই পরামর্শ করিলেন যে, জগদীশ্বর যখন সম্পদ দিতেছেন, তখন তাঁহার কাজে তাহা লাগাইতে হইবে। তাঁহাদের গৃহসংলগ্ন উজ্জানে একটি বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হাঁসপাতালের মত রাখিতে হইবে। তাহাতে ডাক্তার, দাঁস দাসী, সুকলি থাকিবে। তাঁহাদের মহিলা বন্ধুদিগের মধ্যে যে কেহ পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্ত তাঁহাদের নিকট আসিয়া থাকিতে চাহিবেন, তাঁহারা ঐ হাঁসপাতালে আসিয়া থাকিবেন। এই পরিবারের ব্যয়ে

গোতাদের পরিচর্যা হইবে। গিয়া শুনিলাম, এইরূপ দুই চারিটা মেয়ে সর্বদাই ঐ ভবনে আছেন।

এতদ্বিন্ন তাঁহাবা আর-একটা পরামর্শ এই করিলেন যে, তাঁহারা ক্যাথারিনকে একখানি গাড়ি ও দুইটা ঘোড়া দিবেন; ক্যাথারিন গহাতে চড়িয়া ষ্ট্রীট গ্রামের চারিদিকে চাবি পাঁচ মাইলের মধ্যে কৃষক ও শ্রমজীবীদের ভবনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগকে সুরাপান ছাড়াইবার চেষ্টা করিবেন, এবং তাহাদেব শিশুদিগের শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিবেন। ক্যাথারিন তখন সেই কাজে নিযুক্ত। তিনি একদিন বৈকালে আমাকে দেখাচবার জন্য এক গ্রামে কৃষকদের সভা আহ্বান করিলেন। গিয়া দেখি, ১০, ১০ জন কৃষক চা খাইবার জন্য এক প্রকাণ্ড টিনের ঘরে উপস্থিত। ক্যাথারিন আমাকে তাহাদেব অনেকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহাদেব মধ্যে কে কে তাঁহার চেষ্টাতে সুরাপান ছাড়িয়াছে, তাহা আমার কানে কানে বলিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি আমাকে তাঁহাদের নিজ গ্রামের টাউন-হলে লইয়া গেলেন। গিয়া শুনি, প্রসিদ্ধ জন ব্রাইটের জামাতা এই গ্রামে বাস করেন, এবং তাঁহাব একটি জুতার কল ও কারখানা আছে। তিনি এ টাউন-হলটি নিয়ন্ত্রণ করিয়া তথাকার কৃষক ও শ্রমজীবীদের ব্যবহারার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই হলে পাঠাগার, নাট্যাগার, পুস্তকালয়, ভোজনাগার, প্রতি সকলি দেখিলাম। ঐ হলে ব্রান্সসমাজের মত বিশ্বাস ও কার্য-কলাপের বিষয়ে আমি কিছু বলিলাম। জন ব্রাইটের কন্যা তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতান্তে উঠিয়া বলিলেন, “ব্রান্সসমাজের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু ভারতবর্ষের নারীকুলের জন্য ইহারা যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে জন্য ইহাদের মন্তকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ-পুষ্পের বৃষ্টি হউক।” সে কথাগুলি আমি কখনও ভুলিব না। কেবল তাহা নহে, তাঁহার মুখখানি আমার মনে দৃঢ় মুদ্রিত রহিয়াছে। আমি

এমন পবিত্র নারীমূর্তি অল্পই দেখিয়াছি। একরূপ সৌজন্য, একরূপ হ্রীণীলতা, একরূপ পবিত্রতা যে-নারীমূর্তিতে থাকে, তাহা একবার দেখাও জীবনের একটা পরম লাভ।

তৎপরে ফিরিবাবর সময় ক্যাথারিন বলিলেন, এই-সকল শিক্ষার উপায় বিধানের আয়োজনের ফল কি হইয়াছে, চল তোমাকে এক কুশকের ঘরে লইয়া দেখাই। এই বলিয়া এক কুশকের ঘরে আমাকে লইয়া গেলেন। সে ব্যক্তি তখন ঘরে ছিল না। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেটি যেন একটি ল্যাবরেটরী; এত প্রকার কল, আরক, শিশি বোতল প্রভৃতি রহিয়াছে! একপাশে একটা প্রকাণ্ড পুস্তকের আলমারি। ক্যাথারিন বলিলেন, “মানুষটা বিজ্ঞানের পরীক্ষা লইয়া এবং উদ্ভিদবিজ্ঞা লইয়া পাগল।” আমি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। তৎপরে আমি ষ্ট্রীট ছাড়িয়া লংওনে ফিরিলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

ইংলণ্ডের জাতীয় চরিত্রে । নানা বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ :—স্বাভাব্য-প্রবৃত্তি ও নিয়মানুগত্যা ; রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা ; প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সহিষ্ণুতা ; কার্যবাহুল্য ও কোলাহল বর্জন ; সামাজিক সুখভোগ ও ধর্ম ও নীতিতে ঐকান্তিকতা । ষ্টেড-সাহেবের সহিত কথোপকথন । মধ্যবিত্ত ইংরাজ গৃহস্থের গৃহ :—গৃহে নারীর অধিকার ; সুশৃঙ্খলা ; পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ; ধর্মের ছায়া ।

১৮৮৮

জাতীয় চরিত্রে ইংলণ্ডের শক্তির মূল ।—আমি ইংলণ্ডে আসিয়াই এহ চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম যে ইংরেজ জাতি এত অল্পসংখ্যক হইয়াও কিরূপে এত বড় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপরে রাজত্ব করিতেছে ? এই শক্তির মূল নিশ্চয় ইহাদের জাতীয় চরিত্রে আছে । সে মূল কি, তাহা একবার দোখতে হইবে ।

স্বাভাব্যপ্রবৃত্তি ও নিয়মানুগত্যের সমাবেশ ।—তাহাদের জাতীয় চরিত্রের যে যে গুণ আমার প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাহা এই । প্রথম, তাহাদের জাতীয় চরিত্রে যেমন একদিকে স্বাভাব্য-প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন-শক্তি আছে, তেমনি অপর দিকে সাধুভক্তি ও বাধ্যতা আছে । এই উভয়ের সমাবেশ অতীব আশ্চর্য্য । ঐতিহাসিক স্বেচ্ছাশ্রম পণ্ডিতাম, আর এ দেশের সহিত একটা বিষয়ে পার্থক্য মনে হইত । এ দেশে পার্শ্ববর্তী সকল বিষয়ে স্বাধীনকে গভর্ণমেন্টের দোহাই দিতে দেখিতাম ।

হৃদয় আসিতেছে, গভর্ণমেন্ট দেখিবেন ; জলাগ্নাবন হইয়াছে, গভর্ণমেন্ট দেখিবেন ; নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা হইতেছে না, গভর্ণমেন্ট দেখিবেন ; সুরাপান বাড়িতেছে, গভর্ণমেন্ট দেখিবেন ; ইত্যাদি। সেখানে গিয়া দেখিলাম, গভর্ণমেন্ট কোণ-ঠাসা। গভর্ণমেন্টের খোঁজ খবর বড় পাওয়া যায় না ; সব কাজ প্রজাবাই করিতেছে, গভর্ণমেন্ট কোন কোন বিষয়ে সত্য মাত্র। প্রজারা প্রকৃত সভাদিতে গভর্ণমেন্টকে অবাধ্য কুবাক্য বলিতেছে ; পার্লামেন্ট সভাতে তাঁহাদের নাকের সম্মুখে ঘুষ ঘুরাইতেছে। এক দিকে এই স্বাভাব্য-প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন, অপর দিকে যে কোনও কাজ দশ জনে মিলিয়া করিতেছে, সেই কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যাহার প্রতি যে কাজের প্রধান ভার প্রদত্ত হইতেছে, অপরেরা সেই উচ্চতম কর্মচারীর আজ্ঞাবহ থাকিয়া সুন্দররূপে কার্য্য নির্বাহ করিতেছে। এই জাতীয় চরিত্রগত বাধ্যতার গুণে বড় বড় কাজ কলের মত চলিতেছে। ইংরাজগণ মহা স্বাভাব্য-প্রবৃত্তি সত্ত্বেও রাজবিধির বাধ্য, পুলিশের বাধ্য, আইন আদালতের বাধ্য, সামাজিক ও গার্হস্থ্য নিয়মাবলীর বাধ্য। জাতীয় চরিত্রে বিরুদ্ধ গুণের এই এক অদ্ভুত মিলন।

রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার সমাবেশ।—দ্বিতীয় মিলন, রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার। এমন রক্ষণশীল, প্রাচীরের প্রতি এরূপ আস্থাবান জাতি অল্পই দেখিয়াছি। কোনও ভদ্র গৃহস্থের গৃহে যাও, অপরাপর দৃষ্টব্য বিষয়ের মধ্যে সেই পরিবারের পূর্বপুরুষগণের স্মৃতিচিহ্ন ভক্তিসহকারে প্রদর্শিত হইবে। হয় ত গৃহস্থামী তোমার হস্তে একখানি বাইবেল দিয়া বলিবেন, “এখানি আমার অত্যন্ত-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের ব্যবহৃত গ্রন্থ।” গুণিগণের ও দেশের অতীত মহাশয়গণের প্রতি সর্বশ্রেণীর লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা অতিশয় প্রবল।

উইন্ডসর কাসল (Windsor Castle) রাজবাড়ী দেখিতে গিয়া দেখিলাম, যে-মাস্তুলটার নিম্নে নেলসন্ আহত হইয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ

প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে প্রোথিত রহিয়াছে, এবং জেনারেল গর্ডনের ব্যবহৃত পাঠবেলখানি একটা কাষ্ঠনির্মিত বাল্কের মধ্যে সম্বন্ধে রক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয় চরিত্রে সাধুভক্তি এতই প্রবল, প্রাচীনের প্রতি আস্থা এতই প্রবল যে বাজ্যেশ্বরী মহারাণী পর্যন্ত একজন প্রজার স্মৃতিচিহ্ন বক্ষা করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের যে কোনও বড় নগরে যাওয়া যায়, সকল স্থানেই রাজপথ সকল তৎতৎ প্রদেশের বড়লোকদিগের পাষণনির্মিত মূর্তিতে পরিপূর্ণ। 'ৱেস্টমিনষ্টার অ্যাবী (Westminster Abbey) নামক প্রসিদ্ধ সমাধি-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলে, দেশের বড় বড় কবি, বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় সাধু পণ্ডিতের মাহুসেব স্মৃতিচিহ্নে সে স্থান পূর্ণ দেখা যায়। তাঁহাদের স্মৃতিপূর্ণ। সকল উক্তি তাঁহাদের স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে। একদিন সেখানকার সেন্ট পল্‌স্ নামক গির্জাতে পদার্পণ করিয়া দেখি যে ভারত-প্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম জোন্স সাহেবের এক প্রস্তর-নির্মিত মূর্তি রহিয়াছে; তাহার এক পার্শ্বে এক ব্রাহ্মণ শিক্ষকের মূর্তি, অপর পার্শ্বে এক মুসলমান মৌলবীর মূর্তি। সে দেশের নানা স্থানে বড়লোকদিগের স্মৃতি আর এক প্রকারে রক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা জীবনের অধিকাংশ দিন যেখানে গৃহে বাস করিয়াছিলেন, সেই গৃহগুলি পূর্বাবস্থাতে রাখা হইয়াছে, এবং গৃহগুলি গৃহস্থানীর স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ। এইরূপে দেখা যায়, সে দেশের রাজাপ্রজা সকলের মনে সাধুভক্তি প্রবল।

আবার অপর দিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার দিকে সর্বশ্রেণীর মনোযোগ; ধর্ম সমাজনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক নূতন তত্ত্ব-সকলের আশুচিন্তার জন্য নানাপ্রকার আয়োজন। সাধুভক্তিতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ হিতশীল করিতেছে না। সভা, সমিতি, পাঠাগার প্রভৃতির অন্ত নাই।

প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সহিষ্ণুতার সমাবেশ।—দ্বিতীয় চরিত্রে তৃতীয় পরম্পর-বিরোধী গুণের সমাবেশ অতীব আশ্চর্য। তাহা এক দিকে

জ্ঞান ও বিশ্বাসের ঐকান্তিকতা ও তন্নিকট, উন্নতিস্বার্থ উৎকর্ষতা, আবার অপর দিকে তাহার লাভ বিষয়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। স্বরাপান-নিবারণী সভাতে, বা Female Suffrage সভাতে যাইয়া বক্তাদিগের কথা শুনিলে মনে হয় যে, তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন না করিলে দেশের পরিত্রাণ নাই; অথচ কাগজে পাড়ি যে তাঁহাদের প্রার্থনা পার্লামেন্টের গোচর করিয়া তাঁহারা স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য দশ বৎসর, বিশ বৎসর, ত্রিশ বৎসর অপেক্ষা করিতেছেন; প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ধৈর্য্যধারণ করিতেছেন।

কার্য্যাবহুল জীবন ও কোলাহল-বর্জ্জনের সমাবেশ।—চতুর্থ বিরুদ্ধগুণদ্বয়ের সমাবেশ, তুষ্ণীভাব, নির্জল-বাস, আত্ম-চিন্তা এবং সজন-বাস ও কার্য্যদক্ষতা। মানুষ এ জীবনে স্বল্পভায়ী হইয়া কিরূপে কাজ করিয়া যাইতে পারে, এ বিষয়ে মানববুদ্ধিতে যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে ইংরাজগণ তাহা করিয়াছেন। ভদ্র গৃহস্থের গৃহে শিশু সন্তান যদি না থাকে, তবে সে গৃহে থাকাও যাইল, আর হিমালয়ের শৃঙ্গে কোনও গিরিকন্দরে থাকাও তাহা। চাকরাণী আসিতেছে যাইতেছে, আদেশ শুনিতেছে ও তাহা পালন করিতেছে, কিরিওয়ালা জিনিসপত্র দিয়া যাইতেছে, জল-স্রোতের দ্বারা কার্য্যের স্রোত চলিতেছে, অথচ গৃহে সাড়া নাই শব্দ নাই। চাকর-চাকরাণী যে ঘরে থাকে, সে ঘরে প্রত্যেক ঘরের নম্বর অনুসারে নম্বরওয়ালা ঘণ্টা আছে, তাহার সঙ্গে প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে তারযোগে যোগ আছে। যদি চাকরাণীকে চাও তবে তোমার ঘরে বসিয়া কলনাড়া দেও, এক মিনিটের মধ্যে চাকরাণী আসিয়া উপস্থিত; তোমার দ্বারে টোকা দিতেছে, তাহাকে ঘরে আসিতে বল, তবে তোমার ঘরে প্রবেশ করিবে। তুমি আদেশ কর, অবিলম্বে তদনুসারে কার্য্য করিবে। এমন স্বরে তোমাকে কথা কহিতে হইবে, বেন অপর ঘরের লোক শুনিতে না পায়। তুমি একটা রাত্তার ধারের

বাড়ীতে আছ, নিজের ঘরে বসিয়া লিখিতেছ ; রাত্তা হইতে সাড়া নাই, শব্দ নাই, কেবল মস্ মস্ জুতার শব্দ শোনা যাইতেছে। কিন্তু একবার যদি উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়াও, বোধ হইবে যেন রাত্তাতে টুপীর বজা আসিয়াছে, এত লোক যাইতেছে ! দোকানে কাপড় কিনিতে যাও, যেই দ্বারটা খুলিবে অমনি কোথা হইতে টং করিয়া একটা ঘণ্টা বাজিবে ; প্রবেশ কবিবামাত্র একজন লোক উপস্থিত। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যাহা প্রয়োজন তাহাকে বল, অবিলম্বে তাহা পাইবে, দর নাই, দস্তর নাই, পাচ মিনিটের মধ্যে কাজ সমাধা। যেমন নিস্তরু ভাবে কাজ কবিবার বাঁতি, তেমনি সমস্ত বাঁচান। এই গুণেই ইংরাজগণ কাজ করিবার এত সমস্ত পান। বলিতে কি, ছয় মাস ইংলণ্ডে বাস করিয়া আমার চুপে চুপে কথা কহিয়া একপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, স্বদেশে ফিরিয়া বঙ্গদেশে স্ববের মাত্রাতে উদ্ভূতিতে অনেক দিন গেল। ঐ সময়ের মধ্যে যাহারা আমাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আমার অন্তর করিয়াছে কি না, নতুবা এত চুপে চুপে কথা কহিতেছি কেন ?

আমি ইংরাজ জাতির এই নিজনবাস ও নিস্তরুতার বিশেষ ইষ্টফল দেখিয়াছি। প্রত্যেক ভদ্র ইংবাজের গৃহে একটা ঘর থাকে, যাহাকে Drawing Room বা বৈঠকখানা বলে। সে ঘরে কেহ শয়ন করে না, এহা কেবল বন্ধু-বান্ধব অতিথি অভ্যাগতগণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিবার ঘর। বাড়ীর লোকে সার্বক্ষিক আহারের পর সেখানে বসিয়াই বিশ্রাম ও গল্পগাছা করেন, লোকে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সেই ঘরেই দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহস্থানীর যে একটা ঘর ঘর থাকে, সেখানে তিনি যখন বাস করেন, তখন সে-ঘরে কেহ যায় না। সে ঘরটিকে তাঁহার Study বা পাঠাগার বলা হয়। তিনি সেখানে বসিয়া পাঠ ও চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহাতেই ইংরাজগণ বড় বড়

কাজ করিতে পারিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ কাজ নির্জনবাস ও আত্মচিন্তার ফল।

এক দিকে নির্জনে পাঠ ও চিন্তা, অপর দিকে সজনে কার্যাদক্ষতা ও আবশ্যক হইলে বক্তৃতা। ইংরাজগণ সজনে কাজকর্মে কিরূপ গুরুতর শ্রম করেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তখন এক্রপ মন প্রাণ দিয়া কার্য্য করেন যে, দেখিলে মনে হয় যে তাঁহাদের অগ্র কৰ্ম্ম বুঝি নাই।

সামাজিক সুখভোগের স্পৃহার সহিত ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে ঐকান্তিকতার সমাবেশ।—পঞ্চম বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ, সামাজিকতা ও ধর্ম্মভাব। আমি বখন সেখানে ছিলাম, দেখিতাম পরীহ বা ছুটির দিনে হাজার হাজার লোক লণ্ডন সহর হইতে রেলপথে বাহির হইয়া যাইত। সহরের বাহিরে কোনও মাঠে ক' বনে আমোদ-আহ্লাদে দিনটা অতিবাহিত করাই উদ্দেশ্য। ফিরিবার সময় রেলগাড়ি হইতে নামিয়া একজন লোক যদি একটা ছোট পিয়ানোতে নাচের বাজাইল, অমনি দলে দলে পুরুষ ও নারী কোমরে কোমরে বাধাবাধি কবিত্তা রেলপথে প্রাটফর্মেই নাচিতে আরম্ভ করিল! যেন আমোদ প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ইটালিয়ান ব্যাণ্ড নামে এক প্রকার বাদ্য-যন্ত্র লইয়া লোকে দ্বারে দ্বারে বাজাইয়া পরস্পর উপার্জন করে। কোনও স্থানে সেই বাদ্য বাজিতেছে, দুইটা নিম্নশ্রেণীর ১৭।১৮ বৎসরের বালিকা কিছু কিনিতে বাজারে যাইতেছে; সেই বাদ্য শোনা অমনি কোমরে জড়াজড়ি করিয়া রাস্তার উপরেই নাচ! ইংরাজ জাতিতে সামাজিক সুখভোগের প্রবৃত্তি এইরূপ প্রবল; কিন্তু তাহা বলিয়া লঘু-চিন্ততা নাই। জ্ঞানাত্ম্যের বিচার বখন আসে, রাজনীতি বা সামাজিক নীতির উৎকর্ষবিধানের প্রস্তাব বখন উপস্থিত হয়, তখন ইংরাজ আপাদমস্তক ঐকান্তিকতার পরিপূর্ণ। সত্যের জয় হইবেই হইবে,

অধর্ম্য হেয় ও ধর্ম্য শ্রেয়, ইহা তাহাদের অস্থি মজ্জা মাংস মস্তিষ্কে যেন বসিয়া আছে। আমি ব্রাডল'র দলের নাস্তিকদের সভাতেও উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াছি; তাঁহাদের কথার ভাবভঙ্গী ও মত প্রকাশের ঐকান্তিকতা দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহাদের মতে তাঁহাদের পথাবলম্বী না হইলে ইংলণ্ডের রক্ষা নাই এবং সেই পথাবলম্বী হইতেই হইবে। এত সব বৈধিভাম, আর মনে মনে এই কথা জাগিত যে ইংরাজ জাতি ন্যায়াবলম্বী ও ধর্ম্মাবলম্বী জাতি।

ইংরাজজাতির ধর্ম্মপ্রবণতা বিষয়ে ফেড্ সাহেবের সহিত রূপোপকথন।—আমি ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করিবার প্রাক্কালে একদিন ফেড্ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইংলণ্ড হইতে কি লইয়া যাইতেছ?

আমি—কি জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ?

ফেড্—না, তা কেন? কি দেখিয়া কি শিখিয়া গেলে?

আমি—দেখিয়া যাইতেছি যে তোমরা ধর্ম্মপ্রবণ বিশ্বাসী জাতি। তোমাদের নাস্তিকেরাও আস্তিক, তারাও বিশ্বাস করে যে ব্রহ্মাও ধর্ম্ম-নয়ম দ্বারা শাসিত, এখানে সত্যের জয় হবেই হবে।

ফেড্—তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমরা ধর্ম্মপ্রবণ জাতি।

ফলতঃ এই ধর্ম্মপ্রবণতা ইংরাজজাতির চরিত্রের মূলে মহাশক্তিরূপে বিবাজ করিতেছে।

মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজের গৃহ।—ইংরাজজাতির উন্নতির ও মহত্বের দাব-একটি মূল কারণ লক্ষ্য করিলাম। তাহা ইংরাজের গার্হস্থ্যনীতি। মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজের গৃহ একটি দেখিবার জিনিস। দশ দিন তাহা দেখা বাস করিলে মনে এক অভূতপূর্ব শান্তি আনন্দ ও পরিচ্ছন্ন মনুষ্যত্বের কথা বায়। ইংরাজের গৃহের সৌন্দর্যের অনেকগুলি কারণ আছে। য যে কারণ আমার মনে লাগিয়াছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

গৃহে নারীর অধিকার।—প্রথম কারণ, মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজ গৃহস্থের ভবনে নারীর অধিকার। ইংরাজের গৃহে গৃহিণী সত্য-সত্যই গৃহস্বামিনী, রাণী। পুরুষ উপার্জক, স্ত্রীরাং বিচারের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহারই কর্তা হইবার কথা। কিন্তু ইংরাজজাতির সামাজিক ব্যবস্থা অল্পসারে গৃহিণীই রাণী। পুরুষ গৃহে তাঁহার প্রজ্ঞা বা প্রধান, মন্ত্রী। পুরুষ যাহা উপার্জন করেন তাহা গৃহিণীর হস্তে দিয়া, তাঁহারই কর্তৃত্বাধীন হইতে ভালবাসেন। গৃহের ব্যবস্থাবিষয়ে নিশ্চিত থাকিয়া তিনি পাঠ চিন্তাদি দ্বারা আত্মোন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইতে পারেন।

গৃহিণীর সর্বময় কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা থাকাতে অতি চমৎকার ফল ফলিতেছে। নারীগণ সর্ববিধ জ্ঞানচর্চার অংগী ও সর্ববিধ শুভচেষ্টার সহায় হইতেছেন। আমি ১৮৬৩ বঙ্গাব্দে গুলশতগুনিতে গেলে সভায় অর্ধেক নারী দেখিতে পাইতাম। অনেক সময়ে কোনও বিখ্যাত আচার্য্যের উপদেশ শুনিবার জন্য স্ত্রীলোক ঠেলিয়া উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণাদিতে গেলে, বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত কোনও জ্ঞানের বা সামাজিক উন্নতির প্রসঙ্গে কোথা দিয়া সময় যাইত জানিতে পারিতাম না।

অথচ প্রত্যেক ভদ্র গৃহস্থের গৃহে নারীগণের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে একরূপ সকল সামাজিক শাসন ও সুনিয়ম দেখিতে পাইতাম যে, দেখিয়া মন মুগ্ধ হইত। এদেশের লোক নারীর অবরোধ দেখিয়া অভ্যস্ত; তাহাদের স্বভাবতঃ মনে হইতে পারে যে যে-সমাজে নারীগণ সম্পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করেন, তাঁহারা বোধ হয় নীতি অংশে হীন। অল্প দেশের কথা জানি না, ইংরাজ মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের নারীগণ পবিত্রতার আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহারাই ইংরাজ জাতির গৌরব ও শক্তির মূলে।

সুশৃঙ্খলা।—নারীজাতির শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারের পরে ইংরাজ গৃহস্থের গৃহের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ, পারিবারিক সকল কার্যের সুব্যবস্থা। যে-কাজটি যে সময়ে করিবাব নিয়ম আছে, সে-সময়ে সেটি হইবেই হইবে। উঠিবার ঘণ্টা, চা খাইবার ঘণ্টা, পারিবারিক উপাসনার ঘণ্টা, পোতব্রাশের ঘণ্টা, মাধ্যাহ্নিক আহাণেব ঘণ্টা, বৈকালের চা খাইবার ঘণ্টা, ডিনারের ঘণ্টা, এইরূপ ঘণ্টাব পব ঘণ্টা চলিয়াছে। ঠিক সময়ে আসা চাই, ঠিক সময়ে খাওয়া চাই, ঠিক সময়ে ওঠা চাই। এইরূপ সময়ের সুব্যবস্থা থাকিতে তাতে অনেক সময় থাকে, এবং পরিবারের লোকেরা অনেক কাজ মন দিতে পারে। তৎপরে আগ্রে যে নিস্তরূপ ও বর্ণনা করিয়াছি তাহা পরিবাব মধ্যেও বিদ্যমান। গৃহমধ্যে জল-স্রোতের স্ত্রী-স্বাক্ষার্যস্রোত চলিতেছে, অথচ গৃহেব মাধ্য থাকিয়াও জানিতে পারা যায় না। যে পড়িতেছে, সে নিস্তরূপ গৃহে নির্জনে একান্ত মনে পড়িতেছে, যে চিন্তা করিতেছে সে নিকল্পিচিন্তে চিন্তা করিতেছে; যে কর্ম করিতেছে সে অপবপার্শ্বে দ্রুত শ্রম করিতেছে, বার কাজ ওব কাজ, তাহাতে অপনের সংশ্রব নাই। এই চিন্তা ও কার্যের ব্যবস্থা অতীব মনোরম।

তাহার পব আর-একটা গুণ, যাহাকে ইংরাজীতে order বলে, অর্থাৎ যেখানকার যেটা সেইখানে সেইটা থাকা। দোয়াতটীর জায়গায় দোয়াতটি, বইগুলির জায়গায় বইগুলি। আবশ্যক হইলেই পাওয়া যায়, কোনও জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাইতে দুই মিনিট বিলম্ব হয় না। এ দেশে কতবার দেখিয়াছি, গৃহস্থামী একস্থানে দোয়াত কলম রাখিয়া গিয়াছিলেন, বাড়ীর কোনও ছেলে আসিয়া কলমটা কোথায় লইয়া গিয়াছে, গৃহস্থামী একটা বিল স্বাক্ষর করিয়া দিবেন, কলমটাব প্রয়োজন; চীৎকার করিতেছেন, “ওরে রামা! কলম নে-পেল কে? কলমটা দেখে নিয়ে আয়।” কলম আসিতে বিলম্ব হইতেছে, তাহার মেলাজ খাপ্পা হইয়া

বাইতেছে; যে বিল স্বাক্ষর করাইতে আসিয়াছে, সে দ্বারে দণ্ডায়মান, তার সময় বাইতেছে; বাবুর ক্রোধ বাড়িতেছে, মহা হুলস্থূল। ইংরাজ ভদ্রলোকের গৃহে একরূপ ঘটনা বড় নিন্দার বিষয়। একরূপ ঘটতে থাকিলে সে বাড়ীর গৃহিণীর ভদ্রসমাজে মুখ দেখান কঠিন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।—মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহে এই গার্হস্থ্য ব্যবস্থার পরে পারিবারিক প্রধান গুণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (cleanliness)। প্রতিদিন গৃহের সকল অংশ স্নমার্জিত হয়; কেবল তাহা নহে, প্রত্যেক চেয়ারের পায়াগুলি, প্রত্যেক খাটের পায়া ও বাড়িগুলি, প্রত্যেক আলমারির ধারগুলি, কাপড়ের দ্বারা উত্তমরূপে মার্জিত হইয়া থাকে। অনেক গৃহস্থের গৃহসামগ্রীগুলি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন অল্প দিন সে বাড়ীতে আসিয়া বাসিয়াছেন।

ধর্ম্মের ছায়া।—সর্বোপরি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ ভদ্র গৃহস্থের গৃহে ধর্ম্মের একটা ছায়া আছে। প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা হইয়া থাকে; রবিবার গির্জাতে যাওয়া ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত হয়। সৎকার্যের জন্ত দান অধিকাংশ স্থানে অব্যাহিতরূপে করা হইয়া থাকে। এইরূপে ধর্ম্মভাব ও নীতির ভাব পারিবারিক হাওয়ার মধ্যেই বিদ্যমান। দুই দিন সেই হাওয়াতে বাস করিলেই তাহা অনুভব করা যায়।

আমি লগুনে ও মফঃসলে যে যে পরিবারে গিয়া বাস করিতাম, সেইখানেই পারিবারিক জীবনের এই সকল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ইংলণ্ডে আমার কার্য্য । ব্রিষ্টল ; রামমোহন বায়েব সমাধি
মন্দির , স্মৃতিসভা ; স্মৃতিচিহ্ন । ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত
লিখিবার সূচনা । স্বদেশে প্রত্যাবর্তন । জাহাজে
পাদরী সাহেবদের সঙ্গে তর্ক । জর্জ
মূলারেব সাক্ষাৎ লাভ ।

১৮৮৮

ইংলণ্ডে আমার কার্য্য ।—আমার ইংলণ্ড-বাতার প্রধান উদ্দেশ্য
ছিল দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা কবা । জনহিতকব নানা অস্থান ও
ইংরাজ জাতির স্বভাব চরিত্র রীতি নীতি পরিদর্শন করিতে, এবং নানা
শ্রেণীর লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেই আমার অধিকাংশ
সময় ব্যয়িত হইত । এতদ্ব্যতীত লণ্ডনে ও মফঃসলের নানা স্থানে
ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, এবং ইউনিটেরিয়ানদিগের
দ্বারা ও ব্রাহ্ম (Theistic) আচার্য্য ভয়সী সাহেবের দ্বারা আহুত
হইয়া তাঁহাদের উপাসনামন্দিরে কয়েকবার উপদেশ দিয়াছিলাম । তত্ত্বিন্ন
স্বরাপানের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সমাজ ও শিক্ষার অবস্থা বিষয়েও
নানা সভাসমিতিতে কয়েকবার বক্তৃতা করিয়াছিলাম ।

রাজা রামমোহন বায়েব মৃত্যুদিনে ব্রিষ্টল নগরে স্মৃতিসভা ।
১৮৮৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর দিবসে মহাত্মা রাজা রামমোহন বায়েব
মৃত্যুদিনে ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার স্মৃতিতে এক সভা করিবার জন্ত ঐ

নগরে যাই। তৎপূর্বে আমি ও আমার বন্ধু হুর্গামোহন দাস উদ্যোগী হইয়া Arno's Vale নামক সমাধিক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিনিশ্চিত রাজার সমাধি-মন্দিরের মেরামতের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। কিরূপ মেরামত হইল, তাহা দোখবাবও ইচ্ছা ছিল। ঐ দিন আমি সমস্ত দুপুর বেলা রাজার সমাধি-মন্দিরে যাপন করি, এবং সন্ধ্যার সময় এক প্রেকাশ্য হলে রাজার বিষয়ে বক্তৃতা কবি।

রাজার স্মৃতি যে এখনও ব্রিষ্টলবাসীর মনে আছে তাহা জানিতাম না। আমি দুপুরবেলা সমাধি-মন্দিরে বসিয়া আছি, দেখিলাম সেই সময়ের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি আসিয়া সমাধি-মন্দিরের সমক্ষে ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া সমাধিতে লিখিত বাক্যগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সন্ধ্যার সময় আমার বক্তৃতা শেষ হইলে দেখি যে একটি বৃদ্ধা-স্ত্রীলোককে লোকে ধরিয়া সভামধ্য হইতে আমার দিকে আনিতেছে। আমি তাঁহাকে দেখিয়া সসজ্জমে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—“এই হাতে রামমোহন রায়ের হাত ধরিয়াছিলাম। এস, আজ তোমার হাত ধরি।” বলিয়া মহোৎসাহে আমার হাত ধরিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখে, কোথায় কিরূপে রামমোহন রায়কে দেখিয়াছিলেন, তাহা শুনিলাম।

রাজা রামমোহন রায়ের মূর্ধ্বস্থিত মূর্তি ও শালের পাগড়ী।—
পরে আর-একটা ঘটনা ঘটিল, তাহাও চিরস্মরণীয়। মৃত্যুকালে রাজা রামমোহন রায়কে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কণ্ঠা তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার ঘোবনকালে নিজ পিতার সঙ্গে রামমোহন রায়কে অনেকবার দেখিয়াছেন, রাজার সঙ্গে মিশিয়াছেন, ও তাঁহার আতিথ্য করিয়াছেন। রাজা ও তাঁহার পিতা গত হইলে, তিনি নিজ পিতার নিকটে প্রাপ্ত মূর্ধ্বস্থিত রাজার মস্তক ও তাঁহার মাথার শালের পাগড়ী প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্নগুলি সন্মুখে রাখা করিয়া

আসিতেছিলেন। বার্কিকো কবে চলিয়া যান, ইহা ভাবিয়া সেগুলি আমার হাতে অর্পণ করিবার জন্ত আমাকে ডাকিলেন ও সেগুলি আমার হাতে অর্পণ করিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলাম, এবং দেশে লইয়া আদিলাম। দুঃখের বিষয় আমি নানা স্থানে বাসা নাড়িয়া বেড়াইবার সময় অপরাপর ছোট ছোট স্মৃতিচিহ্নগুলি হারাইয়া ফেলিলাম। অবশেষে তাঁহার মূর্নিষিত মৃতিটী ৩ শালের পাগুড়ীটা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের হস্তে দিয়াছি, তাঁহার এক কবিতাও ছিল। বাজা রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে রাখা অতীব কর্তব্য, এই ভাব মনে আসাতে স্মৃতিচিহ্নগুলি তাঁহাদের হাতে দিয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার সূচনা।—আমি ছয়মাস কাল মাত্র ইংলণ্ডে ছিলাম। বাহা বাহা দেখিয়াছিলাম, তদ্ব্যতীত দেখিবার আবহু অনেক স্থান ও বিষয় ছিল। কিন্তু আমার স্বল্প গুরুতর এক কার্যের ভার পড়াতে শেষ করেক মাস আমার দেখা শুনার কিছু ব্যাঘাত ঘটিল। সে বিষয়টা এই। ট্রুবনার (Trubner) নামক মুদ্রাকর কোম্পানীর ম্যানেজার একদিন কুমারী কলেটের নিকট হস্তলিখিত একখানি পুস্তক পাঠাইয়া লিখিলেন যে, সেখানি একজন ভ্রমলোকের লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত; তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার ছাপিতে পারেন। কুমারী কলেট পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে অনেক স্থলে ভুল আছে; তাহা না ছাপাই ভাল। এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে লিখিলেন, “ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা এখন এখানে আছেন, তোমরা যদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ছাপিতে চাও, তাঁহা দ্বারা লিখাইয়া দিতে পারি।” এই বলিয়া আমাকে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্ত ধরিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার

অল্পরোধে তাঁহারই সংগৃহীত কাগজপত্র লইয়া ইতিহাস লিখিতে বসিলাম। শেষ দুই মাস এই কাজে আবদ্ধ ছিলাম।

দুর্গামোহন বাবু ও পার্শ্ববর্তী বাবুর দেশে প্রত্যাবর্তন।—আমি মে মাসে লণ্ডনে পৌছিয়াছিলাম, নভেম্বর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি। আগিবার সময় দুর্গামোহন বাবুর সঙ্গ পাইলাম না। তিনি পীড়িত হইয়া তৎপূর্বেই পার্শ্ববর্তী বাবুর সঙ্গে দেশে ফিরিয়াছিলেন। আমি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লইয়া বাস্তব থাকাতে তাঁহাদের সঙ্গে আসিতে পারি নাই।

আমার প্রত্যাবর্তন।—যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্ত বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল, অচিরকালের মধ্যে সেই ইতিবৃত্ত লেখাই বন্ধ করিতে হইল। লিখিতে লিখিতে সংবাদ পাওয়া গেল যে ট্রুবনার (Trubner) কোম্পানি ঐ ইতিবৃত্ত ছাপিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা কি শুনিলেন, কি ভাবিলেন, আমরা জানিতে পারিলাম না; কেবলমাত্র কুমারী কলেটকে জানাইলেন যে তাঁহারা সে সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই আদেশক্রমে আমার লিখিত অংশ ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীর পুস্তকাধ্যক্ষ একজন জর্দান পণ্ডিতকে দেখাইয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বতঃপ্রসূত হইয়া কিয়দংশ রেভারেণ্ড ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রাক্কেও পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি ভারি খুসী হইয়াছিলেন। ট্রুবনার কোম্পানী পিছাইয়া পড়িতেছে শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া গেলেন, এবং বলিলেন, “তুমি থাক, আমি ম্যাকমিলান কোম্পানী দ্বারা তোমার বই ছাপাইব।” কিন্তু আমি থাকি কিরূপে? আমার কতিপয় বন্ধু আমার ইংলণ্ডে থাকিবার ব্যয় দিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ভারাক্রান্ত করিতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। আমি কোন কোন সংবাদপত্রে লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতেছিলাম। তাহাতেও সমুদয় ব্যয় নির্বাহ হওয়া কঠিন বোধ হইতে লাগিল।

অবশেষে মনে হইল, যাহা লিখিবার আছে দেশে গিয়া লেখাই ভাল।
এই স্বদেশে প্রস্থান করিলাম।

জাহাজে পাদরী সাহেবদেব সঙ্গে তর্ক — ফিরিবার সময়কার সমুদ্রপথের একটা ঘটনা মনে আছে। আমি Talmudic Miscellanies, Life and Teachings of Confucius, প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক কিনিয়া আনিয়াছিলাম; জাহাজে সেইগুলি সর্বদা পঠ করিতাম, এবং অধিকাংশ সময় ধর্মচিন্তাতে যাপন করিতাম। আমাদের সঙ্গে একজন ইংরাজ খ্রীষ্টীয় মিশনারি আসিতেছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে কথা কহিতেন না; কিন্তু যখন দেখিলেন আমি কখনও Talmud পড়িতেছি, কখনও Confucius পড়িতেছি, কখনও বাইবেল পড়িতেছি, তখন আমি কি, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কোতাহল জন্মিল। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোন্ ধর্মাবলম্বী। -

আমি—আমি একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক।

মিশনারি—তোমাকে কখনও দেখি Talmud পড়িতেছ, কখনও দেখি Confucius পড়িতেছ; এ সকল পড় কেন?

আমি—পড়িয়া জ্ঞানোপদেশ পাই বলিয়া, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক উচ্চ কথা পাই বলিয়া।

মিশনারি—তোমাকে বাইবেলও পড়িতে দেখি। তুমি বাইবেলের বিষয়ে কি মনে কর?

আমি—বাইবেলেও অনেক ভাল কথা আছে। বাইবেল পড়িয়াও গ্রন্থ পাই।

মিশনারি—তুমি এই-সকল গ্রন্থের সঙ্গে বাইবেলকেও এক জায়গায় দাড় করাইলে, এটা ভাল নয়। বাইবেল অত্যন্ত ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ, ইহাতে যে-সকল উপদেশ আছে, তাহা অপর কোনও গ্রন্থে নাই।

আমি—আচ্ছা আপনি বাইবেলের এমন কোনও উপদেশ উল্লেখ ককন, যাব সদৃশ উপদেশ আপনাকে বিবেচনায় অগ্রহ কোনও গ্রন্থে নাই।

মিশনারি —“Do unto others as you would that they should do unto you.”

সৌভাগ্যক্রমে এই উপদেশের অনুরূপ দুইটি উপদেশ আমি কিছুদিন পূর্বে ‘Talmud ও Confucius’ উভয় গ্রন্থেই পড়িয়াছিলাম। আমি গ্রন্থ দুইখানি আনিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। বলিলাম, “দেখুন, কংফুচের অনুবাদক ডাক্তার লেগ্ (Legge) আপনাদেবই একজন মিশনারি। তাঁহাবই উক্তিতে প্রমাণ, কংফুচ বীণ্ড জন্মবার প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। একজন শিষ্য কংফুচকে ‘জিজ্ঞাসা কবিতেন, ‘গুনো, সকল উপদেশেব সাব কি?’ তদুত্তরে কংফুচ বলিতেন, ‘সকল উপদেশেব শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই,—তোমাব প্রতি অপেব যে ব্যবহার তুমি পছন্দ কব না, তাহা অপরেব প্রতি কবিয়ো না।’ ইহা ত প্রকবাস্তবে ঐ একই কথা। বলুন তবে বাইবেলের অলৌকিকতা কোথায় রাইল? আপনি কি বলেন?—সত্যের প্রবর্তক কে? ঈশ্বরই ত সত্যের প্রবর্তক। তবেই ত ‘প্রমাণ হইতেছে যে তিনি দেশ ও জাতিনিবিশেষে আধ্যাত্মিক সত্যসকল অভিব্যক্ত করিয়াছেন।”

আমাব যতদূর শ্রবণ হয়, তিনি মৌনী হইয়া থাকিলেন। কিন্তু আব একটা মিশনারি ভদ্রলোক বলিলেন, “কথাটা কি জান? দুষ্ট শয়তান অনেক সময় ধম্মেব মুখস্ পবিয়া মানুষকে বিপথে লইয়া যায়। অনেক উচ্চ কথা মানুষের গোচর কবিয়া তাহাকে পথভ্রান্ত করে। সুতরাং শয়তানও সত্য অভিব্যক্ত করে। সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জগ্গই বীণ্ডর অভ্যাস।”

গুনিয়া আমি বলিলাম,—“আমি আপনার কাছে হার মানিলাম !”
 ঙ্গাবিলাম ইহাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বুঝা ।

তখন দেশ হইতে আসিবার সময়কার সমুদপথের একটি ঘটনা স্মরণ
 হইল, তাহা যথাস্থানে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি । ইংলণ্ডে যাইবার সময়
 সিংহল হইতে কয়েকজন খ্রীষ্টীয় মিশনারি আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহা
 সেই বিবরণে সম্পর্কে লিখিয়াছি । ইহারা পথিমধ্যে প্রতী-রবিবার
 আরোহীদিগকে লইয়া জাহাজের এক পার্শ্বে গির্জা করিতেন । আমি
 তাহাদের উপাসনাতে যাইতাম । দুই তিনবাব যাওয়ার পর একজন
 মিশনারি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদের উপাসনাদি
 .এমার কেমন লাগিতেছে ?”

আমি—ভালই লাগিতেছে । কেবল একটা চিন্তা বারবার আমার
 মনে উদয় হয় ।

মিশনারি—সেটা কি ?

আমি—আপনারা উপদেশে প্রায় প্রতিবার বলেন যে মনুষ্যের পাপে
 গম্ভীর, মনুষ্যের প্রকৃতি পাপপ্রবণ, সভ্যতার যতই উন্নতি হইতেছে ততই
 মানুষ ঘন হইতে ঘনতর পাপে নিমগ্ন হইতেছে । অথচ ইহাও বলেন যে
 অবশেষে মানুষ ঈশ্বরচরণে আসিবে । ইহা কিরূপ ? যদি মানুষ দিন দিন
 অধিক হইতে অধিকতর পাপেই ডুবিল, তবে আবাব পূর্ণ উন্নতি পূর্ণ সুখ
 পাইবে কিরূপে ?

মিশনারি—তা বুঝি জান না ? প্রভু বীণা যখন আবার আসিবেন,
 তখন শয়তানকে ধরিয়া এক অন্ধকার গহ্বরে বন্ধ করিয়া ফেলিবেন ।
 মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার কেহ থাকিবে না, সুতরাং মানুষ নিষ্পাপ
 হইবে ।

এই উত্তর শুনিয়াও আমি হাঁ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম ।
 পরে ইংলণ্ডবাসকালে একদিন সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড ষ্টপফোর্ড ক্রকের নিকট

এই কথার উল্লেখ করাতে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “ইহা তোমাদের পুরাণের মত একপ্রকার পুরাণ।”

জর্জ মুলারের দর্শন লাভ।—এই সমুদ্রযাত্রা কালের আর-একটা বিষয় স্মরণ আছে। আমবা যখন সিংহলের বাজধানী কলম্বো সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন গুনিলাম, ব্রিষ্টল অনাথাশ্রমেব প্রতিষ্ঠাতা জর্জ মুলার দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময়ে সেখানে আসিয়া এক হোটেলে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা শুনিয়াই তাঁহাকে দেখিবার জন্ত আমি সেই হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি দ্রুত করিয়া আমাকে দেখা দিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে কয়েক মিনিটমাত্র যাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই কয়েক মিনিট চিরস্মরণীয় হইয়া বহিয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি তৎপূর্বে তাঁহার প্রণীত “The Lord’s Dealings with George Muller” নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, এবং তদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, তিনি গুনিয়া আনন্দিত হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি সকল বিষয়েই প্রার্থন করেন?” তিনি বলিলেন, “আমাব একটা চাবি হারাইয়া গেলেও আমি তাহা পাইবার জন্ত ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি। জীবনেব এমন কোন বিভাগ নাই, কার্য্য নাই, যাতায় জন্ত সেই মুক্তিদাতা বিধাতার শরণাপন্ন হই না।”

আমি আব-একজন সাধু পুরুষের এই চাবি হারাইলে প্রার্থনার কথা শুনিয়াছি। তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় কালীনারায়ণ গুপ্ত। এই সাধু পুরুষের পরিবার-পরিজনের মুখে শুনিয়াছি, জীবনের এমন কোন কার্য্য ঘটিত না যাহাতে তাঁহাকে “ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম” শব্দ উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বর স্মরণ করিতে ও তাঁহার রূপা ভিক্ষা করিতে দেখা যাইত না। সন্তানগণ এমনও দেখিয়াছেন যে পিতার চাবি হারাইয়া গিয়াছে, তিনি চাবি খুঁজিতেছেন, কিন্তু মুখে “ওঁ ব্রহ্ম,

ও ব্রহ্ম”; ঈশ্বর স্মরণ করিতেছেন। ভক্ত মানুষের কার্য্যই স্বতন্ত্র। প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততার বিষয়ে বিচার তাঁহাদের নাই। সকল বিষয়ে সর্বাবস্থাতে প্রার্থনা তাঁহাদের প্রাণে লাগিয়াই আছে। সাধু জর্জ মূলারের মুখে সেই অকৃত্রিম ভক্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখিলাম। ঐরূপ মানুষকে জীবনে একবার দেখাও পরম লাভ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

কলিকাতায় ইংরাজ ও ফিরঙ্গী একেশ্বরবাদিগণের জন্য উপাসনা প্রবর্তন ।

ইন্দোরে প্রচারযাত্রা ; হোলকার । ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ।

নবীনচন্দ্র রায়ের মৃত্যু । মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রচার

যাত্রা । কালিকটে নাথুরী ব্রাহ্মণ ও নায়র । কোক-

নদায় দ্বিতীয় বার ; টাইফয়েড জ্বর ।

১৮৮২, ১৮৯০

কলিকাতায় ইংরাজ ও ফিরঙ্গী একেশ্বরবাদিগণের জন্য উপাসনা প্রবর্তন —আমি ক্রমে আসিয়া দেশে পৌছিলাম । আসার কিছুদিন পরে ইংলণ্ডের মিষ্টার ভয়সীর চর্চের সভ্য, মিষ্টার ব্রেকার নামে এক জন ইংরাজ ভদ্রলোক (যিনি কেলনার কোম্পানির অধীনে কোনও কন্ম করিতেন,) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লিখিলেন । তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া স্থির হইল যে কলিকাতাতে ইংরাজ ও ফিরঙ্গী একেশ্বরবাদীদিগের জন্য একটা উপাসকমণ্ডলী স্থাপন করা হইবে ; তাহাতে ইংরাজী ভাষায় উপাসনা হইবে, এবং উপাসনার ভার আমার উপর থাকিবে । তদনুসারে মিষ্টার ব্রেকার টাকা তুলিয়া লালদীঘির দক্ষিণবর্তী ড্যাংলহোসী ইনষ্টিটিউট রবিবার প্রাতের জন্য ভাড়া লইয়া উপাসনার বন্দোবস্ত করিলেন । আমি আচার্য্যের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম । আমি মিষ্টার ভয়সীর প্রকাশিত ও তাঁহার লণ্ডনস্থ উপাসনা-মন্দিরে ব্যবহৃত প্রার্থনাপুস্তক হইতে আরাধনা প্রার্থনা প্রভৃতি পাঠ করিতাম, এবং একটা উপদেশ লিখিয়া পড়িতাম । এ উপদেশের অনেকগুলি ইতিহাস মেসেঞ্জার কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে ।

মিষ্টার ব্রেকারের উপাসকমণ্ডলী ক্রমে ড্যালহৌসী ইনষ্টিটিউট হইতে নামা স্থানে ভদ্রলোকের বাড়ীতে বাড়ীতে উঠিয়া যায়, এবং কয়েক বৎসর নিয়ম-মত তাহার কার্য্য চলে। অবশেষে মিষ্টার ব্রেকার কার্য্য-গতিকে স্থানান্তরিত হওয়াতে তাহা উঠিয়া যায়। উপাসকমণ্ডলী চালাইয়া দেখিতে পাইলাম যে প্রধানতঃ যাহাদের জ্ঞাত তাহা স্থাপন করা হইয়াছিল, তাঁহারা বড় আসিতেন না। ইংরাজ বা ফিবিঙ্গী অল্পই আসিতেন; প্রধানতঃ এ দেশীয় বিলাতফেরত লোকেরাই যোগ দিতেন। বাজা হউক, তাহাও রহিল না।

ইন্দোরে প্রচারযাত্রা।—ইংলও হইতে দেশে পৌঁছিয়াই আমি খাবার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। অপরাপর কার্য্যের মধ্যে ইন্দোরে প্রথম প্রচারযাত্রা স্বরণ আছে। আমার বন্ধু নবীনচন্দ্র বায় তখন কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া খাণ্ডোয়াতে বাস করিতেছিলেন, সেখান হইতে তিনি রটলামে এক কর্ম্ম পান। আমি ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে ত্রীযুক্ত লছমন প্রসাদকে সঙ্গে লইয়া খাণ্ডোয়া ও রটলাম হইয়া ইন্দোরে গমন করি। সেখানে কতকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। ইন্দোরে আমি রাজ-অতিথিরূপে রাজার অতিথিশালাতে আশ্রয় পাই। আমার পরিচর্য্যার জন্ত চাকর-বাকর এবং বাতায়ানের জন্ত গাড়ী নিযুক্ত হয়।

ক্রমে আমি কার্য্য আরম্ভ করি। ইন্দোরে যেখানে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বাজপ্রতিনিধি (Resident) থাকেন, তাহা রেসিডেন্সী বিভাগ বলিয়া খ্যাত। এই রেসিডেন্সী বিভাগে অনেক ভদ্রলোকের বাস। আমার বান্ধববন্ধুগণ আমাকে রেসিডেন্সী বিভাগে একটা বক্তৃতা দিবার জন্ত অহুরোধ করেন। তাঁহাদের অহুরোধে আমি বক্তৃতা করিতে রাজি হই। তাঁহারা রেসিডেন্সী বিভাগে একটা হল স্থির করিয়া আমার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন বাহির করেন। এই মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের এক খণ্ড রেসিডেন্ট

সাহেবের হস্তে পতিত হয়। কে তখন রেসিডেন্ট ছিলেন, ভাল মনে নাই; বোধ হয় সার লেগেল গ্রিফিন। তিনি বিজ্ঞাপন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ শিবনাথ শাস্ত্রী কে?” উত্তরে শুনিলেন যে একজন বাল্মীকী ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক। তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “বাল্মীকীরা কেন এখানে আসে? এ বক্তৃতা এখানে হইতে পারিবে না।” অগত্যা তাড়াতাড়ি রাজার অধিকার-মধ্যে একটা স্কুলগৃহ স্থির করিয়া সেখানে বক্তৃতা করা হইল।

হোলকার।—তৎপরে আমি ও আমার বন্ধু লছমনপ্রসাদ ২৮শে নভেম্বর মহারাজা হোলকারের সহিত সাক্ষাৎ করি। যতদূর স্মরণ হয়, তিনি দিন ক্ষণ দেখিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং কাল পোষাক পরিয়া গেলে পছন্দ করিতেন না বলিয়া আমাদের সাদা কোট পরিয়া বাইতে হইয়াছিল। তিনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট সন্মান প্রকাশ করিলেন। আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ঋণশোধের সাহায্যার্থে ৪০০ শত টাকা এবং আমার ও লছমনের যাতায়াতের ব্যয়নির্বাহার্থ কিছু কিছু টাকা দিলেন। মহারাজা ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “জব্ব মৈনে সুন্য আপলোগোঁকে বীচুমে ঝগড়া হয়, তব মেরা দিল টুটু গয়া” অর্থাৎ যখন আমি শুন্লাম যে আপনাদের মধ্যে বিবাদ ঘটেছে তখন আমার আশা ভগ্ন হইয়া গেল। রাজার কথাগুলি এখনও আমার কর্ণে বাজিতেছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দুই এক বৎসর পরে আবার ইন্দোরে গিয়া শুনি যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাজার মন বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোনও সভাসমিতি হইতে দিবেন না বলিয়াছেন। শুনিলাম, রাজার ক্রোধ দেখিয়া আৰ্য্যসমাজ প্রভৃতি অনেক সভার মীটি বন্ধ হইয়াছে; কেবল ব্রাহ্মেরা তাঁহার বিরক্তি গ্রাহ্য না করিয়া উপাসনার্হ তাঁহাদের মন্দিরে নিয়মমত মিলিত হইতেছেন। ইহাতে স্নান্ধি

হোল্‌কার ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে তাঁহার ভবনে ডাকিয়া বলিয়াছেন যে তিনি তাহাদের মন্দির ভাঙ্গিয়া দিবেন! এক সময়ে তিনি ঐ মন্দির নির্মাণার্থ কয়েক সহস্র টাকা দিয়াছিলেন, এখন ঐ মন্দির ভাঙ্গিতে প্রস্তুত! আমি শুনিয়া ভাবিলাম, দেশীয় রাজার রাজ্যে বাস করাও বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থা।

সেবারে আব-এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে রাজার ব্রাহ্মাদেগের প্রাতি ঐ বিধেবুদ্ধি আরও প্রকাশিত হইল। সেটা দশহরার সময়। এই দশহরার সময় ইন্দোরাদিপতি পাত্রমিত্রসহ হস্তী আরোহণে সৈন্তে বাহির হইয়া থাকেন। বহুকাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এত দশহরা যাত্রার দিন আমি আমার বন্ধু সদাশিব পাণ্ডুরঙ্গ কেল্‌কারের সহিত যাত্রা দেখিতে গেলাম। রাজপথের উপর বিপুল জনতা হওয়াতে আমরা রাজপথ হইতে নামিয়া মাঠের মধ্যে দাড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; সেখানে ভিড় ছিল না। তৎপরাদিন হোল্‌কার মহারাজার পুত্রের শিক্ষক আমাদিগকে বলিলেন যে মহারাজা হোল্‌কার তাঁহাকে প্রহর করিয়াছেন, “আমি অমুক মাঠে কেল্‌কারের পার্শ্বে যেন পাণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে দেখিলাম; তিনি কি এখানে আসিয়াছেন?”

উত্তর—অজ্ঞে হাঁ, এখানকার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব চালাতেছে; সেই জন্য তিনি আসিয়াছেন।

হোল্‌কার—আমি পছন্দ করি না যে এইসব মানুষ আমার রাজ্যে আসে।

উত্তর—আজ্ঞে, তিনি ছই এক দিনের মধ্যেই চলিয়া যাইবেন।

পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই মহারাজাকে পদচ্যুত করিয়া বন্দিদশায় রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্রকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। রাজার অব্যবহিতচিত্ততা ও অতিরিক্ত প্রভুত্বপ্রিয়তা বোধ হয় তাহার কারণ।

ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়।—ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি যে কয়েকটা কার্যের সূত্রপাত করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একটি ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয় স্থাপন। অগ্রেই বলিয়াছি যে আমি ইংলণ্ডে বাসকালে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল দেখিয়াছিলাম, এবং শিক্ষাবিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থও কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেইগুলি পাঠ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন চিন্তা আমার মনে উদয় হয়। ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয় স্থাপন তাহারই ফল।

শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার সম্বন্ধে বহুকাল পূর্বের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা।—এ জাতীয় চিন্তা বহুদিন হইতেই আমার মনে ছিল। আমি যখন বি-এ ক্লাসে পড়ি, তখন একটা বিশেষ ঘটনাতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় নূতন চিন্তা আমার মনে প্রবেশ করে। সে ঘটনাটি এই। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ীতে গেলে বাবা আমাকে প্রতিনিধি দিয়া তাঁহার শিক্ষকতা-কার্য হইতে কিছুদিনের জ্ঞাত অবসর গ্রহণ করেন। একদিন আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াইতেছি, এমন সময় সর্বনিম্ন শ্রেণীর পণ্ডিত মহাশয় একটা চারি কি পাঁচ বৎসরের বালককে লইয়া ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া বলিলেন, “মহাশয়, এই ছেলেটাকে ‘পড়’ বলিলেই কঁাদে ; কি করি ?” আর বাস্তবিক দেখিলাম, ছেলেটার হুই চক্ষের দুইটা অশ্রুধারা পড়িয়া পেটের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাঁর চিহ্ন রহিয়াছে। আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল ; বলিলাম, “পড় বলিলেই কঁাদে ? আচ্ছা, ওকে আমার নিকট দিয়ে যান, আমি দেখি।” তিনি ছেলেটাকে আমার নিকট দিয়া গেলেন।

আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি আমার হাত ধরে আমার সঙ্গে বেড়াও ত।” সে আমার হাত ধরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমার যখন মনে হইল যে বেড়াইতে বেড়াইতে সে ভয়-ভাঙ্গা হইয়াছে, তখন তাহাকে তুলিয়া বেঞ্চের উপরে বসাইলাম। বসাইয়া নিজের অঙ্কুরি

দিয়া তার পেট টিপিতে লাগিলাম ; সে হাসিতে লাগিল । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বল ত, কি দিলে ভাত খেয়েছ ?” তখন সে ভাত, ডাল, চড়্‌চড়ি প্রভৃতি তরকারির উল্লেখ করিতে লাগিল ; কিন্তু মাছের নাম করিল না । আমি মনে করিলাম, খুব সম্ভবতঃ মাছ খাইয়াছে, কেবল নাম করিতে গুলিয়া যাইতেছে । বলিলাম, “তুমি আর-একটা জিনিস খেয়েছ, আমাকে বলছ না কেন ? তুমি মাছ খেয়েছ ।” তখন তার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল । সে মনে করিল, আমি পেটের বাহিরে অঙ্গুলি দিয়া মাছ খাওয়া ধরিলাম কিরূপে ? সে হাসিয়া বলিল, “তুমি জানলে কি করে ?” আমি বলিলাম—“আঁা থোকা, আমি পেটে আঙ্গুল দিলে মাছ াওয়া ধরতে পারি, তা বুঝি জানতে না ?”

এইরূপে যখন দেখিলাম সে একেবারে ভয়-ভান্ধা হইয়াছে, তখন তার বই খানা খুলিয়া তার সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, “দেখ, তুমি খায়্যাপ ছেলে, আর আমি ভাল ছেলে ।” সে জিজ্ঞাসা করিল “কেন ?” আমি উত্তর করিলাম, “আমি পড়তে পারি, তুমি পড়তে পার না ; এই দেখ আমি পড়ি ।” এই বলিয়া ক খ গ ঘ করিয়া পড়িয়া চলিলাম । সে আমাকে পড়িতে দেখে না, বলিল “আমিও পড়িতে পারি ।” আমি বলিলাম, “আচ্ছা পড় ।” তখন সে জোরে জোরে ক খ গ ঘ করিয়া পড়িয়া চলিল ।

অবশেষে আমি তাহাকে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে (তাহার ক্লাসে) লইয়া গেলাম । গিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, “দেখুন, আপনি বলছিলেন, ও ‘পড়’ বললেই কাঁদে, কিন্তু আমার কাছে ত বেশ পড়িল ।” চাহিয়া দেখি, পণ্ডিত মহাশয়ের পার্শ্বে একগাছি চেটাল বাঁকারি রহিয়াছে ; কোনও ছেলে না পড়িলে বা অবাধ্য হইলে তাহার পৃষ্ঠে, বা তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া তাহার পেটে, ঐ বাঁকারি পড়ে । আমি বলিলাম, “ও বাঁকারি দেখলে ওষ্ট বাবা হরত কীদে, ও ত কাঁদবেই । ও বাঁকারি আপনাকে কেলে দিতে হবে ।” তিনি বলিলেন, “তা হলে আর পড়াশোনা হবে না ।”

আমি বলিলাম, “আচ্ছা দেখুন, আপনার সম্মুখেই আমি পড়াই।” এই বলিয়া স্কুলের চাকরকে বলিলাম,—“একটা বড় মাছুর পেতে দে, আমাদের একটা খেলা হবে।” অমনি ক্লাসভুক্ত ছেলে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল, “দেখুন, কি খেলা হবে?”

আমি—রোসো না, দেখবে এখন, খুব মজার খেলা হবে।

তারপর মাত্র পাঁচ মিনিট হইলে সেই মাছুরে ছেলেদিগকে লইয়া বলিলাম। প্রথমে তাহাদেরই সর্বসম্মতিক্রমে একটা নিয়ম করিয়া লইলাম যে, খেলার মধ্যে যে দ্বুটামি বা গোল করিবে, তাহাকে খেলা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। শেষে খেলা আরম্ভ হইল। আমি স্নেটে লুকাইয়া লুকাইয়া একটা ঘোড়া আঁকিলাম। তাহার জিভ বাহির হইয়া আছে। শেষে তাহার জিভে “ক”, লেজের আগায় “খ”, পায়ের খুরে “গ”, এইরূপে বর্ণমালার অক্ষরগুলি লিখিলাম। শেষে সেই ঘোড়া যখন সকলের সম্মুখে বাহির করিলাম, তখন মহা হাস্তের রোল উঠিল। বাহাদের কিছু কিছু অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল, তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল, “ঘোড়ার জিভে ক, ল্যাঙ্গে খ”, ইত্যাদি। আর বাহাদের বর্ণপরিচয় হয় নাই, তাহারা বুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “কই ভাই, দেখি কেমন জিভে ক”, ইত্যাদি। দেখিতে দেখিতে তাহাদের বর্ণপরিচয় হইতে লাগিল। তৎপরদিন যেই স্কুলে প্রবেশ করিয়াছি, অমনি সর্বান্ন শ্রেণীর ছেলেরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বলিতে লাগিল, “পণ্ডিত মশাই, তুমি আমাদের ক্লাসে এস, আমাদের সঙ্গে খেলা করবে।”

এই ঘটনাটা আমার চিরদিন মনে রহিয়াছে। পরে হরিনাভিতে ও ভবানীপুরে যখন হেডমাষ্টারি করিয়াছি, তখন নিম্নশ্রেণীর মাষ্টারদিগকে ছেলেদিগকে ভুলাইয়া পড়াইবার উপদেশ দিয়াছি। ইংলণ্ডে গিয়া কিণ্ডারগার্টেন স্কুল দেখিয়া ঐ সকল ভাব আমার মনে আরও প্রবল হয়।

ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ের প্রথম কল্পনা।—ব্রাহ্মপাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে সর্বদা সমাজের মাঠে খেলিতে দেখিয়া মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ইহাদিগকে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা বিত্তালয়ে না পাঠাইয়া এদের জন্ত একটি ছোট স্কুল করা যাক। স্কুলটা তিন ঘণ্টা বসিবে, এবং কিণ্ডারগার্টেনের অনুরূপ প্রণালীতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ভাবিয়া প্রথমে কতকগুলি শিশু সংগ্রহ করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করা গেল। স্কুলটিতে বালিকাই অধিক জুটিল, সঙ্গে শিশু বালকও থাকিত। নাম রাখা গেল ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়। আমি নিজে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে বোর্ডের সাহায্যে ছবি আঁকিয়া পড়াইয়া দেখাইতাম, কেমন করিয়া পড়াইতে হয়। সে সময়কার কোন কোন শিক্ষক সেই সময় হইতে শিশুশিক্ষার একটা নূতন ভাব পাইলেন, এবং উত্তরকালে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে এই শিক্ষালয়টি বড় হইয়া উঠিল। ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি ইহাতে নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এবং তদনুরূপ আয়োজন কাবতেছিলাম। কিন্তু সমাজের সভ্যগণ ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিয়া ফেলিলেন, এবং শ্রেণ্য গুরুচরণ মহলানবিশের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বোর্ডিংকে ইহার সহিত যুক্ত করিয়া ইহাকে এক প্রসিদ্ধ বালিকা-বোর্ডিং-স্কুল করিয়া তুলিলেন। পরে আমি ইহার সহিত সাক্ষাৎ সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করিলাম।

নবীনচন্দ্র রায়ের মৃত্যু।—১৮২০ সালের আগষ্ট মাসে একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটে। আমার প্রজ্ঞাপন্ন বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় কলিকাতাতে একটি বাসভবন নির্মাণ-কার্য শেষ করিবার জন্ত আমার ভবনে আসিয়া বাস করেন। ঐ কার্যের তত্ত্বাবধানের জন্ত তাঁহাকে গুরুতর শ্রম করিতে হয়। তন্নিম্ন তাঁহার চিরদিন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাসের অভ্যাস ছিল,

তঁাহার আহাঙ্গাদির নিয়ম স্বতন্ত্র ছিল, তাহা আমাদের ভবনের নারীগণ জানিতেন না ; নবীন বাবুও স্বাভাবিক হীণীলতাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু বলিতেন না । এতদ্বিধ বোধ হয় তঁাহার অপর কোনও উদ্বেগের কারণও ছিল । যাহা হউক, তিনি আমার ভবনে গুরুতর রক্তমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন । তখন খাণ্ডোয়া হইতে তঁাহার পরিজন-দিগকে আনা হয় এবং তঁাহার ইচ্ছানুসারে তঁাহাকে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত করিয়া চিকিৎসা করা যায় । এই রোগশয্যাতে সেই সাধু-পুরুষের যে ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহা চিরদিন মনে মুদ্রিত রহিয়াছে । যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এ যাত্রা আর বাঁচিবেন না, তখন প্রথম প্রথম দেখা গেল যে তঁাহার পত্নী নিকটে গিয়া বসিলেই তঁাহার মন আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠে ও চক্ষে জলধারা পড়ে । বোধ হয় ভাবেন, তঁাহার মৃত্যুর পর তঁাহার পত্নীকে কে দেখিবে । দুই তিন দিন পরে সে ভাব চলিয়া গেল, চিত্ত ও মুখ প্রশান্তভাবে ধারণ করিল । তখন পত্নী নিকটে গিয়া কাঁদিলে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমার দিকে দেখাইয়া দিতেন, এবং আর সংসারের কথা শুনাইতে বারণ করিতেন । এই অবস্থায় একদিন একজন ব্রাহ্ম যুবক আসিয়া বলিলেন, “আপনাকে একটা গান শুনাইতে চাই ; কোন্ গানটা করিব ?” নবীনচন্দ্র বলিলেন, “ঐ যেই দেখা যায় আনন্দ ধাম” এই গানটা করুন । সে গানটি এই—

“ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম,

অপূর্ব শোভন, ভবজলধির পারে, জ্যোতির্ময় !

শোকতাপিত জন সবে চল, সকল দুখ হবে মোচন ;

শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে ।

কত যোগীন্দ্র ঋষিযুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন !

স্তিমিত-লোচন কি অমৃতরসপানে ভুলিল চরাচর ।

কি সুধাময় গান গাইছে সুবগণ, বিমল বিভূষণ বন্দনা।

কেটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিবাম।”

এই সংগীত যখন হইতে লাগিল, তখন দর-দর ধারে নবীন বাবুর চক্ষে প্রেমাস্র বিগলিত হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল এক অপূর্ণ জ্যোতিতে পূর্ণ হইল। আমরা কি দেখিলাম।

নবীনচন্দ্রে এমন কিছু ছিল, বাহা দেখিয়া স্বদেশী বিদেশী সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা কবিতে বাধ্য হইত। শুনিয়াছি, এই বিবরণ যখন কাগজে বর্ণিত হইল, তখন তাহা দেখিয়া খাণ্ডোয়াব ডেপুটী কমিশনার সাহেব নাক বলিয়াছিলেন, “আমি বিশ্বাস কবি, নবীনচন্দ্র স্বচক্ষে স্বর্গধাম দেখিয়াছিলেন।”

যাত্রা হউক, ইতার পর যে দুই দিন তিনি বাচিয়া ছিলেন, সে দুই দিন কেবল স্বীয় পত্নীকে সাহসনা দিবাব প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পত্নীকে বলিলেন, “মহবৎসে মিল্কর হমেশা য়হাঁ রহ্না”, অর্থাৎ প্রমে মিলিত হইয়া চিরদিন ইহাঁদেব কাছে থাকিও। এই তাঁর স্ত্রীর প্রতি শেষ উপদেশ। ইহাঁব শেষ শ্বাস যখন যায়, তখন আমরা ভগবানের নাম কীর্তন কবিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি হাত দুইখানি জুড়িয়া বক্ষে উপরে ঝুইলেন, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। পবিত্র-পরিজনকে দেখিবার ভার আমার উপর দিয়া গেলেন।

মাস্ত্রাজ প্রদেশে প্রচার যাত্রা।—নবীনচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর আমি একবার ধর্ম প্রচারার্থ মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীতে গমন করি। ৪ঠা অক্টোবর ১৮৯০ মাস্ত্রাজ পহুছিয়া তথা হইতে ১৪ই অক্টোবর কোইম্বাটুর, ও ২১শে অক্টোবর পশ্চিম মালাবার উপকূলস্থিত কালিকট নগরে বাই। কালিকটে গিয়া বাহা শুনিলাম তাহাতে আশ্চর্য্যবিত হইয়া গেলাম। সেখানে প্রবাদ যে মালাবার উপকূলে স্বয়ং পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগের রাজত্ব

স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে নান্দুরীসম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণগণের অসীম প্রভুত্ব। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের নাম নায়র। নায়রগণ বোধ হয় আদিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত এদেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন। নায়রগণের বীরত্বের অনেক কথা শুনিলাম।

কালিকটে নান্দুরী ব্রাহ্মণ ও নায়রদিগের সামাজিক প্রথা।— সেখানে কতকগুলি প্রথা দেখিলাম, যাহা অতীব বিস্ময়জনক। প্রথম দেখিলাম, ব্রাহ্মণ বা গুরুজনদিগকে দেখিলে নায়র বা শূদ্র স্ত্রীলোকদিগকে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিতে হয়। শুনিলাম, তাহা ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদিগের প্রতি সম্মম প্রকাশের চিহ্ন! এ সম্বন্ধে একটী গল্প শুনিলাম। একবার টিপু সুলতান নাকি উপহাসচ্ছলে একজন নায়র পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “নায়র যুবতীদের বক্ষঃস্থল অনাবৃত কেন? লোকে ত অপমান করিতে পাবে।” তৎক্ষণে নায়র পুরুষ বলিলেন, “নায়রদের স্ত্রীগণের বক্ষঃ অনাবৃত, পুরুষদের তববারিও অনাবৃত।” নায়রদিগের বীরত্ব-খ্যাতি আছে।

দ্বিতীয় সামাজিক নিয়ম যাহা দেখিলাম, তাহা একটী ঘটনাদ্বারা প্রকাশ করিতেছি। একদিন অপরাহ্নে একজন ব্রাহ্মণ বন্ধুর সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, পশ্চিমদিকে দেখিলাম, একজন নিম্নশ্রেণীর লোক আসিতে আসিতে দশ বার হাত দূরে দাঁড়াইয়া গেল এবং কি বলিল। আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “ও আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে, এই জন্য দাঁড়াইয়া আমাকে সতর্ক করিতেছে, যেন উহার বাতাস বা ছায়া আমার গায়ে না লাগে; ইহাই আমাদের সামাজিক প্রথা। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে পথে ব্রাহ্মণ দেখিলে ঐরূপ করিতে হয়।” আমি ঐরূপ সামাজিক শাসন আখ্যাবর্তে কখনও দেখি নাই; দেখিয়া দাক্ষিণাত্যে জাতিভেদ প্রথা যে কতদূর গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম।

তাহার পর বাহা গুনিলাম, বাহা অতীব বিস্ময়জনক। তাহা এই। গুনিলাম, নায়র ও শূদ্র বালিকাদের বিবাহ নাই। বিবাহের বয়স হইলে স্বজাতীয় একটা বালকের সঙ্গে একদিন নামমাত্র বিবাহ হয়, একটা খাওয়া-দাওয়া হয়, কিন্তু তাহা বিবাহ বলিলে বাহা মনে হয় তাহা নহে, বিবাহের পরদিন হইতে তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ রহিত হয়। তৎপর কত্কা মাতৃভবনেই থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আত্মীয় স্বজন একজন ব্রাহ্মণ বককে আনিয়া তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দেন, এবং সেই ব্যক্তিই পরকৃত পতি হইয়া দাঁড়ায়। রমণী মনে করিলে তাহাকে পরিবর্তন করিতে পাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি কার্যতঃ পতি হইলেও সম্মানদিগের সম্বন্ধে তাহার কোনও দায়িত্ব থাকে না। সে দায়িত্ব তাহাদের মাতুলের উপর থাকে, তাহারা মাতুলেরই ধনের অধিকারী হয়।

একদিকে যেমন এই নিয়ম, অপরদিকে নান্দুরী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আর-এক অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম পুত্র বংশরক্ষার জন্ত বিবাহ করে, অপর পুত্রেরা বিবাহ না করিয়া নায়র ও শূদ্রজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত এবং আবশ্যক হইলে একাধিক শূদ্র রমণীর সহিত সংগত হইবার জন্ত থাকে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে অনেক ব্রাহ্মণকন্তাকে পতি অভাবে চিরকৌমার্য্য ধারণ করিতে হয়। নায়র নাবীদিগের সহিত নান্দুরী ব্রাহ্মণদিগের মিলিত হওয়া সেদেশে একরূপ স্বাভাবিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একদিন একজন নায়র ভদ্রলোক আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, “আমার এই দেহে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে”!

কোকনদায় দ্বিতীয়বার ও গুরুতর পীড়া।—কালিকট হইতে পুনরায় কোইম্বাটুর গমন করি, ও তৎপর ত্রিচিনপল্লী ও বাঙ্গালোর হইয়া ৩০শে অক্টোবর মাস্ত্রাজে ফিরিয়া আসি। তথার কিছুকাল থাকিয়া বেজগুদা, মঙ্গলিপটম ও রাজমহেন্দ্রী হইয়া ১৮ই নভেম্বর কোকনদাতে

যাই। এই আমার কোকনদার দ্বিতীয়বার গমন। সেখানে গিয়া ২০শে নভেম্বর গুরুতর পীড়াতে আক্রান্ত হই। পরে শুনিয়াছি, তাহা টাইফয়েড অর। জরের সহিত রক্ত দাস্ত ও মাথায ঘ্রাণ আরম্ভ হয়। কোকনদার বন্ধুগণ প্রথমে আমার জন্য একটা বাড়ী স্থির করিয়া সেই বাড়ীতে আমাকে রাখিয়াছিলেন। অপর একস্থান হইতে দুইবেলা আমার খাবার পাঠাইয়া দিতেন। পীড়া বধন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল তখন তাঁহারা বঁড়ই চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান কোকনদা স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন এবং সপরিবারে স্কুল-ভবনে বাস করিতেন। অবশেষে তিনি দয়া করিয়া আমাকে স্কুলভবনে লইয়া গেলেন এবং চিকিৎসা করাইতে আরম্ভ করিলেন।

আমাব শুশ্রূষাব ভার ব্রাহ্মসমাজাধ্যক্ষগণী কতিপয় যুবকের প্রতি ছিল। কিন্তু তাঁহারা তখনও হিন্দুসমাজসংস্ঠ আছেন। তাঁহারা সমাজ-ভয়ে আমাকে খাওয়ান খোয়ান প্রভৃতি কার্য সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সেজন্ত একজন মেথবজাতীয় স্ত্রীলোক রাখা হইয়াছিল, সে খোঁড়া ও দুর্বল, সে আমাকে তুলিয়া পান্থখানায় লইবার সময় প্রায় ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিত। একদিন তার কঠিন হস্তে বন্দী হইয়া টলিতে টলিতে আমি বলিয়া উঠিলাম, "I see my career is going to end in the arms of a sweeter woman", অর্থাৎ "একজন মেথরানীর বাহুপাশেই বা আমার জীবন শেষ হয়।" যেই এই কথা বলা, অমনি দেখি, একজন ব্রাহ্মণ যুবক আপনার গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া, পৈতা কোমরে শুঁজিয়া বলিল, "লোকে যা করে করবে, আপনাকে একরূপ লাহিত হতে কখনই দেব না।" এই বলিয়া সে দৌড়িয়া আসিয়া মেথরানীকে সরাইয়া আমাকে বুকে করিয়া ধরিল, এবং তদবধি প্রত্যাধিক যত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার প্রেম আমি কখনই ভুলিব না।

এই পীড়ার সময়ের তিনটি বিষয় আমার স্মৃতিতে রহিয়াছে। প্রথম, আমার শারীরিক ধাতুর দুর্বলতা এত অধিক হইয়াছিল যে পড়িয়া পড়িয়া আমার মনে হইত যেন কে আমার সমগ্র শরীরের উপর দিয়া একখানা সীসা বা টস্পাতের পাত বুলাইতেছে! দ্বিতীয় বিষয়টি অতি আশ্চর্য্য। আমি দারুণ মাথার যন্ত্রণায় অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় অচেতনপ্রায় আছি, হঠাৎ ঘণ্টার শব্দের শ্রাব্য কি শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমার বোধ হইল যেন ঘণ্টার শব্দটি ক্রমশঃ আমার নিকটস্থ হইতেছে। সে দিকে মনোনিবেশ করিবামাত্র যেন বহু বহু লোকের সম্মিলিত সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীতে সর্বদা ইংরাজীতে কথা কহিতাম, সুতরাং ইংরাজীতে বলিলাম, “Where is that noise from?” অমনি এক নারীর স্বর শুনিলাম (আমি মনে করিলাম, তিনি ঘণ্টা বাজাইতেছিলেন); তিনি বলিলেন, “That’s the anthem of the immortals.” অর্থাৎ উহা অমরদিগের বন্দনাধ্বনি।

আমি—In what language is it? অর্থাৎ, কোন্ ভাষাতে ঐ সংগীত হইতেছে?

নারী—Have the immortals any language? Those are thoughts.—অর্থাৎ, অমরদিগের কি ভাষা আছে? ও-সকল চিন্তা।

আমি—But I notice a tune.—অর্থাৎ, কিন্তু আমি যেন কি একটা সুর লক্ষ্য করিতেছি।

নারী—That’s the tune of the universe,—harmony. অর্থাৎ, উহা এই ব্রহ্মাণ্ডের সুর, উহার নাম মহাবোগ।

ইহা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, অমরগণের চিন্তা মহাবোগে এক হইয়া বাজিয়া উঠিতেছে। তৎপরে প্রশ্ন করি, আর সে নারীকণ্ঠের উত্তর নাই। তখন আমি ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছি, এমন

সময়ে দেখিলাম, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন। এরূপে মৃতব্যক্তির স্বপ্ন আমি প্রায় দেখি না ; কেন জানি না, আমার পরমাত্মীয়দিগকেও স্বপ্নে দেখি না। কিন্তু এবারে আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে দেখিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, “দেখ, পৃথিবীতে থাকতে কত ভুল করা যায়, পরস্পরকে চিন্তে পারা যায় না। যা হোক, তুমি এস, তোমাকে রামমোহন রায়ের কাছে নিয়ে যাই।” আমি যেমন উঠিব, অমনি ঘুম ভাঙিয়া গেল, চেতনা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তৎপরে দুই তিন দিন জাগ্রত অবস্থাতেও সেই মহারোল ও অমরদিগের গাথা শুনিতে লাগিলাম।

তৃতীয় ঘটনাটাও আশ্চর্য্য, ইহা পরে শুনিয়াছি। আমি যখন কোকনদাতে শয্যা পড়িয়া মা মা করিয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম, তখন না-কি আমার মাতাঠাকুরাণী গ্রামের বাড়ীতে পিতাঠাকুর মহাশয়কে অস্থির করিয়া তুলিলেন, “তুমি কলকাতাতে যাও, ও তার খবর আন। আমার মন কেন অস্থির হচ্ছে ?” বাবা রাগ করিয়া সহরে আসিলেন ; আসিয়া গুরুচরণ মহানবিশ মহাশয়ের নিকট গিয়া শুনিলেন, আমার গুরুতর পীড়া।

যাহা হউক, আমার গুরুতর পীড়ার কথা শুনিয়া কলিকাতার বন্ধুগণ ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার (আমার বর্তমান জামাতা), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শশিভূষণ বসু, 'আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী, ও আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা, এই চারিজনকে কোকনদাতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা গিয়া চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা দ্বারা আমাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। ২০শে ডিসেম্বর আমার অরত্যাগ হইল, ও ২৬শে ডিসেম্বর আমি তাঁহাদের সঙ্গে কলিকাতা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

সাধনাশ্রম । ব্রাহ্ম-বালক-বোর্ডিং । উপাসকমণ্ডলীর স্থায়ী আচার্য্য ।

গ্রন্থ রচনা । পুত্র ও কন্যাগণের বিবাহ । পত্নী প্রসন্নময়ীর

স্বর্গারোহণ । বহুমূত্র রোগের আক্রমণ । ১৯০৪

সালে শেষবার সমগ্রভারত ভ্রমণ । অন্ধ

কন্ফারেন্সের সভাপতি । ১৯০৭

সালে গুরুতর পীড়া ।

(১৮৯১-১৯০৮)

সাধনাশ্রম ।—১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করি । ১৮৯১ সালে আমি সহরের ভিতর হইতে উঠিয়া গিয়া বালিগঞ্জে বাসা করিয়াছিলাম । উঠিয়া বাহবার কারণ এই । কিছুদিন হইতে আমার মনে কি একপ্রকার অবসাদের ভাব আসিয়াছিল, আমার নিজের কাজকর্মের প্রতি ও সমাজের কাজকর্মের প্রতি কেমন একপ্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল । কিছুই ভাল লাগিত না ; মেজাজ খারাপ হইয়া যাইতেছিল । সামান্য কথাতে বন্ধুবান্ধবের প্রতি, পরিবার-পরিজনদের প্রতি বিরক্ত হইতাম । অবশেষে মনে হইল সহর হইতে একটু দূরে থাকাই ভাল । তাই বালিগঞ্জে একটা বন্ধুর একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া গিয়া বাস করিলাম । এখানে প্রায় প্রতিদিন প্রাতে এক নির্জন বাগানে গিয়া বসিয়া চিন্তা করিতাম । এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল যে, যাহারা ব্রাহ্মধর্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ব্রাহ্মসমাজ ও জনসমাজের সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিবেন, এবং বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবার ভাবের দ্বারা অহুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিবেন, এরূপ একটা ঘনিষ্ঠ সাধকমণ্ডলী গঠন করার

প্রয়োজন। তত্ত্বিন্ন ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগিবে না। বিদ্বাসী ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন মানুষই ধর্মসমাজের বল। একরূপ মানুষ প্রস্তুত না হইলে ধর্মসমাজের শক্তি জাগে না। এই ধারণা মনকে এমন করিয়া ধরিয়া বসিল যে দিনরাত্রি চিন্তাকে অধিকার করিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৯২ সালের মাঘোৎসবের সময় মনে সংকল্প জাগিল যে একরূপ একটা সাধকমণ্ডলী প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই বিষয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে হৃদয়ে সেইরূপ প্রেরণা আসিল। ঐ বৎসর আমার জন্মদিনের পূর্বে (অর্থাৎ ৩১শে জানুয়ারির পূর্বে) সেই সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। প্রস্তাবিত আশ্রমের উদ্দেশ্য ও ভাব একখানি কাগজে লিখিয়া বন্ধুবর আনন্দমোহন বন্ধুকে দেখাইলাম। তিনি হৃদয়ের সহিত উৎসাহ দিলেন। তৎপরে ৩১শে জানুয়ারি আমার জন্মদিন হইয়া গেল। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৯২, ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনের সিটি স্কুলবাড়ীর একটা ঘর চাহিয়া লইয়া কতিপয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনাপূর্বক আশ্রম স্থাপন করিলাম।

সেইদিন ঠাঁহার উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ময়মনসিংহের ত্রীব্রত গুরুদাস চক্রবর্তী একজন। তিনি ঐ কাগজ পড়িয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং আপনাকে ঐ কার্যের জন্ত দিবার নিমিত্ত কণ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন ময়মনসিংহ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে তখন বিনামূল্যে দেওয়া গেল। কিন্তু তিনি গিয়া বারবার পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার কিছু ঋণ ছিল। অবশেষে সেই ঋণ শোধ করিবার জন্ত তাঁহাকে টাকা দিয়া, তাঁহাকে আসিতে বলিলাম।

অগ্রদূতের আশ্রম উপায়ে আশ্রমের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে লাগিলেন। 'আমি একটা ছেলের হাতে তিকার খুলি পাঠাইতাম'।

তাহাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোকে যাহা দিত তাহা দ্বারাই সমুদয় ব্যয় চলিয়া যাইত। গুরুদাস সর্বত্যাগী হইয়া আসিলেন। তৎপরে ত্রীমুক্ত কানীচন্দ্র ঘোষাল নামে বিক্রমপুরের একজন ব্রাহ্ম তাঁহার ছুতার দোকান তুলিয়া দিয়া আসিলেন। ক্রমে ক্রমে আরও অনেকে আসিলেন। ইহার মধ্যে অনেকে আবার চলিয়া গিয়াছেন। আশ্রম ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে থাকিয়া অবশেষে সমাজ পাড়াতে সমাজের নিম্নিত প্রচারক-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং অত্যাধিক সেইখানেই আছে।

“আশ্রমের ইতিবৃত্ত” নামে একখানি হস্তলিখিত পুস্তক আছে, তাহাতে ইহার অনেক আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া এখানে আব অধিক লিখিলাম না। কেবল কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আশ্রম যখন স্থাপিত হইল, তখন আমার হাতে একটা পয়সা ছিল না। এমন কি, বলিয়া লিখিবার জন্য যে একখানি চেয়ার ও ডেস্ক কিনি, সে পয়সারও অভাব ছিল। অথচ আশ্রম স্থাপনের উপাসনাতে যে-সকল বন্ধু আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাছেও কিছু চাহিলাম না। মনে এই ভাব ছিল, এ কার্য যদি জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হয়, সাহায্য আপনি আসিবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা চলিবে। আশ্চর্যের বিষয় এই, দুই দিন যাইতে না যাইতে ইংলণ্ড হইতে প্রফেসার ফ্রান্সিস নিউম্যানের প্রেরিত ১৫০ পনের টাকা আসিয়া উপস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন, “তুমি ব্রাহ্মসমাজের যে কাজে ব্যয় করিতে চাও, করিয়ো।” তাহা দিয়া একটা ডেস্ক, একখানি চেয়ার ও অত্যাধিক যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল, তাহা কেনা হইল। এই ভাবাপন্ন হইয়াই, যে রানকটার হাতে বাড়ীতে বাড়ীতে বাল্ল পাঠাইয়াছিলাম, তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম, “কাহারও নিকট বিশেষ ভাবে কিছু চাহিবে না। কেবল বাল্লটী লইয়া বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া দাঁড়াইবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া

মিনি বাহা দিবেন লইবে।” এইরূপ করিয়াই চারিদিক হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল।

আশ্রমসংক্রান্ত আর একটি ঘটনা চিরস্মরণীয়। ১৮৯২ সালে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালের মাঘোৎসবে ১২ই মাঘ সাধনাপ্রমের উৎসবের দিন ছিল। উপাসনা-কার্য্য নির্বাহের জন্ত আমরা মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করি। তিনি দয়া করিয়া সম্মত হন। তিনি সংক্ষেপে উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বেদী হইতে অবতরণপূর্ব্বক চলিয়া গেলে, ক্রিয়ৎক্ষণ আমাদের প্রার্থনাদি চলিতে থাকে। সে দিন এইরূপ একটি ভাবের আবির্ভাব হইল যে, সমাগত বহুগণের নিকট দানের উপযুক্ত যে কিছু ছিল, সকলে আশ্রমের জন্ত দান করিতে লাগিলেন। এমন কি, অবশেষে চারিদিক হইতে আমার মস্তকের উপর পুরুষদিগের গায়ের শাল, দামী পট্টিবস্ত্র, মহিলাদের বালা, চুড়ী, গলার হার, প্রভৃতি পড়িতে লাগিল। তাহা বিক্রয় করিয়া পরে অনেক শত টাকা হইয়াছিল।

এইরূপ স্বতঃপ্রযুক্ত দানের দ্বারা সাধনাপ্রম চিরদিনই চলিয়া আসিয়াছে। সাধনাপ্রমের ইতিবৃত্ত দেখিয়া বহুগণ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিবার যথেষ্ট কারণ পাইবেন। তিনি যে ইহার অর্থাভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছেন, কেবল তাহা নহে; ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে-চারিজনকে এ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপনাদের প্রচারক-পদে বরণ করিয়াছেন।

আর একটি স্মরণীয় ঘটনা, একবার আমি সাধনাপ্রমের কার্য্যভার আশ্রমের একজন পরিচারকের প্রতি দিয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ লাহোরে গিয়াছিলাম। সেখানে সন্ধান পাইলাম, আশ্রমে মহা অর্থকষ্ট উপস্থিত। দিনে ২১০ আনা মাত্র বাজার হইতেছে। যে রবিবার প্রাতে এই সন্ধান



পাটলাম, সেইদিন তথাকার এক ব্রাহ্ম বন্ধুর ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আহার করিতে বাইবার সময় সন্দের একটা ব্রাহ্ম বন্ধুকে বলিলাম, “আজ আমার নিমন্ত্রণ খেতে উৎসাহ হচ্ছে না। কলিকাতার আশ্রমে খারা আছেন, তাঁদের বাজারের পরসা নাই, আর আমি এখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াচ্ছি, এ ভাল লাগছে না। কিন্তু কি করি, কথা দিয়েছি, না গেলে নয়।” এই বলিয়া কোন প্রকারে গিয়া আহার করিয়া আসিলাম। সন্ধ্যাকালে লাহোর মন্দিরে উপাসনার কার্য্য আমাকে করিতে হইল। উপাসনান্তে আমি বেদী হইতে নামিয়াছি, এমন সময় একজন আসিয়া আমাকে বলিলেন যে একটা পাঞ্জাবী বড় ঘরের মেয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত মন্দিরের পশ্চাতের ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি গিয়া দেখি, তিনি একজন বড়লোকের পুত্রবধূ; তাঁহার পতি কিছুদিন পূর্বে হইতে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া গলবস্ত্রে আমার চরণে প্রণত হইলেন, এবং আমার পায়ে একশত টাকার নোট রাখিয়া বলিলেন, “আপনার স্থাপিত আশ্রমের সাহায্যার্থে দান।” তৎপরদিনই সেই টাকা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলাম।

ব্রাহ্ম-বালক-বোর্ডিং।—এই কালের মধ্যে আর-একটা কাজে হাত দেওয়া গিয়াছিল, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই। যে সময়ে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সমকালেই সীতানাথ মন্ডী নামে এক ব্রাহ্ম-যুবক আমার নিকট ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্ত একটা বোর্ডিং স্থল স্থাপনের আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। আমি বলি, “তোমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আমি পশ্চাতে আছি।” তিনি বলেন, “আপনি যদি সম্পাদক বলিয়া নাম দেন, তাহা হইলে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।” আমি সম্পাদকরূপে নাম দিতে স্বীকৃত হই, এবং ঐ কার্য্যের দায়িত্ব নিজের শিরে গ্রহণ করি। সীতানাথের তত্ত্বাবধানে বোর্ডিং স্থাপিত হয়। ক্রমে

অনেকগুলি বালক জোটে। ছুঃখের বিষয়, ইহার অন্নদিন পরেই সীতানাথ নন্দীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি বোর্ডিঙের ভার সাধনাশ্রমের পরিচারক গুরুদাস চক্রবর্তীর প্রতি অর্পণ করি। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী নামক একজন পূর্ববঙ্গীয় যুবক আসিয়া আশ্রমে বোগ দেন, এবং ব্রাহ্মবালক বোর্ডিঙে গুরুদাস বাবুর সহকারী হন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে বোর্ডিং কিছুদিন চলে। তৎপরে গুরুদাস বাবু প্রভৃতি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আরাতে ও সেখান হইতে বাকিপুরে গমন করেন এবং সেখানে শাখা-সাধনাশ্রম স্থাপন করেন। তখন ব্রাহ্মবালক বোর্ডিঙের ভার শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয়। অনেক বালকের দেয় অনাদায় থাকাতে গুরুদাস বাবুর বাজারে প্রায় ৫০০ পাঁচশত টাকা দেনা রাখিয়া যান, তাহা আমাকে দিতে হয়। মহলানবিশ মহাশয়ের হাতে সে বোর্ডিংটি উঠিয়া যায়। কিন্তু তিনি আবার একটা ব্রাহ্মবালক বোর্ডিং ও স্থল স্থাপন করিয়াছেন, এবং অতীবধি চালাইতেছেন।

উপাসকমণ্ডলীর দায়ী স্থায়ী আচার্য্য :—আমার এই সময়ের আর একটা বিশেষ কাজ, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলীর উন্নতিসাধন। বরাবর উপাসকমণ্ডলীর কাজ এইভাবে চলিয়া আসিতেছিল যে, সম্পাদক এক এক সপ্তাহে এক এক জনকে উপাসনা করিতে অনুরোধ করিতেন; তিনি উপাসনা করিতেন। আমরা এই ভাবেই উপাসনা করিয়া আসিতেছিলাম; তাহাতে কিছুই জন্মিতেছিল না। পরে ১৮৯৬ কি ১৮৯৭ সালে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক হন। তিনি অল্পভব করিতে লাগিলেন যে খ্রীষ্টীয় সমাজের pastoral system প্রবর্তিত করিতে না পারিলে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে না। আমার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করাতে আমি হৃদয়ের সহিত সে কার্যে সহায় হইলাম, এবং প্রথম দায়ী স্থায়ী আচার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম। আচার্য্যের ও উপাসকগণের ব্যবহারার্থ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী নামে একটা লাইব্রেরী

স্থাপিত হইল। আমি আমার আপিস তাহাতে স্থাপন করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতে লাগিলাম। প্রতি সপ্তাহে নিখিয়া উপদেশ দিতাম, এবং সেই উপদেশ পরে ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইত। সেই উপদেশগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়া “ধর্ম্মজীবন” নামে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিকে আমার আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্ম্মজীবনের পরিণত ফল বলিলে হয়।

কিছুদিন পরে শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্ত আমাকে দায়ী আচার্য্যের কাজ ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে বাইতে হয়। উপাসকমণ্ডলীর কাজ আবার পূর্ববৎ দাঁড়াইয়াছে। সেটা একটা দুঃখের বিষয়।

ইহার পরে এই সময়ের মধ্যে আর নূতন কাজে হাত দিই নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধনশ্রমের কাজ ও উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের কাজ, এই দুই কাজই প্রধান কাজ থাকিয়াছে। ১৮৯৮ সালে শরীরের স্বাস্থ্যের জন্ত চন্দননগরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটা বাড়ীতে গিয়া থাকি। সেখান হইতে রবিবার কলিকাতার আসিয়া মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিতাম, এবং সমাজের অন্যান্য কাজে সাহায্য করিতাম। ১৮৯৯ সালের শেষে কলিকাতার ফিরিয়া আসি।

গ্রন্থ রচনা।—এই কালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আর-একটা এই। এই সময়ের মধ্যে আমার মন্দিরের উপদেশ “ধর্ম্মজীবন” বাতীত, “বৃগাস্ত্র” ও “নয়নতারা” নামে দুইখানি উপজ্ঞাস, ও “মাহোৎসবের উপদেশ, ও বক্তৃতা,” প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তন্মিত্ত “রামতল্লা নাছিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” নামে একখানি গ্রন্থ, এক আমার রচিত প্রবন্ধসকল সংগ্রহ করিয়া “প্রবন্ধাবলী” নামে এক গ্রন্থ মুদ্রিত করি

জ্যোতী কস্তা হেমলতার বিবাহ।—এই কালের মধ্যে ১৮৯৩ সালে আমার জ্যোতী কস্তা হেমলতার বিবাহ হয়। ডাক্তার বিপিনবিহারী

সরকার, যিনি কোকনদাতে পীড়ার সময় আমার চিকিৎসার জন্য সমাজের বন্ধুগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি আমার পীড়ার সময় হেন্ডের সহিত পরিচিত হন। সেই পরিচয় ক্রমে দাম্পত্য প্রেমে পরিণত হয়, এবং অবশেষে তিনি হেমকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এবং আমার অনুমতি পাইয়া তাঁহার বিবাহিত হন।

কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীর বিবাহ।—এই কালের মধ্যে আমার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীও বিবাহিতা হয়। সাধনাশ্রমসংস্থ কুঞ্জলাল বোষ নামক একজন যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হয়। দুঃখের বিষয় ইহার পর সুহাসিনী বহুদিন বাঁচিয়া থাকে নাই। ১৮৯৯ সালে বিবাহিতা হইয়া ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ঐ সালের ১৫ই নবেম্বর দিবসে গতান্ব হয়।

পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ।—১৯০১ সালের গ্রীষ্মকালে আমার পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ হয়। ঐ বিবাহ কটকের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম বন্ধু মধুসূদন রাওর দ্বিতীয়া কন্যা অবস্খী দেবীর সহিত হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ অল্প পর্যা্যন্ত একটা পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে।

পত্নী প্রসন্নময়ীর স্বর্গারোহণ।—১৯০১ সালের ৩রা জুন প্রসন্নময়ী স্বর্গারোহণ করেন। তৎপূর্বে বহু বৎসর তিনি গুরুতর বহুমূত্র রোগে ক্লেশ পাইতেছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি পরলোকগত রামকুমার বিজ্ঞারত্ন ভায়ার মাতৃহান সর্বকনিষ্ঠা কন্যা রমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স এক বৎসর। তাহাকে লগুয়ার কিছুদিন পরেই তাহার গুরুতর রক্তামাশয় রোগ জন্মে। সেই সময় রাজি জাগরণ ও দুর্ভাবনাতে প্রসন্নময়ীর বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হয়। তদবধি তাঁহাকে স্বাস্থ্যের জন্য নানাস্থানে প্রেরণ করা হয়। কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে ১৯০১ সালের জুন মাস হইতে অল্পলিতে ক্ষত হইয়া তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

বহুমূত্র রোগের আক্রমণ — প্রসন্নময়ী চলিয়া গেলেন। এদিকে সেই বৎসরেই আমাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি নির্বাচন করাতে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সেই পরিশ্রম ও তৃষ্ণিত্বাতে প্রসন্নময়ী চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আমার বহুমূত্র রোগ প্রকাশ পাইল। তদবধি আর বসিয়া নিরুদ্বিগ্ধচিত্তে কাজ করিতে পারিতেছি না। বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস স্বাস্থ্যের জন্য সিমলা, দার্জিলিং, কটক, পুরী প্রভৃতি স্থানে থাকিতে হইতেছে।

১৯০৪ সালে সমগ্র ভারত ভ্রমণ।—এই অস্বাস্থ্যের অবস্থাতেও খাসাধ্য সমাজের কাজ করা আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু অনেক সময় সহরে না থাকাতে সাধনাশ্রমের কাজের ক্ষতি হইয়াছে। এই পীড়িত অবস্থাতেও একবার ইচ্ছা হইল যে সমুদয় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া আসি। তদনুসারে ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পত্নী বিরাজমোহিনী ও আশ্রমসংস্কেত শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ দত্তকে লইয়া ভারত ভ্রমণে বহির্গত হই। বহির্গত হইবার সময় সংকল্প করি যে যাত্রার সাহায্যের জন্য বিশেষভাবে কাহারও নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিব না। যাত্রার পূর্বে মন্দিরে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার বিষয়ে একটা বক্তৃতা করিব। সেই বক্তৃতাস্থলে একটা ভিক্ষার ঝুলি থাকিবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে যিনি যাহা ফেলিয়া দিতে চান দিবেন, তাহাই আমাদের যাত্রার পাত্থেন্দ্ররূপ হইবে। তদনুসারে বক্তৃতার দিন একটা ঝুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে বন্ধুরা যিনি যাহা ফেলিয়া দিলেন, তাহা লইয়াই আমরা বহির্গত হইলাম। পথে একবারমাত্র ভিক্ষা না করার নিয়মের ব্যাঘাত করিয়াছিলাম। এলাহাবাদে একজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে আমাদের জন্য ভিক্ষা করিবার অহুমতি দিয়াছিলাম। সেখানে কিছুই হইল না। তৎপরে আমরা ভিক্ষা করা একেবারে বন্ধ করিলাম। কাহাকেও আমাদের অভাব জানাইতাম না; যিনি যাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিডেন তাহাই গ্রহণ করিতাম। এইরূপে আমাদের ব্যয়নির্বাহ হইত। আমরা

এলাহাবাদ হইতে লক্ষৌ, লক্ষৌ হইতে কানপুর গেলাম। তৎপরে আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, রাওলপিণ্ডী, ইন্দোর, বোম্বাই, মাদ্রাসার, কালিকট, কোইম্বাটুর, বাদ্রালোর, ত্রিচিনপলী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর ইইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা না করিয়া স্বতঃপ্রস্তুত দানের দ্বারা আমাদের এই বিস্তীর্ণ ভ্রমণের সমুদয় ব্যয় স্বেচ্ছাক্রমে নির্বাহ হইয়া গেল।

অক্স কনফারেন্সের সভাপতি ইইয়া কোকনদা গমন।— তাহার পর আর এত দূর ভ্রমণ করি নাই। বিগত বৎসর অর্থাৎ ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে Andhra Conference সভাপতির কার্য্য করিবার জন্ত একবার কোকনদাতে যাই। সেখান হইতে কলিকাতাতে ফিরিয়া আসিয়া শরীরটা বড় খারাপ হয়। সেই অবস্থাতে বায়ুপরিবর্তনের জন্ত দার্জিলিঙ্গে যাই।

১৯০৭ সালে গুরুতর পীড়া।—দার্জিলিং হইতে পিতাঠাকুর মহাশয়ের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া সত্বর গ্রামে যাইতে হয়। তিনি আরোগ্যলাভ করিলে গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসি। কলিকাতা আসিয়া ১৭ই জুন দিবসে আমি গুরুতর পীড়াতে পতিত হই। এই পীড়াতে কয়েকবার জীবন সংশয় হইয়াছিল। যাহা হউক, ঈশ্বরকৃপাতে ৪।৫ মাস রোগশয্যায়াপন করিয়া উঠিয়াছি। সেই পীড়ার শেষ ফল এখনও রহিয়াছে; আজিও (৫ই জুন ১৯০৮) সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারি নাই। আগামী ১৭ই জুন হইতে আবার কার্য্যারম্ভ করিব, ভাবিতেছি।

রোগশয্যাতে পড়িয়া অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার সময় পাইয়াছি। নবশক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন ভাব মনে আসিয়াছে। অবশিষ্ট যে কয়েক বৎসর জগতে থাকি, নূতন ভাবে কাটাইব মনে করিতেছি। ঈশ্বর এই শুভসংকল্পের সহায় হউন।

পরিশিষ্ট ।

যে সকল সাধু সাধবীর সংশ্রবে আসিয়া এ জীবনে
বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, তাঁহাদের কি
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার
কথঞ্চিৎ বিবরণ ।

পারিশিষ্ট

(১)—পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্য ।

আমার পূজনীয় পিতৃদেব হরানন্দ ভট্টাচার্য্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেবল প্রিয়পাত্র নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতির অনেক গুণ তাঁহাতে ছিল। শুধু গুণ কেন, তাঁহার প্রকৃতির অনেক দোষও আমার পিতার প্রকৃতিতে ছিল। সেই সৌন্দর্য্যতা, সেই উৎকট ব্যক্তিত্ব, সেই অত্যাশ্রয় প্রতি বিদ্যেব, সেই স্বাভাবিকদাজ্ঞান, সেই পরহুঃখকাতরতা, সকলি আমার পিতাতে ছিল; আবার সেই স্বমতপ্রিয়তা, সেই ফলাফলের প্রতি দৃষ্টির অভাব, সেই আত্মপরীক্ষা ও আত্মসংশোধনের প্রয়াসভাব, তাহাও ছিল। কিন্তু গনবকুলের মধ্যে কে আছে, যে দোষে গুণে জড়িত নয়? আমার পিতার দোষ বাহা থাকে থাকুক; ইহা নিশ্চিত কথা যে শৈশব হইতে ঐ সৌন্দর্য্য অধন্যবিশেষী ও সত্যানুরাগী মানুষের শাসনাধীন না থাকিলে, মানব চরিত্র গঠিত হইত না।

আমি আমার দীর্ঘ জীবনের পরীক্ষাতে এই দেখিলাম যে, কোনও পিতার গৃহের প্রোঙ্গনের চারিদিকে যদি প্রাচীর থাকে, এবং ঐ প্রাচীর বাদ উঠে হয়, তবে গৃহের বালক বালিকা প্রাচীরের অপর পার্শ্বের প্রতি বেশাব প্রোঙ্গনের আবর্জনা যেমন দেখিতে পায় না, সুখেই থাকে, তেমনি, পিতামাতার চরিত্র যদি উচ্চ হয়, তাহাতে যদি সন্তানগণ পাপের প্রতি অকৃত্রিম ঘৃণা ও সাধুতার প্রতি অকৃত্রিম আদর দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই পিতৃচরিত্র এবং মাতৃচরিত্র উন্নত প্রাচীরের দ্বারা তাহাদিগকে ঘিরিয়া

থাকে। তাহারা সংসারের খারাপটা সহজে দেখিতে পায় না ; সুপথে থাকিয়াই বর্দ্ধিত হয়।

“অকৃত্রিম” কথাটী এই জন্ত ব্যবহার করিতেছি যে, অনেক গৃহে এমন অনেক পিতামাতা দেখিয়াছি, যাহারা ইংরেজ লেখক ডিকেন্সের (Dickens) বর্ণিত গুরুমহাশয়ের ছায়, নিজেরা মাংসখণ্ড মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে শিশুদিগকে উপদেশ বলেন, “দেখ শিশুগণ, লোভ দমন চরিত্রের উন্নতির প্রথম সোপান”। অর্থাৎ, তাঁহারা জানিয়া রাখিয়াছেন, শিশুদিগকে মুখে উপদেশ দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য ; মুখে বড় কথা বলিতে হইবে, মুখে অধমের প্রতি স্বর্ণা ও সাধুতার প্রতি আদর দেখাইতে হইবে ; মুখে সত্য বচনে, সত্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত করিতে হইবে, কার্যতঃ হউক আর না হউক। আমি একরূপ এক জন লোকের কথা জানি, যিনি সন্তানদিগকে এইরূপ মৌখিক উপদেশ দিবার নিয়ম রাখিয়াছিলেন ; মুখে বড় বড় উপদেশ দিতেন এবং তাহাদিগকে লইয়া ঈশ্বরের নাম করিতেন। কিন্তু এক দিন কোনও ভদ্রলোকের বাগানের মালী নিজ প্রভুর কতকগুলি গাছ চুরি করিয়া বেচিতে আনিল ; স্বয়ং মূল্যে সেগুলি পাইয়াই তিনি কিনিতে বসিলেন। তখন উপস্থিত সমাগত একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, “মহাশয়, বুঝিতে পারিতেছেন না, চুরী-করা গাছ ; নতুবা কি এত শস্তা দেয় ?” তিনি বলিলেন, “তাহা আমি দেখিতে পেলাম কেন ? আমার দ্বারে গাছ আনিয়াছে, আমি শস্তাতে গাইতেছি, লইতেছি। আমি ত উহাকে প্রলোভন দিয়া আনি নাই।” এই বলিয়া গাছগুলি লইলেন। আমি শুনিয়াছি, তাঁহার পুত্রেরা সেখানে উপস্থিত ছিল। তৎপরে কতবার ভাবিয়াছি, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে তাঁহার পুত্রদের অসংখ্য উত্তরকালে বদময়স হইয়াছে। তাঁহার মৌখিক উপদেশের কোনও কাজ হয় নাই।

আমার পিতা এ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। তিনি মুখে আমাদিগকে কখনও নীতির উপদেশ দেন নাই; কখনও বলেন নাই, “দেখ, এইরূপ স্থলে এইরূপ কর্তব্য”; কিন্তু তাঁহাতে জীবন্ত নীতি দেখিয়াছি। তিনি যে আমাকে বালাকালে গুরুতর প্রহার করিতেন, এমন কি, এক একবার অচেতন করিয়া ফেলিতেন, তাহা তাঁহার আদেশের অবাধ্যতা-জনিত ক্রোধবশতঃ নহে; আমার আচরণে মিথ্যা বা অজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়াতে। তাঁহার অধঃস্ববিবেশের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একবার গ্রীষ্মকালে আমাদের গ্রামের একজন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের পুষ্করিণীর মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের চাকরাণী বাসন মাজিতে গিয়া একটা বড় মাছ আনিল। আনিয়া মাকে বলিল, “মা, অমুকদের পুকুরে রাত্রে অনেক মাছ মরে ভেসে উঠেছে; পাড়ার লোকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই আমিও একটা এনেছি।” মা মনে করিলেন, পাড়ার সকল লোক যখন লইয়া বাইতেছে, তখন বুঝি বাড়ীওয়ালারা সকলকে বিলাইতেছে। তাই তিনি আর কিছু বলিলেন না।

তারপর বাজারের সময় বাবা মার কাছে পরস্যা চাহিলেন; মা আনাজ তরকারী প্রভৃতি কিনিবার পরস্যা দিলেন, মাছের পরস্যা দিলেন না।

বাবা। কৈ, মাছের পরস্যা দিলে না? মাছ কি আজ আসবে না।

মা। আজ মাছ আনতে হবে না, মাছ আছে। অমুকদের পুকুরে রাত্রে অনেক মাছ মরে ভেসে উঠেছে; লোকে নিয়ে যাচ্ছে, কিও একটা এনেছে।

বাবা শুনিয়া একেবারে অশ্লিষ্ট হইয়া গেলেন; তাঁহার আশ্রয়সিঁড়ি অল্পোপাত আরম্ভ হইল। চূপড়ীতর কোটা মাছ দেখিবার জন্য আনাইলেন; বিকে গালাগালি করিতে লাগিলেন, কেবল মারিতে

বাকি রাখিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই কোটা মাছ-শুদ্ধ চুগড়ী সেই গৃহস্থের বাড়ী পাঠাইলেন; তৎপর মাছ কিনিবার জন্য বাজারে গেলেন। আমরা ইহা দেখিলাম। ইহার পরে কি আর নাকী সুরে “দেখ, শিশুগণ চুরী করা বড় পাপ,” এরূপ উপদেশ আবশ্যক হয়?

আর একটা ঘটনা আমার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়াছিল, এজন্য মনে আছে। বাবা তখন কলিকাতায় বাঙ্গলা পাঠশালাতে পণ্ডিতী করেন। তিনি আমাকে লইয়া গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ীতে গিয়াছেন। সে সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া চারিদিকের গরীব লোক বড় কষ্ট পাইতেছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য গভর্ণমেন্ট একটা রিলীফ কমিটি করিয়াছেন। বাবার প্রতি ঐ কমিটির সভ্যগণের এমনি প্রত্যাশা যে, তিনি যাহাকে সাহায্যের উপযুক্ত বলেন, তাহাকেই তাঁহার সাহায্য দেন। ইহার কারণও ছিল। কাহাকেও সার্টিফিকেট দিতে হইলে, বাবা তাহার গ্রামে গিয়া তাহার উনান পর্য্যন্ত না দেখিয়া আসিয়া তাহাকে সাহায্যের উপযুক্ত বলিতেন না। আমাদের কলিকাতা যাত্রা করিবার সময়-সময় বাবা একদিন শুনিলেন যে আমাদের গ্রাম হইতে তিন চারি মাইল দূরে কোনও চাষা লোক সপরিবারে অনাহারে আছে। শুনিয়া নিজের গোলা হইতে দুই পালি চাউল কাপড়ে বাঁধিয়া হাঁটিয়া তাহাদিগকে দিতে গেলেন। গিয়া তাহাদিগকে বলিয়া আসিলেন, “পরশু হাটবারে তোমরা আমার কাছে যেও, আমি সঙ্গে করে তোমাদিগকে রিলীফ কমিটির বাবুদের কাছে নিয়ে সাহায্য পাবার বন্দোবস্ত করে দেব।” তখন তাঁহার মনে ছিল না যে তৎপরদিনেই আমাদের কাছে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে, এবং সেই হাটবারের দিনই তাঁহাকে স্কুলের শিক্ষকতা করিবার জন্য কলিকাতা উপস্থিত হইতে হইবে, এবং অল্পপস্থিত থাকিলে ছুটির দুই মাসের বেতন কাটা যাইবে। তখন এইরূপই নিয়ম ছিল।

তৎপর দিন যথাসময়ে শালতী ভাড়া করিয়া দুইজনে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি ; আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় তিন চারি মাইল পথ আসিয়াছি ; আমি শালতীর মধ্যে বসিয়া চারিদিকের মাঠ ঘাট গাছপালা দেখিতেছি, বাবা বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন ; হঠাৎ বাবা শালতীর ডালিতে আঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওই যা, বড় ভুল হইয়াছে। ওরে, থাম্ থাম্, ফিরে যেতে হবে।” শালতীর চালকগণ জিজ্ঞাসা করিল, “সে কি, মশাই ? এতদূর এসে ফিরে যাবেন ?”

বাবা। হাঁ, ফিরে যেতে হবে ; একটা বড় ভুল হয়েছিল। তোমরা দেব না ; তোমাদের যা দেব বলেছি, তা দেব। তোমাদের অপরাধ কি ? আমি ভাড়া না করলে তোমরা অন্য ভাড়াটে পেতে।

আমি। বাবা, আপনাকে কাল স্কুলে ত উপস্থিত হতেই হবে, তা না হলে দুমাসের মাইনে কাটা যাবে।

বাবা। তা কি হবে ? মহেশা কাওরা-রা অনাহারে সপরিবারে মারা যায়। আমি হাটবারে তাদিগে আসতে বলেছি। সঙ্গে করে নিয়ে রিলীফ কমিটির কাছ থেকে তাদের সাহায্য পাবার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। আমি গরীবদের কাছে কথা দিয়েছি, ভুলে গিয়েছিলাম ; এখন মনে হয়েছে ; তা-ভেঙ্গে যেতে পারি না।

আমরা আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। বাবাকে পুরা শালতীর ভাড়া দিতে হইল ; স্কুলের বেতন কাটা ত পরে রহিল।

সৌভাগ্যক্রমে সে যাত্রা বাবার দুমাসের বেতন কাটার শাস্তিটা আর ভোগ করিতে হইল না। বাবা কলিকাতার আসিয়া, কখন এক দিন কামাই হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার তাঁহার প্রতি বিশেষ অহুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ, আর বেতন কাটিলেন না।

তৃতীয় ঘটনা বাবা উজ্জলরূপে মনে আছে, তাহা এই। বাবা তখন

আমাদের গ্রামের হার্ডিঞ্জ মডেল বাঙ্গলা স্কুলে হেড পণ্ডিতের কাজ করেন। একবার গভর্নমেন্ট স্কুল-বর মেরামতের জন্য বাবার নিকট কিছু টাকা পাঠাইলেন। স্কুল-বর মেরামত হইয়া গেলে কতকগুলি শালের খুঁটি প্রভৃতি বাঁচিল। সেগুলি কি করিতে হইবে, অথ কোনও গ্রামের স্কুল-গৃহের মেরামতে যাইবে, কি নিলাম করিয়া গভর্নমেন্টের হস্তে টাকা জমা দিতে হইবে, ইহা জানিবার জন্য বাবা গভর্নমেন্টকে পত্র লিখিলেন। চিঠির উত্তর আর আসে না। দুই একমাস অপেক্ষা করিয়া অবশেষে বাবা স্কুলগৃহের নিকটস্থ পুকুরিণীতে খুঁটিগুলি ডুবাইয়া রাখিতে বলিলেন। সেইরূপ রাখা হইল।

কিছুদিন পরে আমি যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী গিয়াছি, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবা ঘরের দাবাতে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় একজন গ্রামস্থ ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেন।

সন্ধ্যাগত ব্যক্তি। পণ্ডিত মশাই, প্রণাম হই।

বাবা। এস বাপু! কল্যাণ হোক! ওঠ, দাবাতে ওঠ। বসো, তামাক খাও।

সন্ধ্যাগত ব্যক্তি। থাক্, আর দাবাতে উঠবো না। অল্প কথা, এই নীচে থেকেই বলে যাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করি, ঐ স্কুলের পুকুরে যে খুঁটিগুলো ডুবিয়ে রেখেছেন, ওগুলো কি হবে?

বাবা। কি হবে তা জানি না। ও গভর্নমেন্টের জিনিস। তাঁহাকে পত্র লিখেছি। হয়, অথ কোনও স্কুলের মেরামতের জন্য যাবে; না হয়, নিলাম করে বিক্রী করতে হবে।

সন্ধ্যাগত ব্যক্তি। ও-খুঁটিগুলো আমাকে দিয়ে দিন না? আপনাকে আমি কিছু ধরে দিচ্ছি।

বাবা প্রথমে ঐ লোকটার প্রস্তাবের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, খুঁটিগুলি কিনিতে চায়। তাই বলিলেন, “তুমি কি আমার

কথা শুনতে পেলেন না ? ও-গুলো গভর্নমেন্টের জিনিস। তাঁরা বেকপ করতে বলবেন, তাই হবে। তাঁদের হুকুম ভিন্ন কি বেচতে পারি ?”

সমাগত ব্যক্তি। আমি আপনার কথা শুনতে পেয়েছি। আমি একথানা ঘর তুলছি, খুঁটির প্রয়োজন। আমি আপনাকে দশ বার টাকা ধরে দিচ্ছি, আমাকে খুঁটিগুলো দিন না ?

এতক্ষণে সমাগত ব্যক্তির হৃদয়গত কথা বাবার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি অনুভব করিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে ঘুষ দিতে চাহিতেছে। তখন একেবারে লক্ষ্য দিয়া দাবা হইতে নীচে পড়িয়া তার হাত ধরিলেন, এবং বলিলেন, “তুমি এমন ছোটলোক যে তুমি আমাকে দশ বার টাকা ঘুষ দিয়ে খুঁটিগুলো অমনি নিতে চাও ! আর আমাকেও এত ছোটলোক মনে করেছ যে, পরের ধন ঘুষ নিয়ে তোমাকে দেব ! চল, তোমাকে গানায় যে-যাব, তুমি নিশ্চয় ঐ খুঁটির কিছু চুরি করেছ।”

এই বলিয়া টানোটানি আরম্ভ করিলেন। আমি মাঝখানে পড়িয়া ছাড়াইয়া দিলাম। আমি বলিলাম, “বাবা, খুঁটি ত গোপা আছে। কাল সন্ধ্যা গিয়ে খুঁটি তুলিয়ে গুণে দেখবেন, যদি কম হয়, তখন না হয় এই ব্যক্তির নামে থানায় খবর দিবেন। এখন একে ছেড়ে দিন।” অনেক বলাতে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

আর কয়েকটা ঘটনা লিখিয়া রাখিবার ও মনে রাখিবার মত বিষয়। বহু বৎসর পূর্বে বাবা একবার নিজের বেতনের বিল ইন্স্পেক্টরের স্বাক্ষর করাইয়া ভাঙ্গাইবার, লম্বা কলিকাতার আসিতেছেন, এমন সময়ে গ্রামস্থ একজন সার্কেল পাঠশালার পণ্ডিত বাবার হাতে একখানি ১৫ টাকার বিল দিয়া বলিলেন, “পণ্ডিত মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই বিলখানাও ইন্স্পেক্টরের স্বাক্ষর করাইয়া ভাঙ্গাইয়া আনিবেন।” বাবা তাঁর বিলখানাও লইয়া আসিলেন।

এদিকে সহরে আসিয়া ইন্স্পেক্টর-আপিসে বাইতে বাবার কিছুদিন

বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে গ্রাম হইতে সংবাদ আসিল যে, সেই সার্কেল পণ্ডিতটা ওলাউঠা হইয়া মারা পড়িয়াছেন। বাবা যখন উদ্ভো সাহেবের আপিসে গেলেন, তখন উদ্ভো সাহেব বাবাকে বলিলেন যে, তিনিও ঐ পণ্ডিতটার জ্বর দরখাস্ত পাইয়াছেন, যেন তাঁর স্বামীর টাকা অপর লোকের হাতে না পড়ে। বাবা বুঝিলেন, দেবরদের সঙ্গে ঐ বিধবার বিবাদ ঘটিয়াছে; তাই তিনি আর এই টাকা লইতে চাহিলেন না। কিন্তু উদ্ভো সাহেব বাবাকে অতিশয় প্রভা করিতেন, তিনি বলিলেন, “পণ্ডিত, তোমাকে চিনি, টাকাগুলি লইয়া যাও, নিজের হাতে ঐ বিধবাকে দিবে।” বাবা অগত্যা টাকাগুলি লইয়া গেলেন। কিন্তু বাড়ীতে গিয়াই শুনিলেন, সে বিধবাটা তার পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছে। তখন টাকাগুলি নিজের বাক্সের এককোণে রাখিয়া দিলেন, মনে করিলেন, সে জীলোকটা ফিরিয়া আসিলে নিজে তার হাতে দিবেন।

তারপর দুই মাস যায়, ছয় মাস যায়, সে আর আসে না। বাবা সে কথা ভুলিয়াই গেলেন, এবং টাকাগুলিও নিজের টাকার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া খরচ হইয়া গেল।

১৫।১৬ বৎসর পরে বাবার সে কথা স্মরণ হইল, কিছুদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে অপর কাহাৎকও না পাইয়া, নিজে দশ বার মাইল হাঁটিয়া গিয়া সেই বিধবাকে ১৫ টাকা দিয়া আসিলেন।

শেষজীবনে বহুবার তিনি নিজের পূর্বকৃত কোন ঋণের কথা স্মরণ হইবামাত্র অত্যন্ত অস্থির হইয়া আমার নিকট কলিকাতায় আসিতেন। একবার কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীতে আমার আপিস-ঘরে কয়েকদিন ছিলেন। তদ্ব্যতীত একদিন বৈকালে আমি বেড়াইয়া আসিয়া দেখি, বাবা ম্লান মুখে আমার খাটে শয়ন করিয়া আছেন।

আমি। বাবা, আপনাকে বড় ম্লান দেখছি কেন?

বাবা। ওরে, একটা বড় ক্লেশের কারণ ঘটেছে। আমার মনের এই বড় ইচ্ছা যে এক পরসাদ দেনা রেখে মরবো না। মনে করছিলাম যে আর এক পরসাদ দেনা নাই। কিন্তু সেদিন ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল যে, আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন শ্রীশ বিদ্যারত্ন * আমার সঙ্গে পড়তো। কয়েক বার আমার অর্থান্ধ হওয়াতে শ্রীশ আমাকে দুই তিন বারে চল্লিশ টাকা কর্জ দিয়েছিল। কথা ছিল যে কলেজ হতে বাহির হয়ে দুজনে যখন কক্ষে বসব, তখন আমি ঐ ৪০ টাকা শোধ দেব। তার পর আমি কোথায় গেলাম, সে কোথায় গেল। সে বিধবা-বিবাহের সঙ্গামার ভিতর পড়ল। সে টাকার কথা দুজনেই ভুলে গেলাম। এত দিনের পর মনে হয়েছে, এখন কি করি ?

এ কথাবার্তা বোধ হয় ১৮৯৭ কি ১৮৯৮ সালের। বিদ্যারত্ন মহাশয় তার অনেক বৎসর পূর্বে গতান্ন হইয়াছেন। আমি বলিলাম, “এ জন্ত আপনি মন খারাপ করিবেন না। আমি খুঁজি, শ্রীশ বিদ্যারত্নের কে আছেন।” আমি খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার প্রথমপক্ষের পুত্রকে জীবিত পাইলাম। তাঁহার নিকট গিয়া বলিলাম, “আমার পিতা পঠদশায় আপনার পিতার নিকট চল্লিশ টাকা কর্জ করিয়াছিলেন।* এতদিনের পর তাহা স্মরণ করিয়া তাঁর মন চঞ্চল হইয়াছে। আপনি এই চল্লিশ টাকা গ্রহণ করুন, করিয়া আমাকে একখানি রসিদ দিন। আমি বাড়ীতে তাঁহার কাছে রসিদ পাঠাইয়া দিই, তাঁর মন সুস্থির হউক।” তিনি বলিলেন, “এ ত কখনও শুনি নাই যে ৬৫ বৎসরের দেনা বাড়ীতে আসিয়া শোধ করিয়া যায়।” আমি টাকা দিয়া রসিদখানি বাবাকে পাঠাইলাম ; তিনি সুস্থির হইলেন।

আর-একবার সহরে আসিয়া আমাকে বলিলেন যে আর-একটা

* তিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করেন।

ঘটনার কথা মনে পড়িয়াছে। প্রায় ২৫ কি ৩০ বৎসর পূর্বে আমাদের গ্রামের ছেলেরা একটি পাব্লিক লাইব্রেরী করে। বাবা একবার সহরে আসিতেছিলেন, তখন ছেলেরা তাঁহার হাতে একটি বইয়ের তালিকা দিয়া বলে, “পণ্ডিত মহাশয়, কোনও জানা-শোনা দোকান হতে এই বইগুলি এনে দিবেন, পরে দাম দেওয়া যাবে।” তিনি তাঁর একজন সমাখ্যায়ী বন্ধুর পুস্তকালয় হইতে দশ টাকার পুস্তক লইয়া ঐ গ্রামস্থ যুবকদিগকে দেন। তার পর মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল, তাহাদের দাম দেওয়া আর হইয়া উঠিল না। বাবারও আর সে কথা মনে রহিল না। এত দিনের পর সে কথা মনে পড়িয়াছে। আবার আমি, তাঁর সেই সমাখ্যায়ী বন্ধু পরিবারস্থ কেহ জীবিত আছেন কি না, অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতার বটতলায় তাঁহার পুত্রকে জীবিত পাইলাম; তখনও তিনি পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসা করিতেছেন। এ দশ টাকা বাবা নিজে দেশ হইতে আমার নিকট পাঠাইলেন। আমি বটতলাতে গিয়া সেই ঋণ শোধ করিয়া বাবার কাছে রসিদ পাঠাইলাম, তবে তিনি সুস্থির হইলেন না।

আবার আর একটি দেনার কথা স্মরণ হইল। বিশ পাঁচিশ বৎসর পূর্বে বাবা ভবানীপুরের এক কাপড়ের দোকান হইতে পাঁচ টাকার কাপড় ধারে লইয়াছিলেন। তার পরেই সে দোকান উঠিয়া যায়। সে ঋণ শোধের কি হইবে? আমরা অনুসন্ধান করিয়া সে দোকানদারের কোনও উদ্দেশ্য পাইলাম না। কি করা যায়? বাবার মন সুস্থির হয় না। অবশেষে পাঁচ টাকার কাপড় কিনিয়া তাঁহার নিকট পাঠান গেল, তিনি গ্রামের দরিদ্রদিগকে দান করিলেন।

আমার পিতার কিরূপ তেজস্বিতা ও মনুষ্যত্ব ছিল, তাহার দুইটা দৃষ্টান্ত স্মরণ আছে। একরূপ শুনিয়াছি যে আমার মাতাঠাকুরাণীর বিবাহের দিনে, আমাদের গ্রাম হইতে সমাগত বরপক্ষীয় লোকদিগের সহিত

চাঞ্চড়িপোতা ও তৎসন্নিকটবর্তী গ্রামের কল্যা-পক্ষীর লোকদিগের বিবাদ হয়। এ বিবাদ কি জন্ত ঘটয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। অহুমান করি যে, বরপক্ষের বাৎস-গোত্রীয় ভট্টাচার্য্য-বংশীয় পদগর্ভিত ব্রাহ্মণগণ অহুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করা হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহাদের বিরক্তির ভাব বিবাহের পর হইতেই প্রকাশিত হইল। বিবাহের পরে যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে আমার মাতামহের গৃহের ছাদের উপরে আহ্বারে বসান হইল, তখন বরপক্ষের লোকগুণি একত্র বসিলেন, এবং এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে গৃহস্থের জিনিসপত্রের অপচয় করিয়া বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা করিবেন। এই সঙ্কল্প অহুসারে তাঁহারা মুঠা-মুঠা লুচি কচুরি সন্দেশ প্রভৃতি ছাদ হইতে বাড়ীর পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, অপর জাতীয় যে-সকল ব্যক্তিকে লুচি সন্দেশ দিবার আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছিল, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে চিড়া দৈ খৈ দিয়া পরিচর্যা করিতে হইল। এই জন্ত আমার মাতামহ আমাদের জ্ঞাতিগণের প্রতি মহা বিরক্ত হইয়া গেলেন, এবং অগ্রে বেক্রপ সম্ভোষণকরূপে বিদায় করিবেন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা আর করিলেন না। আমাদের জ্ঞাতিগণও বিরক্ত হইয়া দেশে ফিরিলেন।

ইহার ফল এই হইল যে, আমার বালিকা মাতা যখন প্রথম ঋণ্ডরঘর করিতে গেলেন, তখন তিনি সেখানে আবদ্ধ হইলেন; আর তাঁহাকে পিতৃগৃহে পাঠান হইল না। • দুই বৎসর যার, তিন বৎসর যার, পিতৃগৃহের লোক গিয়া বার বার ফিরিয়া আসিতেছে; মাকে আর ছাড়ে না। আমার বড় পিলী ও পিসা মহাশয়, বাহাদের উপর গৃহের কর্তৃত্বভার ছিল, তাঁহারাও জ্ঞাতিদের আপত্তি ও অসন্তোষ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তখন পিতা মহাশয় কলিকাতার ঋণ্ডরের বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতেছেন। জ্ঞাতিদের এই ব্যবহারের বিষয় তিনি

খণ্ডরালয়ের লোকের নিকটে শ্রবণ করিলেন। একটা নিরপরাধা বালিকার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা অত্যাচারণ বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল; অথচ নিজেই বালক, জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ও ভগিনীপতিকে কিছু বলিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু সময় গেল। অবশেষে বাবার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। তিনি রাগিয়া গেলেন, এবং যেরূপে হউক বালিকা পত্নীকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পিতৃগৃহে আনিবেন, স্থির করিলেন। এই স্থির করিয়া একবার কলেজের ছুটির সময় বাড়ীতে গেলেন। গিয়া মাকে ডুলি করিয়া নিজে সঙ্গে করিয়া পিত্রালয়ে আনিতে প্রস্তুত হইলেন। গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; জ্ঞাতীগণ ভাঙ্গিয়া পড়িলেন; বড় পিসী ও পিসা মহাশয় লজ্জায় ত্রিস্রমাণ হইলেন, কারণ একজন ১৫।১৬ বৎসরের বালকের পক্ষে এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বড় লজ্জার কথা মনে হইতে লাগিল। কিন্তু বাবা কাহারও আপত্তির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। মার ডুলির সঙ্গে গ্রামে বাহির হইলেন, এবং জ্ঞাতিবর্গের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় চীৎকার করিতে লাগিলেন, “কে আছে, বাহির হও। এই দেখ, আমার জ্বীকে আমি খণ্ডরবাড়ী লইয়া বাইতেছি।”

আর একটা বিষয়ও এইরূপ তেজস্বিতা ও মনুষ্যত্বের ত্রোতক। অগ্র্যেই বলিয়াছি, বাবা কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয়-পাত্র ছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিতও তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। উক্ত উভয় মহাশয় পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া, মিশিয়া জীবিকার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল। তদনুসারে তিনি ছুটির সময় ঘরে আসিলেই আমার মাতাঠাকুরাণীর শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। মা ঘরের কাজ সারিয়া দশটা রাত্রে শয়ন করিতে আসিলে তাঁহাকে পড়াইতে বসিতেন। মা-ও উৎসাহ সহকারে পড়িতেন। কলেজ খুলিলে বাবা মাকে পড়িবার জন্ত বই দিয়া বাইতেন; মা

সেইগুলি মনোবোগ পূর্বক, বিনা সাহায্যে যতদূর হয়, পাঠ করিতেন ; কখনও কখনও পাড়ার ছেলেদিগকে ডাকিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইতেন । মার পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এক প্রধান গ্রন্থ ছিল । আমার জ্ঞানে, আমি তাঁহাকে প্রায় প্রতিদিন রামায়ণ পড়িতে দেখিতাম । নিজে পড়িতেন, এবং ছুটির দিনে আমাকে দিয়া পড়াইয়া শুনিতেন ।

কিন্তু যে জন্তু মার লেখাপড়া শিক্ষার কথা বলিতেছি তাহা এই যে, এ জন্তু বাবাকে নির্যাতন সহ করিতে হইত । বড় পিসী গালাগালি দিতেন, পাড়ার মেয়েরা মাকে উসিতে বসিতে ঠাট্টা করিত । জ্ঞাতিগণ বাবার “সাহেব” নাম তুলিয়া দিলেন । ইহার আর একটা কারণও ছিল । তিনি একবার কাল জুতা পায় দিয়া এবং একটা চীনে ছাতা মাথায় দিয়া গ্রামে গিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে চটি পায়ের না দিয়া কাল জুতা পায়ের দিয়াছে, এবং গোলপাতার ছাতা মাথায় না দিয়া চীনে ছাতা মাথায় দিয়াছে, ইহা গ্রামের লোকের, বিশেষতঃ জ্ঞাতিবর্গের চক্ষে অসহনীয় বোধ হইয়াছিল । সে যাহা হউক, বাবা মাকে শিক্ষা দিবার বিষয়ে আত্মীয় স্বজনের এবং জ্ঞাতিবর্গের আপত্তি শুনিলেন না । স্বাধীনভাবে ও দৃঢ়চিত্তে আপনার কাজ করিয়া বাইতে লাগিলেন ।

তীক্ষ্ণা বিষয়ে তাঁহার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও এই তেজস্বিতা কিরূপে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংশ্রবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি ।*

এক্ষণে তাঁহার উগ্র উৎকট আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের বিষয়ে কিছু বলি । আমি তাঁহার বিরাগ সবেও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে, তিনি কিরূপে

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমার উপার্জিত অর্থের এক পরসাত্ত গ্রহণ করিবেন না, কিরূপে আমাকে অতি গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইত, এবং কিরূপে আমার মধ্যমা ভগিনীর বিবাহের সময় তাঁহাকে লুকাইয়া মার হাত দিয়া কিছু অর্থ সাহায্য করাতে, তাহা জানিতে পারিয়া রাগিয়া ঘরে আগুন দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি*। এই ভাব তাঁহার ১৭।১৮ বৎসর ছিল। পরে আমার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইলেন, এবং সংসারের সাহায্য করিতে দিলেন। যে সময়ে তিনি আমার সাহায্য গ্ৰহণ না করা বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছেন, তখন আমি একবার শুকতব পীড়াতে আক্রান্ত হইলে তিনি কিরূপে মার গহনা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া মাকে লইয়া আমার চিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় আসিলেন, তাহাও অগ্রেই বলিয়াছি†। বাহার এক পরসাত্ত লইতেছেন না, সেই অবস্থা পুত্রের জন্ত যথাসর্ব্বশ্রমে দিতে প্রস্তুত, এরূপ মহত্ব কোথায় দেখা যায়!

এই যে আমাকে দেখিতে আস, ইহা হইতে আর এক ঘটনা ঘটিল, বাহাতে বাবার মনুষ্যত্ব ও আত্মমৰ্য্যাদাজ্ঞান অতি উজ্জলরূপে প্রকাশ পাইল। তিনি আমার পরিচর্য্যার জন্ত মাকে এক স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়া, সেখানে আমাকে রাখিয়া 'গেলেন। কিন্তু গ্রামের কোনও কোনও বিদ্রোহী লোক গ্রামের জমিদার বাবুদের নিকট গিয়া বলিল, "শুনেছেন মশাই? হারাণ-পণ্ডিত সেই জাতিচ্যুত ছেলের বাড়ীতে আপনার স্ত্রীকে রেখে এসেছে।" জমিদার বাবুদের বড় বাবু পূৰ্ব্ব হইতেই বালিকাবিদ্ভালমসংক্রান্ত ব্যাপারে বাবার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন; সুতরাং এই কথা যেই শোনা, অমনি কোঁস করিয়া উঠিলেন; "বটে! এ দিকে সুখে ত খুব তেজ দেখান হয়! এবার

পণ্ডিতকে ছাড়া হবে না।” অমনি বাবাকে একঘরে করিবার জন্ত চক্রান্ত চলিল। বাবার প্রতি পূর্ব হইতে যাহাদের ঈর্ষ্যা বা অসন্তোষ বা বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, তাহার। সকলে এই দলে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের মধ্যে বিলক্ষণ দুইটা দল পাকিয়া দাড়াইল। বাবা অগ্রে বরং প্রকৃত কথা কাগাকেও কাহাকেও বলিতেছিলেন; কিন্তু যেই শুনিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে দল বাধিতেছে, অমনি মুখ বন্ধ করিলেন। বলিলেন, “আচ্ছা! ওদের যা করবার, করুক!”

ক্রমে আসল কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল; গ্রামের লোকে কলকাতা হইতে বাড়ীতে গিয়া প্রচার করিয়া দিল যে আমার বাগীতে মাঝে রাখা হয় নাই, কিন্তু মার কাছে আমাকে আনিয়া রাখা হইয়াছে ও আমাব পরিবার পরিজন স্বতন্ত্র বাড়ীতে আছে। এখন জমিদার বাবুরা মুস্থিলে পড়িয়া গেলেন; একবার মুখ দিয়া বলিয়াছেন যে বাবাকে একঘরে করিবেন, আবার কি করিয়া সে কথা তুলিয়া লন? তখন বলিলেন, “পণ্ডিত একবার নিজে আসিয়া বলুক যে তার স্ত্রী স্বতন্ত্র বাড়ীতে আছেন; তা হ’লে আমরা বা বলছি তা তুলে নি।” বাবা শুনিয়া বলিলেন, “শর্মা সে ছেলেই নয়! যদিও ইহা সত্য কথা, তবু আমি, যারা ভয় দেখিয়েছে, তাঁদের কাছে গিয়ে এ কথা বলতে প্রস্তুত নই। তাঁদের যা করবার হয় করুন।” তমাস যায়, চারি মাস যায়, বাবা আর বান না; জমিদার বাবুরা নামালোকের দ্বারা ডাকিয়া পাঠান, বাবা সে পথ দিয়াই চলেন না। অবশেষে জমিদার বাবুরা আপনাদের মান রক্ষার জন্ত এক কোশল অবলম্বন করিলেন। বাবা তাঁর ছোট্ট মামাত ভাই গোবর্দ্ধন শিরোমণি মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি প্রদ্বা করিতেন। তিনি জমিদার বাবুদের গুরু ছিলেন। বাবুরা নিরুপার হইয়া তাঁর শরণাগত হইলেন। তিনি একদিন বাবুদের কাছাড়ীতে বসিয়া বাবাকে ডাকাইয়া

পাঠাইলেন। চাকর আসিয়া বলিল, “কান্নাঝগ বাড়ীর বড় কৰ্ত্তা, বাবুদের কাছারীতে ব’সে আপনাকে ডাকছেন।” বাবা বলিলেন, “বাবুদের কাছারীতে ব’সে কেন?” চাকর সে বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিল না। বাবার যাইতে বড় ইচ্ছা হইল না; কিন্তু কি করেন, দাদা ডাকিয়াছেন, না গেলেও নয়। অবশেষে অনিচ্ছাক্রমে গেলেন; তখন বাবুদের কৌশলের কথা মনেই আসিল না। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, বড় বাবু ও বড় কৰ্ত্তা বসিয়া আছেন। বড় কৰ্ত্তাকে দেখিয়াই বাবা গম্ভীর হইয়া গেলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন?” বড় কৰ্ত্তা দেখিয়াই বুঝিলেন, গতিক ভাল নয়। তখন বড় বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “বাবু, আমি বলাতেই হারাগের বলা হচে। আমি বলছি শুনুন; আমাদের বৌ কলকাতায় গিয়ে আছেন বটে, কিন্তু ছেলের বাড়ীতে নাই; তাঁরই বাড়ীতে তাঁর কাছে ছেলে আছে।”

যেই এই কথা বলা, অমনি বাবা দ্রুতবেগে সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলেন; এবং বড় কৰ্ত্তা তাঁহাকে অপমানিত করিলেন বলিয়া, তদবধি তিন বৎসর তাঁহার মুখ দর্শন করিলেন না।

বাবাকে যে বিদ্যাশাগর মহাশয়ের স্ত্রায় একগুঁয়ে কলিয়াছি, তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে; তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম একগুঁয়েমোর দৃষ্টান্ত, আমার দ্বিতীয় বিবাহ। অগ্রেই বলিয়াছি যে, বাবা কোনও কারণে আমার প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ীর প্রতি ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিরক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, প্রসন্নময়ীকে ত্যাগ করিয়া আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবেন। তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার মাতা ইহার বিরোধী ছিলেন; আমি তখন ১৭।১৮ বৎসরের ছেলে, আমি অস্বত প্রকাশ করিয়াছিলাম; আমার মাতামহী প্রসন্নময়ীকে ভাল বাসিতেন,

তিনি ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন ; গ্রামের জাতি কুটুম্ব বন্ধ বান্ধবের মধ্যে অনেকে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন । বাবা কাহারও কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না ; বিবাহ দিয়া তবে ছাড়িলেন ।

আর একটা বিষয়ও এইরূপ স্মরণীয় । আমি ব্রাহ্মসমাজে বোগ দিলে তিনি বলিলেন, “আমার পৈতৃক বিষয়ের এক কাণা কড়িও ওকে দেব না ।” মধ্যে একটা উইল করিয়া আমার কনিষ্ঠা ও সর্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয়কে বাস্তু-ভিটাতে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । সে উইল গোপনে বাহির করিয়া লইয়া আমার মা ছিঁড়িয়া ফেলেন । ৩২পবে বহুবৎসর চলিয়া গেল । আমি নিজ ব্যয়ে বাবা ও মার মস্তক গ্রাধবার জন্ত আগেকার খঁড়ো ঘরের পরিবর্তে কোটাবাড়ী করিয়া দিলাম ; মা তাহাতে কয়েক বৎসর বাস করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন । তাঁহার স্বর্গারোহণের পর বাবা নিজের সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্ত আমার এক উইল করিয়া আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে পৈতৃক ভিটাতে স্থাপন করিলেন, এবং আমাকে সমুদয় পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন ; সামান্য চারিখণ্ড ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, তাহার তিন খণ্ড আমার তিন ভগিনীকে দিয়া, তাহাদের অল্পবয়সে সামান্য একখণ্ড জমি আমার পুত্র প্রিয়নাথকে দিলেন । তাঁহার দুইখানি গ্রন্থের একখানি প্রিয়নাথকে ও অপরখানি আমার পত্নী বিরাজমোহিনীকে দিলেন । আমার নিশ্চিত কোটাবাড়ীটি তিনি যে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে দিয়াছেন, তাঁহার এই ব্যবস্থাতে আমি সন্তুষ্ট দিয়াছি ; কারণ আমার কনিষ্ঠা ভগিনী প্রাণ দিয়া বহু বৎসর তাঁহার সেবা করিয়াছে । আমি প্রথমে বলিয়াছিলাম, “উইল লেখা, উইল রেজিস্টারী করা প্রভৃতির প্রয়োজন কি ? আপনার কি ইচ্ছা, বলিয়া বাদ ; আমি তদনুরূপ ব্যবস্থা করিব ।” শেষে ভাবিলাম, একগুঁয়ে মানুষের মনের ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ না হইলে মনটা স্থির হইবে না ; তাই উইল লিখিতে

ও রেজিষ্টারী করিতে উৎসাহ দিলাম। ইহাতে তাঁহার মন শান্ত হইয়াছিল। বলিয়া সন্তুষ্ট আছি।

অধিক কি, প্রতিদিন পদে পদে তাঁর একগুঁয়েমোর প্রমাণ পাওয়া যাইত। একবার তিনি ও আমার কনিষ্ঠা ভগিনী কুসুম আসিয়া আমার বালিগঞ্জের বাসাতে কিছুদিন ছিলেন। কোনও কারণে বাবার বাড়ীতে যাওয়া আবশ্যক হইল। সেইদিন প্রাতে আমাদিগকে বলিলেন যে তিনি অপরাহ্ন তিনটার ট্রেনে বাড়ী যাইবেন। আমি বলিলাম, “কেন বাবা তিনটার গাড়ীতে যাবেন? বাড়ীতে পৌঁছিতে রাত হইয়া যাইবে; অন্ধকারে পথে পড়ে যান, কিছু হোক। কাজ কি তিনটার গাড়ীতে গিয়ে? কুসুম সকাল সকাল রেঁধে দিক। আপনি খেয়ে প্রাতে ১১টার গাড়ীতে যান; সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে পৌঁছিতে পারবেন।” তিনি মাথা ঘুরাইয়া বলিলেন, “বা নয়, সেই কথা! আমি অত তাড়াতাড়ি তৈয়ের হতে পারবো না।” তখন তাঁর সঙ্গে আর তর্ক করা বুধা বোধে কুসুম-আমার পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, যেক্রমে হউক প্রাতে ১১টার গাড়ীতে বাবাকে পাঠাইতেই হইবে। এই পরামর্শ করিয়া কুসুম তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইল; আমি বাবার যাইবার জন্ত যে কিছু আয়োজন করা আবশ্যক ছিল তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বেলা ৮টার সময় ছাদে বাবার স্নানের জল দেওয়া গেল। কুসুম আসিয়া বলিল, “বাবা, ছাদ হ’তে নেয়ে এস।” বাবা কিছু বলিলেন না, স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে পূজা আধিক প্রভৃতি সারিয়া উঠিতে ৯টা বাজিল। ইতিমধ্যে তাঁহার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত, কুসুম আসিয়া আহারার্থে ডাকিল। তখনও বাবা কিছু বলিলেন না; আহার করিতে গেলেন। ৯টার সময় আহার শেষ করিয়া আসিলেন। তখন আমি ঘড়ি দেখাইয়া বলিলাম, “আপনি আর এক ঘণ্টা শুইয়া থাকুন, আমি তৎপরে আপনাকে গাড়ীতে করিয়া রেলের তুলিয়া দিয়া

আসিব। তিনি বলিলেন, “না, আমি সেই তিনটার গাড়ীতেই যাব,” এই বলিয়া শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা গেলেন। কুসুম ও আমি কত যে হাসিলাম, তা আর কি বলিব। একবার মুখ দিয়া বলিয়াছেন, “তিনটাব গাড়ীতে”; সেটা ছেলে মেয়ের কথাতে লজ্জন হইবে, তাহা সহ্য হইল না!

এই স্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই একগুঁয়ে মানুষকে লইয়া বরকলা করিতে আমার মাকে যে কি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। বাবা কথা না শুনিলে মা যখন ঝগড়া করিতেন, তখন বাবা বলিতেন, “আমি ত আর ‘ঘণ্টার গরুড়’ নই যে, ‘যে-আজ্ঞে’ বলে হাত ষোড় ক’রে থাকব!” বাস্তবিক, পাছে কেহ তাঁহাকে ‘ঘণ্টার গরুড়’ মনে করে, এই ভয়ে তিনি চিরদিন দৃঢ়রূপে স্বমত-প্রিয়তা অবলম্বন করিয়া থাকিয়াছেন।

তৎপরে পিতৃদেবের আর একটা উল্লেখযোগ্য গুণ সহৃদয়তা। একরূপ দয়ালু মানুষ কম দেখা যায়। অগ্রেই তাহার দয়ার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি। আরও কয়েকটা উল্লেখ করিতেছি। একবার আমার জননী একজন গ্রাম-পার্শ্ববর্তী চাষা লোককে ষোলটা টাকা এই বালিয়া কর্জ দিয়াছিলেন যে, সে হৃদের পরিবর্তে প্রতি হাটবারে কিছু কিছু তরকারী দিয়া যাইবে, তার পর হাতে টাকা হইলে টাকা শোধ করিবে। দুই বৎসর যায়, চার বৎসর যায়, সে হাটবারে হাটবারে তরকারী দিয়া যাইতেছে; * ইতিমধ্যে মার টাকার বড় প্রয়োজন হইল। তিনি ঐ ব্যক্তিকে টাকা শোধ করিবার জন্ত খরিলেন। তখন তাহার হাতে টাকা নাই; সে মাকে বলিষ করিতে কহিল। মা বলিষ করিয়া রহিলেন। কিন্তু শেষে সে হাটবারে আর সে-পথ দিয়া আসে না; মা তাকে আর দেখিতে পান না। এ দিকে দুর্বৎসর উপস্থিত হইয়া। প্রজাকুলের বড় অন্নকষ্ট ঘটিল। এই সময়ে মা তাহাকে এক দিন

পথে দেখিতে পাইয়া তিরস্কার করেন। এই কথা শুনিয়া বাবা বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, “তুমি না হরচন্দ্র ভায়রত্নের মেয়ে? তোমার গায়ে না ছিঁছুর চামড়া আছে? তুমি কি বলে এই ছুঁড়িকের সময় তাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি কর?” এই বলিয়া বৈকালে আপনাদের গোলা হইতে ছই সের আন্দাজ চাউল কাপড়ে বাঁধিয়া তিন চারি মাইল হাঁটিয়া তাহাদিগকে দিতে গেলেন। ঋণের টাকা আদায় দূরে রহিল, তাহাদের দারিদ্র্যের চিন্তায় বিব্রত হইলেন।

আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার আমাদের পাড়ার একটি গরীব লোকের যববাড়ী আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল। বাবার এমন সামর্থ্য ছিল না যে তার ঘর তুলিবার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের ভদ্রলোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে বেড়াইতে লাগিলেন; এবং কাহারো নিকটে বাঁশ, কাহারও নিকটে দড়ি, কাহারও নিকটে পয়সা, কাহারও নিকটে টাকা আদায় করিয়া তার ঘর তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত,—“ইহাকে কিছু টাকা তুলিয়া দাও।” আমি কিছু টাকা তুলিয়া দিলাম।

আবার এই সহনীয়তা কেবল মানুষের উপরে নয়; ইতর প্রাণীদের উপরে তাঁহার ভালবাসা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি একটি কুকুর-শাবককে শিয়ালের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আনিয়া তাহার পৃষ্ঠের ক্ষতে দৈ ঢালিয়া ঢালিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া কিরূপে তাহাকে বড় করিয়াছিলেন, এবং কিরূপে তাহার নাম ‘শেয়ালখাকী’ হইয়াছিল, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি*। একটি না একটি কুকুর বাড়ীতে সর্বদাই থাকিত; তাহাকে অন্নমুষ্টি না দিয়া তিনি আহার শেষ করিতেন না। অনেক দিন কুকুরকে ভাতের

সঙ্গে মাছ কেন দেওয়া হয় নাই বলিয়া আমার ভগিনী ও ভাগিনের ভাগিনেরীদের সঙ্গে তাঁহার ঝগড়া হইত। আমাদের একটি বিভাগ আছে, যা তার নাম রাখিয়া গিয়াছেন “হুল্‌টী”, অর্থাৎ তার গারে হুল্‌চার ছায় স্নন্দর স্নন্দর দাগ আছে। সেই হুল্‌টী বাবার বড় আত্মরে ছিলেন। তিনি মাছ ভিন্ন আহার করিতেন না, এবং বিছানা ভিন্ন শুইতেন না। মাতাঠাকুরাণীর যখন কাল হইল, তখন কয়েক দিনের জন্ত আমাদের বাড়ীতে মাছ আনা বন্ধ হইল। বাবা বাড়ীর ছেলেদের জন্ত তত ব্যস্ত হইলেন না, হুল্‌টীর জন্য যত ব্যস্ত হইলেন। আমার ভগিনী কুসুমকে বলিতে লাগিলেন, “ওরে কুলী, হুল্‌টীর জন্যে মাছ আনতে দে।” কুসুম বলিল, “নেও নেও, রেখে দাও; বেয়ালের জন্যে আবার মাছ কিনতে দেব! যা নর, তাই!” বাবা বলিলেন, “ও কি শ্রদ্ধা ক’রতে বসেছে? ও মাছ খাবে না কেন?”

কুসুম। না, এ ক’দিন বাড়ীতে মাছ আসতে দেব না।

বাবা। আচ্ছা, তবে ওকে তোরা বড় পিসীর বাড়ী থেকে মাছ খাইয়ে আন।

এই লইয়া দুইজনে খুব ঝগড়া চলিল।

ইতিমধ্যে আমার এক ঘটনা উপস্থিত। কিছু দিন পরে হুল্‌টীর তিন-চারিটা ছানা হইল। বাবা মহা ব্যস্ত, “ওরে কুলী, হুল্‌টী রোগা-হয়ে গেছে; ছানাগুলো দুধ পাবে না। আর আধ সের দুধ রোজ কর; ওরা খাবে, আর গিন্নী পাখীটা রেখে গেছেন, সেটাও খাবে।”

কুসুম। এমন কথা কখনো শুনিনি যে বেয়াল-ছানার জন্যে দুধ রোজ করে!

বাবা। আহা, ওরা শিশু।

এই ‘শিশু’দের মধ্যে একটি একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কাতরকন্নি করিতেছে। বাবার নিদ্রাস্তব্ধ হইল, হঠাৎ সেই কাতরকন্নি শুনিয়া

অস্থির হইলেন ; “ওরে কুসী, বেয়াল্ ছানা কাঁদে কেন রে ? বুঝি শীত ক’রছে ।”

কুসুম । তুমি ঘুমোও, ঘুমোও । ও’র মাকে পাচ্ছে না বলে ডাক্চে ।
এখন ও’র মা আসবে, তখন চুপ করবে ।

এ কথা বাবার মনঃপূত হইল না । তিনি উঠিলেন, এবং বিড়াল-শাবকটাকে আপনার লেপের মধ্যে আনিয়া কোলে করিয়া শুইলেন । তবুও সে থামে না ! বাবা বলিলেন, “আহা, শিশু কিনা, বোধ হয় উদরের পীড়া হ’য়েছে ।”

কুসুম (রাগিয়া) । হাঁ ! ও’র উদরের পীড়া হ’য়েছে ! যাও, তুমি উঠে গিয়ে কবিরাজ ডেকে আন !

এই ‘উদরের পীড়া’র বিষয়ে একটু কথা আছে । আমার বাবা সামান্য কথোপকথনেও অনেক সময় শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন । ইহা লইয়া আমাদের বাড়ীতে সময়ে সময়ে বড় হাসাহাসি হইত । তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । একদিন তিনি দ্বিপ্রহরের সময় আহা়ারান্তে শয়ন করিয়াছেন । সবে নিদ্রা আসিতেছে, এমন সময় পাড়ার কতকগুলি বালকবালিকা আমার ভাগিনেরীর সঙ্গে খেলিবার জন্ত আসিয়া উপস্থিত । তাহারা গোল করিতেছে । বাবা, বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আঃ, নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে, এখন কে গোল করে ?” মা আসিয়া ছেলেকুলিকে তাড়াইয়া দিলেন ; বলিলেন, “বাঃ, যাঃ, অন্য জায়গায় খেলগে যা । এখন ‘কর্ষণ’ হচ্ছে, দেখ্‌চিস না ?” এই লইয়া আমার ভগিনীদের মধ্যে মহা হাসি উঠিয়া গেল ।

অধিক কি, ইতর প্রাণীদের উপরে বাবার এতই ভালবাসা যে, একদল শকুনির প্রতি নির্ভরতা অপরাধে তিনি আমার স্ব-গ্রামবাসী ব্রাহ্ম বন্ধু কালীনাথ দত্তের প্রতি একবার হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন । সে ব্যাপারটা এই । কতকগুলি শকুনি কালীনাথ বাবুর নারিকেলবাগানের

নারিকেল গাছে বসিয়া সৰ্বদাই নিজেদের বাসা বাঁধিবার জন্য পাতা ছিঁড়িত। কালীনাথ বাবু শকুনিগুলিকে ভয় দেখাইবার জন্য বা মারিবার জন্য একবার একটা বন্দুক আনিলেন। ইহা শুনিয়া বাবা চট্টিয়া গেলেন, এবং বলিলেন, “এরা আবার ব্রাহ্ম! শকুনি তোমার গাছের পাতা নেবে না, আমার গাছের পাতা নেবে না, তবে কি ওদের নিজের গাছ আছে যে বাসা বাঁধবে?” আমার স্মরণ আছে, ইহার কিছুদিন পরে আমি বাড়ীতে গেলে, আমাকে ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন; এবং ইহা অমুভব করিয়াছিলাম যে সে-জন্য কালীনাথ বাবুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই পিতার গৃহে জন্মিয়া ইহারই দৃষ্টান্তের প্রভাবের ভিতরে আমি বর্দ্ধিত হইয়াছি। আমি আত্মজীবন পরীক্ষা করিয়া পরিকাররূপে দেখিতে পাই যে, এই তেজস্বিতা, এই সত্যানুরাগ, এই দৃঢ়চিত্ততা, এই সহনশীলতা শৈশব হইতে না দেখিলে আমি নীতির মূল্য এরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না। কিন্তু অপরদিকে ইহাও অমুভব করি যে, পিতার তেজস্বিতা, মনুষ্যত্ব, আত্মমর্যাদাজ্ঞান, ও দৃঢ়চিত্ততা আমি পূর্ণ মাত্রাতে পাই নাই। এগুলি আরও অধিক মাত্রাতে আমাতে থাকিলে ভাল হইত।

(২)।— জননী গোলোকমণি দেবী।

আমি শৈশব হইতে যেমন পিতাতে মনুষ্যত্ব ও দৃঢ়-চিত্ততার আদর্শ দেখিয়া আসিয়াছি, তেমনি জননীতে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মনিষ্ঠার আদর্শ দেখিয়াছি। আমার মাতামহ ধার্মিক পুংস্বরের আদর্শ ছিলেন; আমার মাতুল দেশে কর্তব্যপারায়ণ, দৃঢ়চেতা ও স্বদেশপ্রেমিক মানুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার পিতা সত্যবাদী, দৃঢ়চেতা ও পরোপকারী পুংস্বর ছিলেন; সুতরাং আমার জননী ধর্মপরায়ণতা ও সুনীতির প্রভাবের

মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই প্রভাবের মধ্যেই বর্ধিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে তেজস্বিনী ও মনস্বিনী নারী ছিলেন। তাঁহাতে দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না; কোমলতা ছিল, কিন্তু ভীরুতা ছিল না; সাধুভক্তি পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কিন্তু অন্ধতা ছিল না; স্বধর্ম্মাহুতাগ প্রবল ছিল, কিন্তু পরধর্ম্মে বিদ্বেষ ছিল না।

তাঁহার আত্মমর্যাদাজ্ঞান প্রবল ছিল। আমার পিতার আর কখনই মাসে ৩০।৩৫ টাকার অধিক ছিল না। মাতা এমন অসুগৃহিণী ছিলেন যে, ইহাতেই পুত্রের শিক্ষা, তিন কন্যার বিবাহ ও ধার্মিক হিন্দু গৃহস্থের ক্রিয়া কৰ্ম্ম সমুদয় নির্বাহ করিয়াছেন। অথচ আমার জ্ঞানে আমি কখনও তাঁহাকে নিজ অভাব অপরকে, এমন কি তাঁহার পিত্রালয়েব মানুষকেও জানাইতে, বা কাহারও নিকট ছু টাকা ঋণ করিতে দেখি নাই। তিনি আমার পিতাকে সম্পূর্ণ রূপে ঋণহীন রাখিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মপরায়ণতা যেন তাঁহার অস্থি মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়াছিল। তৎপরে, বাল্যকালে বিবাহিত হইয়া তিনি যখন আমাদের ভবনে আসিলেন, তখন আসিয়াই অশীতিপর বৃদ্ধ আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় রামজয় স্ত্রায়ালঙ্কার মহাশয়ের সেবাতে নিযুক্ত হইতে হইল; ঐ সাধু পুরুষের সংসর্গে ও উপদেশে মাতার ধর্ম্মভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি তাঁহার নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন, এবং দেবতার স্তায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। আমার প্রপিতামহ এ লোক হইতে অস্তর্হিত হইবার পর পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল মাতা ঠাকুরাণী জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার স্মৃতি একদিনের জন্তও আমার মাতার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত আমার প্রপিতামহের জপের মালা লইয়া প্রতিদিন জপ করিয়াছেন।

শৈশবে আমি একবার কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইলে তিনি বে হাতে

ও মাথাতে ধুনা পোড়াইয়াছিলেন এবং বুক চিরিয়া সেই রক্ত দিয়া ঈষ্ট-দেবতার স্তব লিখিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে* ।

যৌবনে যখন আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলাম, তখন মার প্রতীতি জন্মিল যে, তাঁহার পূর্বজন্মের কোন পাপের জন্তই সন্তানের দুর্দশি ঘটিয়াছে । তিনি আমার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিলেন না, কিন্তু এই বিশ্বাসের বশবর্তিনী হইয়া তিনি তাঁহার জপ তপ ব্রত নিয়মের মাত্রা অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দিলেন । দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাইলেই আমার ঠিকুজী কোষ্ঠী তাঁহাকে দেখাইতেন, এবং যে-ব্রাহ্মণ যে-কিছু ব্রত বা ধর্মীয়ুষ্ঠান করিতে বলিতেন, তাহাই করিতেন । এইরূপে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া গেল, এবং তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল ; বহু বার চিকিৎসার জন্ত তাঁহাকে কলিকাতাতে আনিতে হইল । অবশেষে একজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার কোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন যে আমার কোষ্ঠীতে আছে, কখনই আমার দেবতা ব্রাহ্মণে মতি হইবে না । তখন হইতে জননী নিস্তার পাইলেন ।

পিতা ও মাতাতে কি প্রভেদ ! পিতা আমাকে মারিবার জন্ত গুণ্ডা ভাড়াতে কয়েক বৎসরে ২০।২২ টাকা ব্যয় করিলেন ; আর জননী আমার জন্ত ব্রত নিয়মে প্রায় ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিলেন ।

গত বৎসর (১৯০৭ সালের জুন মাসে) গুরুতর পীড়াতে আমি যখন যত্নশয্যাতে শয়ান ছিলাম, তখন জননী আসিয়া কিছুদিন আমার নিকট ছিলেন । তখন প্রতিদিন প্রাতে নিজের পূজা সারিয়া, আমাকে মস্তপুত জল একটু পান করাইতেন ; প্রপিতামহের জপের মালা আমার কণ্ঠে এবং নিজের পদধূলি আমার মস্তকে দিতেন । আমার বহুসংখ্য দমিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আমার জননী দমেন নাই । তখন তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা

দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার প্রার্থনা ও আশীর্বাদে আমি সারিয়া উঠিব।

এই স্বাভাবিক ধর্মভাব তাঁহার প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ ছিল। তিনি গয়া কাশী বৃন্দাবন জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি সমুদয় প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন; তথাপি পুণ্যস্থান দেখিবার আকাঙ্ক্ষা মিটত না। তাঁহার ধর্মাকাঙ্ক্ষা যেন অসীম ছিল।

আমার শৈশবকাল হইতেই জননী তাঁহার হৃদয়ের সর্বোচ্চ ভাবগুলি আমার হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথমতঃ, আমার বর্ণপরিচয় হইলেই এবং পড়িতে শিখিলেই তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যে-দিন আমার পাঠশালা বা স্কুল থাকিত না, সেইদিন দুপুরবেলা তিনি আহাবান্তে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলে আমাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত। যে স্থানটী অধিক মিষ্ট লাগিত, দিনের পর দিন বহুবার তাহা পাঠ করাইতেন, এবং মাতা পুত্রে সে স্থানটি মুখস্থ আবৃত্তি করিতাম। তদবধি বহু কাল আমি রামায়ণেব অনেক স্থল মুখস্থ বলিতে পারিতাম। এই দীর্ঘকাল পরেও রামায়ণের কোনও কোনও দৃশ্যের ছবি যেন আমার চক্ষেব সন্মুখে রহিয়াছে। এইরূপে, ব্রাহ্মধর্মের ভাব পাইবার পূর্বে, রামায়ণের ধর্ম আমার ধর্ম ও রামায়ণের নীতি আমার নীতি ছিল। তখন রামায়ণের আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আছে, ইহা কেহ বলিলে আমি সহ্য করিতে পারিতাম না।

দ্বিতীয়তঃ, মা যদি কখনও শুনিতে পাইতেন যে, কেহ আমার সহিত এইরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়াছে যাহাতে ঈশ্বরে ও পরকালে অবিশ্বাস প্রকাশ পায়, তখন তিনি বাখিনীর ভায় তাহার মধ্যে পড়িতেন, অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ কবিতেন, ও সে তর্ক থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। এমন কি, আমার পিতাও যদি তর্কস্থলে এমন কিছু বলিতেন, তাহাও মা সহ্য করিতেন না। বলিতেন, “আমার ছেলের মাথা খেয়ে।

না।” * এই কাৰণেই বোধ হয় এই দীৰ্ঘ কালৰ মध्ये এক দিনেৰ জন্তুও আমাৰ মনে ঈশ্বৰ ও পৰকালৰ প্ৰতি অবিশ্বাস জন্মে নাই। এমন দিন কি এমন ক্ষণ মনে হয় না, যখন আমি ঈশ্বৰেৰ সত্যতে অবিশ্বাস কৰিরাছি।

আৰ একটা ভাব মাতাৰ মध्ये দেখিতে পাইতাম। কপটাচাৰী ব্যক্তিদের প্ৰতি আমাৰ মাত্ৰ আন্তৰিক ক্লণা ছিল। বাহাৰা মুখে বড় কথা বলে কিন্তু কাজে ছোট কাজ করে, বাহা মনের বিশ্বাস নহে তাহা কাজে দেখায়, ভিতরে অসাধু থাকিয়া বাহিৰে সাধুতাৰ পৰিচ্ছদ পৰিধান করে, মা তাহাদের নাম পৰ্য্যন্ত সহ্য কৰিতে পাৰিতেন না। কেহ তাহাদের প্ৰশংসা কৰিলে তাঁহাৰ গায়ে যেন তপ্ত জলেৰ ছড়া দিত। হয় উঠিয়া যাইতেন, নতুবা সে প্ৰশংসা থামাইয়া দিতেন, এবং বলিতেন, “বলোন, বলোন! ওৰ ধৰ্ম্মেৰ মুখে ছাই! ওৰ গেক্ৰুয়া কাপড়ের, ওৰ ভয় মাখাৰ মুখে ছাই!”

আৰ একটা এই দেখিতাম যে, যে-কাৰ্য্য তিনি একবাৰ কৰ্ত্তব্য বলিয়া অনুভব কৰিতেন, তাহা অতি দৃঢ়তাৰ সহিত কৰিতেন; লোকের অনুৰাগ বিৰাগেৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিতেন না। তাহাৰ একটা নিদৰ্শন দিতেছি। একবাৰ দুভিক্ক হইয়া অনেকগুলি নিৰন্ন লোক আমাদের গ্ৰামে উপস্থিত হইল। তাহাদের মध्ये একটা নিরন্ত্ৰেণীৰ লোক চৰম অবস্থাৰ মৃতপ্ৰায় হইয়া আমাদের পাড়াতে আসিয়া পড়িল। পাড়ার ব্ৰাহ্মণ-কন্যাগণ তাহাকে ঘিৰিয়া ফেলিলেন। আমাৰ জননীও তাৰ মध्ये ছিলেন। মা তাহাৰ কাছে বসিয়া “তুমি কত দিন খাও নি?” বলিয়া জিজ্ঞাসা কৰিতে লাগিলেন। সে তখন কথা বলিতে পাৰে না, কেবল হাঁ কৰিয়া নিজের ক্লুখা জানাইতে লাগিল। মা বলিলেন, “আমি ওৱ

মুখে ভাত দিব”, এই বলিয়া ভাত আনিতে গেলেন। পাড়ার মেয়েরা বলিতে লাগিলেন, “ও মা, তা কেমন করে হবে! ও কি-জাত, তাঁর ঠিক নাই। কোনও নীচ জাতীয় লোককে ডাক, সে খাওয়াক্,” ইত্যাদি, ইত্যাদি। মা সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। ভাত আনিয়া ভাল করিয়া মাখিয়া তার মুখে দিতে লাগিলেন; সে আহার করিল। জল দিলেন, জল পান করিল। কিন্তু হার, পরক্ষণেই প্রাণবায়ু তার দেহকে পরিত্যাগ করিল। আমার মা কাঁদিতে লাগিলেন। তার পর মা আমাকে বলিয়াছিলেন, “ও বোধ হয় পূর্বজন্মে আমার কোনও আত্মীয় ছিল।”

কোথাও পুরাণ পাঠ হইতেছে বা ধর্মের ব্যাখ্যা হইতেছে শুনিলে, মাকে নিতান্ত অন্তঃস্থ অবস্থাতেও এবং নিতান্ত বার্কিক্যেও ধরিয়া রাখা যাইত না। আমাদের বাড়ী হইতে দূরে হইলেও লাঠির উপর ভরু করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন।

একবার মা আসিয়া আমার বালিগঞ্জের বাসাতে কিছুদিন ছিলেন। তাহার মধ্যে তাঁহার কি একটা ব্রত উপস্থিত হইল। ঐ ব্রতের সময় ব্রতকারিণীকে একটা “কথা” শুনিতে হয়। আমি পূজা করিবার ব্রাহ্মণ আনিলাম, কিন্তু সে বেচারী সে “কথা”টা জানিত না। আমি আবার ব্রাহ্মণ খুঁজিতে বাহির হইলাম। ব্রাহ্মণ পাইলাম না। আসিয়া দেখি, মা আসন দিয়া আমার ভবনের এক পার্শ্বে বসিয়াছেন, এবং বিড় বিড় করিয়া সমগ্র “কথা”টি বলিয়া যাইতেছেন। আমার কন্যারা তাঁহাকে ঘিরিয়া হাসিতেছে, বলিতেছে, “ওমা, এ কেমন কথা-শোনা!” তিনি হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে চুপ করিতে বলিতেছেন। শেষে উঠিয়া হাসিয়া বলিলেন, “কেন? কথা শোনা চাই, এই মাত্র ধর্মে বলে। পরের মুখে শুন্বে কি নিজের মুখে শুন্বে, তার ত নিয়ম নাই? কথা শুনে আমার কাণে গেলেই হল। আমারই কথা আমার কাণে গেল,

‘এই ৫ হল ?’ এক নাক্ষী বলিয়া উঠিল, ‘ধনি ঠাকুৰমা তোমার বুদ্ধি !’ মা বলিলেন, “বুদ্ধি না ? কথাটা না শুনলে ত্রুটা পণ্ড হয়, তাই নিয়মটা রক্ষা করা গেল।”

বাবা বোধ হয় লোকের মুখে “বাহবা পণ্ডিত মশাই।” এই কথাটা শুনিতে ভাল বাসিতেন ; অন্ততঃ আমাব মাতাঠাকুৰাণী এইকপ মনে কবিতেন। কাৰণ, কোনও ক্ৰিয়া কৰ্ম্ম কবিবার সময় ধৰ্ম্মে বতদূৰ চায়, শাস্ত্ৰে যাহা বলে, তাহা কৰিয়া বাবা সন্তুষ্ট হইতেন না ; এমন কৰিয়া কৰিতে চাহিতেন যাহাতে সকলে ধস্তি-ধস্তি করে। ইহা যে সকল স্থলে প্রশংসাপ্ৰিয়তা হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা নহে ; বাবার সন্তুষ্টিতাই অনেক স্থলে ইহাৰ মূলে থাকিত। লোককে দিতে খাওয়াইতে তিনি ভালবাসিতেন। কিন্তু আমাব মনে হয়, তাঁহার প্রকৃতিতে একটু প্রশংসা-প্ৰিয়তাও বোধ হয় ছিল। যাহা হউক, মা এই টুকুও সহ্য কৰিতে পাৰিতেন না। এই প্রশংসাপ্ৰিয়তাৰ গন্ধটুকু থাকাতে আমার বাবার ক্ৰিয়া-কৰ্ম্মে মা বড় আস্থা রাখিতেন না। বলিতেন, “তুমি ত ধৰ্ম্মার্থে ৩৩ কব না, যত ‘ভালাবে পণ্ডিত’ শোন্‌বার ভঞ্জে কর।” এই লইয়া দই জনে অনেকবার বিবাদ হইতে দেখিয়াছি। মা ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মের মধ্যে কোনও প্রকার ঔভিসন্ধিৰ গন্ধ সহ্য কৰিতে পাৰিতেন না।

যাহা কিছু অসৎ, যাহা কিছু অপবিত্ৰ, তাহাব প্রতি মাতার এত ঘৃণা ছিল যে, শৈশবে আমি এবং আমার ভগিনীগণ পাড়ার বালক-বালিকাদের সঙ্গে মিলিয়া কত যে খারাপ বিষয় দেখিতাম, কত খারাপ কথা শুনিলাম, তাহার একটাও বাড়ীতে আনিতে সাহস কৰিতাম না। আমি একবার একটা খারাপ কথা বাড়ীতে উচ্চারণ কৰিয়া যে সাজা পাইয়াছিলাম, তাহা যথাস্থানে লিখিয়াছি। মা ভালবাসিবার সময় ফুলের গুধৰ কোমল, অথচ শাসন কৰিবার সময় লোহের স্তায় কঠিন হইতেন।

অতএব ইহা আমি অকুণ্ঠিত ভাবে বলিতে পারি যে, আমি যে জৈবরৈ ও পরকালে, এবং সত্যে ও নিজ কর্তব্যে আস্থা রাখিতে শিখিয়াছি, তাহা অনেক পরিমাণে আমার জননীর দ্বারা। তিনি যে কেবল তাঁহার স্তনদুগ্ধের দ্বারা আমাকে পালন করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; তাঁহার চরিত্রের দ্বারাও আমার চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন ।

(৩) ।—জ্যেষ্ঠ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ।

১৮৫৬ সালে আমি যখন আমার পিতার সহিত কলিকাতাতে পড়িতে আসিলাম, ও চাঁপাতলায় আমার মাতামহের বাসাতে উঠিলাম, তখন মাতামহ মহাশয় সেখানে ছিলেন না। তিনি পীড়িত হইয়া দেশে ছিলেন। আমি সেই সময় হইতে বাসার অপরাপর লোকের ব্যবহার ও আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যবহারে কিছু পৃথক দেখিতাম। তিনি তামাকটি পর্য্যন্ত খাইতেন না ; সর্বদা গম্ভীর, বাসার আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন না ; এবং সর্বদা পাঠে মগ্ন থাকিতেন। তিনি বোধ হয় তখন তাঁহার গ্রীস ও রোমের ইতিহাস লিখিতেছেন। গৃহে যেমন তাঁহাকে পাঠে নিযুক্ত দেখিতাম, সংস্কৃত কলেজে পড়িতে গিয়াও দেখিতাম, তিনি লাইব্রেরী-গৃহের এক কোণে পাঠে নিমগ্ন আছেন। এমন গম্ভীর যে লোকে তাঁহার কাছে যাইতে ভয় পায়। বাস্তবিক, তিনি এমন গম্ভীর মানুষ ছিলেন যে আমার মার মুখে শুনিয়াছি, দাদা যেরূপ আছেন দেখিলে ভগিনীরা পায়ের মল টানিয়া হাঁটুর কাছে তুলিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ীতে নামিতেন। বড় মামার এত কম কথা কহা অভ্যাস ছিল যে, আমাকে যে এত ভাল বাসিতেন আমাকেও কখনও একটি আদর বা ভালবাসার কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়া আছেন বা বেড়াইতেছেন দেখিলে আমরা সে দ্বার দিয়া বইতাম না।

আমার বয়স যখন ১২ কি ১৩ বৎসর, ও আমার বড় মামীর বয়স ১৭ কি ১৮, (ইনি বড় মামার তৃতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠী,) তখন মাসীরা একটা কথা লইয়া বড় হাসাহাসি করিতেন, তাই মনে আছে। সে কথাটা এই। মামার পড়ার নেশা এমন প্রবল ছিল যে, রাত্রি ১১টার সময় বড় মামী যখন গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া শয়ন করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন যে বড় মামা এমন পাঠে নিমগ্ন যে একবার মামীর দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। মামী গায়ে পড়িয়া কথা কহিতে গেলেন, বড় মামা বাম হস্তের ইসারা করিয়া তাঁহাকে থামিতে আদেশ করিলেন। মামী মানিনী হইয়া দম্ করিয়া আছড়িয়া বিছানাতে পড়িলেন, সে রাত্রে আর মামার সহিত কথা কহিলেন না। বাস্তবিক, আমি অনেক দিন রাত্রি ১১টার সময় শয়ন করিতে যাইবার সময় দেখিয়াছি, বড় মামা পাঠে নিমগ্ন; আবার রাত্রিশেষে ৪টার সময় উঠিয়া দেখিয়াছি, বড় মামা পাঠে নিমগ্ন। বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছি, তবে তিনি যুমান কখন!

১৮৫৮ সাল হইতে সোমপ্রকাশ কাগজ বাহির হইলে এই নির্জন-বাস ও পাঠাভ্যাস অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল। যখন তিনি তাঁহার ছাপাখানা ও সোমপ্রকাশ কাগজ তাঁহার বাসগ্রাম চাকড়িপোতাতে তুলিয়া লইয়া মাতলা বেলওয়ার ডেল প্যাসেঞ্জার হইলেন, তখনও দেখিতাম, গাড়ী আসিতে বিলম্ব আছে, নানা জনে নানা কথা কহিতেছে, তিনি একপাশে তন্মনস্ক হইয়া কলেজে বাহা পড়াইবেন, সেই পুস্তক পাড়িতেছেন। গাড়ীর মধ্যে তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া অনেকবার দেখিয়াছি, নানা জনে নানা প্রশঙ্গ করিতেছেন, তিনি কিছুতেই বড় একটা যোগ দিতেছেন না, হঁ-হাঁ করিতেছেন মাত্র; অধিকাংশ সময় হয় নয়ন মুদ্রিত করিয়া চুলিতেছেন, না-হয় কলেজের পুস্তক দেখিতেছেন। কেবল, বাহাতে কোনও অন্তর বা অবশ্যের প্রতিবাদ আছে, এরূপ কোনও আলোচনা উঠিলে, ও তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার মুখখানি বদলিয়া

বাইত ; অত্যাশ্রয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। বলিতে কি, তিনি ট্রেনে, বে-কামরাতে থাকিতেন, সেই সময়ের জন্য সে-কামরার হাওয়া যেন উন্নত ভাব ধারণ করিত।

কর্তব্যকার্যে তাঁহার এমনি গাঢ় অভিনিবেশ ও চিন্তের একরূপ অন্তরত একাগ্রতা দেখিতাম যে, তিনি যখন বাড়ীতে থাকিতেন, তখন দেখিলে মনে হইত যে সৌম্যপ্রকাশ দেখা ভিন্ন তাঁহার পৃথিবীতে অল্প কার্য্য নাই ; আবার কলেজে গিয়া যখন বসিতেন, তখন দেখিলে মনে হইত যে কলেজে পড়ান ছাড়া তাঁহার পৃথিবীতে অল্প কার্য্য নাই। বাস্তবিক তিনি বে-কাজটা একবার কর্তব্য বলিয়া ধরিতেন, তাহা সমগ্র হৃদয়ের সহিত ধরিতেন ; ক্ষতিক্রমে ক্ষতি বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, এবং সে-কার্য্য উদ্ধার না করিয়া ছাড়িতেন না। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

একবার তিনি একদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে গোপজাতীয়া একটি বিধবা যুবতী কাদিতে কাদিতে সেই পথ দিয়া চলিয়াছে। বড় মামা তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, গ্রামের একজন ধনী লোক তাহাকে দাসী করিয়া বাড়ীতে রাখে ; সেই অবস্থাতে তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া বিপথে লইয়া যায় ; এবং তৎপরে তাহাকে সসজ্জা দেখিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সে তখন নিকৃষ্টপায়। শুনিয়া বড় মামার ক্রোধান্বিত জলিয়া উঠিল। তিনি প্রথমে সেই ধনীকে নিকটে লোক পাঠাইয়া ঐ হতভাগিনীর ভরণ-পোষণের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাকে অকৃতকার্য্য হইয়া রাজস্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন ; নিজে ব্যয় দিয়া মোকদ্দমা চালাইবার বোগাড় করিলেন। এই অবস্থাতে বোধ হয় ঐ ধনী ব্যক্তি সেই জীলোককে যাবজ্জীবন মাসে ৪৮ টাকা করিয়া দিতে রাজি হইল। তৎপরে বিধবার গর্ভের সন্তানটী যাহাতে নষ্ট না হয়, মামা তাহার উপায় করিলেন, এবং মাতা পুত্রের রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মার একটি দৃষ্টান্ত এই। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতুল মহাশয় অল্পভব কবিত্তে লাগিলেন যে, গ্রামে একটি ভাল ইংরাজী স্কুল থাকা আবশ্যক। তৎপূর্বে গ্রামের জমিদার বাবুদের স্থাপিত একটি স্কুল ছিল। প্রথমে বড় মামা তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সেটাকে ভাল করিবার প্রয়াস পাইলেন। তুই তিন বৎসরের মধ্যেই অল্পভব করিলেন যে সে-প্রয়াস বার্থ। তখন নিজের উপরেই স্কুলটার উন্নতি সাধনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া সেই কার্যে দেহমন অর্পণ করিলেন। তাঁহার জ্ঞান একজন দরিদ্র বাক্ষণ পণ্ডিতের পক্ষে ইহা যে অতিশয় দুঃসাহসিকতার কার্য, এ কথা কেবারও তাঁহার মনে আসিল না। স্কুলটার সমগ্র ব্যয়ভার তাঁহার উপরেই পড়িয়া গেল। এই ভার তিনি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত বহন করিয়াছেন। মাসেব প্রথমে সংস্কৃত কলেজের বেতন পাইলেই সেই দিন বাড়ী ফিরিবার সময় তিনি প্রথমে স্কুলে গিয়া স্কুলের আয় ব্যয় দেখিয়া আবশ্যকমত নিজ বেতন হইতে অর্থসাহায্য করিয়া শিক্ষকদিগের বেতন দিবার বন্দোবস্ত করিয়া তবে বাড়ী যাইতেন।

আমার মাতুলের উদারতা ও মহত্বের কোনও কোনও বিবরণ অগ্রে দিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি আর করিলাম না। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার পিতা মাতার চরিত্রের পর আমার মাতুলের চরিত্র আমার চরিত্রগঠনের পক্ষে প্রধানরূপে কার্য করিয়াছে। তাঁহার জ্ঞাননিষ্ঠা, তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা, তাঁহার স্বদেশাত্মরাগ, তাঁহার অকপটচিত্ততা চিরদিন আমার মনে স্মৃতিত রাখিয়াছে। আমার 'রামতল্লা লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থে তাঁহার জীবনচরিত্র দিয়াছি।

(৪)।—পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আমার মাতুলের পরেই বীর সংগ্রহে আসিয়া আমি বিশেষরূপে উপকৃত হই, তিনি পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমি ১৮৫৬ সালে

নয় বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসি। আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হই। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কেবল তাহা নহে, বন্ধুত্বসূত্রে আমার মাতুলের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত মধ্যোমধ্যে আমাদের বাসাতে আসিতেন। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি আমাকে দেখিলেই হাতের দুই অঙ্গুলি চিম্টার মত করিয়া আমার ভুঁড়ির মাংস টানিয়া ধরিতেন। এই ভয়ে, তিনি আসিতেছেন জানিতে পারিলেই, আমি সেখান হইতে নিরুদ্ধেশ হইতাম। কিন্তু তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আসিয়াই আমাকে খুঁজিতেন, আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। আমার বাবাকেও অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং মাতুলের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ লইয়া বিচার উপস্থিত হইলে, বাবাকে ডাকিয়া মীমাংসা করিয়া লইতেন। বাবার ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল।

কলেজে আমরা তাঁহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতাম, এবং তাঁহা হইতে দূরে দূরে থাকিতাম। ছেলেরা দুষ্টামি করিলে তিনি ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেন, কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন, এবং 'বইয়ের পাতাকাটা সুইসের দ্বারা তাহাদের পেটে মারিতেন। আমার যেন মনে হয়, আমার কোনও দুষ্টামির জন্ত আমাকে ধরিয়া লইয়া আমার ভুঁড়িতে মারিয়াছিলেন, ও আমাকে কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন।

আমরা কলেজের ছোট বড় সকল ছেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একজন কণ্ঠজ্ঞানী পুরুষ বলিয়া মনে করিতাম। আমার বেশ মনে আছে, তিনি যখন ডিরেক্টরের সহিত বগড়া করিয়া কলেজ ছাড়িলেন, তখন আমরা গবর্ণমেন্টের উপর মহা চট্টিয়া গিয়াছিলাম। তিনি যেন আমাদের প্রাণ সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

তার পর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁর সঙ্গে আরও গাঢ় যোগ হইতে লাগিল। আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে বাবার যে রকম

হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারও মনে বড় ক্লেশ হইয়াছিল। বাবা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “মামুষ যেমন ছেলে যমকে দেয়, তেমনি আমি ছেলে কেশবকে দিয়াছি,” তাহাতে বিজ্ঞানগণ মহাশয় কান্দিয়াছিলেন। কিন্তু পথে বাটে আমার সঙ্গে দেখা হইলেই প্রথম প্রশ্ন এই করিতেন, “হাঁ রে তোর কেমন ক’রে চলে?” আমি গৃহভাঙিত হইয়া কষ্ট পাইতেছি, এই মনে করিয়া তাঁর ক্লেশ হইত।

আমি গবর্ণমেন্টের চাকুরী যখন ছাড়িলাম, তখন একজন গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “মশাই, পাজিটা এমন স্থলের চাকুরীটা ছেড়ে দিলেই।” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “কোন পাজির কাছে বলছ? সে ত আমার মনের মত কাজ করেছে।”

কেহ তাঁহাব নিকট গিয়া আমাকে গালাগালি করিলে, তিনি আমার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের জন্ত দুঃখ করিতেন, কিন্তু বলিতেন, “যাই বল, ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।”

আমি নানা স্থলে, নানা অবস্থাতে তাঁর সঙ্গে মিশিয়া তাঁর প্রকৃতির গুণসকল দেখিবার যথেষ্ট অবসর পাইতাম। এরূপ দয়াবান, সদাশয়, তেজোবান, উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মামুষ এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমার প্রণীত ‘প্রবন্ধাবলী’ নামক গ্রন্থে ‘বিজ্ঞানগণ’ প্রবন্ধে তাঁহার অনেক গুণের উল্লেখ করিয়াছি।

(৫)।—প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী।

অনুমান ১৮৫০ সালে কলিকাতার ৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত রাজপুর নামক গ্রামে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রসন্নময়ীর জন্ম হয়। তাঁহার বয়স্ক্রম যখন এক মাস হইল, তখন দাক্ষিণাত্য মুসলিম বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কুলপ্রথা অনুসারে তাঁহার পবিত্র আচার বিবাহ সন্ধি হইয়াছিল, এবং তাঁহার ৯ কি. ১০ বৎসর ও আচার ১১ কি. ১২

বৎসর বয়সে ঐ সম্বন্ধ বিবাহে পরিণত হয়। আমার প্রপিতামহ পূজ্যপাদ রামজয় ভাট্টালকার মহাশয় এই বাগ্‌দান ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

বালিকা প্রসন্নময়ী বধুরূপে আমাদের গৃহে আসিয়া বড় অধিক সমাদরে গৃহীত হন নাই। জ্ঞানালোচনাতে ও সামাজিক অবস্থাতে হীন বলিয়া আমার খণ্ডরকুলের ব্যক্তিগণের প্রতি আমার পিতামাতার, বিশেষতঃ আমার পিতার অবজ্ঞা ছিল। প্রসন্নময়ী সে গৃহের কণ্ঠা, স্নতরাং তিনিও কিয়ৎ পরিমাণে সেই অবজ্ঞার অংশী হইয়াছিলেন। তাঁহার সকল কাজ কর্মের মধ্যে আমার জনক জননী অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বংশের পরিচয় পাইতেন। তাঁহার বালিকাসুলভ সামান্য সামান্য ক্রটি-সকলও গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে বালিকা বধুকে স্বশ্রা ও গুরুজনের সমক্ষে কিরূপ ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়, তাহা অনেকে জানেন। অতি অল্প বালিকাই সে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। এরূপ সকল দিক দেখিয়া চলা, সরল প্রকৃতির বালিকা প্রসন্নময়ীর বুদ্ধিতে কুলাইত না; স্নতরাং তিনি স্বরায় পতিগৃহে বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

আমি এখন এই সকল কথা বলিতেছি; তখন বকি নাই। তখন আমিও বালক ছিলাম, সম্পূর্ণরূপে গুরুজনের ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের প্রভাবের অধীন ছিলাম। আমি তখন অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকিতাম। গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে গৃহে যাইতাম; তখন বালিকা পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু তখন আমি অপরের চক্ষেই তাঁহাকে দেখিতাম, এবং অনেক সময় গুরুজনের শাসনের উপরে শাসনের রাজ্য বর্ধিত করিয়া প্রসন্নময়ীর জীবনকে বিঘন করিতাম। তাহা স্বরণ করিয়া পরে অনেক ক্ষোভ করিয়াছি।

বাহা হউক, আমার বাল্যাবস্থা না স্মৃতিতেই গিতুকুল ও স্বতন্ত্র

কুল উত্তরকুলের মধ্যে বিবাদ পাকিয়া উঠিল। প্রসন্নময়ীকে আমাদের গৃহ হইতে নির্বাসিত করা হইল, এবং আমি পিতামাতার এক মাত্র পুত্র বলিয়া, আমাকে দারাস্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইল।

এই কার্যের পরেই আমার মনে অশুশোচনার উদয় হয়, তাহার ফলে আমি অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকি। ব্রাহ্মধর্ম হৃদয়ে প্রবেশ করিলে আমি অনুভব করিলাম যে প্রসন্নময়ীকে অকারণে সাজা দেওয়া হইয়াছে। তখন আমি তাঁহাকে নিবাসন হইতে গৃহে আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। তিনি পুনরায় আমাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এদিকে আমি এক এক পা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তৎপরে অনেক প্রকার পরীক্ষার ভিত্তি দিয়া আসিতে হইল। সে সকলের উল্লেখ নিম্নরোজন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে-সমুদয় পরীক্ষার মধ্যে প্রসন্নময়ী আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। গোপনে উৎসাহ দান করিয়া আমাকে সবল করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সেই দিন আসিল, যখন আমাকে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। ১৮৬৯ সালে আমি প্রকৃত্ত ভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলাম। সে সময়ে প্রসন্নময়ীকে দক্ষবাক্যব আত্মীয় স্বজন সকলেই আমার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। আমার শিশু কন্যা হেমলতাকে লইয়া আমার নিকট আসিলেন। আমি তখনও ছাত্র। যে সামান্য ছাত্রবৃত্তি পাইতাম, তদ্বারাই নিজের তরল পোষণ নির্বাহ করিতাম। সকলেই বুঝিতে পারেন, গৃহত্যাগিত হইয়া আমাদিগকে কি বোয় দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। প্রসন্নময়ী অতি কষ্টজিন্দে সেই দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

তৎপরে যখন আমি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রসন্নময়ীকে গোপনে বলিলাম যে ধর্মপ্রচারে জীবন দিতে আমার ইচ্ছা, তিনি তাহাতে স্বিকৃতি করিলেন না। বলিলেন, “তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই কর।” আমি বিধাতার দ্বারা চালিত হইয়া অগ্রে অগ্রে ধর্ম-প্রচারের পথে আসিয়া পড়িলাম। প্রসন্নময়ী বিবোধী হইলে, কখনই এ পথে সুখে ও সহজে আসিতে পারিতাম না। তিনি কেবল যে বাধা দিলেন না, তাহা নহে, বরং সকল প্রকার দারিদ্র্য ও পরীক্ষা বহন করিবার জন্ত বন্ধপবিকর হইলেন।

এদিকে দুই একটি করিয়া গৃহহীন বালিকার জন্য আমাদের গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইল। ক্রমেই তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। আমি আনিতাম, তাহাতে যেন আশ মিটিত না, প্রসন্নময়ী নিজেও জুটাইতেন। এই রূপে বিভিন্ন সময়ে আমাদের গৃহে বিশ বাইশটি বালক-বালিকা আশ্রয় লইয়াছে। প্রসন্নময়ী ইহাদিগকে নিজের সন্তাননির্বিশেষে পালন করিতেন। সে বিষয়ে কোন প্রভেদ করিতেন না। তাহাদের আবদার ও উপদ্রব সহিতেন, তাহাদিগকে রান্না খাওয়াইতেন, রোগে সেবা করিতেন, কোনও প্রকারে মায়ের অভাব জানিতে দিতেন না। অধিক কি, ইহা বলিলে অভ্যুত্তী হইত না যে, সকল গৃহস্থের গৃহের চারিদিকেই প্রাচীর থাকে, বিনা অনুমতিতে কেহ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না, এবং তাহারা আপনাদেরটা আপে দেখিয়া পরেরটা পরে দেখে; কিন্তু প্রসন্নময়ীর হৃদয়ের গুণে আমার গৃহের চারিদিকে যেন প্রাচীর ছিল না। যে আসিয়া আপনার হইয়া থাকিতে চাহিত, সেই বসিতে পাইত; আশ্রয়ার্থী হইয়া কেহই বিমুখ হইত না।

এখন তাঁহার কতকগুলি গুণের কথা বলি। তাঁহার প্রথম গুণ পরকে আপনাত্মক করা। এ বিষয়ে তাঁহার সমকক পুত্র ন্য

দ্বীলোক দেখি নাই। যে সকল বালিকা এক সময়ে আমাদের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে, তাহারা পরে বেথানেই বাউক, বেথানেই থাকুক, আমার বাড়ী তাহাদের বাপের বাড়ীর মত হইয়াছে। প্রসন্নময়ী সহস্র কাজের মধ্যে তাহাদের সংবাদ লইয়াছেন, অর্থের দ্বারা সহায়তা করিয়াছেন, ও তাহাদের ভদ্রাভদের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিয়াছেন। মৃত্যুশয্যাতে পড়িয়াও তাহাদের অনেকের নাম করিয়াছেন ও দেখিতে চাহিয়াছেন। সত্য সত্যই পরকে আপন করা এরূপ দেখা যায় না।

দ্বিতীয় গুণ গৃহকার্য্যে দক্ষতা। যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন সকলেই জানেন, তিনি আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না। যতদিন শরীরে শক্তি ছিল, রাঁধুনী রাখিতে দিতেন না; নিজ হস্তে পাক করিয়া সন্তানদিগকে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। এ কথা বলিলে বোধ হয় অভুক্তি হয় না যে, আমার সন্তানেরা কখনও তাহাদের মাতাকে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ; অর্থাৎ তাহারা নিদ্রিত হইলে তিনি শয্যাতে যাইতেন, এবং তাহারা উঠিবার পূর্বেই গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকার্য্য অর্ধেক সারিয়া ফেলিতেন। সাধনাপ্রসঙ্গে আসার পর প্রাতে ৮টার পূর্বে রাঁধিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত রাখিয়া যথাসময়ে উপাসনায় যোগ দিতেন।

তৃতীয় গুণ কাজের শৃঙ্খলা। তিনি অনিয়ম সহ্য করিতে পারিতেন না। রন্ধনশালার বা ভাঁড়ার ঘরে সর্বদা একটি বড়ী রাখিতেন। বড়ীর নিয়মানুসারে সকল কাজ করিতেন। আমাদের বহু বান্ধব সকলে বলিতে পারিতেন, তিনি কোন্ বস্তুর কি কাজ করিতেছেন।

চতুর্থ গুণ হৃষ্টচিত্ততা। তিনি যে এত পরিশ্রম করিতেন, একদা নিরন্তর্য্যে বাস করিতেন, সংসারের এত ভার বহিতেন, তাঁহার মুখ দেখিলে তাহা বুদ্ধিতে পারা যাইত না। সর্বদা প্রফুল্ল থাকিতেন আর গান করিতেন, বা সুখে সুখে কোনও ছড়া আবৃত্তি করিতেন। পাইয়া

হাসিয়া অভিনয় করিয়া পরিবারস্থ সকলকে চিত্র-আনন্দে রাখিতেন, বন্ধুগণ সর্বদা বলিতেন, এই আমুদে পরিবারের লোকে হুঃখ কাহাকে বলে জানে না।

তঁাহার স্বাভাবিক হৃষ্টচিত্ততার ছইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার আমাদের বড় দারিদ্র্যের অবস্থা উপস্থিত হয়। সেই সময়ে প্রসন্নময়ীও আরসীখানি ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তঁাহার একখানি নূতন আরসী কিনিবার পরস্য ছিল না। তিনি জলের জালাতে মুখ দেখিয়া চুল বাঁধিতে আরম্ভ করেন। এ সকল কথা আমি জানিতাম না। একদিন আমার বন্ধু হর্গামোহন দাস মহাশয়ের পত্নী ব্রহ্মময়ী অপরাহ্নে তঁাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে প্রসন্নময়ী জলের জালার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কি হেমের মা, জলের জালার কাছে দাঁড়িয়ে কেন?” প্রসন্নময়ী হাসিয়া উত্তর করিলেন,—“আরসীখানা ভেঙ্গে গেছে, তাই জলের জালাতে মুখ দেখে চুল বাঁধছি।” ব্রহ্মময়ী—“ও মা, এমন ত কখনও শুনি নি।” প্রসন্নময়ী অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন,—“দেখলেন, আমি কেমন একটা নূতন দেখালাম।” ছই জনেই হাসিতেছেন, এমন সময় আমি উপস্থিত। তখন আমি সমুদয় কথা জানিতে পারিলাম। এ কথাটাও আমার এই সঙ্গে বলা আবশ্যক যে আমার বন্ধু-পত্নী হাসিলেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটার তাঁর প্রাণে একটা আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড একখানি স্থল্লর আরসী কিনিয়া আনিয়া উপহার দিলেন।

আর একটি ঘটনা এই। এইরূপ দারিদ্র্যের অবস্থাতে একবার আমাদের বি ছিল না। একদিন প্রসন্নময়ী একখানি মলিন বসন পরিয়া প্রাজনে ঝাড়ু দিতেছেন, এমন সময়ে কাহাদের বাড়ীর একজন স্ত্রীলোক পাড়াতে বেড়াইতে আসিল। সে প্রসন্নময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ গা, তুমি এদের বাড়ী বাসে কত মাইনে পাও?” প্রসন্নময়ী বলিলেন,—“ও গো,

আমাকে এরা মাইনে দেয় না, পেটঃ ১ এদের বাড়ীতে আছি।” সে দ্বীলোক আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছে, এমন সময়ে আমার সন্তানদের মধ্যে কেহ মা বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রসন্নময়ীকে ধরিল। তখন সে দ্বীলোক বলিয়া উঠিল,—“ও মা, তুমি এ বাড়ীর গিন্নি।” তখন প্রসন্নময়ী খ্যাংরা ফেলিয়া অটুহাস্ত করিয়া গৃহের মধ্যে গেলেন।

পঞ্চম গুণ পবিত্রচিত্ততা। পবিত্রাচরিতাতে তিনি নারীকুলের অগ্রগণ্য শ্রেণীতে ছিলেন। অপবিত্র কার্য্যের প্রতি এমন গভীর ঘৃণা প্রাপ্ত দেখা যায় না। অভদ্র আলাপ, অভদ্র পরিহাস সহ করিতে পারিতেন না; এমন কি, মলিন চিন্তাও কখনও মনে উদয় হইত না। অধিক কি, যদি কখনও মলিন স্বপ্ন দেখিতেন তাহাতেও চরিত্রের হীনতা জ্ঞানে ক্ষোভ করিতেন। আমি বুঝাইয়া সে ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিতাম না।

ষষ্ঠ গুণ সরলতা। তিনি কাগরও অনিষ্ট চিন্তা কখনও করেন নাই। সংসারের কুটিল পথ একেবারেই জানিতেন না। তাঁহার চিন্তের সরলতা এতই অধিক ছিল যে, তিনি পঞ্চাশৎ বৎসরেরও অধিক কাল সংসারের মধ্যে বাস করিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয় মনে কলঙ্কের রেখাও পড়ে নাই।

সপ্তম গুণ, তাঁহার শিক্ষা কিছুই ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তিনি আমার কয়েকজন বন্ধুর প্রতি অন্তরের একরূপ শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে কেহই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মন এমন কুসংস্কারবিহীন ও সামাজিক বিষয়ে এত অগ্রসর ছিল যে, দেখিয়া অনেকের আশ্চর্য্য বোধ হইত; অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি। আমরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পক্ষেও আমার জনক জননী সর্ব্বদাই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন যেস আমার সন্তান-গণ ব্রাহ্মণকেই বিবাহ করে। প্রসন্নময়ী বলিতেন, “তা কি বলিবে পারি ?”

ছেলে মেয়েরা যাকে ভাল বাসিবে তাকেই বিবাহ করিবে। ব্রাহ্ম যখন হইয়াছি, তখন আবার জাত কি ?” কাজেও সেইরূপই করিয়াছেন।

উপাসনাতে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রোগে নিতান্ত অশক্ত হইলেও প্রতিদিন ঈশ্বরোপাসনা করিতে ভুলিতেন না। এমন কি, যে-রোগে তাঁর প্রাণ গেল তাহার মধ্যেও যতরূপ শক্তি ছিল অতি কষ্টে শয্যাতে উঠিয়া বসিয়া গান ও ঈশ্বরোপাসনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে সময়ে প্রায় প্রতিদিন সাধনাশ্রমের উপাসনা কালে বলিতেন, “আমাকে লইয়া আশ্রমের বারান্দাতে শোয়াও।” আমি শিলচর হইতে “প্রসন্নময়ীর অবস্থা খারাপ” এই টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতায় আসিলাম। আসিয়াই ডাকিয়া বলিলাম, “দেখ, আমি আসিয়াছি।” তখন তিনি বলিলেন, আমার মাথার কাছে বসিয়া উপাসনা কর।” মৃত্যুর পূর্বে কতাদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমার মৃত দেহ ঘাটে লইয়া যাইবার পূর্বে একবার আশ্রমের উপাসনা-কুটারের বারান্দাতে শোয়াস্।” তদনুসারে তাঁর শবদেহ আশ্রমের বারান্দাতে রাখিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

তাঁহার সরল পবিত্র হৃদয়ে পরস্পরবিরোধী ভাবের আশ্চর্য্য সমাবেশ দেবিয়াছি। হুনীতির প্রতি তাঁহার এমনি বিরাগ ছিল যে ওরূপ জলন্ত ঘৃণা প্রায় দেখা যায় না। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিজের একজন নিকটস্থ আত্মীয়ের কোনও গর্হিত অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, সে-ব্যক্তি দেখা করিতে আসিলে দেখা করিলেন না, এবং আর তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ ঋণ করিয়া টাকা দেয় না, মিথ্যা প্রবঞ্চনা কবে, বা আরও কিছু গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে, শুনিলে ঘৃণাতে অধীর হইয়া উঠিতেন। বলিতেন, “ব্রাহ্মসমাজে কি মানুষ নাই ? এই হতভাগাদিগকে কান ধরিয়া দূর করিয়া দেয় না কেন ?” অথচ যদি আবার বিশ্বাস হইত যে, কোনও জীলোক দুর্বলতারশতঃ পাপে পড়িয়াছে বা তাহাকে

‘প্রবঞ্চনাপূর্বক কেহ বিপথে লইয়াছে, এবং সেজন্য সে অমৃতপ্ত, তাহা হইলে ভগিনীর জ্ঞান তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিতেন; সময়ে অসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। বলিতে কি, অমৃতপ্ত ব্যক্তির প্রতি তাঁহার সন্তাব দেখিয়া আমরা সবাকু হইয়া যাইতাম।

সমাজের কাজ লইয়া ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত সমস্ত সমস্ত আমার মত-বিরোধ হইত। সাধারণতঃ আমি বাহিরের কথা ঘরে লইয়া যাইতাম না। কিন্তু প্রসন্নময়ী যদি কাহারও মুখে শুনিতেন যে আমাকে কেহ ককশ কথা বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কিছুই বিরক্ত হইতেন না। বলিতেন, “সমাজ তোমারও যেমন, তাঁদেরও তেমনি, দশ কথা বলিলেই দশ কথা শুনিতে হয়।” অধিক কি, নববিধানের বন্ধুগণের সহিত কত বিরোধ করিয়াছি, ও তাঁহাদিগের কত কটুক্তিভাজন হইয়াছি, তাহা সকলেই জানেন। প্রসন্নময়ীকে যদি কেহ ঐ সকল কটুক্তির কথা শুনাইত, তিনি হাসিতেন; ঐ সকল কটুক্তিসত্ত্বেও নববিধানের যে সকল বন্ধব সহিত তিনি একবার একগৃহে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আপনার লোক ও অগ্রজ ভ্রাতার জ্ঞান দেখিতেন, তাঁহাদের নাম হইলেই গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, দেখা হইলেই আনন্দিত হইতেন। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধাঙ্গদ ভ্রাতা গৌরগোবিন্দ রায় ও কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়-দ্বয় তাঁহাকে রোগশয্যাতে দেখিয়া বাহিরে বাইবার সময় লোকের নিকট বলিয়া গিয়াছিলেন, “ইনি ত আমাদের লোক।” বাস্তবিক, প্রসন্নময়ী যেখানেই থাকুন, প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে মনে মনে তাঁহাদের লোক রহিয়াছিলেন। তবে নববিধানের নূতন মত ও কাজ কর্তৃক ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। বলিতেন, “এ সব মতিভ্রম কেন ঘটিল!”

এই ত একদিকে আমার বিরোধীদিগের প্রতি উদারতা। কিন্তু অপর দিকে যদি কখনও শুনিতে পাইতেন যে, কোনও লোক গোপনে

আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে নিন্দা করিতেছে বা লোকচক্ষে আমাকে হীন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন আর তার নাম সহ্য করিতে পারিতেন না। বলিতেন, “ও কাপুরুষের নাম আমার নিকট করিও না”, বলিয়া ক্রোধভরে সে স্থান ত্যাগ করিতেন।

এই সকল গুণে প্রসন্নময়ী সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল আমার সন্তানেরাই যে মা-হারী হুস্কা-ছিল তাহা নহে, তাঁহার জন্ত অনেকের চক্ষে জল পড়িয়াছিল।

আমি বহু বৎসব পূর্বে ঈশ্বর চরণে নিবেদন করিয়াছিলাম,—

“আমি বড় হুঃখী তাতে হুঃখ নাই ;

পবে সুখী ক’বে সুখী হতে চাই।

নিজে ত কাদিব,

কিন্তু মুছাইব

অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।

সত্য !—ধন মান

চাহে না এ প্রাণ ,

যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই।

বহু কষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,

এই আশীর্বাদ কর, হে ঈশ্বর,—

খাটিতে বাচিব,

খাটিয়া মরিব,

এই বড় আশা ; পূর্ণ কর তাই।”

তখন আমি যে ছবি আদর্শে রাখিয়াছিলাম, প্রসন্নময়ী তাহা জীবনে পরিণত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সংসারের শত কষ্ট ও অশান্তির মধ্যে পরকে সুখী করিয়া সুখী হইয়াছেন, নিজে কাঁদিয়া অপরের অশ্রু মুছাইয়াছেন, এবং অনলস শ্রমশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যথার্থই তিনি খাটিতে বাচিয়াছেন ও খাটিয়া মরিয়াছেন।

ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ନାମ-ସୂଚୀ ।

[ଅକ୍ଷରାଳି ପୃଷ୍ଠାବ ସଂଖ୍ୟାବ ସୂଚନା]

ଅ

ଅକ୍ସଫର୍ଡ୍ ୩୨୭, ୩୨୯

ଅସୋବକାମିନୀ ୨୦୧, ୨୮୧-୨୯୦

ଅସୋବନାଥ ଶୁକ୍ଳ ୧୦୨, ୧୧୩, ୨୯୬

ଅକ୍ଷ କନ୍ଫାରେନ୍ସ ୫୬୨

ଅଗ୍ରଦାଚରଣ ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ୧୬୯, ୧୯୧, ୧୯୨, ୨୧୦, ୨୨୧

ଅଗ୍ରଦାମିନୀ ସବକାମ ୧୬୫

“ଅଗ୍ରପୂର୍ବ” ୮

ଅଭିଧାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ସାମା) ୨୧, ୨୨

ଅଭିଧାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ସ୍ଵପ୍ନ) ୧୦୬

ଅଭିଧାନ ଦାମ ୧୧୯

ଅଗ୍ରତାଳ ବନ୍ଧୁ ୩୩

ଅଗ୍ରତାଳ ୨୯୮, ୩୨୯

ଅସୋଧ୍ୟାନାଥ ପାକଡାଶୀ ୮୧, ୧୧୩, ୧୧୫

ଅଗ୍ରକଟ୍ (କର୍ମେଷୁ) ୩୦୧, ୩୦୨

ଅଗ୍ରତୀ ଦେବୀ ୫୫୦

“ଅଗ୍ରବାହୁ” ପତ୍ରିକା ୩୫, ୧୧୯, ୧୧୯

ଆ

ଆଗ୍ରା ୨୯୦, ୫୬୨

ଆଦର୍ଶ (ନବଗ୍ରାମ) ୨୯୬, ୨୯୭

আদবানি (শৌকিরাম) ২২৬

আনন্দচন্দ্র মিত্র ২৪৪, ২৫৮

আনন্দচন্দ্র রায় ৩১১

আনন্দময়ী (পিসী মাতা) ৭, ১৭-১৯, ২৪, ২৭, ৭০—৭৩, ৪৭৫—৪৭৭, ৪৮৫

আনন্দমোহন বসু ১৩৮, ১৫৯, ২২৪-২৩০, ২৪০, ২৪৪, ২৪৭-২৫৩, ২৬৩,

২৬৭-২৭০, ২৭৪, ২৭৭-২৭৯, ২৮৪, ৩০৯, ৩১০, ৪৫৪

“আনন্দবাদী দল” ১৬৮

“আপার মিড্‌ল ক্লাস” স্কুল ৩৯২

আমদপুর ৫৬, ৮২, ৮৫

আরা ২৭৩, ৪৫৮

আর্নল্ড (এডুইন্) ৪০৭

আর্য্যসমাজ ২৯৩, ৩১৪, ৪৪০

আলিপুর ৯০

আলেগ্‌জাণ্ড্রা প্যালেস্ ‘ ৩৯০

“আশ্রমের ইতিবৃত্ত” ৪৫৫-৪৫৭

আসাম ৩৫৩-৩৫৮

আহমদাবাদ ২৯৮, ২৯৯, ৩০২

ই

“ইণ্ডিয়ান আইডিলস” ৪০৭

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ২২৬-২৩০, ২৪৮, ৩৫৪

“ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার” পত্রিকা ৩৪৩, ৩৪৪, ৪৩৮

ইণ্ডিয়ান রিকর্ম এসোসিয়েশন্ ১৮০, ২৭১

ইণ্ডিয়ান ব্যাডিক্যাল লীগ ১৩২

ইণ্ডিয়ান লীগ ২২৮-২৩০

ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী ৪৩২

“ইন্দুপ্রকাশ” পত্রিকা ২৯৮

ইন্দোর ৪৩৯-৪৪১, ৪৬২

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯

ইম্পী (কাথারিন) ৪১৪-৪১৮

ইম্পী পরিবার ৪১৩-৪১৮

ইংলণ্ড ৩৬২-৪৩৩

ঈ

ঈশানচন্দ্র রায় ১২১, ১২২, ১২৪, ১৩২, ১৩৬, ১৪৬, ১৪৭

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৮, ৬৪, ১০৪

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ১৭৩, ১৭৪

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২০, ৪৯, ৫০, ৫৬, ৬১, ৭৫, ৯১, ১০১, ১০২, ১২১, ১২২,

১৩০, ১৩৯—১৪৪, ২২৭, ২২৮, ৪৬৫, ৪৭৬, ৪৮০, ৪৯৭—৪৯৯

উ

উইগ্‌স্‌ কাস্‌ল্‌ ৪২০

উইলিয়ম্‌ ষ্টেড্‌ ৪০০—৪০৩, ৪২৫

উইলিয়াম্‌ (অধ্যাপক মনিয়ার) ৪০৩

উদ্রো সাহেব ৯৭—১০০, ২২২, ২২৩, ৪৭২

উর্দাদিনী ২৫—২৭, ৪০, ৪১, ৬৬, ৬৭, ১১৫, ১৬০

উপাসক মণ্ডলী ৪৫৮, ৪৫৯

উপেন্দ্রনাথ বসু ২৫৭, ২৭৪

উপেন্দ্রনাথ দাস ১২১, ১৩২—১৪২

উর্দানাথ গুপ্ত ২৫৭, ৩০৪

উমেশচন্দ্র দত্ত ৩০, ৮৭, ৮৮, ১০৭, ২০৯, ২২২, ২৩০, ২৩৬

উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০২, ১০৮, ১০৯, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৮, ১৭৬

- “এট কি বাস বিবাহ ?” ২৫, ১৬৭
 এক্সপ্রেস (কুমারী) ২১১
 “এডুকেশন গেজেট” পত্রিকা ১০০—১০১
 এলাহাবাদ ২৭৩, ২৯৮, ৩০৪, ৭৬, ৭৬২
 এলবার্ট্‌ হিল ২২৮, ২৫১
 “এস এন্‌ ডট্‌” ১০১, ১০২

—

- ওয়ালগ্‌ (বি এম) ২৯৮
 ওয়া (বেঞ্জামিন্‌) ৩৮০
 ওয়ার্কিং মেন্‌স্‌ ইনস্টিটিউট ৩, ১—৩৮৬
 ওয়েষ্টন্‌-সুপার-মেরার ৩৯৭
 ওয়েষ্টমিনস্টার অ্যাবী ৪২১

—

- কটক ৪৬০, ৪৬১
 কনকিউসিয়ার্স ৪৩৩, ৪৩৪
 কব্‌ (মিস্‌) ৩৯৭
 “কমলকুটার” ২৪৩, ৩৩৯, ৩৪
 কমলাস্বা ৩৩০, ৩৩১
 কর্‌টি ২৯৬
 কলং দ্ব ৪৩৬
 কলাইঘাটা ১৫৮, ১৬৫
 কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী ৪, ১, ৪৫২
 কলিকাতা কলেজ ১০৯
 কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমী ১১৩

কলেট (মিন্) ৩৬৫, ৩৭২, ৩৭৩, ৪০৭, ৪৩১, ৪৩২

কংফুচ ৪৩৩, ৪৩৮

কাউয়েল (ই বি) ১১, ৬২, ৩৯৪, ৩৯৫

কাকুডগাছি . ৮২

কানপুর ৪৬২

কানাই বাবু (ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের চেডমাষ্টার । ২৮১

কান্তিচন্দ্র মিত্র ১৮৩, ১৯০, ১৯১, ২৪৯, ২০৭

কামিনা সেন ৩৬৩

কাবপেন্টার (অধ্যাপক জন্ এষ্টলিন্) ৪০৩

কার্লিকট ৪৪৭—৪৪৯, ৪৬২

কালীনাথ দত্ত ৮৭, ৮৮, ১৬৩, ২৩০, ৪৮৬, ৪৮৭

কালীনাথ বসু ১৫৭

কালানারায়ণ গুপ্ত ৪৩৬

কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ১৬৫

কাশী ৩৫৮—৩৬১

কাশীচন্দ্র ঘোষাল ৪৫৫

কাশীধর মিত্র'১৭৩

কাক্সারগাটেন ৩৯১, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৫

“কুচবিহার বিবাহ” ২৪৩—২৪৯, ২৫২—২৫৯, ২৭১

কুঞ্জলাল ঘোষ ৪৬০

কুডোরাম চৌধুরী ৮২

কুণ্টে ২৯৮

“কুল সম্বন্ধ” ৭, ৮, ১১৯

কুলী আইন ৩৫৪, ৪০০

কুসুম (কনিষ্ঠা ভগিনী) ৪৮১-৪৮৬

কৃষ্ণচরণ নাপিত ৭৪

কৃষ্ণদাস পাল ৩১১

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৮

কৃষ্ণবিহারী সেন ১৫৯, ২৮০

কেদারনাথ বায় ১৫—১৭, ২১০, ২৩০—২৩৪, ২৫৮

কেশ্বজ ৩৯৩—৩৯৫

কেল্কাব (সদাশিব পাণ্ডুরঙ্গ) ৫৪১

কেল্নার কোম্পানী ৪৩৮

কেশবচন্দ্র সেন ৮৭, ১০৮, ১০৯, ১৩৯, ১৫৪—১৫৯, ১৬৮, ১৬৯

১৭১, ১৭৭—২০০, ২১০—২১৫, ২২১, ২২৪—২২৬, ২৪৩—

২৫৯, ২৬২, ২৬৩, ৩০২—৩০৬, ৩৩৮—৩৪১, ৩৪৮—৩৫০

৪৫২, ৪৯৯

কেশবচন্দ্র সেনের পত্নী ১৮৩—১৮৭, ২৫৮, ২৫৯, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৯

কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ৪৯, ১০৪

“কৈশব দল” ১৭১

কোইম্বাটুর ৩২৭—৩৩০, ৪৪৭, ৪৪৯, ৪৬২

কোকনদা ৩২১—৩২৬, ৪৪৯—৪৫২, ৪৬৫, ৪৬২

কোন্নগর ২২৬

“কৌমুদী” পত্রিকা ২৬৬

ক্যাথারিন্ ইম্পী ৪১৪—৪১৮

ক্রিষ্টাল্ প্যাগেল্ ৩৭৪

ক্ষেত্রনাথ শেঠ ১৭৪

খাণ্ডোয়া ৪৩৯, ৪৪৬, ৪৪৭

১৩৫৩

খোদাই (ভূত) ২৪০, ২৪১

খোঁড়া জাঠতুত বোন্ ৩২

খ্রীষ্টিয়া যুবতী ২৩৪—২৩৬

গ

“গঙ্গাধর হাতী” ৬৩, ৬৪

গঙ্গার বাদা ১

গণেশচন্দ্র ঘোষ ২৭০, ২৭২, ৩১১

গণেশসুন্দরী ১৬৫—১৬৮, ২০৮

গর্ডন (সেনাপতি) ৩৭৪, ৩৭৫, ৪২১

গার্জপুর ৩০৪

গুড়িত চক্রবর্তী ৫৯

শুকচরণ মহলানবিশ ১৩৬, ২৭৪, ২৭৭, ৩১০, ৩১৭, ৪৪৫, ৪৫২, ৪৫৮

শুরদাস চক্রবর্তী ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৮

গোপালচন্দ্র মল্লিক ১৫৫, ১৫৬, ১৭৫

গোপালস্বামী আয়ার ৩৩০

গোয়ালপাড়া ৩৫৪

গোলোকমণি দেবী (মাতা) ১০, ১৫—৫৫, ৭১—৭৪, ১০৫—১০৭,

১১২, ১১৮, ১৪৭, ১৬০—১৬৪, ২৩৭—২৪০, ৩৫৮—৩৬০, ৪৫২,

৪৬৭, ৪৭৪—৪৯৪

গোবর্দ্ধন শিরোমণি ৪৭৯, ৪৮০

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ২৬৩

গৌরগোবিন্দ রায় ১৮১, ২৫৩, ৫০৭

গোহাটী ৩৫৪

ঘ

“ঘনানিবিষ্ট দল” ২৪৩, ২৫৮

চ

চন্দননগর ৪৫৯

চন্দাবরকার (নারায়ণ গণেশ) ২৯৮, ২৯৯

চন্দ্রকেতু দত্ত ২

চাক্কাড়িপোতা ৮, ১০, ৮০, ১১৮, ১৬০, ১৯৯, ২০২, ৪৭৫, ৪৭৬

চার্লস্ (ডাক্তার) ১৮১

চাঁদমোহন মৈত্র ৬৪

চিন্তা (দাসী) ২৭, ২৮

“চৈতন্যচরিতামৃত” ৩

“চৌদ্দ আইন” ২১২

ছ

ছাত্রসমাজ ২৮৪, ২৮৫

জ

জগদ্রথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৩ - ১১৭, ১২২

জননী—“গোলোকমাণ দেবী” দেখ।

জন ব্রাইট ৪১৭

জয়নগর ১

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ৩৯৫

জর্জ মুলার ৩৮০, ৩৮৮, ৪৩৬

“জাতহরী” ২৪, ২৫

জালাসি (গ্রাম) ২১ - ২৭

জেম্‌স্ মার্টিনো ৩৯৫, ৩৯৬

জোন্‌ (সার উইলিয়ম্) ৪২১

জাননা (রামকুমার বিজ্ঞানবৈজ্ঞানিক পত্রী) ২৭২

ট

- টম্‌সন (আর্নল্ড) ৩৮২, ৩৮৪
 টম্‌সন হল ৩৮৪
 "টাইমস্" পত্রিকা ১৮১
 "টি কে ঘোষের একাডেমী," ঝাঁকিপুর ২৮৯
 টিপু সুলতান ৪৪৮
 টি মাধব রাও (মাধ) ২৯৮
 টুণ্ডলা ২৯০—২৯২
 "ট্যালমন্ড" গ্রন্থ ৪৩৩, ৪৩৪
 টুর্নাব কোম্পানী ৪৩১, ৪৩২

⇒

- ঠাকুরদাসী (ভাগিনী) ৩৫৯

ড

- ডিকেন্স্ ৪৬৬
 ডিক্‌গড় ৩৫৪—৩৫৮
 ডুমরাওন্ ২৮৭, ২৮৯
 ডেভিড্‌ হোয়ার ৮
 ড্যান্ (সি এইচ্‌ এ) ১৮১, ৩৩১, ৩৫২, ৩৫৩
 ড্যান্‌হোন্‌ ইন্‌স্টিটিউট ৪৩৭

ত

- "তত্ত্বকোমুদী" পত্রিকা ২৬৬—২৬৮
 "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা ৮৭, ২৬৬
 তরঙ্গিনী (দ্বিতীয়া কল্প) ১৬৫, ৩৬১
 "তিন.আইন" ১৮১

তিনকড়ি বোম্ব ২৮৯

“তুলী” ১৬৫, ৩৬১

তেজপুৰ ৩৫৪

তেলাঙ্গ (কে.টি) ২৯৮

ত্রিচিনপল্লী ৪৪২, ৪৬২

ত্রৈলোক্যানাথ সান্যাল ১৬৯

থ

ধাকর্মণ ২৩০—২৫৪

ধিওড়োর পাকার ১০৭, ১১০, ১৫৩

থিয়সফিক্যাল সোসাইটি ৩০১, ৩০২

দ

দক্ষিণেশ্বর ১১৫

দয়ানন্দ সরস্বতী ২৯৩, ৩১৪

দয়াল সিং (সর্দার) ২৯৪

“দরবার” ৩০৬

দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ২, ৩, ১১৯, ৪৯৯

দার্কিলিং ৩১১—৩১৩, ৩৫০, ৩৫২, ৪৬১, ৪৬২

দিব্লী ৪৬২

দুর্গামোহন দাস ১৭৬, ১৯১, ২০১, ২১৭—২২১, ২৪৫, ২৪৮, ২৫২,
২৫৪, ২৫৫, ২৭৪, ৩০৯, ৩৬২, ৩৬৩, ৪০৫, ৪৩০, ৪৩১

দুলচী (বিড়াল) ৪৮৫

দেপুর্ ১০৬

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ২৫৩, ২৫৬

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৭, ১৫৩—১৫৬, ১৯৪, ২২৬, ২৩০, ২৩১, ২৬৩,

২৭২, ২৭৪—২৭৭, ৪৫৬

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৯১, ১৯২, ২১০—২১৩,
২৪৮, ২৫৩, ২৫৫, ২৬৬, ৩০৬, ৩৪৪, ৩৫৪—৩৫৮

দ্বারকানাথ ঠাকুর ৪৩০

দ্বারকানাথ বাগ্‌চি ২৭১

দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ ৮, ৯, ১৫, ১৬, ৫৬—৮১, ১০০, ১০৪, ১১৩, ১২৪,
১৪৯, ১৫৪, ১৫৫, ১৬১, ১৭১, ১৮৩, ১৯৮—২০০, ২২৩, ৪৯৪—৪৯৮

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৩, ২৭৪, ২৭৬

ঈ

“ঈশ্বরজীবন” ৪৫৯

“ঈশ্বরতত্ত্ব” পত্রিকা ১৫৮, ১৮৩, ২১৩, ২১৪, ২৬৬

ধুবড়ী ৩৫৪

ঋ

ঋগ্‌গী ৩৫৪

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯০, ১৯১, ১৯৫, ১৯৬, ২০০, ২১০, ২১৩,
২১৪, ২২১, ২২২, ২৩০

নন্দলাল বায় ১৬৫

“নন্দনতারা” ৪৫৯

নবদ্বীপচন্দ্র দাস ৩৫০, ৩৫১

নবলরায় শৌকিরাম আদবানি ২৯৬, ২৯৭

নববিধান ৩০৬, ৩৩২, ৩৪৮, ৩৪৯, ৫০৭

নবীন ঠাকুর ৮৪—৮৬

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ৬৮

নবীনচন্দ্র রায় ২৮৬, ২৯০, ৪৩৯, ৪৪৫—৪৪৭

নবীনচন্দ্র সেন (কবি) ১০২

নবীনচন্দ্র সেন (কেশবচন্দ্র সেনের ছোট) ১৫৬

নাগপুর ৪৬২

নাথুরী ব্রাহ্মণ ৪৪৮, ৪৪৯

নায়র ৪৪৮, ৪৪৯

নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকার ১৯৮, ২৯৯

নারায়ণ পরমানন্দ ২৯৮

নিউম্যান (জন হেনরী) ২১৫

নিউম্যান (ফ্রান্সিস) ১৫৩, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪১৪, ৪৫৫

“নিরুপাসিতের বিলাপ” ১০৩, ১০৪, ১৭১

নীতিবিজ্ঞান ৩৪২, ৩৪৩

নীলকমল দেব ১৬৫

নীলমাণ মিত্র ৩১৬

নেপালচন্দ্র মল্লিক ১৭৫

নেপোলিয়ন্ ১১৪, ৪০৫

নেলসন ৪২০

জাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ২৮৮, ৩৭৫

প

“পঞ্চপ্রদীপ” ২৩০

পরমানন্দ (নারায়ণ) ২৯৮

পরশুরাম ৪৪৭

পার্কার (থিওডোর) ১০৭, ১১০, ১৫৩

পার্নেল ৪০৪

পার্বতীচরণ রায় ৩৫২, ৩৬২, ৩৬৩, ৪৩২

পিগট (মিস) ১৮৬, ১৮৭, ২৪৩

পিতা—“হরানন্দ ভট্টাচার্য্য” দেখ।

পিতামহ (রামকুমার ভট্টাচার্য্য) ৫—৭

পিতামহী (লক্ষ্মী দেবী) ৪—৬

পিসামহাশয় ৪৭৫—৪৭৭,

পিসীমাতা (আনন্দময়ী) ৭,১৭—১৯,২৭,২৭,৭০—৭৩,৪৭৫ ৪৭৭,

৪৮৫

“পীপ্লস প্যালেস” ৫৮৭

পুণা ৩০.

পূর্ণদা প্রসাদ সরকার ৩৪৫—৩৪৮

পূরী ৪৬১

“পুষ্পমালা” ২৪৩

“পুষ্পাঞ্জলি” ২৮২

পৈতৃক বিগ্রহ ২৪, ৪৫, ১১১

প্যারীচরণ সবকার ১০০—১০৩

প্যারীমোহন চৌধুরী ১৩৬

প্রকাশচন্দ্র রায় ২০৬, ২৮৭—২৯০, ৩০৫

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৯৪, ২৪৬, ২৫৬, ২৫৭

প্রপিতামহ—“বামজয় ন্যায়ালঙ্কার” দেখ।

“প্রবন্ধাবলী” ৪৫৯, ৪৯৯

“প্রভাকব” পত্রিকা ৮

প্রমদাচরণ সেন ৩৪৩

প্রসন্নকুমার বার ৪৫৮

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ১০৮, ১১৯, ১৪৯, ১৭৩, ১৮২, ১৮৬

প্রসন্নকুমার সেন ১৯৩

প্রসন্নময়ী দেবী (প্রথম পত্নী) ৬৮—৭০, ১০৪—১০৬, ১১৮, ১৪৭,

১৬৪—১৬৬, ১৮৮—১৯০, ২০১, ২০৬, ২০৭, ২১৪, ২১৫, ২১৯, ২২০, ২৩৮,

২৪১, ২৪২, ২৭২, ২৭৪, ২৮৫, ২৮৬, ৪৬০, ৪৬১, ৪৮০, ৪৯৯—৫০৮

প্রাণকুমার দাস ১৭৫

প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ১৭৫, ৪৬০, ৪৮.

প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী ৬৬, ৮৮

প্রিয়নাথ বসু ৩১২

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ৩৯৫

ফক

ফণীন্দ্র ঘতি ৩১৫ ৩১৬

কসেট (মিসেস) ৪০৩

ব (বর্গীয় ও অন্তঃস্থ)

বঙ্গচন্দ্র রায় ৩০৪

“বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়” ২১১

“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ” ৪৩১

“বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী” (অক্সফোর্ড) ৩৯৩

বড পিসী মাতা (আনন্দময়ী) ৭, ১৭-১৯, ২৪, ২৭, ৭০—৭৩, ৪৭৫—
৪৭৭, ৪৮৫

বডবেলুন (গ্রাম) ৩৪৫—৩৪৮

বড়োদা ২৯৮

“বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়” ১৮৩, ১৮৬, ২৭১

বাইবেল ১৬৬, ১৬৮, ২৩৫, ২৩৬, ৩৭০, ৩৭৯, ৩৮৯, ৪০৮, ৪৩৩, ৪৩৪

বাঘ-আঁচড়া (গ্রাম) ২৭১, ৩৬১

বাল্লোলোব ৩৩০, ৩০১, ৪৪৯, ৪৬২

বাটিলার (মিসেস) ৪০৩, ৪০৪

বারাসত ১০৫

বারিপুর ৮৯

বার্ড কোম্পানী ৩১২

বার্ণার্ডো (ডাক্তার) ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৮

- বাণীগঞ্জ ৪৫৩, ৪৯২
 বাঁকিপুর ২৭৩, ২৮৭—২৯০, ৩০৫, ৪৫৮
 বি এম ওয়াগলে ২৯৮
 বি এল গুপ্ত (মিসেস) ১৯৩
 বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১০৯, ১১৩, ১৫৬—১৫৮, ১৬৯, ২৭০, ২৭১, ৩১১
 বিনোদিনী (হরনাথ বসুর পত্নী) ২১১—২১৩
 বিপিনচন্দ্র পাল ২৪৪
 বিপিনবিহারী সরকার ৪৫২, ৪৫৯, ৪৬০
 “ব্রাহ্মদেব-ই-হিন্দু” পত্রিকা ২৯৩
 ব্রাহ্মমোহিনী দেবী (দ্বিতীয়া গল্পী) ১০৬, ১১৬, ১২৭, ১৩৩, ১৮৭—
 ১৯০, ২০০, ২০১, ২০৯, ২১০, ২২২, ২৩৯, ২৪২, ২৭২, ২৭৪, ২৮৫, ২৮৬,
 ৩৫৯—৩৬১, ৪৫২, ৪৬১, ৪৮১
 বারেনশলিঙ্গম্ পাণ্টুলু ৩২১, ৩২৬
 বাচস্মা পাণ্টুলু ৩২০, ৩৩২
 বৃথ (জেনারেল ও মিসেস) ৩৯০
 বৃথ (ব্রামওয়েল) ৩৯০, ৩৯১
 বেজ ওয়াদা ৪৪৯
 বেণীসংহার নাটক ১৪৮
 বেথুন কলেজ ২১১
 বেলঘরিয়া ১৫২
 বেহালা (গ্রাম) ২০২, ২৭১
 বৈদিক ব্রাহ্মণ ২
 বোম্বাই ২৯৭, ২৯৮, ৪৬২
 বোর্ড স্কুল ৩৯১
 ব্রজনাথ দত্ত ২৯, ৮৭

- ব্রজেন্দ্রকুমার বসু ২৮৯
 ব্রহ্মপুত্র নদ ৩৫৬
 ব্রহ্মময়ী (ভূগামোহন দাসের পত্নী) ২১৭—২২১, ২৪৫, ৫০৪
 বাইট্ (জন) ৪১৭
 বাড্‌ল ৩৭৮, ৩৭৯, ৪১৫, ৪২৫
 “বান্ধ পাবলিক প্রিন্সিপল” পত্রিকা ২৫১, ২৫২, ২৬৬—২৬৮, ৩০৩, ৩৭৩
 “বান্ধ প্রতিনিধি সভা” ২২৫, ২২৬
 বান্ধ মিশন প্রেস ৩৪৪, ৩৪৫
 বান্ধবালক বোর্ডিং ৪৫৭, ৪৫৮
 বান্ধ বালিকা শিক্ষালয় ৩৪৩, ৪৪২—৪৪৫
 “বান্ধসমাজ কমিটি” ২৫২, ২৫৩, ২৫৭
 বান্ধসমাজ লাইব্রেরী ৪৫৮, ৪৭২
 “বান্ধসমাজের ইতিবৃত্ত” ৪০৭, ৪৩১, ৪৩৩
 বান্ধ সাধনাশ্রম ৪৫৩—৪৫৭
 ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ২২৭
 ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী ৩৯২, ৩৯৩
 ব্রিষ্টল ৪২৯—৪৩১
 কক্ (রেভারেণ্ড্‌ ষ্টপ্‌ফোর্ড) ৪০৩, ৪৩২, ৪৩৫
 ক্লাভাট্‌স্‌কী (মাদাম্) ১৩৩, ৩০১, ৩০২
 ক্রেকার (মিষ্টার) ৪৩৮, ৪৩৯

ড

- ভগবতী দেবী (বিদ্যাসাগর-জননী) ১৪৪
 ভগবানচন্দ্র বসু ৩১৬
 “ভগি দিদী” ২০৪, ২০৫
 “ভট্ট বাবু” ৮২, ৮৪

ভন (Vaughan , সাহেব ১৬৭

ভঙ্গসী (রেভারেণ্ড চার্লস্ ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৭৩৮

ভবানীপুর ৮১—১১৩, ১০৯—২২৩

ভবানীপুর (আদি) ব্রাহ্মসমাজ ৮৭, ১০৮, ১১৮

ভবানীপুর (নিজবাটীতে) ব্রাহ্মসমাজ ২১০

ভবানীপুর সাউথ স্বেদাবসন স্কুল ১০৯- ১২৩, ১০

ভাণ্ডারকর (রামকৃষ্ণ গোপাল) ১৯৮

ভারতচন্দ্র (রায় গুণাকর) ৬৪

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ১৬৯, ১৯৭, ২১০, ২১৪. ১৪৫—১৫৭, ১৬৩

৭৪, ৩৭৮

ভাবত সভা ১১৬ ২৩০, ২৪৮, ৩৫৪

ভারত সংস্কার সভা ১৮০, ২৭১

ভারত-আশ্রম ১৮১—২০১, ২১০ —২১৩, ২৭৯, ২৭১.

ভৌমরাও ৩১৩—৩২৬

ভুবনমোহন দাস ২৫২, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩

ভোলানাথ পাল ২৮০, ২৮১

ভোলানাথ সারিভাস ১৯৮

অ

অগরা হাট ৯২

অজিলপুর ১, ৮৭-৯১, ১১০—১১৩, ১১৮, ১৬১—১৬৪

“অজিলপুর পত্রিকা” ২৯

অজিলপুর পাব্লিক লাইব্রেরী ৪৭৪

অজিলপুর বালিকাবিদ্যালয় ৮৮—৯১

অজিলপুর হার্ডিঞ্জ মডেল (বাকলা) স্কুল ২০, ২৮, ৭৫, ৪৭০

অজিলপুরের ইংরাজী স্কুল ২৯

মজঃফরপুর ২৭৩

মতিহারী ২৭৩, ৩১৩—৩১৬

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ২০, ২৮, ৪৭৬

“মদ না গরল ?” ১৮০

মধুসূদন রাও ৪৬০

মণিলাল মল্লিক ১৭৫

মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্‌ (অধ্যাপক) ৪০৩

মনোমোহন ঘোষ ২২৭—২৩০

মনোমোহিনী (গণেশসুন্দরী) ১৬৫—১৬৮, ২০৮

ময়দা (গ্রাম) ১

মস্তুলিপট্টম ৪৪৯

মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে ২৯৮ ৩০২

“মহাপাপ বাল্যবিবাহ” ১৭৫

মহালক্ষ্মী ১২২— ৩২, ১৪২, ১৪৬, ১৪৭

মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় . . ৩— . ১৭

মহেন্দ্রলাল সরকার (ডাক্তার) ১৩১, ১৩২, ২৩৭

মহেশচন্দ্র চৌধুরী ৮১—৮৬, ৯১, ৯৭, ১০৩, ১০৫, ১১৩, ১১৯, ১২০,

মহেশা কাওরা ৪৬৯

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১০৪

“মাঘোৎসবের উপদেশ” ৪৫৯

মাক্সালোর ৪৬২

মাতা—“গোলোকমণি দেবী” দেখ ।

মাতামহ ৮— . ০, ১৫, ১৬, ৫৭, ৪৭৫, ৪৮৪, ৪৮৭

মাতামহী (শ্রীমাদেবী) ১০—১৪, ৭৮, ১১৮, ১২৪, ৪৮০

মাতুল—“স্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ” দেখ ।

মাধব রাও (সার্টি) ২৯৮

মাদ্রাজ ৩১৯—৩৩৮, ৬৪৭—৪৫২, ৪৬২

“মাদ্রাজ মেইল” পত্রিকা ৩২১, ৩২৬

মাটিনো (জেমস) ৩৯৫, ৩৯৬

মাসেলিস্ ৩৬৪

মালাবার উপকূল ৩৪৭

মিউটিনি ৬১ ৩৯৪

“মিবাব” পত্রিকা ৫৪, ১৫৮, ১৯৬, ২১৩, ২১৫, ২২৫, ২৪৮, ৩০২—৩০৬

“মুকুল” পত্রিকা ৩৮৩

মুক্তি ফৌজ ৩০৪, ৩৮৯—৩৯১

মুঙ্গের ১৫৭, ২৪১—২৪৩, ২৭২, ২৮৫

মুদালিয়ার (রঙ্গনাথম) ৩২৭, ৩২৮

মূলতান ২৯৪—২৯৬

মূলার (জর্জ ৩৮০, ৩৮৮, ৪১৬

“মেজ বউ” ২৪০, ২৮৮

ম্যাক্মিলান কোম্পানী ৪৩২

ম্যানিং (মিস্) ৩৭৫

ঘ

যতুমণি ঘোষ , ৩৩৮—৩৪১

যত্ননাথ চক্রবর্তী ১৫৭, ২৫৭

যাজপুর ৩

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ২৪৫

‘যুগান্তর’ ৪৫৯

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জামাতা) ৩৬১

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজ্ঞাতৃষণ) ১০৮, ১০৯, ১১৫, ১১১-
১৩২, ১৩৮, ১৪২, ১৪৮

র

রঘুনাথ রাও (দেওয়ান বাহাদুর) ৩২১
রজনাক্ষম মুদালিসাব ৩১৭, ৩২৮
রঙ্গা চার্লু (দেওয়ান) ৩৩০
রজনীনাথ রায় ১৫৯, ১৬৫, ১৯১, ২১০
রটল্যাম ৪৩৯
রবা (কুর্কুর) ৬৯, ৭০
রমানাথ খোষ ৮৭
রমা (বামকুমার বিজ্ঞারত্নের কন্যা) ৪৬০
রবিবাসরায় নাতিবড়ালয় ৩৪২, ৩৪৩
রাওলপিণ্ডী ৬৬২
রাও (সার টি মাধব) ২৯৮
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৫
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১
রাজনারায়ণ বসু ১৮১, ২৩৭, ২৭৫, ২৭৬
রাজপুর ১০, ৬৮, ২০২, ৪৯৯
রাজমহেন্দ্রী ৩২১, ৩২৬, ৪৪৯
রাজলক্ষ্মী সেন ১৯৩
রাণাডে (মহাদেব গোবিন্দ) ২৯৮—৩০১
রাণী রাসমনি ৯৩.
রাধাকান্ত দেব (সার রাজা) ৯৯
রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৮
রাধাগোবিন্দ মৈত্র ৬৪

বাধাবাণী লাহিড়ী ১৩৮, ১১৬, ১৯৩

বাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (স্কুল ইনস্পেক্টর) ২০৯, ২০২

বাধিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ইঞ্জিনিয়ার) ৩১৭

বামকুমার ভট্টাচার্য (পিতামহ) ৫-১

বামকুমার বিজ্ঞাবহু ২৩১, ২৫৬, ২৭০, ২৭৮, ৩১১, ৩৫১, ৩৫২, ৬৬

গামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকৰ ২৫৮

ନାମକରଣ ପଦ୍ୟମଂ ୨୧୫—୨୧୬

বামকৃষ্ণিয়া ৩২১—৩২৬

বামচন্দ্র চক্রবর্তী ৬১

বামজয় ত্রায়াণদাব (প্রপিতামহ) ১, ১, ১- ১ , ৫, ১ ৫.

55, 59, 2 20, 867, 872, 8 . 0

বামতনু লাহিডা ১৩৮

“বানতনু লাহিডা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” ১৫৯, ১৬১।

বানমোহন বাবু ২৬৬, ৬২৯—৬৩১, ৬৫২

ନାୟାଦବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୧୦

বাটলেজ (জেমস) ১৮১

বেজিমেণ্টাল ব্রান্সসমাজ, বাঙ্গালোব ৩৩০

କ୍ଷ

ଗଞ୍ଜେଇ ୨୭୭

লক্ষ্মী দেবী (পিতামহ) ৪—৬

ବିଶ୍ୱକର୍ମା ୨୦୧, ୨୦୨, ୨୦୪

‘‘ଲହମନ ପ୍ରସାଦ ୫୭୯, ୫୫୦

ମାତ୍ର . ୩୬୫—୪୭୨

লরেন্স (লর্ড) ১৫৬, ১৬৮

লাল সিং ২৯৩—২৯৮, ৩০১, ৩০২

লাবণ্যপ্রভা বসু ৩৪৩

লাহোর ২৯৩, ২৯৪, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৬০

লীলাবতী অগ্নিহোত্রী ১৯৩

লেগ্ (Dr Leggc) ৪১৮

লেহ্‌না সিং ২৯৪

লোকনাথ মৈত্র ১৩৯, ২৪৫

ল

(বর্গীয় ব দেখ ।

শ

শরচ্চন্দ্র বায় ২৪৭

শশিভূষণ বসু (প্রচারক) ৩৫০, ৩৫১

শশিভূষণ বসু (সহঃ সম্পাদক) ৪৫২

শিতিকণ্ঠ মল্লিক ২১৮

শিবরুঞ্চ দত্ত ২৯, ৮৭

শিবচন্দ্র দেব ২৪৭—২৪৯, ২৫৪, ২৭৮, ৩১১

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী ২৯৩, ৩১১

শিবসাগর ৩৫৪—৩৫৮

শিলং ৩৫৪

শিলিগুড়ি ৩১১, ৩৫২, ৩৫৩

শিশিরকুমার ঘোষ ১৩৮, ১৬৮—১৭০, ২২৭—২৩০

শুকনা ৩১২

শুকর মোল্লা ৮৯, ৯০

শেয়ালখাকী (কুকুদ) ৪১—৪৪, ৪৮৪

- শোভাবাজার বাজবাড়ী ১৪৮
 শৌকিরাম আদবানি ১৯৬
 গ্রামবাজার ব্রাহ্মসমাজ ১১৩
 গ্রামাচরণ গুপ্ত ১৮
 গ্রামাদেবী (মাতামহী) ১৮ - ১৪, ১৮, ১১৮, ৪৭০
 শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা ১
 শ্রীনাথ দত্ত ১৫৯, ১৩০
 শ্রীনাথ দাস ১৩২, ১৩১ - ১১২
 শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ৮৩, ৮
 শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাবাস ৭৭১
 শ্রী বাজা রামমোহন রায় প্রাণেড্ স্কল ৩৩৬

স

- স্প্রফোড কক ১০৩, ৭৩১, ৭৩৫
 (ষ্টেড্ (উইলিয়ম) ৪০০- ১০৩, ৪২৫
 স্ট্রট্ (গাম) ৭১০ ৮১৮

স

- সকর ২৯৬
 “সখা” পত্রিকা ৩৪১
 সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ৪৫৮
 সদাশিব পাণ্ডুরঙ্গ কেন্কার ৪৪১
 “সমদর্শী” পত্রিকা ২১৪, ২২৪, ২২৫, ২২৯, ২৪৭, ২৭২
 “সমালোচক” পত্রিকা ২৫১—২৫৩, ২৬৬
 সরলা মহলানবিশ ৩৪৩
 সরোজিনী (কস্তা) ২১৪, ২৪১, ২৪২

ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ୧୬,୬୧—୬୭,୧୧୭,୧୨୦,୧୨୮ ୧୩୨,୧୪୮—୧୫୧,

୧୭୭, ୧୮୭, ୩୨୫

ମାଉଁଷ ସ୍ୱର୍ବାକ୍ଷନ ଶୂଳ (ଭବନୀପୁର) ୨୦୯—୨୨୭, ୩୦୯

ମାଟ୍ରିକ୍ସ୍ ସାହେବ ୨୨୨

“ସାଧନକାନନ” ୨୨୬

ସାଧନାଶ୍ରମ ୫୧୭—୫୧୭, ୫୦୬

“ସାଧନାଶ୍ରମେବ ହାତବୁଦ୍ଧ” ୫୧୧—୫୧୭

“ସାଧାରଣଚକ୍ର” ୨୬୭

ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜ ୨୨୯, ୨୫୦, ୨୫୮—୨୬୧, ୫୭୮ ୫୭୨

ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜର ନାମ ୨୬୨—୨୬୫

“ସାମ୍ବାହିକ ସମାଚାର” ପତ୍ରିକା ୨୨୨

ସାବନାନାଥ ହାଲଦାର ୧୬୫

“ସାରସ ପକ୍ଷୀର ଉକ୍ତି” ୨୫୭

ସାକ୍ଷୀଭାଣ୍ଡ (ଭୋଳାନାଥ) ୨୯୮

ସାମ୍ବିକ ଶୂଳ ୨୭୮—୨୮୫, ୩୫୨, ୫୫୫

ସିନ୍ଦୁରିଆପଟା ବ୍ରାହ୍ମସମାଜ ୨୫୫, ୨୭୨, ୨୮୦

ସିମଳା ୫୬୧

ସୌତାନାଥ ନନ୍ଦୀ ୫୧୭, ୫୫୮

ସୁନ୍ଦରୀମୋହନ ଦାସ ୨୫୫

ସୁରାଟ ୨୯୮

ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ୨୨୬—୨୩୦, ୨୭୮, ୨୭୯

“ସୁଭାଷ ସମାଚାର” ପତ୍ରିକା ୨୮୦

ସୁହାସିନୀ (କଣ୍ଠା) ୨୦୨, ୫୬୦

“ସୋମପ୍ରକାଶ” ପତ୍ରିକା ୭୫, ୮୦, ୧୦୦, ୧୦୫, ୧୫୮, ୧୭୨, ୧୯୮—୨୦୦,

୨୧୦, ୨୨୭, ୨୨୯, ୫୨୫, ୫୨୬

সোসাইটি অব্ বীষ্টিক ফ্রেণ্ড্‌স্ ১৮০

সৌদামিনী খাস্তগির ১৯৩

স্ট্যান্ডেশন আমি ৩০৪, ১৮৯—৩৯১

হ

হরগোপাল সরকার ১৬৪

হরচন্দ্র আয়রভ (মাতামহ) ৮—১০, ১৫, ১৬, ৫৭, ৪৭৫, ৪৮৪, ৪৮৭

হরনাথ বসু ৮৭, ৮৮, ২১১—২১৩

হরলাল রায় ১৭০

হরানন্দ ভট্টাচার্য্য (পিতা) ৩, ৫, ৭, ১৫, ৩৮, ৪১, ৫৫—৮১, ৯৭, ১০৪—

১১৩, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১২৪, ১৬০—১৬৪, ২৩৭—২৪০, ৩৫৮—

৩৬১, ৪৪২, ৪৫২, ৪৬২, ৪৬৫—৪৮৭, ৪৯৮, ৪৯৯

হরিন্দাস দত্ত ২৯

হরিনাভি ২০০—২০৮

হরিনাভি দাতব্য চিকিৎসালয় ২০৩

হরিনাভি আক্ষসমাজ ১৭৭, ২০৬, ২৩৬, ২৩৭

হরিনাভি মিউনিসিপ্যালিটি ২০২, ২০৩

হরিনাভি স্কুল ২০১—২০৬, ৪৪৪

হরেকৃষ্ণ বাবাজী ৫৭, ৫৯, ৬০

“হাই চর্ক” ২১৫

হারদরবাদ (সিদ্ধ প্রদেশ) ২৯৬

হার্ডিঞ্জ মডেল বাঙ্গলা স্কুল (মজিলপুর) ২০, ২৮, ৭৫, ৪৭০

“হিন্দুপেট্রিয়ার্ট্‌” পত্রিকা ৩২১

হিন্দুমহিলা বিভাগ ২১১

“হিমাদ্রিকুসুম” ৩৫৩

হেমচন্দ্র বিহারী ১২১, ১২২, ১৫৪, ১৫৫, ২৩৮

হেমসুন্দর বোষ ১৬৯

হেমলতা (জ্যোষ্ঠা কল্যা) ১১৮, ১১৯, ১৬৪, ২১১, ২৭৩, ৩৪৩, ৪৫২, ৪৫৯

৪৬০, ৫০১

হেমেন্দ্রনাথ দত্ত ৪৬১

হেন্স (ডেভিড্) ৮

হেন্স স্কুল ২২২, ২৩৪ ২৪৯—২৫১

হেন্স (সার আর্থার) ১৫৩

হোল্কার ৪৪০, ৪৪১



